প্রাক্‌কথন

অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপার অনুগ্রহে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে (ইংরেজি ১৯৬০) প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমানে ইহার সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হইতেছে। বাংলাভাষাভাষী ও বাংলাভাষাবিদ্ ভক্তগণের চাহিদাতেই একের পর এক সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হইতেছে।

শ্রীম-দর্শন ষোলটি খণ্ডে সম্পূর্ণ।

শ্রীম দর্শনের মূল আবেদন ঃ গৃহে বাস করিয়া কি প্রকারে দেবভাবে জীবন যাপন করা যায়, কিভাবে বেদবর্ণিত উপায়ে সুখদুঃখ সমভাবে গ্রহণ করিয়া সংসারে শান্তিতে বাস করা সম্ভব হয়।

শ্রীমতী ঈশ্বরদেবী গুপ্তা 'শ্রীম-দর্শন'-এর পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ শ্রীম-র কথামৃত হইতে এই স্বর্গীয় আনন্দ ও শান্তি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই উপলব্ধির ফলশ্রুতিরূপেই তিনি স্বামী নিত্যাত্মানন্দজীকে এই পুস্তক প্রকাশের জন্য আবেদন জানাইয়াছিলেন। ঈশ্বরদেবী নিজেই বাংলাভাষা শিক্ষা করিয়া এই গ্রন্থ হিন্দীতে অনুবাদ করিতে শুরু করেন যাহাতে হিন্দীভাষাভাষী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ এই মহাগ্রন্থের আস্বাদ লাভ করিতে পারেন। এই গ্রন্থ পরে ইংরেজি ভাষাতেও অনুদিত হইয়াছে। ইংরেজি ভাষাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির মিলনসেতু রচনা করিয়াছে — তাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শান্তি ও আনন্দের মহাবাণী জগতের দিকে দিকে ছড়াইয়া দিবার জন্যই বিশেষ করিয়া ইংরেজিতে অনুবাদ করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। এই ভাবেই রামকৃষ্ণ-লোকগত শ্রীমৎ স্বামী নিত্যাত্মানন্দজীর আশীর্বাদে ও অগণিত ভক্তের মনোবাঞ্ছায় 'M- The Apostle and the Evangelist' প্রকাশিত হয়।

পূজ্যপাদ স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজ তৎরচিত এই মহাগ্রন্থ 'শ্রীম-দর্শন' খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিবার সম্পূর্ণ দায়িত্বভার 'শ্রীম

ট্রাস্ট’-এর উপর অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহারই নির্দেশ স্মরণে রাখিয়া ভক্তগণের পরমাকাঙ্ক্ষিত এই গ্রন্থরাজি ট্রাস্ট নিয়মিতভাবে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন।

সমগ্র ভক্তসমাজ এবং শ্রীম ট্রাস্টকে আমাদের আন্তরিক কতৃজ্ঞতা জানাইতেছি।

শ্রীম-দর্শন মুদ্রণে এবং প্রকাশনে যে সকল সহকর্মী ও অনুরাগীবৃন্দ আমাদের সহায়তা দান করিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেককে আমাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাইতেছি। শ্রীরামকৃষ্ণে নিবেদিতপ্রাণ পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাস মহাশয় ও তাঁহার সহযোগীদের সহায়তা ব্যতিরেকে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা সুকঠিন হইত।

চণ্ডীগড় ১৯-ডি সেক্টরে অবস্থিত ট্রাস্টের নিজস্ব ভবন নির্মাণে যে সকল মহানুভব রামকৃষ্ণ-অনুরাগী ব্যক্তিবর্গ অকৃপণ হস্তে অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য দান করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ভাষা নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপা তাঁহাদের উপর অজস্র ধারায় বর্ষিত হোক।

এই ভবন ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পীঠ’ রূপে নামাঙ্কিত হইয়াছে।

‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত’-এর সঞ্জীবনী ধারায় যাঁহারা অভিসিঞ্চিত হইতে চাহেন, দেশ-দেশান্তরে এই অমৃতধারা যাঁহারা পরিবেশন করিতে ইচ্ছা করেন আমরা তাঁহাদের এই ‘পীঠ’-এ যোগদান করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি। শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনদর্শন অনুধ্যানের সুযোগ এই ‘পীঠ’ তাঁহাদের দিবার জন্য সর্ব প্রকার সহায়তা করিবে।

॥ ওঁ সত্যব্রহ্ম শ্রীরামকৃষ্ণঃ ॥

শ্রীমতী ঈশ্বরদেবী গুপ্তা
প্রকাশিকা

নাগ পঞ্চমী, ১৩৮৭
শ্রীম-র ১২৭তম জন্মদিবস
শ্রীম ট্রাস্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পীঠ
সেক্টর ১৯-ডি, চণ্ডীগড়।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কৃপায় বহু বাধা-বিঘ্নের পর 'শ্রীম-দর্শন' প্রকাশিত হল। উত্তরাখণ্ডে হিমালয়ে গঙ্গাতীরে পর্ণকুটিরে বাস, ভিক্ষান্নে উদরপূরণ, 'নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে ভগবানকে ডাকা'র জন্য পূজ্যপাদ আচার্য শ্রীম তাঁর অন্তেবাসীদিগের প্রাণে জন্মাতেন গভীর প্রেরণা, অফুরন্ত উৎসাহ। ভারতের এই সনাতন মহান্ আদর্শ শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তানগণের সঙ্গে তাঁর জীবনেও মূর্ত হয়েছিল। শ্রীম-র দেহত্যাগের পর আমাদের জীবনে যখন সেই সুসময়ের আবির্ভাব হয় আর তাঁরই শুভাশীর্বাদে ঋষিকেশে* ভিক্ষাজীবি হয়ে অভূতপূর্ব সুখশান্তির আস্বাদ পেলাম, তখন তাঁর অমৃতকথার ভাণ্ডার যা বহুকাল ধরে যক্ষের ধনের মত পুঁটুলী বেঁধে রেখেছিলাম সেই ডায়েরীগুলি দেখতে লাগলাম। এখন এইগুলি আরো মূল্যবান, অধিক মধুর ও শান্তিদায়ক বলে বোধ হতে লাগল। ভাল খাতায় সুন্দর করে গুছিয়ে লিখতে আরম্ভ করলাম। বন্ধুগণ কৌতূহলী হয়ে খোঁজ নিলেন কি লিখছি। আর চেয়ে নিয়ে আগ্রহ করে পড়তে লাগলেন। ঋষিকেশবাসী ত্যাগী তপস্বীগণ পড়ে হলেন বিমোহিত। আরম্ভ হলো ভাল করে লিখে প্রকাশ করবার বারংবার অনুরোধ উপরোধ।

এর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয় ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের বসন্তকালে ঋষিকেশেই। তারপর তা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের বহু নবীন প্রবীণ সাধু ও ভক্তগণ, আর অনেক বিদ্বান ব্যক্তি পড়েন ও শোনেন তিন বছর ধরে। তাঁরা সকলে উহার প্রশংসা করেন। প্রকাশের ইচ্ছা থাকলেও উপায়ের অভাবে চেষ্টা হয় নাই। তখন যেন দৈববশে দার্শনিকপ্রবর আচার্য মহেন্দ্রনাথ সরকার আসেন উত্তরাখণ্ডে। উনিও পাণ্ডুলিপি

*হৃষীকেশ (নারায়ণ, বিষ্ণু, কৃষ্ণ)

পড়ে মুগ্ধ হন এবং প্রকাশের জন্য কলকাতায় নিয়ে যান। বাংলার রাজনৈতিক বিপর্যয়ে প্রকাশ হয় হয় হয়েও হয় নাই। ভগবানের ইচ্ছা ছাড়া কিছুই হবার নয়। তাই এতদিন পর উহা সাধারণের নিকট পৌঁছাল।

এই পুস্তকে আছে পরমহংসদেবের ও মায়ের কিছু নূতন কথা, আর তাঁদের স্বামীজী প্রমুখ অন্তরঙ্গ সন্তানগণের কথা। আর আছে 'কথামৃত'কার দ্বারা কথামৃতের' ব্যাখ্যা। আর শ্রীরামকষ্ণ-জীবনালোকে উপনিষদ্, গীতা, ভাগবত, পুরাণ, বাইবেল-আদি শাস্ত্রের আলোচনা।

এই পুস্তক লেখার প্রধান উদ্দীপন হয় বেলুড় মঠের কয়েকজন সাধুর বিশেষ অনুরোধে। তাঁরা জানতেন আমার কাছে শ্রীম-র কথার ডায়েরী আছে। ডায়েরী আমি নিজে পড়তাম — আমার নিজের জন্যই রাখা হয়েছিল। কখন কেউ শুনতে চাইলে শোনাতাম। পুস্তাকাকারে প্রকাশ করবার ইচ্ছা ছিল না। সাধুগণ ও ভক্তগণের ইচ্ছাতেই প্রকাশের ইচ্ছা হয়।

পূজ্যপাদ শ্রীম-র কৃপাশ্রয়ে থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল দীর্ঘকাল। সেই সময় যা প্রত্যক্ষ দেখতাম ও শুনতাম তা-ই নিজের দৈনন্দিন ডায়েরীতে গোপনে লিখে রাখতাম। নিজে পড়তাম ও পরে ভক্তগণের আগ্রহে তাঁদের শোনাতাম। শ্রীমও উহার পাঠ শোনেন এবং স্থানবিশেষে সংশোধন করে দেন। কি করে নিখুঁতভাবে ডায়েরী রাখতে হয় তার উপদেশ দেন। এই পুস্তকের সমগ্র উপকরণ আমার নিজের ডায়েরী হতেই প্রাপ্ত — অপর কারো নিকট শুনে, বা অন্য বই পড়ে লেখা হয় নাই।

শ্রীম-র সাহচর্যলাভ — সে-ত এক দৈব ঘটনা। অতি অল্প বয়সে 'কথামৃতে'র প্রথম ভাগ হাতে পড়ে, কিন্তু বিশেষ কিছু বুঝতে পারি নাই তখন। সেই সময় শ্রীম-র প্রতি আকর্ষণও ছিল না — বই লিখেছেন শ্রীম, এইমাত্র জানতাম। আমাদের আকর্ষণ ছিল জগৎগুরু শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের উপর। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম থেকেই তাঁর নাম শুনি। আর তাঁর চিকাগো বক্তৃতার ছবি দেখি। এই বীরকেশরী বিবেকানন্দ ছিলেন আমাদের উপাস্য। আমরা মনে করতাম, তিনি

ভারতের মুক্তির জন্য এসেছেন। তাঁর উপর তখন যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা হতো তা ভক্তের ভাবে নয়, admirer-এর ভাবে। সেই সময় হতে স্বামীজীকে আশ্রয় করে আমরা যথাসাধ্য পবিত্র জীবন যাপন ও সেবাব্রতের অনুষ্ঠান করতে চেষ্টা করি। গীতা চণ্ডী প্রভৃতি পড়ি ভাল করে না বুঝলেও। অনাড়ম্বর সরল জীবন হয় আমাদের আদর্শ। কিন্তু, ভগবানলাভ মনুষ্যজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য, তার খবর তখনও হৃদয়ে পৌঁছায় নাই। এইরূপে দিন যায়।

কলেজে পড়ার সময় একদিন একটি বন্ধুর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যগণের সম্বন্ধে কথা হয়। মাঝে মাঝে এরূপ আলোচনা হত। বন্ধুটি বেলুড়মঠের দীক্ষিত, শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। উনি বললেন, শ্রীম ঠাকুরের কথা ছাড়া অন্য কথা বলেন না। তর্কচ্ছলে আমি বললাম, তিনি স্বামীজীর কথা কেন বলেন না? স্বামীজী ভারতকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন, মুক্তির সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর আগমনে ও প্রচারেই তো স্বাধীনতা-সংগ্রামের নূতন করে সূত্রপাত হয়। আমরা তো তাঁর কথায়ই জীবন যাপনের চেষ্টা করি — তাঁর কথা কেন বলেন না?' তর্ক ক্রমশঃ প্রখর হতে থাকে। ভক্ত বন্ধু অগত্যা বলেন, আপনি গিয়ে একদিন তাঁকে এই কথা বলে আসুন না যদি তাই আপনার মত হয়। তাই ঠিক হল।

শ্রীমকে উত্তম উপদেশ দিতে গিয়ে তাঁরই উপদেশজালে চিরতরে বদ্ধ হলাম। শ্রাবণের বিকালে বৃষ্টি হয়ে গেছে — মর্টন স্কুলের চারতলার ছাদে শ্রীম-র সঙ্গে বসা। প্রথম দুইচারটি কথা জিজ্ঞেস করে আমার মুখের উপর শ্রীম-র ঐ দৈবী অন্তর্ভেদী চক্ষু দু'টি এক মিনিট স্থাপন করে স্বামীজীর কথা বলতে লাগলেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! ক্রমাগত তিনঘন্টা বললেন শুধু স্বামীজীর কথা! আমার বোধ হতে লাগল — চিত্তে শান্তি ও অমৃতের বর্ষণ হচ্ছে। হৃদয়ের পুঞ্জীভূত সংশয় অশান্তি দূর হয়ে যেন প্রার্থিত বিষয় অজানিতভাবে প্রকাশিত হতে লাগল। অমন মধুবর্ষণ হৃদয়ে আর কখনও হয় নাই। বহুদিনের বাঞ্ছিত বস্তুটি লাভ হল বলে হৃদয় আনন্দপূর্ণ। আর শ্রীম-র এই কথায় সমালোচকদের দৃষ্টিতে যে পরীক্ষার প্রবৃত্তি থাকে তা-ও দূর হতে লাগল। মনে হতে

লাগল, এই ব্যক্তি কে? তাঁর কথায় তো অহংকারের একটুও লেশ নাই, ‘আমি’ — এ শব্দটা পর্যন্ত নাই। আমরা যুবক আর ইনি বৃদ্ধ, তাঁর ব্যবহার আমাদের সঙ্গে যেন সমবয়সীর ব্যবহার — কোনও ব্যবধান নাই। আর কি মাধুর্য! বুঝতে পারলাম, উনি যেন ওঁর নিজের সঙ্গেই আলাপ করছেন। নিজের কথা একটুও না বলে স্বামীজীর কথা অনর্গল চলল। বললেন, ভারতের যুবকেরা যদি স্বামীজীকে ধরে তবে তাদের নিজেদের কল্যাণ আর দেশের ও দশের কল্যাণ। শুকদেব নবকলেবরে নরেন্দ্রনাথরূপে এসেছেন। তাঁর নিজের কোনও প্রয়োজন নাই, তিনি নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরকোটি সপ্তর্ষির এক ঋষি; ভারতের আর জগতের কল্যাণের জন্য তাঁর আগমন — চারতলা থেকে একতলায় নেমেছেন জীবশিবের সেবা শিক্ষা দিতে, রামকৃষ্ণদেবের ‘মাথার মণি’ নরেন্দ্র। আঠারটা গুণ তাঁর — কেশবের মাত্র একটা। সিজার, আলেকজাণ্ডার ও নেপোলিয়ানের বিজয়ের চাইতেও তাঁর বিজয় বড় — ধর্মক্ষেত্রে, ইত্যাদি।

পূর্বে যে স্বামীজীর উপর আমাদের প্রীতি ছিল উহা যেন fanatic-এর প্রীতি — তুবড়ীর মত ভুশ ভুশ করে ওঠে, আবার পড়ে — sentimental admirer-এর প্রীতি। রাজনীতির রং-এ রঙিয়ে দেখতাম তখন স্বামীজীকে। শ্রীম-র কথায় সে রং ধুয়ে আরও উচ্চভাবে দেখবার আলো পেলুম। অবতারের প্রধান পার্ষদ নিত্যমুক্ত ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বিবেকানন্দ — এই সন্ধান হৃদয়ে ঢুকল। ব্রহ্মজ্ঞানের তুঙ্গ শৃঙ্গে সমাসীন বিবেকানন্দ — বিশাল তাঁর দৃষ্টি আর সর্বতোমুখী প্রতিভা! তা দিয়ে তিনি দেখতে পেতেন জগতের ও ভারতের সমস্যাগুলি নখদর্পণে। আর স্থানকালপাত্র ভেদে তারই কিছু কিছু ব্যক্ত করলেন। অল্পদৃষ্টি মানুষ কি করে তাঁকে বুঝবে! তাই সে নিজের চশমার রং-এ রাঙিয়ে তাঁকে দেখে।

আমার নিজের প্রধান লাভ হল শ্রীমকে পাওয়া। এই দর্শনের পূর্বে কিছু কাল ধরে হৃদয়ের ভিতর হতে আকাঙ্ক্ষা হতো, আর নিশিদিন নীরব প্রার্থনা — হে ঈশ্বর, আমায় এমন একজন মানুষ জুটিয়ে দাও যাঁর বুদ্ধি স্থির অবিচলিত। যাঁর বুদ্ধিকে আশ্রয় করে

চললে জীবনের ওঠাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। সেই ব্যক্তির সাহায্যের প্রয়োজন ঈশ্বরলাভের জন্য নয়, কিন্তু আমার দৈনন্দিন জীবনপথে তাঁর বুদ্ধিতে চলব। এইরূপ একজন 'স্থিতপ্রজ্ঞে'র সন্ধানের কারণ ছিল নিজের বুদ্ধির দুর্বলতা ও অস্থিরতা দেখে। কলেজে পড়বার সময় কোনও একটি ঘটনাতে নিজের বুদ্ধির দোষ দেখতে পাই, মনে হয় একে নিয়ে গর্ব করা বৃথা। অমন হালকা চঞ্চল বুদ্ধিকে এতদিন আমি বড় বলে মনে করে এসেছি, একে আর বিশ্বাস করা যায় না। বুদ্ধিমান বলে যে অভিমান ছিল তা ভেঙে গেল। এটি বড় দুঃসহ ব্যাপার মানুষের জীবনে। নিজের বুদ্ধিকে আশ্রয় করেই সকলে সব করে, ছোট বড় কাজ। কিন্তু যখন নিজের বুদ্ধির উপর অবিশ্বাস আসে তখন মানুষের জীবন্মৃতের অবস্থা। এই অশান্তির অনল হৃদয়ে সর্বদা জ্বলছিল। নিরুপায় হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুল প্রার্থনাও চলছিল — এমন একজনকে মিলিয়ে দাও যাঁর কথা slave-এর মত মেনে চলবো। আমি আর চলতে পারছি না, এই বুদ্ধি নিয়ে। বাইরে সব করা হচ্ছে। কিন্তু ভেতরে এই জ্বালা আর প্রার্থনা! এই মনোবৃত্তির অরাজকতার সময় দর্শন ও লাভ হয় শ্রীমকে নূতন ভাবে। যেদিন এই ভাব নিয়ে শ্রীমকে দেখলাম সেই দিন থেকে বুঝলাম ভগবান আমার প্রার্থনা শুনে শ্রীমকে দিয়েছেন — শ্রীম কর্ণধার।

আর একটি বাসনাও পূর্ণ হলো এই সঙ্গে। বাল্যকাল হতে আরুণি, উপমন্যু, বেদ — এঁদের কথা পড়ে গুরুগৃহে বাস করবার ইচ্ছা হতো ঋষিসঙ্গে। শ্রীমকে লাভ করে আর তাঁর সঙ্গে বাস করে এই বাসনাও পূর্ণ হলো পূর্ণরূপে।

এই মিলনের পূর্বে ঠাকুর ও স্বামীজীর বই পড়তাম, বেলুড়মঠ ও দক্ষিণেশ্বরে যেতাম। মর্টন স্কুলে শ্রীম — একথা জানাও আছে, দেখাও আছে। কিন্তু সবই মূলতঃ স্বামীজীর সম্পর্কে। তখন এই নূতন দৃষ্টি খোলে নাই। এই ঘটনার দিন হতে নিত্য শ্রীম-র কাছে যেতে লাগলাম। তাঁর কথা একাগ্র মনে শুনতাম ও লিখতাম ঘরে ফিরে। মনে হত — এই কথা আমার প্রাণ শীতল করেছে, লিখে রাখি, যখন শ্রীমকে পাব না তখন পড়ে শান্তি লাভ করবো। অপরকে

শোনান বা বই প্রকাশের বিন্দুমাত্রও ইচ্ছা প্রথমে ছিল না তা বলা হয়েছে। অপরের কথাতেও লেখা হয় নাই। প্রাণের ভিতর থেকে প্রেরণা এলো লিখতে, তাই লিখেছিলাম। সেই লেখাই এখন 'শ্রীম-দর্শন'-রূপে প্রকাশিত।

কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, শ্রীম আমার গুরু। কিন্তু শ্রীম-র কথা ও ব্যবহারে গুরুগিরির নামগন্ধও ছিল না। উহাই আরো বেশী আকৃষ্ট করল। তাঁর নিকট প্রথম শুনলাম, যিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, বাক্যমনের অতীত, তিনিই এসেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণরূপে, এই সেদিন চলে গেলেন, 'হাত বাড়ালে ধরতে পারা যায়'। তাঁর সৌরভ হাওয়া এখনও বহন করে বেড়াচ্ছে। আর শুনলাম, ঠাকুরের প্রতিজ্ঞা — 'যে আমার চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে।' তাঁকে লাভের সহজ উপায়ের কথা শুনলাম — 'আমায় ধ্যান করলেই হবে, তোদের আর কিছু করতে হবে না।' 'আমি কে আর তোরা কে এটা জানতে পারলেই হবে' — ঠাকুরের এই মহাবাক্য।

আর চিনলাম মঠকে নূতন করে। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকান্দ, মঠ — এসব পূর্বে এক দৃষ্টিতে দেখতাম। শ্রীম-র কৃপায় এখন অন্য দৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ যুগাবতার, নরেন্দ্রাদি সাঙ্গোপাঙ্গ — যেমন চৈতন্যদেব ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রচারের প্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠ। সন্ন্যাসীরা মানুষ হলেও ভিন্ন স্তরের মানুষ — আমাদের প্রণম্য। বেলুড় মঠের এক অভিনব রং ধরিয়ে দিলেন শ্রীম, দেবভাবে মণ্ডিত করে। Admiration শ্রদ্ধায় পরিণত হল। বেলুড় মঠের বাগানের প্রতিটি গাছও পবিত্র, প্রতি ধূলিকণা পবিত্র, কারণ এখানে সর্বত্যাগীদের আশ্রম। দক্ষিণেশ্বরের সম্বন্ধেও ঢুকিয়ে দিলেন এই ভাব। ভগবান ত্রিশ বৎসর নরলীলা করেছেন এই পূণ্যভূমিতে। ওখানকার ধুলিকণা, বৃক্ষলতায় রয়েছে তাঁর দিব্য স্পর্শ। বৃক্ষগণ ওখানকার, সব দেব ও ঋষি—লীলাসম্ভোগের জন্য এইরূপে রয়েছেন। তাই বুঝি শ্রীম দক্ষিণেশ্বরের বৃক্ষগণকে আলিঙ্গন করতেন!

উৎসাহিত করে, পরে জোর করে নিত্য মঠে পাঠাতে লাগলেন

অতি প্রত্যুষে। শিখিয়ে দিলেন মঠের ফটকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে আর এই চারটি মন্ত্র উচ্চারণ করে ঢুকবে ঃ — (১) কায়মনোবাক্যে আশ্রমপীড়া করব না। (২) সাধুদের ধ্যানজপের সময় উল্লঙ্ঘন করব না (৩) সাধুদের ভিক্ষান্ন গ্রহণ করব না, কিন্তু প্রসাদ — যেমন চরণামৃত অবশ্য চেয়ে নেব। (৪) বেলুড় মঠের সীমানার ভিতর যদি কোন সাধু তিরস্কার করেন, এমন কি প্রহারও করেন, তবুও হাত জোড় করে তা সহ্য করব — কারণ ইহা অত্যাশ্রয়ীদের আশ্রম। এখানে আমাদের কিছু বলবার অধিকার নাই!

মাঝে মাঝে পূজাপার্বণে মঠে বাস ও সেবা করতে লাগলাম শ্রীম-র উপদেশে। সাধুগণও স্নেহ করতে লাগলেন — ঠাকুরের সন্তানগণ।

এদিকে, শ্রীমকে পূর্বে নিত্য বাহির হতে এসে দর্শন ও তাঁর কথা শ্রবণ করতাম। এখন তাঁর সঙ্গে মর্টন ইনস্টিটিউশানে বাস করতে লাগলাম। ক্রমে স্কুলে পড়াবার ভারও এলো। সাধু ভক্তগণের অভ্যর্থনা ও সেবা, স্কুলে অধ্যাপনা, 'কথামৃত' ছাপার ভার নেওয়া, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা, শ্রীম-র হয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা, শ্রীম-র শরীরের যৎকিঞ্চিৎ সেবা, এই সব কাজ করতে লাগলাম। এককথায় বলতে গেলে আজকাল যাকে 'সেক্রেটারী' বলে সেই কাজ করতে হতো। একসময় তিনি প্রস্তাব করলেন, মর্টন স্কুলের হেডমাস্টার হবার জন্য প্রস্তুত হতে। আমরা রাজী হই নাই। তাতে দুঃখ করে পরে বলেন, 'গুরুজনদের কথায় আপত্তি করতে নাই। তাঁরা চান ভক্তদের বড় কাজ দিয়ে উপরে তোলেন।' ভারতের বাইরের কেউ এলে শ্রীম কখনও আমাদের পাঠাতেন উপদেশ দিয়ে — এই এই সম্বন্ধে গিয়ে আলোচনা কর। ঠাকুরকে দর্শন করেছেন এমন অনেক ব্রাহ্ম ভক্তদের কাছে প্রেরণ করতেন। কলকাতায় সভাসমিতিতে ধর্মপ্রসঙ্গ হলে সেসব স্থানেও প্রেরণ করতেন এবং আমাদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ রিপোর্ট নিতেন। তাঁর একটা বাসনা ছিল কলকাতা শহরে ভগবানের জন্য কে কি করছে তা এক সময়ে দেখা। তাই গীর্জা, মসজিদ, জৈনমন্দির, বুদ্ধবিহার, ব্রাহ্মসমাজ, আর্য সমাজ, সর্বত্রই আমাদের পাঠাতেন — তিনিও কখনও সঙ্গে যেতেন, হিন্দুদের মঠমন্দিরে

যাওয়ার কথা বলাই বাহুল্য। একবার এলেন আমেরিকা থেকে ডক্টর গিল্‌কী। ইনি 'বেরোজ (Dr. Barrows — যিনি পার্লামেন্ট অব রিলিজিয়ানসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন, যাতে স্বামী বিবেকানন্দ বক্তৃতা দিয়ে জগৎবিখ্যাত হয়েছিলেন) লেকচারার'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদারকে এলবার্ট হলে সাতটি বক্তৃতা দেন। প্রায় সবগুলিই ক্রাইস্টকে নিয়ে। শ্রীম আমাকে বললেন, আপনি গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আসুন ক্রাইস্টের ত্যাগসম্বন্ধে এই basis-এ — 'Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the son of the man hath nowhere to lay his head,' (St. Matthew 8:20, St. Luke 9:58); আর তাঁকে আর একটি লেকচার দিতে অনুরোধ করুন — তার বিষয় হবে 'Renunciation of Christ'. বক্তাকে বলা হলে তিনি উত্তর করলেন — 'আমার সময় নেই — দার্জিলিং যাচ্ছি আমি।' আমার এত কাজের মধ্যেও শ্রীম আবার আমাকে 'ল' কলেজে পড়তে পাঠাতেন।

অপর দিকে সাধনভজনও শিক্ষা দিতে লাগলেন। শ্রীম-র নিকট থেকে কেউ চার পাঁচঘন্টার বেশি বিশ্রাম করতে পারতেন না। রাত্রি তিনটায় অগত্যা চারটায় উঠে ধ্যানজপ করতে হতো। এদিকে শুতে প্রায় এগারটা। দেখতে লাগলাম শ্রীম রামকৃষ্ণময়। শ্রীম-র কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের সব কিছু প্রিয় — 'মথুরাধিপতে সকলং মধুরং'। রোজ রোজ শুনে, আচরণ দেখে শ্রীরামকৃষ্ণের উপর আমাদের আকর্ষণ বাড়তে লাগল। তাঁরই ধ্যান, তাঁরই জপ, তাঁরই পূজা করাতে লাগলেন। আর উপনিষদ্ গীতা, বাইবেলাদি শাস্ত্রের ব্যাখ্যা শুনাতেন শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে। শ্রীম বলতেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বেদাদি সর্বশাস্ত্রের ভাষ্য — 'Divine interpretation.' কিন্তু তিনি নিজে গুরুগিরির ত্রিসীমানার বাইরে ছিলেন।

অত কাজের ভিতরও সেই পূর্ব অভ্যাস পূর্ণমাত্রায় চলতো — দৈনন্দিন ডায়েরী লেখা। কখনও সারারাত জেগে ডায়েরী লিখতাম। এক সময় অত চাপে শরীর ভেঙ্গে পড়ল — বুক ধড়ফড় করতে

লাগল। তখন শ্রীম বলেছিলেন, ঠাকুর বলতেন, 'কুঁড়েঘরে হাতী ঢুকলে তোলপাড় করে দেয়'। আপনার অবস্থা তাই হয়েছে। এইসব কথা লিখে রাখার, চিন্তা করবার চেষ্টা করেছেন কিনা, তাই এরূপ হচ্ছে। এসব আমাদের কথা নয় — ঠাকুরের কথা। তিনি কণ্ঠে বসে কথা ক'ন — বড় তেজীয়ান তাঁর কথা। এইরূপ আমারও একবার হয়েছিল। তখন ঠাকুরের শরীর আছে। বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগরমশায়ের বাড়ির সামনে রাস্তায় একদিন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম। পাড়ার লোক দেখতে পেয়ে গাড়ী করে বাড়ি পৌঁছে দিছল। দিনকতক খুব ঘুমোন। আমার সামনে আসবেন না — এলেই কথা শুনে আবার বাড়বে। আর যতটা দুধ হজম করা যায়, ততটা দুধ খান। ঠাকুর আমায় এই ব্যবস্থা দিছলেন — আমার ঐ অবস্থার কথা শুনে।

ডায়েরী কি করে লিখতে হয় মাঝে মাঝে তার উপদেশ দিতেন, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। একবার একস্থানে পাঠালেন ধর্মপ্রসঙ্গ শুনতে। সেখানে কিছু লেখা নিষেধ, অথচ শ্রীমকে সব শোনাতে হবে। কি করা যায় ভাবছি। তিনি বললেন, এ দুটি পয়েন্ট মনে রাখবেন — প্রথম, ঠাকুরের সম্বন্ধে যা বলেন সেই কথা, আর দ্বিতীয়, বক্তার নিজের সম্বন্ধে যা বলেন সেই কথা। তা হলেই বাকী সব আপনিই মনে থাকবে।

একদিন বললেন, খুব ভাল background তৈরী করে এসব কথা অপরকে দিতে হয়, নইলে দাম কমে যায়। যেমন ডায়মণ্ড — মাটিতে রাখুন, এক রকম দেখাবে, ঘাসের উপর রাখলে অন্যরূপ দেখাবে। কাঠে রাখলে আর এক রকম। কিন্তু ভেলভেটের উপর রাখলে তার brilliance সব চাইতে বেশী বাড়ে।

ভক্তদের নিকট চিঠি লেখাতে হলে বলতেন, চিঠিটা পড়েই পাঠকের মনে হওয়া চাই — ঈশ্বরই আমাদের অনন্তকালের বন্ধু, অন্য সব দু'দিনের। তাতে থাকবে সুন্দর বর্ণনা — স্থান-কাল-পাত্রের সহিত। কবিত্বও চাই। এসব রস আস্বাদন না করলে মন একেবারে ব্রহ্মরসে যেতে চায় না। তাই ছিটেফোঁটা এ-ও চাই — যতদিন না সমাধি হচ্ছে। এই পুস্তকের 'রামনবমী' আর 'স্বামীজীর জন্মোৎসব'-

এর বর্ণনাও শ্রীম-র কথায়ই লিখিত।

কলকাতার বাইরে গেলে মঠ ও দক্ষিণেশ্বরাদির বিবরণ চেয়ে পাঠাতেন আমাদের কাছে। একবার মিহিজাম হতে তিনি লিখলেন, আমরা তখন গিয়েছি পুরী —

Dear Jagabandhu Babajee, Many many thanks for your sacred and interesting letter. সমুদ্রে স্নান, সমুদ্র-বেলাভূমিতে ধ্যান, শ্রীমন্দিরে ধ্যান, রত্নবেদী দর্শন ও পূজা। মহাপ্রসাদ তিনবার সেবন বড়ই ভাগ্যের কথা! শ্রীশ্রীঠাকুর চৈতন্যাবতারে এখানে ২৪ বৎসর ছিলেন ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর নিত্য দর্শন করতেন। শ্রীশ্রী ঠাকুর তাই নিজ অন্তরঙ্গদের এই পুরীধাম দর্শন করতে বলতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা ওখানে পাঠ করছ, বড়ই ভাল; শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত — অন্ত্যলীলা অর্থাৎ ঁপুরীলীলা যদি পাঠ করো তো উত্তম হয়। শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মঠ, শ্রীনরেন্দ্র সরোবর, সব শ্রীচৈতন্যের স্থান এবং সার্বভৌমের বাড়ি, ক্ষেত্রবাসীর মঠ ও শশী নিকেতন দর্শন করবেন। সেখানে শ্রীশ্রীমা ও ভক্তগণ অনেকবার ছিলেন।'

দ্বিতীয় পত্রে লিখলেন — 'তোমার interesting পত্রখানি পড়ে যেন ঁপুরীধামে বেড়াচ্ছি ও ঁজগন্নাথ দর্শন করছি মনে হচ্ছে। খামের মধ্যে কণিকামাত্র ঁমহাপ্রসাদ যদি পাঠাও বড়ই আনন্দ হবে।'*

আর একবার লিখলেন মিহিজাম থেকে — Dear Jagabandhu Babajee, Many many thanks for your graphic description of the Star Theatre meeting,... You have brought the proceedings just before our eyes. ...My Sastanga to all the Sadhus and Bhaktas assembled at the Math for witnessing the grest Mahotsava celebrating the anniversary of the birth of our dear Lord and Master, God-incarnate, for humanity.'

একদিন এক সভায় পাঠালেন আমাদের অনেককে। ফিরে এসে

*শ্রীম আমাকে 'আপনি ও জগবন্ধুবাবু' বা 'বাবাজী' বলে সম্বোধন করতেন বেশীর ভাগ সময়। কখনও 'তুমি' ও 'জগবন্ধু'ও বলতেন।

আমরা তার রিপোর্ট করি। তারপর শ্রীম অন্য ভক্তদের জিজ্ঞেস করলেন, কেমন হলো রিপোর্ট? তাঁরা বললেন, ওখানে গিয়ে শুনে যা আনন্দ হয় নাই, এ রিপোর্ট শুনে তা হলো। একবার নববিধান ব্রাহ্মসমাজে উৎসব হচ্ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবের মিলন — এই বিষয়ে আলোচনা থাকে একদিন। তাতে শ্রীম-র নিমন্ত্রণ ছিল। উনি পাঠিয়ে দিলেন আমাকে। আর কি কি বলতে হবে তাও বলে দিলেন। প্রবীণ ব্রাহ্মভক্ত 'সমাজের' নেতা আচার্য প্রমথ সেন (শ্রীকেশব সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র) প্রভৃতির সহিত আলোচনা হচ্ছিল। তখন আরও কতকগুলি ভক্তদের পাঠালেন। সবের শেষে তিনিও গিয়ে উপস্থিত হলেন।

কিছুদিন ভোরে প্রথম স্টীমারে নিত্য আমাদের মঠে পাঠাতে লাগলেন। ফিরে এলে রাত্রে, ভক্তসভায় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ বলতে হতো। এইরূপে ঈশ্বরীয় বিষয় বলার ও লেখার শিক্ষা দিতেন নানাভাবে।

আমাদের কাছে সাধু ও ভক্তসেবার জন্য কিছু টাকা থাকতো। তার হিসাব রাখতে শিখিয়েছিলেন — কোন সাধু এলেন, কোথা থেকে এলেন, নাম কি, খাওয়ানো হলো কি কি, এ সবই লেখা চাই। টাকাপয়সার হিসাব রোজ মিলাতে হতো। কখনও দু'চার পয়সার গোলমাল মিটাতে গিয়ে জ্বলে যেতো একটা ক্যান্ডেল। এতে কিছু বললে বলতেন, একটা মানুষের (তৈরী হওয়ার) দাম বেশী, ক্যান্ডেল তো তিন আনা!

একবার শ্রীম-র জন্য এক জোড়া কাপড় নিয়ে এলাম। আনতেই বললেন, দেখে এনেছেন তো খুলে? ঐরূপ আনি নাই শুনে বললেন, সে কি, পয়সা দিয়ে আনবো, দেখবো না? আমরা বললাম, কলকাতার বড় দোকানে কেউ এরূপ দেখে আনে না। বিরক্ত হয়ে শ্রীম বললেন, সকলের দেখাদেখি আমিও দেখবো না, এ কি কথা! ঠাকুর যে বলতেন, 'ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন' — তার কি হলো? ঠাকুরের ভক্তদের পিঠেও দুটো চোখ থাকবে — তবে তাঁর ঠিক ভক্ত। ঠাকুর আরও বলেছেন, ফাউ চেয়ে আনবে। এর মানে

নাই — তামাসার কথা এসব? তবে যদি ষোলআনা আসে। কাপড়খানা খুলে দেখাই। এক স্থানে কয়েকটি সুতা কম আধ হাত জায়গায়। দেখেই কঠোর স্বরে বললেন, এই যে কাপড় খারাপ। আমাদের তখন ক্রোধ হলেও প্রকাশ করি নাই, কিন্তু শ্রীম বুঝতে পেরেছেন। পুনরায় দোকান থেকে কয়েক জোড়া কাপড় নিয়ে এসেছি দেখে হাসতে লাগলেন আর বললেন, 'রেগে গেছেন দেখছি'। এক জোড়া রেখে দিন। ঠাকুর বলতেন, যে নুনের হিসাব করতে পারে সে মিছরীর হিসাবও করতে পারে। এতে ঠকে গেলে মহামায়ার এই বিচিত্র ভেল্কীতেও ঠকে যায় মানুষ।'

একবার 'কথামৃত' ছাপা হচ্ছে — ভার আমার উপর। অত কাজের ভিতর ঠিক সময়ে সব প্রুফ দেখা হয়ে উঠতো না — অনেক জমে আছে। একদিন, রাত্রি তখন একটা — শ্রীম-র ঘরে আলো দেখে ঘরে ঢুকি — দেখছি, হ্যারিকেনের আলোতে তিনি একাই প্রুফ দেখছেন। শ্রীম-র শরীর তত ভাল ছিল না আর অসময়ে কাজ করায় চোখ দিয়ে জল পড়ছিলো। এ দেখে আমার খুব কষ্ট হল। তাই সশ্রদ্ধ তিরস্কার করলাম। তিনি স্নেহের শাসন মেনে উত্তর দিলেন, এই বই পড়ে লোকের শান্তি হচ্ছে — ঠাকুরের অমৃতময়ী কথা। শরীর তো যাবেই। তাঁর কথায় যদি লোকের শান্তি হয় তাহলে এ ভাবে যাওয়াই উত্তম। আমরা সংসারে রয়েছি, এর কি জ্বালা, কি দুঃখ হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। সে জ্বালা ভুলেছি তাঁর কথামৃতে। সেই 'কথামৃত' দুঃখ সন্তাপে ক্লিষ্ট জগতের লোকদের দেবার চেষ্টা হচ্ছে। বইটা তাড়াতাড়ি বের হলে ভাল হয়, তাই এই কাজ। সত্যিই শ্রীম-র শরীরও গেল এই 'কথামৃতে'র প্রকাশে ও প্রচারে। পঞ্চমভাগের প্রকাশ হচ্ছিল তখন। তার শেষ অংশের কাগজ হাতে নিয়েই যেন মহাপ্রয়াণ করলেন এই মহর্ষি।

মর্টন স্কুল কলকাতার ভাল কয়েকটি উচ্চ ইংরেজী স্কুলের অন্যতম ছিল। শ্রীম তার রেক্টর ছিলেন বরাবর। সেই স্কুলে 'কথামৃত' পাঠ্য ছিল উপরের চার ক্লাসে চার ভাগ। আমরা কখনও পড়াতাম। ছেলেরা খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়ে না দেখে, আর বই বেচার ফিকিরে স্কুলে

পাঠ্য করা হয়েছে — কখনও কখনও এই সমালোচনা শুনে, একদিন শ্রীম-র সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করলাম। তিনি প্রশান্ত চিত্তে উত্তর করলেন, এই পড়ার ফল বুঝবে ছেলেরা যখন সংসারে ঢুকবে। সংসার জ্বলন্ত অনল — ঠাকুর বলতেন, আর আমরাও তা ভাল করে বুঝেছি। সংসারে প্রবেশ করে যখন দুঃখ কষ্টের পেষণে দিশেহারা হবে তখন তাঁর অমৃতময়ী কথা মায়ের মত বাঁচিয়ে রাখবে। এর একটা কথাও যদি মনে থাকে, উহাই তখন সংসারসমুদ্রে ভেলার ন্যায় শান্তির সীমানায় পোঁছে দেবে। বই বেচার জন্য এ পাঠ্য নয়। এই বইয়ের আয়ও নাই। সব খরচ ধরলে — পরিশ্রম, ড্যামেজ — এ লোকসানে চলছে। একটা বইয়েতে মাত্র ছয় পয়সা থাকে। সব খরচ বাদ দিলে লোকসান। এই বই যখন প্রথম বের হয়, তখন উপেনবাবু (ঠাকুরের ভক্ত, 'বসুমতী'র প্রতিষ্ঠাতা) আমাদের চারটি উপদেশ দেন — (১) কাগজ ভাল হবে, (২) ছাপা সুন্দর হবে, (৩) get-up attractive হবে, (৪) দাম বেশী হবে। ওর প্রথম তিনটি নিয়েছি, চতুর্থটি পালন করি নাই। দাম কম এই জন্য, যাতে বহু লোক পড়তে পারে। লোকের কথা অত শুনতে গেলে জগতে কাজ হয় না। তাই ঠাকুর বলতেন, 'লোক পোক'।

'কথামৃতে'র এই সামান্য আয়ও শ্রীশ্রীঠাকুর, মা ও সাধুসেবায় ব্যয় হত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী সন্তান শ্রীম কৃতিত্বের সহিত সারাজীবন শিক্ষাব্রতেই ব্যয় করেন। তাঁর সঙ্গে স্কুলে কাজ করে বুঝেছি, ইনি একজন অতি উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষক। ছেলেদের স্তরে নেমে তিনি পড়াতেন — অত সুপণ্ডিত মেধাবী হয়েও। সাধারণতঃ শিক্ষকগণ ছাত্রদের পুস্তকের বিষয় বলে যান — ছাত্র গ্রহণ করতে পারলো কি না তা দেখেন না। কিন্তু শ্রীম আগে দেখতেন, ছেলে কতটা নিতে পারে, এবং কি উপায়ে দিলে নিতে পারে। ম্যাপ, ছবি, ডায়গ্রাম প্রভৃতি নানা উপায় অবলম্বন করতেন যাতে ছেলে দেখে শিখতে পারে। ত্রিশ বছর পূর্বে সবে মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার কথা আলোচনা হচ্ছিল, সেই সময় শ্রীম মর্টন স্কুলে বাংলায়

পড়ানো প্রবর্তন করেন। তিনি যে শুধু ছেলেদেরই শিখাতেন তা নয় — শিক্ষকদের শিখাতেন ভাল করে পড়াবার প্রণালী।

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমকে শিক্ষা দিয়েছিলেন সংসারে 'বড়ঘরের ঝিয়ের' মত থাকতে, আর 'পাঁকাল মাছের' মত। শ্রীম দীর্ঘকাল গৃহে ঝি ও পাঁকাল মাছের মতই ছিলেন। নিজের ঘরে তিনি যেন একজন অতিথি — বাড়ির লোকের উপর কোন চাপ নাই তাঁর জীবনধারণের জন্য। সাধু ভক্তরা হলেন তাঁর আপনার জন। আর যাঁরা আপনার জন তাঁরা যেন হলেন পর। শরীরত্যাগের সময়ও সাধু ভক্তদের নিয়ে ঠাকুরবাড়িতে থাকতেন। পরিজন ছিলেন মর্টন স্কুলে। দেখতাম, একখানা কাপড়ের দরকার হলে নিজের, যেন তা ঠাকুর ও মার নিকট চেয়ে নিতেন — যেমন সাধুরা ভিক্ষা করে নেয় প্রয়োজন হলে। ঠাকুরকে যে পোষাকে দর্শন করেছিলেন, সারা জীবন সেই পোষাকই রেখেছিলেন — দু'খানা কাপড় ও দু'টি লংক্লথের পাঞ্জাবী, আর একখানা চাদর। একখানা ধুতি তোলা থাকতো কোথাও যেতে হলে।

একবার আমার খুব পেটের অসুখ হয় মর্টন স্কুলে — প্রায় কুড়িবার দাস্ত হয়। শরীর দুর্বল, লম্বা হয়ে পড়ে আছি বেঞ্চের ওপর। ভাটপাড়ার একজন ভক্ত এসে শ্রীমকে অনুযোগ দিয়ে বললেন, জগবন্ধুর এই অবস্থা — কেউ খবর নিচ্ছে না। শ্রীম গম্ভীর হয়ে উত্তর করলেন, তাহলে দেখছি গাছতলায় দাঁড়াতে রাজি নন ইনি। অসুখ হোক বা ভাল থাকুক সাধুদের স্থান গাছতলায়। গাছতলায় পড়ে থাকে অসুখ হলেও — 'ঔষধং জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্যঃ নারায়ণঃ হরিঃ'।

ঘনিষ্ঠভাবে শ্রীম-র সঙ্গে মিশলেও তাঁর কাজে পরস্পর কতকগুলি বিরোধী ভাব দেখে তাঁকে বুঝতে বড় বেগ পেতে হত। এক এক সময় এক এক পার্ট অভিনয় করতেন, যেমন যাত্রায় করে একই ব্যক্তি নানা পার্ট। কখনও দেখতাম শ্রীম যেন বিষয়ীশ্রেষ্ঠ, সম্পূর্ণ মন দিয়ে বিষয় দেখছেন। আবার কখনও দেখা যেতো কর্তৃত্বভাবের চরম অভিব্যক্তি। কখনও রঙ্গরসে সুরসিক। আবার সাধু ভক্তের কাছে দাসানুদাস। যখন স্কুলে গিয়ে বসতেন যেন সিংহ, কথায় ও কাজে। পড়ালে আওয়াজ বেরোতো গম্ভীর মধুর। আবার চারটার

পর সাধু ভক্ত এলে ভিন্ন রূপ ধারণ করছেন, চোখ মুখের চেহারা ও কণ্ঠস্বর বদলে যেতো তখন, আর মুখ দিয়ে বের হত অবিরত ‘কথামৃত’ — নির্ঝরের ন্যায়, যেন দাসবৎ পরিবেশন করেছেন সাধু ও ভক্তগণকে। কিন্তু এই ভাববিপর্যয়ের ভিতরও শ্রীম-র ভিতর থেকে উঁকি মারতো নিরভিমান-ভাব, আর প্রশান্তি। বহুরূপীর মত নানা ভাব দেখে ক্ষুদ্রাধার আমরা একবার বিদ্রোহী হয়ে পড়ি। জিজ্ঞেস করলাম, মশায় খাঁটি কি মেকী? একটি অলৌকিক দিব্য হাসি বেরিয়ে পড়লো শ্রীম-র মুখে আর সঙ্গে সঙ্গেই ছিন্ন হয়ে গেল আমাদের ক্রোধ ও সংশয়ের মূল। তাঁর মুখ থেকে বেরোল, খাঁটি। আপনিই মাথা নত হয়ে গেল, শরণাগত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, এরূপ হয় কি করে? তৎক্ষণাৎ উত্তর এলো — গুরুকৃপায় আর অভ্যাসে। শ্রীমকে ঠাকুর শিখিয়েছিলেন, গৃহস্থ হবে জ্ঞানী শান্ত নিরভিমান, কর্মক্ষেত্রে সিংহতুল্য, রসরাজ রসিক, আবার সাধু ভক্তের কাছে দাস। নিজেকে অকর্তা জেনে সংসারে থাকবে। এসবের পূর্ণ প্রকাশ দেখেছি শ্রীম-তে।

শ্রীম-র কর্মশক্তির কাছে এক ডজন যুবকের শক্তি হার মানতো।

‘কথামৃত’ প্রকাশ ও প্রচারের জন্য শ্রীম-র আগমন। পঞ্চাশ বছর ধরে তার প্রকাশ ও প্রচার করে চলে গেলেন বাউলের মত। একবার পুরীতে আমাকে অভিমানের সুরে বলেছিলেন, ‘ঠাকুর আমায় বলেছিলেন, তোমায় মায়ের একটু কাজ করতে হবে।’ তা পঞ্চাশ বছর করছি, এখনও ছুটি মিলছে না।

শ্রীম দীক্ষা গ্রহণ করার কথা প্রায় বলতেন না, কাউকে দীক্ষা দিতেনও না। কিন্তু, জমি তৈরী করার কথা খুব বলতেন, আর যথেষ্ট সহায়তা করতেন। তাঁর মত ছিল, ‘মা জানে কখন ডিম ফোটাতে হবে, ডিমের অত ভাবনা কেন?’ কিন্তু যদি কেউ মঠ থেকে দীক্ষা নিয়ে আসতেন, তবে ধন্য ধন্য বলে আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ করতেন। কিন্তু এইবার আমাকে দীক্ষা নিতে বলতে লাগলেন বারংবার। আর বলতে লাগলেন, এখন মঠে গিয়ে থাক বরাবরের জন্য। আমাদের ইচ্ছা তাঁর সঙ্গে থাকা, যতদিন ওঁর শরীর থাকে। কিন্তু তিনি তা

শুনবেন না। বললেন, মঠ শ্বশুরঘর, সকলকেই একদিন ওখানে যেতে হবে। মেয়ে বড় হলে বাপের বাড়ি রাখে না, — মেয়ে তো থাকতে চায় সেখানে। কিন্তু বাপ রাখে না, রাখা উচিতও নয়। (জনান্তিকে) এখানে থেকে থেকে adaptation হয়ে গেছে, মঠে যেতে চায় না। কিন্তু একবার ওখানকার আস্বাদ পেলে এখানে আর আসবে না। বাপ মা বিপদে পড়ে মেয়েকে আসতে লিখলে জবাব দেয়, কি করে আসি, এখন এখানে অনেক কাজ ছেলের পরীক্ষা — কত কি ওজর! এই মেয়েই বিয়ের সময় যেতে রাজী ছিল না শ্বশুরঘর!

এই সময় আমরা পুরী চলে যাই, কিন্তু শ্রীম সূতা ধরে আছেন। যতদিন না মঠে যোগদান করেছি ততদিন নিশ্চিন্ত হতে পারেন নাই। একজন ভক্তকে দিয়ে কড়া চিঠি লিখালেন শীঘ্র মঠে যেতে। ভক্ত লিখলেন, আমি তোমায় অমন করে লিখতাম না, যদি পূজনীয় মাস্টারমশায় তোমার সংবাদের জন্য ভাবিত না হতেন।.. তোমার পত্রখানা যেন আঁধার ঘরের আলো।... তোমার পত্র পড়ে মাস্টারমশায় বললেন, তাকে লিখবেন, আমি তাকে মঠে join করবার জন্য পত্র দিয়েছি। পুনরায় লিখুন, দীক্ষা যখন মঠ থেকে হয়েছে তখন তিনি অন্য ঘরের হয়েছেন। তোমাকে 'অগ্রে গচ্ছ' করে আর যে কয়জন হয় মঠে যাত্রা করবেন।.. তিনি ঐজন্য ব্যস্ত হয়েছেন। শ্রীম নিজে লিখলেন, 'দীক্ষা from মঠ is only a stepping stone to ব্রহ্মচর্য — hence invaluable'. অন্য একখানা পত্রে লিখলেন, 'আপনি শ্রীশিবানন্দ মহারাজকে এ বিষয়ে লিখেছেন শুনে সুখী হলাম — যিনি দীক্ষা দিয়েছেন তিনি সর্বদা মঙ্গলচিন্তা করেন — তাঁকে না জানিয়ে পরামর্শ করতে নেই, বিশেষতঃ as to such a serious step as you propose to take. নিজের বুদ্ধি weighed in balance is found wanting. গুরু কর্ণধার! গুরু কত বড় বস্তু appreciate করা যায় না বলে নিজের বুদ্ধি বা friend-দের বুদ্ধির উপর নির্ভর করা। Now that you have taken দীক্ষা, your path is straight — easy and clear. Cast your care on the preceptor who is so kind,

affectionate. অহেতুক কৃপাসিন্ধু।' আর একখানা পত্রে লিখলেন, 'শ্রীশিবানন্দ মহারাজ আপনার গুরুদেব। তাঁর সহিত পরামর্শ করে ও তাঁর আজ্ঞা নিয়ে কাজ করছেন — আর চিন্তা নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় সবই মঙ্গল হবে।

মঠে যোগদান করবার পর আর এক নূতন সমস্যা উপস্থিত হল। শ্রীম শিক্ষা দিতেন, যখন চব্বিশ ঘন্টা ভগবানের নাম করা যায় তখনই গেরুয়া নেওয়ার অধিকার হয়। এই কথা বহু বার বহু বৎসর ধরে শুনে শুনে মনে গেঁথে গেছে। তাই স্থির করলাম, আমি তো তাহলে গেরুয়ার অধিকারী নই, তাই সাদা কাপড় নিয়েই থাকবো — মৃত্যুর পূর্বে যদি ঈশ্বরের কৃপায় সে অবস্থা হয় তখন গেরুয়া নিব। মঠে যাবার কিছুদিন পরে মদীয় গুরুদেব পরমকারুণিক পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ একলা দেখতে পেয়ে আমায় বলতে লাগলেন, 'গেরুয়া নিয়ে মাদ্রাজ যেতে হবে, get ready for Gerua'. তিনমাস প্রায় এরূপ চললো। একদিন কলকাতায় শ্রীম-র কাছে এলে কথাপ্রসঙ্গে তাঁকে এই কথা বললাম। তিনি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি জবাব দাও মহাপুরুষ মহারাজকে?' আমি বললাম, 'কিছুই না, চুপ করে থাকি।' শ্রীম বিরক্ত হয়ে উত্তেজিত ভাবে বললেন, 'তুমি চুপ করে থাক? আমায় যদি বলতেন আমি তো গেরুয়া মাথায় নিয়ে ধেই ধেই করে নাচতাম। একি আর মহাপুরুষ মহারাজ দিচ্ছেন — ঠাকুর দিচ্ছেন। ঠাকুরের link এঁরা।' আমার অভিমান আহত হওয়ায় বললাম, 'সে তো মশায় আপনার শিক্ষারই ফল। বরাবর আপনি শুনিয়ে এসেছেন, চব্বিশ ঘন্টা ঈশ্বরকে ডাকতে পারলে গেরুয়ার অধিকার হয়।' তখন হেসে বললেন, 'তা তো তখন বলেছি, এখন বলছি এই কথা। শীঘ্র মঠে যাও। উনি যখন আবার বলবেন তখন হাত জোড় করে বলবে, আজ্ঞে, আপনার যা ইচ্ছা তাই হোক।'

মাদ্রাজে 'বেদান্ত-কেশরী'তে (মঠের ইংরেজী মাসিকপত্র) কাজ করছি। একজন ভক্তকে দিয়ে লিখে পাঠালেন, 'কাজের সময় কাজ। আর বাকী সময় ঠাকুরের কথা নিয়ে থাকলে সর্বদা যোগে থাকবে।'

আর লিখলেন, 'Freely ye have received — freely ye give.'

মাদ্রাজে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ি একবার — সঙ্কটাপন্ন অসুখ। কিছু ভাল হলে বায়ু পরিবর্তনের জন্য উটকামণ্ড আশ্রমে যাই। সেখানে শ্রীম লিখলেন, শ্রীযুক্ত জগবন্ধুবাবাজী, তোমার অসুস্থ শরীর, বড়ই আমরা চিন্তিত আছি। শ্রীশ্রীঠাকুর সর্বদা দেখছেন। কলিকাল, অন্নগত প্রাণ — তাঁরও (ঠাকুরের) সর্বদা শরীর অসুস্থ ছিল ও কত রোগে ভুগলেন। শেষে দশ মাস cancer!

‘শরীর দুর্বল হলে মনও দুর্বল হয়। তাই momentary (সাময়িক)। "The spirit is omnipotent", said S.V. (Swami Vivekananda). Said Bhagaban শ্রীকৃষ্ণ — “ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং etc. Again “নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য” etc. শরীর দুর্বল বলেই ত্রাস। শ্রীশ্রীঠাকুর সহায়, ভয় কি, ultimately victory! Victory. “জয়স্তু পাণ্ডুপুত্রাণাম্ যেষাম্ পক্ষে জনার্দনঃ.....”।’

মাদ্রাজ থেকে ফিরে মঠে রয়েছি — শরীর খারাপ। শ্রীম দেখে ভাবিত হলেন, কিন্তু লৌকিকভাবে আমার সেবাশুশ্রূষা করবার শক্তি থাকলেও করলেন না। বললেন, অনেকের নিজের শরীর নিজে রাখার শক্তি নাই — কয়টা case-ই দেখলাম। কিন্তু এই পথই পথ — সন্ন্যাস, অন্য পথ নাই — শরীর থাকে বা যায়। বুদ্ধদেব পিতাকে বলেছিলেন — মহারাজ, আমি বুদ্ধবংশে জন্মেছি। আমার বংশের রীতি এই — ভিক্ষা করে খাওয়া, ভিক্ষুজীবন যাপন করা। আমার সন্ন্যাসের পর শ্রীম বলেছিলেন, এখন সন্ন্যাসী, শুধু নিজের মুক্তি হলে হবে না। অপরের কথা ভাবতে হবে সঙ্গে সঙ্গে।

দেওঘর শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন বিদ্যাপীঠে আছি। তখন মনে একটা চিন্তা প্রায়ই উঠতো — ঠাকুর তো তাঁর ভক্তদের ঈশ্বরদর্শন করিয়ে গেছেন — পরিপূর্ণ তাঁরা। আমাদের তো তা হলো না। তাঁর সন্তানগণ একে একে চলে যাচ্ছেন। কি নিয়ে থাকবো — tangible কিছুই লাভ হলো না। মহাপুরুষ মহারাজ কিংবা শ্রীম-র মুখ দিয়ে যদি অযাচিতভাবে কিছু ভরসার বাণী বের হয় তবে খুব ভাল হয়।

মঠে গিয়ে দেখি মহাপুরুষ মহারাজের অসুখ — কথা বলা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। বিকেলে কলকাতায় শ্রীম-র কাছে গেলাম ঠাকুরবাড়িতে। বাবা বৈদ্যনাথের পেঁড়া-প্রসাদ ওপরে পাঠিয়ে দিয়ে নিচে কলে হাত পা-ধুচ্ছি। শ্রীম তিনতলা থেকে অতিষ্ঠ হয়ে নিচে তাকাচ্ছেন আর বলছেন, কই জগবন্ধু আসছে না কেন? অত দেরী কেন? আমি ওপরে গিয়ে তিন তলায় উঠবার কাঠের সিঁড়িতে পা দিয়েছি, এমন সময় তিনি উপর থেকে নেমে এসে সিঁড়ির গোড়ায় আলিঙ্গন করে বুকে ধরে রাখলেন। অমন তিনি প্রায় করেন না। মুখের দিকে চেয়ে দেখি, একটি আনন্দময় অপার্থিব ভাবে মুখমণ্ডল জ্বলজ্বল করছে। আমাকে ধরেই উপরে গেলেন। ঠাকুরের সামনে নিজ হাতে একখানা আসন পেতে দিয়ে আমাকে তা'তে বসালেন। আর একখানা আসনে নিজে বসলেন আমার কাছ ঘেঁষে। ধীরে ধীরে আমার কোলের উপর তাঁর শরীরের অর্ধেক রেখে পুনরায় আলিঙ্গন করে বললেন, কি ভয়! কি ভাবনা! ঠাকুর রয়েছেন, মা রয়েছেন! বাপমাওয়ালা ছেলের মত থাকবে। কেমন করে থাকে বাপমাওয়ালা ছেলে? আমরা উত্তর করলাম, আনন্দে আর নিশ্চিন্তে। তিনিও বললেন, হাঁ, আনন্দে আর নিশ্চিন্তে। তেমনি থাকবে, ভাবনা কি? শ্রীম-র এমন আনন্দময় মাতৃভাব পূর্বে দেখি নাই, ব্যবহারও এমন দেখি নাই। সর্বদা তিনি গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন, আর ব্যবহারে অতি কঠোর নীতিবান। কিন্তু আজ যেন মায়ের মত হয়ে গেলেন — এলোমেলো মাতৃস্নেহে।

আর একবার 'বিদ্যাপীঠ'-এর ছুটিতে মঠে গেছি। সেখান থেকে শ্রীমকে দর্শন করতে যাই। কয়েকজন সাধু ও অনেকগুলি ভক্ত উপস্থিত। মর্টন স্কুলের চারতলার সিঁড়ির ঘরে সকলে বসে আছেন। শ্রীম স্বামীজীর কথা বলছিলেন খুব উদ্দীপিত হয়ে — এই বীর, মায়াজাল দু'হাতে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছেন — যেমন সিংহ পিঞ্জর ভেঙে পালায় — কি মহাবীর! বলতে বলতেই নিজের ঘরে ঢুকলেন আর বিছানায় পড়ে ছটফট করতে লাগলেন? হাতে-পিঠে 'নিউরালজিক্' বেদনা সুরু হল। যন্ত্রণা ক্রমশঃ বেড়ে চরমে উঠল। বালকের মতো আর্তনাদ করতে লাগলেন আর আমার কোলের

উপর উঠে গলা জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলেন, ও জগবন্ধু, ও জগবন্ধু — যেন অধৈর্য বালক! ডাক্তাররা কিছুই করতে পারলেন না। আগুনের গরম সেঁকে দেড় ঘন্টা পর কথঞ্চিৎ সুস্থ হলেন, আর বললেন, দেখ দেহ থাকলে এসব দুঃখকষ্ট আছে। এর হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ হয় না কারো। আর একবার শ্রীমকে কাঁকড়া বিছায় কামড়েছিল। তখনও যন্ত্রণায় ছটফট করেছিলেন। কেউ কোনও প্রতিকার করতে পারছিল না। হঠাৎ শ্রীম যেন সুস্থ হয়ে উঠলেন, মুখে শান্ত স্থির ভাব দেখা দিল। শ্রীম বলতেন, ও মা, যেই ঠাকুরের রোগযন্ত্রণার ছবি মনে এল, অমনি কোথায় গেল আমার দুঃখ সব। মনে হতে লাগলো, তিনি জগতের দুঃখ জ্বালা নিজে বরণ করে ভুগলেন, আর আমার এইটুকু সহ্য হচ্ছে না। অমনি লজ্জা হল। আর সঙ্গে সঙ্গে সব শান্ত হল। ঐ একটি miracle হয়েছিল সেবার।

আর একটি কথা অনেকবার শুনেছি শ্রীম-র মুখে — জীবের দুঃখ-কষ্ট — সব মঙ্গলের জন্য। দুঃখ মনকে majestic height-এ তোলে। দুঃখ না থাকলে ব্রহ্মানন্দের খবর কেউ করতো না, তাই ঈশ্বর দুঃখ সৃষ্টি করেছেন। নিজের কথায় বলতেন, দেখ না আমার নিজের ব্যাপার। কি প্রহেলিকা! বাড়িতে কলহ। একদিন রাত্রি দশটায় গৃহত্যাগ করলুম। মনে সংকল্প, এই দেহ আর রাখবো না — Life is not worth living! স্ত্রীও সঙ্গে গেলেন। শ্যামবাজারের মোড়ে গাড়ির চাকা গেল ভেঙ্গে। পাশেই এক বন্ধুর বাড়ি ছিল, সেখানে ওঠা গেল। বন্ধু ভাবলে, অত রাতে কি আপদ এলো। অনেক কষ্টে রাত্রি দশটায় আর একখানা গাড়ি জোগাড় করে গেলাম বরানগর ভগ্নীর বাড়িতে। ঈশান কবরেজ ভগ্নীপতি। পরের দিন সিদুর সঙ্গে সারাদিন বাইরে এ-বাগান ও-বাগান বেড়িয়ে কাটাচ্ছি। সিদু জানে না আমার মনের ঐ অবস্থা। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে ফিরছি, তখন সিদু বললে, মামা, রাসমণির বাগানে একটি সাধু থাকেন, দেখবে চল। বাগানে ঢুকে দেখি সুন্দর ফুলবাগান — ফুল তুলছি, শুঁকছি, আর ভাবছি, আহা কি সুন্দর — আমরা একটু কবি ছিলাম কি না! তারপরেই ঠাকুরের ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে শুনি ঐ কথা — এক ঘর

লোক বসা। ঠাকুর বলছেন, 'যখন একবার হরি বা একবার রাম নাম করলে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয় জেনো সন্ধ্যাদি কর্ম আর করতে হবে না। তখন কর্মত্যাগের অধিকার হয়েছে।' তার পরের কথা 'কথামৃতে' সব রয়েছে। সাতদিন পর কালীবাড়ির অঙ্গনে বেড়াচ্ছি ঠাকুরের সঙ্গে — সাহস করে তাঁকে বললাম, এ সংসারে না থাকাই ভাল — অত যন্ত্রণার ভিতর। অন্তর্যামী ঠাকুর পূর্বেই আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছেন, তিনি ভরসা দিয়ে বললেন 'বালাই, কেন যাবে তুমি শরীর ত্যাগ করতে — বললেই হলো! তোমার যে গুরুলাভ হয়েছে। যা অভাবনীয়, অচিন্তনীয়, স্বপ্নের অগোচর তাঁর কৃপায় তা সহজ হয়ে যায়।' বলেছিলেন, 'বাজীকর দশ হাজার লোকের সামনে একটা গাঁট দেওয়া দড়ি ফেলে দিল। একটা গাঁটও কেউ খুলতে পারলে না। তারপর বাজীকর নিজ হাতে নিয়ে হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে সব গাঁট খুলে ফেললো। তাঁর কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হয়।' শ্রীম বললেন, দেখুন, কোথায় শরীরত্যাগের সঙ্কল্প আর কোথায় ভগবানলাভ! তাই দুঃখ দেন তিনি কোলে টেনে নেবেন বলে। Human life is excellent apology for suicide without গুরু।

শ্রীশ্রীমায়ের কাছে শ্রীম ছিলেন শিশু। ঠাকুর ও মা অভিন্ন তা শ্রীম-র প্রতি কাজে প্রকাশিত হত। মায়ের শরীর গেলে বৃদ্ধ শ্রীম মাতৃহীন বালকের মত শোকে বলতেন, ঠাকুরকে আমরা পেয়েছিলাম মাত্র পাঁচ বছর। আর মাকে পেয়েছি পঁয়ত্রিশ বৎসর। সেই মা চলে গেলেন।

একবার আমরা শ্রীম-র নিকট প্রস্তাব করলাম — 'কথামৃতে'র ইংরেজী অনুবাদের জন্য। তিনি প্রশান্তভাবে উত্তর করলেন, অনুবাদ ক্লাস এইটের ছেলেরাও করে। আমাদের শক্তিতে কি 'কথামৃতে'র (প্রথম ভাগের) অনুবাদ হয়েছে, না 'কথামৃত' লেখা হয়েছে? মা শক্তি দিয়েছিলেন তাই এসব হয়েছে।

জয়রামবাটির মায়ের মন্দিরের একটি নক্সা একজন শ্রীম-র কাছে এনেছিলেন। বালকের ন্যায় আগ্রহে অধীর হয়ে তাঁর হাত থেকে তা

টেনে নিয়ে মাথার উপর রাখলেন, তারপর দেখতে লাগলেন। একজন প্রবীণ ভক্ত এই দৃশ্য দেখেছিলেন। তিনি একদিন ভক্তসভায় কথায় কথায় শ্রীম-র এই ছেলেমানুষীর কথা উল্লেখ করেছিলেন। শুনে শ্রীম বলেছিলেন, আপনারা তাঁর সঙ্গে মিশেন নাই — কি বস্তু যে ছিলেন মা! অমনটি আর হয় না। সাক্ষাৎ জগদম্বা — অমন স্নেহ আর কার আছে?

মায়ের কৃপায় তাঁর শিশু শ্রীম আকাশে বাতাসে, জলে স্থলে, সর্বত্র তাঁর স্নেহামৃত আস্বাদন করে উল্লসিত হয়ে কখনও কখনও ডেকে ভক্তদের বলতেন বিস্ময়াবেগে — করছেন কি আপনারা বসে মায়ের মাই খান, মায়ের মাই খান। (অঙ্গুলি দিয়ে চারদিকে দেখিয়ে) এই সবই মায়ের মাই।

গৃহস্থ শ্রীম-র সঙ্গে মিশে বহু যুবক হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী। এই একটি বিষয়ই যথেষ্ট প্রমাণ, কিরূপ গৃহী ছিলেন শ্রীম। অন্তরে পূর্ণ সন্ন্যাস নিয়ে শ্রীম ছিলেন গৃহে ‘চাপরাশ’ নিয়ে — জগৎকে ‘ভাগবত’ শোনাতে। গৃহে থেকে সেবাব্রতের সঙ্গে ত্যাগতপস্যার পালন করেছিলেন নিজে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত। প্রায় ষাট বছর বয়সে শ্রীম কনখল, ঋষিকেশ ও স্বর্গাশ্রমে কুটীরে থেকে করেছেন কঠোর তপস্যা। আর সত্তর বছর বয়সে এলেন মিহিজামে যার কথা প্রথম ভাগে বের হচ্ছে।

ভারতের স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগী বিপ্লবী যুবকদের শ্রীম বলতেন, ঋষিবালক। অসহযোগ আন্দোলনে দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ জেলে যাচ্ছে দেখে অধীর হয়ে পড়তেন শ্রীম, আর বলতেন, কারো সাধ্য নাই আর ভারতকে পরাধীন রাখে। কত বড় জোর পেছনে এদের — কত বড় spiritual culture এদেশের! দেশবন্ধু সি. আর. দাশমশায়ের ত্যাগ দেখে বলতেন, বুদ্ধদেবের মত ত্যাগ! তাঁর শরীরত্যাগ হলে মায়ের মত শোকার্ত হয়ে মর্টন স্কুল ছুটি দিলেন তিনদিনের। নিজে লিখে দেন — 'for the demise of the patriot saint of Bengal.’ দাশমশায়ের শ্রাদ্ধবাসরে বৃদ্ধ শ্রীম ট্রামে চড়ে আনাগোনা করেছিলেন দু’তিন বার। মহাত্মা গান্ধীর

অনশনব্রত আরম্ভ হলে শ্রীম হয়ে পড়তেন খুব উৎকণ্ঠিত। তাঁর তখন আহার বিহার কমে যেতো। একবার বলেছিলেন বিনয়নম্রভাবে, আমাদের কথায় কিছু হয় না — বলতে গেলে বলতে হয় গান্ধীমহারাজের ভিতর যেন অবতারের শক্তি প্রকাশ হচ্ছে।

শরীর ত্যাগের সাত দিন পূর্বে শ্রীম-র সহিত পাঁচ দিন থাকি। সেই সময়ে প্রত্যহ সকালে ও বিকেলে ঠাকুরের পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত পুরাতন স্থানগুলির দর্শন ও নূতন স্থান খুঁজে বের করতাম কতিপয় বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে। প্রথম যখন এই সঙ্কল্পের কথা বলি, শ্রীম রাজী হন নাই। পরে যখন বললাম, 'সর্বদা ধ্যান জপে ও কাজে মন আসে না, তখন এই লীলাস্থল দর্শন করলে মনে বেশ উদ্দীপন হয়' — তখন শ্রীম খুশি হয়ে অনুমতি দিলেন। তিনি না খেয়ে বসে থাকতেন যতক্ষণ না ফিরতাম। সকালে বেরিয়ে বারটা হয়ে যেতো ফিরতে। ফিরে এলে খেতে খেতে শুনতেন, আর আমিও খেতাম। একদিন 'চৈতন্যসভা' বের করতে কলুটোলায় গেলাম। দৈবাৎ ভক্তপ্রবর বৃদ্ধ কুঞ্জ মল্লিকমশায়ের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি ঠাকুরকে দর্শন করেছিলেন আর তাঁর ভালবাসাও পেয়েছিলেন। তিনি ঐ স্থান দেখিয়ে দিলেন। উহা এখন তাঁর ভাগ্নের হিস্যায় পড়েছে। এই সংবাদ শুনে শ্রীম অত্যন্ত খুশি হলেন। বললেন, আমরা কয়বার উহা বার করবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু পাই নাই — রাস্তাঘাট সব বদলে গেছে। পরে তিনি নিজে দেখতে গিয়েছিলেন — অনেক ভক্তরা গিয়ে দেখেছেন।

যেদিন শ্রীম-র শরীর যায় সেদিন সকালে প্রণাম করে শ্রীমহাপুরুষ মহারাজের কাছে অনুমতি নিলাম শ্রীম-র কাছে গিয়ে সাতদিন থাকবার। সেই সময়ে শ্রীম-র সহায়তায়, ঠাকুরের কলিকাতার অবশিষ্ট লীলাস্থলগুলি বার করে পুরাতন ও নূতন ঠিকানা লিখে নেব — এই অভিপ্রায় মনে। ঘরের বাহির হলেই ফোনে সংবাদ এলো শ্রীম কিছুক্ষণ আগে মহাসমাধি লাভ করেছেন, রাজহংসের মত গান গাইতে গাইতে — 'গুরুদেব, মা কোলে তুলে নাও'।

পূর্বেই বলা হয়েছে, এই পুস্তক লেখা হয় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের বহু

প্রবীণ ও নবীন সাধু ও ভক্তের অনুরোধে আর শুভেচ্ছায়, এবং তাঁরা অনেকে পাণ্ডুলিপি পড়েন বা শুনেন। স্বামী জগদানন্দজী পড়ে লিখেছিলেন ঃ ‘শ্রীম-র বচনসমূহ গ্রন্থকার যেন জীবন্তভাবে এই গ্রন্থে উপস্থিত করেছেন। ‘শ্রীম’-লিখিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠের পর এই গ্রন্থপাঠে পাঠক ‘কথামৃত’-বিষয়ে বিশেষ আলোকপ্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই।

আমেরিকার প্রবীণ ভক্ত স্বামী অতুলানন্দজী লিখেছেন ঃ — 'This book may serve a double purpose. To those who are acquainted with the *Kathamrita* by 'M', it may be welcome as a Companion Volume, and to those not yet acquainted with the *Kathamrita*, it may arouse a desire to make that acquaintance. For, in this book which is a record of M's talks to his admirers, M's reminiscences not only reveal new facts about the life of Sri Ramakrishna but they also throw new light on that wonderful life.'

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব সর্বাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী শেষের বারে দেরাদুনে ইহার (এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি) পাঠ শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। আমায় বললেন, ‘কি সুন্দর জিনিস লিখেছ! আগে আমায় দিলে না কেন? যা হোক, সব লেখা শেষ কর। মানুষের শরীরের তো কিছু স্থির নেই। লেখা থাকলে অপরেও বের করতে পারবে। আহা, The move is as dramatic as the subject is sublime'...

আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রকাশকের ইচ্ছায় ভূমিকা বড় হয়ে গেল। যাঁরা যে-কোনও রূপে এই গ্রন্থ রচনায় সহায়তা করেছেন তাঁদের সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এই গ্রন্থ পাঠ করে সকলের শ্রীরামকৃষ্ণচরণে ভক্তির উদ্রেক হোক, ইহাই গ্রন্থকারের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

নিত্যাত্মানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ লাইব্রেরী। তুলসী মঠ, ঋষিকেশ।
চৈত্র পূর্ণিমা, ১৩৬৬ সাল। ১১ই এপ্রিল, ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দ।

আচার্য শ্রীম-র সংক্ষিপ্ত জীবনী

যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ প্রিয় পার্যদ শ্রীম-র জন্ম হয় ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জুলাই। বাংলা ১২৬১ সাল, ৩১শে আষাঢ়। সেই দিন ছিল শুক্রবার শ্রীনাগপঞ্চমী তিথি আর শতভিষা নক্ষত্র। তাঁহার জন্মস্থান কলিকাতা মহানগরীর শিমুলিয়া পল্লীস্থ শিবনারায়ণ দাসের লেন। এই পল্লীতেই শ্রীরামকৃষ্ণের যুগবিপ্লবী পার্ষদাগ্রণী বিশ্ববিশ্রুত স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম হয়। বড় হইয়া শ্রীম বাস করিতেন ১৩।২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনের 'ঠাকুর বাড়ি'তে তাঁহার পিতার নূতন ভবনে। এই ঠাকুরবাড়িতেই শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের নিত্য সেবাপূজার প্রতিষ্ঠা করেন এবং কখন মাসাধিক কালও আসিয়া থাকিতেন। এই স্থলেই শ্রীম মহাসমাধি লাভ করেন।

'শ্রীম' এই নামটি তিনি নিজেই গ্রহণ করিয়াছিলেন ছদ্মবেশে। তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে "মাস্টার" বলিয়াও ডাকিতেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত-পরিবারে তিনি "মাস্টার মশায়" বলিয়া সুপরিচিত। 'মণি', 'মোহিনীমোহন', 'একটি ভক্ত' এই সকল ছদ্মনামেও তিনি 'কথামৃতে পরিচিত।

পিতা শ্রীমধুসূদন গুপ্ত ও মাতা শ্রীমতী স্বর্ণময়ী দেবী উভয়েই স্বধর্মনিষ্ঠ, সরল ও অমায়িক লোক ছিলেন। কথিত আছে, দীর্ঘকাল যাবৎ শিব আরাধনার ফলে এই মধ্যবিত্ত বৈদ্য-ব্রাহ্মণদম্পতি মহেন্দ্রনাথকে লাভ করেন। পিতা শ্রীমধুসূদন কলিকাতা হাইকোর্টে কর্ম করিতেন। তাঁহার চারি পুত্র ও চারি কন্যার মধ্যে মহেন্দ্রনাথ ছিলেন তৃতীয় সন্তান। কনিষ্ঠ পুত্র কিশোরীও শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্ত সেবক। অতি শৈশবে মহেন্দ্রনাথ, গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পড়িতেন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অনতিদূরে। গুরুমহাশয় কখনও কোলে করিয়া তাঁহাকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতেন। তারপর পড়েন বিখ্যাত হেয়ার

স্কুলে। এই স্কুলে পড়িবার সময় থার্ড ক্লাস হইতে (১৮৬৭ খ্রীঃ) শ্রীম বরাবর ডায়েরী লিখিতেন। ইহা কেহ তাঁহাকে বলিয়া দেয় নাই, নিজের বুদ্ধিতেই লিখিতেন। প্রাচীন ডায়েরীর এক পৃষ্ঠায় লেখা ছিল — 'আজ সকালে উঠিয়া বাবা ও মাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিলাম।' আর একস্থানে লেখা ছিল, 'আজ স্কুলের পথে নিত্যকার মত ঠনঠনিয়ার মা কালী আর শীতলা মাকে দর্শন ও প্রণাম করিলাম।' পনর বৎসর পর শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত মিলন হওয়ায় (১৮৮২, ২৬শে ফেব্রুয়ারী) এই অভ্যাসই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের জন্ম প্রদান করে। এই স্কুলে পড়ার সময় হইতে তিনি ব্রাহ্মসমাজের নেতা ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের প্রতি আকৃষ্ট হন। ঠাকুরের সহিত মিলন হওয়ার পূর্বে কেশব সেনই ছিলেন শ্রীম-র প্রধান 'হিরো'। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতিও ছিলেন শ্রীম-র অন্যতম 'হিরোজ'। ব্রহ্মানন্দের ভিতর দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন্ত দৈবী ভাবপ্রবাহের স্পর্শই ছিল এই আকর্ষণের কারণ। এই বীরপূজার অবসান শ্রীরামকৃষ্ণে।

শ্রীম এনট্রান্স পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ.এ. পরীক্ষায় পঞ্চম স্থান অধিকার করেন — গণিতের একটি পত্র না দিয়াই বি.এ.-তে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। সুবিখ্যাত অধ্যাপক টনি সাহেব শ্রীমকে অতিশয় ভালবাসিতেন। তিনি বিলাত চলিয়া যাওয়ার পরও মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে সর্বদা পত্রালাপ করিতেন। 'ল' পড়ার সময় পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও ঋষিপ্রণীত মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, বৃহস্পতি প্রভৃতি সংহিতাদি অধ্যয়ন করেন। তাহা ছাড়াও তিনি ছাত্রাবস্থায়ই পাশ্চাত্ত্য দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্রাদি বিষয়ে বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। সংস্কৃত পুরাণ ও কাব্য শাস্ত্রাদিতেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, ভট্টিকাব্য, উত্তর রামচরিত প্রভৃতির শ্লোক শ্রীম-র মুখস্থ ছিল। কালিদাসকে তিনি অতি উচ্চ আসন দিতেন। ঋষিদের তপোবনের বিবরণ তাঁহার কণ্ঠস্থ থাকিত। ষড়্দর্শন তিনি দেখিয়াছেন, জৈন ও বৌদ্ধদর্শনও পড়িয়াছেন। জ্যোতিষ ও

আয়ুর্বেদ তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

শ্রীম-র বিলাত যাইয়া আই.সি.এস্. পড়িবার ইচ্ছা ছিল। তখন স্বপ্ন দেখিতেন, কুয়াশার ভিতর দিয়া ভূমধ্যসাগরে জাহাজ চলিতেছে, আর পায়জামা পরিয়া তিনি 'ডেকে' বেড়াইতেছেন। বাগ্মিপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী আই.সি.এস. পাস করিয়া যখন কলিকাতার তালতলার বাড়িতে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীম তাঁহার নিকট যাইয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া বিলাতের সংবাদ লইতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িবার সময় শ্রীম কোনও সভার সেক্রেটারী ছিলেন আর সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রেসিডেন্ট। এই সূত্রে উভয়ের মধ্যে বিশেষ প্রীতি ছিল।

বি.এ. পড়িবার সময়ই (১৮৭৩ খ্রীঃ) শ্রীম শ্রীকেশব সেনের সম্পর্কীয়া ভগিনী শ্রীমতী নিকুঞ্জ দেবীকে বিবাহ করেন। পরবর্তীকালে শ্রীম-র ধর্মপত্নীও, ঠাকুর ও মায়ের বিশেষ স্নেহ, প্রীতি ও কৃপালাভে ধন্যা হন। নানা কারণে অধ্যয়ন শেষ হইবার পূর্বেই শ্রীমকে কর্মস্বীকার করিতে হয়। সর্বপ্রথম কিছুদিন তিনি কাজ করেন এক ব্রিটিশ সওদাগরী আফিসে। তাহার পর তিনি শিক্ষাব্রত গ্রহণ করেন। ইহাই ছিল তাঁহার জন্মগত কর্ম। যশোহর জেলার নড়াইল হাই স্কুলের হেডমাস্টারের কর্ম কিছুকাল করিয়া তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসেন। এখানে সিটি ও রিপণ কলেজিয়েট স্কুল, মেট্রোপলিটান স্কুল ও শাখা স্কুল, এরিয়ান, ওরিএন্টাল সেমিনারি, মডেল প্রভৃতি নানা স্কুলে হেড মাস্টারের কাজ করেন। তাহা ছাড়া, সিটি ও রিপণ কলেজে তিনি ইংরেজী, ইতিহাস, দর্শন ও অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে অধ্যাপনা করিতেন। অনেক সময় এক ঘন্টা করিয়া তিনটি স্কুলেও হেডমাস্টারের কর্ম করিতেন।

তাঁহার পড়াইবার কৌশল অপূর্ব ও অসাধারণ ছিল। তিনি ছাত্রদের মনের স্তরে নামিয়া যাইতেন। তারপর ধীরে ধীরে প্রীতির সহিত তাহার ভিতর জ্ঞান প্রবেশ করাইতেন। জীবনের শেষ কিঞ্চিদধিক পঁচিশ বৎসর শ্রীম বিখ্যাত মর্টন ইনস্টিটিউশনের অধ্যক্ষ ও অধিকারী ছিলেন। ছাত্র ও শিক্ষকগণ তাঁহাকে 'রেক্টার মশায়' বলিয়া ডাকিতেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন মাতৃভাষায় শিক্ষাপ্রদানের আলোচনা করিতেছিলেন, তাহার পূর্বেই শ্রীম নিজের স্কুলে বাংলায় শিক্ষাদানের প্রবর্তন করেন।

শ্রীম-র কর্মজীবনের প্রায় দশ বৎসর অতীত হইলে, মা না থাকিলে বৃহৎ পরিবারে যাহা হয় এই গুপ্ত পরিবারে তাহাই দেখা দিল। এমন অবস্থা ঘটিল যে, শান্তস্বভাব শ্রীম পারিবারিক কলহে বিরক্ত হইয়া পৃথিবী হইতে চিরতরে বিদায় লইবার কথা বিশেষভাবে ভাবিতে লাগিলেন। একদিন মনের অবস্থা চরমে উঠিল। স্থির করিলেন, আর বিলম্ব না করিয়া এখনই ইহার চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। সেই দিন ছিল শনিবার। রাত্রি দশটার পর গৃহত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। সহধর্মিণী শ্রীমতী নিকুঞ্জ দেবী উহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে একা না ছাড়িয়া সঙ্গিনী হইলেন। অপরের অজ্ঞাতে উভয়েই রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলেন। একখানা ঘোড়ার গাড়ী করিয়া তাঁহারা শ্যামবাজার পৌঁছিলে গাড়ির একটি চাকা ভাঙ্গিয়া যায় ডাক্তার কালীর বাড়ির কাছে। তাঁহারা নিকটে এক বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। বন্ধু মনে করিলেন, এ কি আপদ অত রাতে। কিন্তু শ্রীম উহা বুঝিয়াও পত্নীকে ওখানে রাখিয়া নিকটবর্তী এক আস্তাবলে গিয়া ঘুমন্ত গাড়োয়ানকে অধিক অর্থ দিয়া উঠাইয়া লইয়া আসিলেন। রাত্রি তখন বারটা। সেই গভীর রাত্রিতে শ্রীম বরাহনগর, ভগিনীর বাড়িতে গিয়া উঠিলেন। ভগ্নীপতি ঠাকুরের চিকিৎসক ঈশান কবিরাজ। টলষ্টয়ের গৃহত্যাগের সহিত কি শ্রীম-র এই গৃহত্যাগের কোন সম্পর্ক ছিল? শ্রীম ভক্তদিগকে কয়েকবার টলষ্টয়ের গৃহত্যাগের কথা আগ্রহ ও প্রীতির সহিত পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন।

শ্রীম-র শরীর অবসন্ন আর মন নৈরাশ্যপূর্ণ। বিখ্যাত কবি শেলীর মত স্থির করিলেন, এ সংসারে বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা। মনের ভিতর এই তুফান লইয়া শ্রীম পরদিন রবিবার এ-বাগান সে-বাগান বেড়াইতে লাগিলেন, সঙ্গে সম্পর্কে ভাগিনেয় সিদ্ধেশ্বর। সঙ্গী কহিলেন, ‘মামা, গঙ্গার ধারে একটি চমৎকার বাগান আছে। সে বাগানটি কি দেখতে

যাবেন? সেখানে একজন পরমহংস আছেন।' গঙ্গাতীরের সুষমামণ্ডিত এই অতি উত্তম গোলাপকুঞ্জ মানসিক নিদারুণ ঝঞ্ঝাবাতের সময়ও শ্রীম-র মন হরণ করিল। শ্রীম ফুল দেখিতেছেন, ফুল শুঁকিতেছেন, আর ভাবিতেছেন, আহা কি সুন্দর ফুল!

সন্ধ্যা হয় হয়, শ্রীম আসিয়া ঠাকুরঘরের বাহিরে দাঁড়াইলেন বারান্দায়। ঠাকুর পূর্বাস্য ছোট খাটে বসা। মেঝেতে ভক্তগণ। গৃহ পূর্ণ। শ্রীম শুনিলেন, ঠাকুর বলিতেছেন, "যখন একবার হরি বা একবার রাম নাম করলে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয় জেনো যে সন্ধ্যাদি কর্ম আর করতে হবে না।' কথামৃতপানে ভক্তগণ মত্ত, জগৎ ভুলিয়া গিয়াছেন। শ্রীম ভাবিতে লাগিলেন, শুকদেব যেন গঙ্গাতীরে ভাগবত কথা কহিতেছেন। কিংবা শ্রীচৈতন্য বুঝি ঁপুরীধামে অন্তরঙ্গসঙ্গে ভগবৎ-নামগুণ কীর্তন করিতেছেন। শ্রীম অনুভব করিলেন, এখানে সর্বতীর্থের সমাগম হইয়াছে। 'কি সুন্দর স্থান, কি সুন্দর মানুষ, কি সুন্দর কথা! এখান থেকে নড়তে ইচ্ছা হচ্ছে না।'

আরতির পর ঠাকুরবাড়ি দর্শন করিয়া আসিয়া শ্রীম ঠাকুরের ঘরে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর শ্রীমকে বসিতে বলিলেন। আর তাঁহার পরিচয় লইলেন। ইহারই ভিতর ঠাকুরের মন যেন ভিতরে কে টানিতেছে — যেমন মাছ টানে বড়শি। ঠাকুর ভাবসমাধিতে প্রবেশ করিতেছেন। দুই একটা কথার পর শ্রীম প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। কিন্তু ভাবিতে লাগিলেন, 'এ সৌম্য কে — যাঁহার কাছে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে?' শ্রীম-র শরীর চলিয়াছে বরানগর, কিন্তু মন বাঁধা পড়িয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ে।

ঘন ঘন আসা-যাওয়ার ফলে সাতদিনের মধ্যে শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীম বুঝিলেন, যেন আপন জন পাইয়াছেন। বিদেশাগত পুত্রের জননীর ন্যায় শ্রীমকে স্নেহ সমাদরে হৃদয়ে স্থান দিলেন। একদিন অঙ্গনে বেড়াইতে বেড়াইতে সাহস করিয়া শ্রীম নিজের মনের রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিলেন, ছলনার লীলাভূমি এই সংসার থেকে বিদায় লওয়াই শ্রেয়। অন্তর্যামী ঠাকুর পূর্বেই শ্রীম-র মনের ভাব জানিয়াছেন। তাই অভয়

দিয়া সস্নেহে তৎক্ষণাৎ তিনি উত্তর করিলেন, 'বালাই! কেন যাবে তুমি সংসার থেকে বিদায় নিতে? তোমার যে গুরুলাভ হয়েছে। যা অভাবনীয়, অচিন্তনীয়, স্বপ্নের অগোচর এমন সমস্যাও সেই বাজীকরের কৃপায় নিমেষে দূর হয়ে যায়।' শ্রীরামকৃষ্ণের এই অভয় বাণীতে শ্রীম-র ভরসা হইল, মন মেঘমুক্ত হইয়া গেল, আবার বাঁচিয়া থাকিবার ইচ্ছা ফিরিয়া আসিল। নিজের জীবনের এই সঙ্কটময় ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়া শ্রীম পরবর্তী কালে বিপদগ্রস্ত ভক্তগণকে আশান্বিত করিয়া বলিতেন, দেখুন, কোথায় শরীর ত্যাগের সঙ্কল্প, আর কোথায় ভগবানলাভ! তাই বিপদ মানুষের বন্ধু। ভগবান সর্বমঙ্গলময়।

শ্রীম এই সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শ্যামবাজারস্থিত মেট্রোপলিটন স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। পরের চারি বৎসর ধরিয়া এইখানেই কর্ম করিতেন। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে যখন ঠাকুর খুব অসুস্থ হইয়া পড়েন, তখন সর্বদা শ্রীমকে কাশীপুর বাগানে ঠাকুরের সেবার জন্য যাতায়াত করিতে হইত। তাই স্কুলের বাৎসরিক ফল অপর বৎসরের মত উত্তম না হওয়ায় বিদ্যাসাগর একদিন সস্নেহে অনুযোগ করিলেন — 'এবার ওখানে বেশী যাতায়াত করেছো, স্কুলের ফল তাই ভাল হয় নাই।' শ্রীগুরুর উপর পিতৃসম বিদ্যাসাগরের এই সামান্য আক্ষেপও শ্রীম-র নিকট অসহনীয় হইল। তিনি ঐ স্কুলের কর্ম পরিত্যাগ করিলেন। ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, 'বেশ করেছো'। পনের দিনের মধ্যেই অভাবের তাড়না অসহনীয় হইল। একদিন উহা চরমে উঠিল। শাবকসহ ক্ষুধিতা সিংহিনীর মত শ্রীম দোতলার লম্বা বারান্দায় তিন ঘন্টা ধরিয়া পায়চারী করিতেছিলেন আর ভাবিতেছিলেন — কি খেতে দিব ছেলেদের। তখনি নিচের রাস্তা হইতে ডাক আসিল — 'মহেন্দ্রবাবু, বাড়ি আছেন? এক ব্যক্তি একখানা চিঠি ও জুড়িগাড়ি লইয়া আসিয়াছেন। নিচে গিয়া চিঠি পড়িয়া দেখিলেন — সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী শ্রীমকে রিপণ কলেজের অধ্যাপনা স্বীকার করিতে বিশেষ অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ গাড়ি চড়িয়া বাহির হইলেন। এইরূপে তিনি অন্তরের টানে চার

পাঁচবার কর্ম ত্যাগ করিয়া কখনও কামারপুকুর, কখনও কাশী, পুরী প্রভৃতি তীর্থে চলিয়া যাইতেন — আর ভাবনায় পড়িতেন।

ঠাকুরের দর্শন ও কৃপা লাভ করিয়া শ্রীম নবজন্ম লাভ করিলেন। শ্রীগুরুর কৃপায় অন্তরঙ্গদের মত শ্রীমরূপ বৃক্ষে প্রথম দেখা দিল 'ফল', তারপর আসিল 'ফুল'। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবানের অবতার। তাঁহার পার্ষদগণ অনেকেই পূর্ব পূর্ব অবতারের পার্ষদ। অতএব তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ। এই দিক দিয়া দেখিলে পার্ষদদের সাধনা গৌণ, মুখ্য কৃপা। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় অপর পার্ষদগণের মত শ্রীম আত্মদ্রষ্টা — নিরাকার সাকার চরম অনুভূতির অধিকারী। তথাপি ঠাকুর শ্রীমকে দিয়া প্রচুর সাধন করান লোকশিক্ষার জন্য — দক্ষিণেশ্বরে নিজের কাছে রাখিয়া। ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষায় শ্রীম নিরাকারের সাধনা করেন প্রথম। এই সময় ঠাকুর তাঁহাকে লইয়া মতি শীলের ঝিলে গিয়াছিলেন নিরাকার নির্গুণ অখণ্ড সচ্চিদানন্দের ধ্যান শিখাইতে। বৃহৎ জলাশয়ের বৃহৎ রুই মাছ স্বচ্ছন্দে আনন্দে বিচরণ করিতেছে। ঠাকুর বলিলেন, নিরাকার ধ্যানে এইটা আরোপ করিতে হয় — জীব যেন সচ্চিদানন্দ সাগরে মীন হইয়া আনন্দে বিহার করিতেছে, অথবা অনন্ত নির্মল চিদাকাশে যেন জীব বিহগবৎ উড়িতেছে। এই সম্পর্কে ঠাকুর শ্রীমকে অষ্টাবক্র সংহিতা পড়িতে বলিয়াছিলেন। আবার তিনি শ্রীমকে যোগও শিক্ষা দিয়াছিলেন — তখন বলিয়াছিলেন, 'গীতায় যুক্তাহার-বিহারের কথা আছে, উহা দেখে নিও'। শ্রীম-র স্বাভাবিক ভাব ছিল শুদ্ধাভক্তি। এই ভাবসাধনও ঠাকুর করান।

ঠাকুর মায়ের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন — 'এর সব ত্যাগ করিও না মা।' ...'সংসারে যদি রাখিস্ (লোককে ভাগবত শোনাতে), তো এক একবার দেখা দিস্।' তাই শ্রীমকে ঠাকুর গৃহস্থাশ্রমে থাকার মত নানা সাধনাও করাইয়াছিলেন। শ্রীম অবতারের পার্ষদ হইয়া রাজার ব্যাটার মত 'মাসোহারা' পাইলেও সারাজীবন কঠোর সাধনা করিয়াছেন। ঠাকুরের শরীর গেলেও দক্ষিণেশ্বরে তিনি সাধনা করিতেন। সপ্তাহে কখনও তিনদিন ওখানে থাকিতেন। আর চারদিন কর্ম করিতেন। কয়বার কেবল চিড়া খাইয়া আমাশায় পড়েন। কখন

গুরুভ্রাতারা আনিয়া বাড়িতে রাখিয়া যাইতেন। আবার বরানগর মঠে কখনও দীর্ঘকাল বাস করিতেন সাধু গুরুভাইদের সঙ্গে। বলিতেন, পায়খানায় শৌচের জন্য যে জল থাকিত চৌবাচ্চায় উহা মাথায় ছিটাইয়া দিতাম — অতি পবিত্র মনে হইত। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে ছয়মাস একসঙ্গে বরানগরে ছিলেন। তারপর মা-ঠাকুরুণের আদেশে বাড়ি যান। নিত্য অষ্টপ্রহর সাধনামণ্ডিত ছিল শ্রীম-র সুদীর্ঘ জীবন। ঠাকুরের কৃপায় শ্রীম সাকার নিরাকার দর্শনে উচ্চ অধিকারী হইয়া গৃহে ছিলেন, যেন 'পাঁকাল মাছ', কিংবা 'নষ্টা স্ত্রী', অথবা 'কচ্ছপ', বা 'পদ্মপত্রে জল', অথবা 'বড় ঘরের দাসী'। শ্রীম 'হাতে তেল মাখিয়া কাঁটাল' ভাঙ্গিয়াছিলেন — জনক রাজার মত।

শ্রীম-র আজীবন তীব্র বাসনা ছিল সর্বত্যাগী সন্নাসী হইবার। ঠাকুরকে এই বাসনা নিবেদন করিলে ঠাকুর বলিলেন, "মা আমায় বলেছেন, তোমাকে তাঁর একটু কাজ করতে হবে — লোককে 'ভাগবত' শোনাতে হবে। মা ভাগবতের পণ্ডিতকে একটা পাশ* দিয়ে সংসারে রেখে দেন।" তবুও সন্ন্যাসের জন্য পীড়াপীড়ি করিলে একদিন সন্ধ্যার পর সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া ঠাকুর বলিলেন, 'কেহ মনে না করে, আমি না হলে মায়ের কাজ চলবে না। মা একটা তৃণ থেকে বড় বড় আচার্য তৈরী করতে পারেন।' ঠাকুরের ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়া শ্রীম নিজগৃহে সন্ন্যাসী হইলেন।

ঠাকুর শ্রীম-র নিকট ভক্তদের পাঠাইয়া দিতেন। ভক্তগণ আসিলে শ্রীম অনবরত শ্রীরামকৃষ্ণমাহাত্ম্য কীর্তন করিতেন। যেখানে যে অবস্থায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হউক শ্রীম আগন্তুককে শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পরিবেশন না করিয়া যাইতে দিতেন না। শ্রীম-র সাংসারিক জীবনের দুর্দৈবাবস্থায় কোন অবিবাহিত যুবক গেলে বলিতেন, 'এইজন্য ঠাকুর বলতেন, সংসার জ্বলন্ত অনল। এতে প্রবেশ করলে জ্বলে পুড়ে যায়।' ঠাকুরের জীবিতাবস্থায় শ্রীম-র বিপদ দেখাইয়া ঠাকুর, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি যুবকগণকে সাবধান করিতেন। শ্রীম-র জীবনের

---

*পাশ - বন্ধন

পরবর্তীকালের বিপদের সময় তিনি যুবক ভক্তদের বলিতেন, ‘আমার এই বিপদ তোমাদের শিক্ষার জন্য’।

ঠাকুর শ্রীমকে ‘চাপরাশ’ দিয়াছিলেন লোকশিক্ষার জন্য। এই শক্তির প্রভাবে শ্রীম সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া ভক্তদের দিবানিশি প্রাণে শান্তি-সুখ বিতরণ করিয়াছেন। আর অকৃতদার যুবকগণকে পবিত্র ত্যাগব্রতে অনুপ্রাণিত করেন। এই সকল ঘটনাই — স্পষ্টরূপে বলিয়া দেয় শ্রীম-র ভিতর জ্বলন্ত সন্ন্যাস ছিল। বেলুড় মঠে একদিন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ শ্রীমকে বলিয়াছিলেন, “আমি জিজ্ঞাসা করে জানলুম মঠের চৌদ্দ আনা লোক সাধু হয়েছে ‘কথামৃত’ পড়ে আর আপনার সঙ্গে মিশে।’

শ্রীম-র জীবনের অক্ষয় কীর্তি ‘কথামৃত’। এই পুস্তক ধর্মজগতে এক অভিনব ভাবের জন্ম দিয়াছে। তিথি নক্ষত্র তারিখ দিয়া আর কোনও গ্রন্থ হয় নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া তাই বলিয়াছিলেন, .. You have hit Ramkristo to the right point... It is indeed wonderful. The move is quite original... It has been reserved for you this great work.' শ্রীশ্রীমা শ্রীমকে লিখিয়াছিলেন, ‘একদিন তোমার মুখে (কথামৃত) শুনিয়া আমার বোধ হইল যে তিনিই (ঠাকুর) ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।’

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত প্রথম বাহির হয় ইংরাজীতে 'Gospel'-রূপে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে। বাংলায় প্রথম ভাগ বাহির হয় ১৯০২ অব্দে, দ্বিতীয় ভাগ ১৯০৪ অব্দে, তৃতীয় ভাগ ১৯০৮ অব্দে, চতুর্থভাগ ১৯১০ অব্দে আর পঞ্চম ভাগ ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে। অনেকগুলি ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছে।

শ্রীম-র কৃপায় বহু লোক ঠাকুরকে দর্শন করিয়াছেন। উত্তম লক্ষণযুক্ত ছাত্রগণকে শ্রীম ঠাকুরের কাছে লইয়া যাইতেন। ‘কথামৃতের’ রাখাল, বাবুরাম, সুবোধ, সারদা, পূর্ণ, ছোট নরেন, ক্ষীরোদ, নারায়ণ, তেজচন্দ্র, পল্টু প্রভৃতি শ্রীম-র ছাত্র ছিলেন।

বহু সদ্‌গুণ লইয়া শ্রীম জন্মগ্রহণ করেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস, দেবদ্বিজে

ভক্তি, গুরুজনে শ্রদ্ধা, মধুর ভাষণ, মধুর স্বভাব, অদ্ভুত মেধা, অলৌকিক স্মৃতিশক্তি, সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি, প্রশান্ত গম্ভীর ভাব প্রভৃতি দৈবী সম্পদ শ্রীম-র জীবনে বিকশিত হইয়াছিল। আজীবন বিদ্যানুরাগ ও বিদ্যানুশীলন, সৎসাহস, পরদুঃখকাতরতা, সহানুভূতি, দয়া, দান, সেবা, সংযম প্রভৃতি ছিল অন্যতম গুণাবলী। অতবড় ‘এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা’ তিনি ছাত্রের মত পেন্সিলে দাগ কাটিয়া পড়িতেন। ভক্তগণকে তিনি অধ্যয়নে খুব উৎসাহিত করিতেন। শ্রীম ব্রহ্মবিদ্যার নিচেই স্থান দিতেন লৌকিক বিদ্যার। যখন মঠ ও মিশন সুপরিচিত ছিল না, সেই সময়ে নির্ভয়ে ‘কথামৃত’ প্রকাশ ও প্রচার কম সৎসাহসের কার্য নহে।

শ্রীম-র অলৌকিক স্মৃতিশক্তির সহিত অপূর্ব কল্পনাশক্তির সংযোগ হওয়ায় কালের ও স্থানের ব্যবধান তাঁহার নিকট হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। প্রায় অর্ধশতাব্দী অতীত হইলেও তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা-দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করিতেন সর্বদা। তাঁহার বাঙ্ময়ী আলেখ্য প্রস্তুত করিবার শক্তিও অসাধারণ ছিল। এমন করিয়া কোন ব্যক্তি, তীর্থ বা ঘটনার বিবরণ প্রদান করিতেন যে, শ্রোতা মনে করিতেন তিনি যেন উহা চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছেন। শ্রীম-র অন্তর্দৃষ্টিও ছিল অদ্ভুত। চেহারা দেখিয়া, বা দুইটি কথা শুনিয়া বা একটা কাজ দেখিয়া, অথবা গানের দুই চরণ শুনিয়াই শ্রোতার ভিতর দেখিতে পারিতেন। তাহার উপর উপযুক্ত শ্রোতার মনের স্তরে নামিয়া মনটিকে ধরিয়া লইয়া সর্বোচ্চ আদর্শে পৌঁছাইয়া দিতেন। শ্রোতার কর্ণে প্রবেশ করাইতেন — ভগবানদর্শনই মনুষ্যজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। অপর দিক দিয়া কখনও শ্রোতার মনে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরীয় যে কোনও সদ্‌গুণকে সবলে ধরিয়া লইয়া উপরে উঠাইয়া দিতেন। ইহার চাপে অসৎ গুণগুলি আপনি খসিয়া পড়িত। আক্রমণ চলিত এই দুই দিক দিয়া।

শ্রীম-র ভিতর ব্রহ্মশক্তি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন্ত অধিষ্ঠান ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের চিন্তা করিতে করিতে শ্রীম এই নরকলেবরেই যেন সালোক্য, সামীপ্য ও সারূপ্য মুক্তির অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

তাঁহার সান্নিধ্যে ভক্তদের মন হইতে কামাদি রিপু ও অশান্তি আপনি ঝরিয়া পড়িত — পাঁচ মিনিটেই জগৎ ভুল হইয়া যাইত। আর মন এক প্রশান্ত আনন্দময় ধামে বিরাজ করিত। শ্রীম বলিতেন, ঠাকুর তাঁহার কণ্ঠে বসিয়া কথা কহিতেন — তিনি যন্ত্রমাত্র।

দেবতা, মহাপুরুষ, মহাপ্রসাদ, তীর্থ ও সাধু যেন সাক্ষাৎ ঈশ্বরের জীবন্ত বিভূতি — ভক্তগণ শ্রীম-র ব্যবহারে বুঝিতেন।

শ্রীম 'কথামৃত'-এর পরিবেশন আরম্ভ করিয়াছিলেন ঠাকুরের জীবিতাবস্থায়, ইহার পরিসমাপ্তি হইবে অনন্তে। আজ সমগ্র জগৎ 'কথামৃত'-বর্ষণে সিঞ্চিত। অশরীরী শ্রীম এখনও অশরীরী শ্রীরামকৃষ্ণের 'কথামৃত' সর্বত্র বর্ষণ করিতেছেন।

অন্ন, জীবন, বিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা — এই চারি প্রকার দানের মধ্যে শ্রীম আজীবন বিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা দান করিয়াছেন। তাই তিনি জগতে 'ভূরিদা জনাঃ'র অন্যতম। অবিরাম ব্রহ্মবিদ্যা দান করিয়াছেন, কিন্তু আচার্য হইয়াও সেবকভাবে। শ্রীম-র নিকট গুরুভাব বলিতে একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীম নিরহংকারের প্রতিমূর্তি। শ্রীরামকৃষ্ণের কথিত গৃহাশ্রমী জ্ঞানীর পাঁচটি লক্ষণের সবগুলিই সম্পূর্ণরূপে শ্রীম-তে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। তিনি ছিলেন নিরভিমান, প্রশান্ত, কর্মক্ষেত্রে সিংহতুল্য, রসরাজ রসিক আর সাধুভক্তের দাসানুদাস। তাঁহার পদরেণুর কৃপায় যে সাধু হইয়াছে তাহাকেও তিনি গুরুতুল্য শ্রদ্ধা প্রদান করিতেন। এমনি জীবন্ত মূর্তিমতী ছিল তাঁহার সাধুভক্তি। আবার সর্বভূতে শ্রীরামকৃষ্ণের অধিষ্ঠান জানিয়া সকলকে নমস্কার মুদ্রায় পূজা করিতেন।

সকল ধর্মের উপর শ্রীম-র শ্রদ্ধাও ছিল শ্রীগুরুর অনুরূপ। তিনি যেরূপ হিন্দুর সকল ধর্মমন্দিরে যাইতেন, সেইরূপ খ্রীস্টীয় চার্চ ও মুসলিম মসজিদেও গমন করিতেন। বৌদ্ধ, জৈন, শিখ গুরুদ্বার, আর্যসমাজ, আদি ব্রাহ্মসমাজ, নববিধান ব্রহ্মসমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেও সর্বদা যাতায়াত করিতেন। শ্রীম-র ইচ্ছা ছিল, একই সময়ে কলিকাতার সকল ধর্মসম্প্রদায়ের উপাসনা দর্শন করিবার।

ঠাকুর শ্রীমকে চৈতন্যদেবের পার্ষদরূপে দর্শন করিয়াছিলেন

চৈতন্যসংকীর্তনে 'সাদাচোখে'। তাঁহার চৈতন্য ভাগবত পাঠ শুনিয়া ঠাকুর বুঝিয়াছিলেন শ্রীম কে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলিয়াছিলেন, 'তুমি আপনার জন, এক সত্তা — যেমন পিতা আর পুত্র।' সেই জন্য পিতারই মত স্নেহ ও শাসন উভয়ই করিতেন। শ্রীগুরুর কৃপায় শ্রীম-র অন্তরে ছিল তীব্র জ্ঞান আর বাহিরে ভক্তির ঐশ্বর্য — প্রহ্লাদের মত। একই আকাশে যুগপৎ চন্দ্র-সূর্য উদয়ের ন্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবিতাবস্থায় শ্রীম ভক্তগণের মধ্যে সর্বপ্রথম ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুর দর্শন করেন। ঠাকুরের কৃপায় সমগ্র কামারপুকুর একটি জ্যোতির্ময়ধামরূপে দর্শন করিয়াছিলেন — বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, মনুষ্য সকলই জ্যোতির মূর্তি। তাই রাস্তায় ঢিপ্ ঢিপ্ করিয়া সকলকে প্রণাম করিতেন। জ্যোতির্ময় একটি বিড়াল সম্মুখে পড়িল, অমনি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম। একদিন দক্ষিণেশ্বর-ধামকে জ্যোতির্ময় দর্শন করিয়াছিলেন। পুরীতে ঠাকুর শ্রীমকে পাঠাইয়াছিলেন নিজে না গিয়া। বলিতেন, ওখানে নিজে গেলে শরীর থাকিবে না — স্বীয় চৈতন্যলীলার স্মৃতিতে দেহ মহাভাবাবেশে ত্যাগ হইতে পারে। শ্রীম ঠাকুরের নির্দেশে অসম সাহসে অসময়ে জগন্নাথকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। পরেও শ্রীম অনেকবার পুরী দর্শন করিয়াছেন।

কাশীতে প্রথম যান ষোল বছর বয়সে। রেলের পুলের উপর হইতে কাশী দর্শন করিয়া শ্রীম-র মনপ্রাণ আনন্দে নৃত্য করিয়াছিল। তাহার পর আরো কয়েকবার যান। ঠাকুরের শরীর ত্যাগের পর ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী ও বিশুদ্ধানন্দ স্বামীকে দর্শন করিয়াছিলেন। ভাস্করানন্দ স্বামী শ্রীম-র মুখে ঠাকুরের 'মায়ের গান' শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'তুমি বলছো অত কাজ কর। তার উপর এই সব ভাবনা ভাববার সময় পাও কি করে?' ত্রৈলঙ্গ স্বামী শ্রীম-র হাত হইতে মিষ্টির চ্যাঙ্গারি কাড়িয়া লইয়া বালকের মত পিছনে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন।

অযোধ্যায় রঘুনাথদাস বাবাজী প্রবোধ দিয়াছিলেন শ্রীমকে — 'গুরুর ধামে গমন, গুরুর নাম-রূপ চিন্তন, গুরুর গুণগান কীর্তন করিতে থাক।'

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীম ঝুলন দর্শন করিয়াছিলেন। আর নিধুবনে 'গঙ্গা মাঈ'র অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। রাসধারীদের অভিনয় শ্রীম-র মন হরণ করিয়াছিল।

শ্রীম ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে শ্রীশ্রীমায়ের সহিত কাশী যান। সেই বৎসর এবং তাহার পরবৎসর তিনি তপস্যায় উত্তরাখণ্ডে অতিবাহিত করেন। হরিদ্বার-কনখলে গঙ্গার ধারে একটি কুটীরে থাকিয়া তপস্যা করেন। মাঝে মাঝে ঐ কুটীরে স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী শিবানন্দ প্রভৃতি গুরুভাইদের সহিত 'ব্রহ্মচক্র' রচনা করিতেন। তারপর যান ঋষিকেশে — প্রথমে থাকেন মায়াকুণ্ডে, পরে স্বর্গাশ্রমে একটি কুটীরে নিবাস করেন। আজও ভগ্নাবস্থায় ঐ কুটীরটি বিদ্যমান।

শ্রীম-র ভিতর বরাবর তপোবনে তপোনিষ্ঠ একজন উচ্চশ্রেণীর ঋষির নিবাস ছিল। সারাজীবন তপোবনে বাস করিবার ইচ্ছা শ্রীম-র মনে অতিশয় প্রবল ছিল। কলিকাতার নিজ বাসস্থলে — মর্টন স্কুলে ও 'ঠাকুর-বাড়িতে', টবে নানা প্রকার ফুল ও ফলের বৃক্ষ রোপণ করিয়া রাখিতেন ছাদে। ঐ স্থলে বসিয়া বৈদিক গুরুগম্ভীর সুরে তাঁহার মুখে উপনিষদ্ পাঠ শুনিলে স্বতঃই মনে হইত সত্যযুগের একজন ঋষি বুঝি নূতন শরীর ধারণ করিয়া আসিয়াছেন।

উপনিষদ্ ছিল শ্রীম-র প্রাণ, তারপর গীতা। বাইবেলের তিনি ছিলেন 'মাস্টার'। অনর্গল সর্বদা কথাপ্রসঙ্গে এই তিনটি গ্রন্থ হইতে দেববাণী আবৃত্তি করিতেন। তাঁহার মুখে খ্রীস্ট বাণীর ব্যাখ্যা শুনিয়া পাড়ার বৃদ্ধ ও আনুষ্ঠানিক পাদ্রি খ্রীস্টভক্ত বোসমশায় অবাক হইতেন। শ্রীম সহাস্যে উত্তর করিতেন, ঠাকুর ও ক্রাইস্ট এক — এই কথার ইঙ্গিত করিয়া — 'আমরা ক্রাইস্টের সঙ্গে ঘর করেছিলাম কিনা, তাই তাঁর কথা একটু বুঝতে পারছি।'

যাঁহারা সাধু হইবেন অকৃতদার এরূপ যুবকগণকে শ্রীম শত মায়ের হৃদয় লইয়া ভালবাসিতেন। যেমন পিতামাতা পুত্রকে 'লায়েক' করিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হন, তেমনি শ্রীম যখন দেখিতেন, ভক্তগণ শ্রীরামকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তখন তিনি নিশ্চিন্ত হইতেন। সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত — শ্রীম সাধু ও ভক্তদের

সদা বলিতেন।

শ্রীম সর্বদা সাধুভক্তে পরিবৃত থাকিতেন। তিনিও ঠাকুরের ন্যায় সাধু ভক্তগণকে আপন জন মনে করিতেন, আর আপন জনকে পরের মত দেখিতেন। শরীর যাইবার সময়ও সেবক ব্রহ্মচারীকে বারণ করিয়াছিলেন বাড়ির লোকদের সংবাদ দিতে। পাড়ার লোকেরা সংবাদ দিলে বাড়ির লোক আসিয়া উপস্থিত হয়।

শ্রীম-র দুই পুত্র ও দুই কন্যা আর বৃহৎ স্বজনমন্ডল। তিনি সকল কর্তব্য সমাপন করিয়াও যেন নিজগৃহে প্রবাসী — যেন পান্থশালায় পথিক। ঠাকুরের কুলজনদিগকে আর মায়ের পিতৃকুলজনকে তিনি ঠাকুরের মত শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহাদের জন্মস্থানবাসীকেও সেইরূপই দেখিতেন। তিনি ঠাকুর আর মাকে অভেদ জ্ঞান করিতেন, গুরুভ্রাতা — ভগিনীগণ ছিলেন গুরুবৎ। বেলুড় মঠের বাগানের একটি বাতাবীলেবু আর দক্ষিণেশ্বরের একটি বেল ছিল শ্রীম-র কাছে — বৈকুণ্ঠের নির্মাল্য।

মর্টন স্কুলের চারতলার ছাদ ও সিঁড়ির ঘরটি ছিল যেন নৈমিষারণ্য — সদা ভাগবতকথায় মুখরিত! নারদ ঋষির মত শ্রীম রামকৃষ্ণ-গুণগানে সহস্রমুখ হইয়া যাইতেন। যে কোন প্রসঙ্গ কেহ উত্থাপন করুন অপরের অজ্ঞাতে শ্রীম উহাকে ঐ প্রাণারাম শ্রীরামকৃষ্ণ-অমৃতসাগরে অবগাহন করাইবেন। শ্রীম-র কাছে কেহ কখনও সাধুনিন্দা করিলে তাহার রক্ষা ছিল না — মিষ্ট কথায় তাহাকে চোখের জলে ভাসাইয়া দিতেন। শ্রীম বলিতেন, দোষে-গুণে মানুষ। সাধুর দোষ থাকিলেও তাঁহারা আমাদের প্রণম্য। তাঁহাদের নিন্দা করিলে আমরা কাহার কাছে ঈশ্বরীয় কথা শুনিব? একবার তিনি অনেক বৎসর ধরিয়া ভক্তগণকে নিত্য বেলুড় মঠে পাঠাইতেন ভোরে প্রথম স্টীমারে সাধুসঙ্গের জন্য।

শ্রীম ছিলেন গুণগ্রাহী রাজহংস। অপরের দোষ দর্শনের দরজা তাঁহার জীবনে চিরতরে রুদ্ধ ছিল। জাতি, বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ ও গুণের অভিমান সমূলে উৎপাটিত হইয়াছিল তাঁহার জীবন হইতে।

‘কথামৃতে’র প্রকাশ ও প্রচারের জন্যই শ্রীম-র জন্ম। পঞ্চম ভাগের

লেখার কার্য শেষ হইল রাত্রি নয়টায়। তারপরই স্নায়ুশূল-বেদনা উপলক্ষ্য করিয়া রাজহংসের মত গান গাহিতে গাহিতে — 'গুরুদেব মা, কোলে তুলে নাও' — শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ শ্রীম মহাসমাধিতে প্রবেশ করিলেন — ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা জুন, শনিবার, ফলহারিণী কালীপূজার শেষে, অমাবস্যা তিথিতে আর রোহিণী নক্ষত্রে।

একুশ দিন পূর্বেই শ্রীম "দুর্গা" বলিয়া যাত্রা করিয়া বসিয়া ছিলেন, আর প্রাণ ঢালিয়া গাহিয়াছিলেন, মৃতুঞ্জয়ী বিদায়-সঙ্গীতটি —

আমি অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি
আর কি যমের ভয় রেখেছি॥

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, তুলসী মঠ, ঋষিকেশ। বিনীত
চৈত্র পূর্ণিমা, ১৩৬৬ সাল, ১১ই এপ্রিল, ১৯৬০ খ্রীঃ। **গ্রন্থকার**

প্রথম অধ্যায়

মিহিজামে শ্রীম

ঋতুরাজ বসন্ত ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছে। অলিকুল পুষ্পমধু আহরণে মগ্ন। এই শুভক্ষণে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে'র ভাণ্ডারী শ্রীম মিহিজামে বাস করিতেছেন — সঙ্গে বিনয় প্রভৃতি কয়েকজন ব্রহ্মচারী। ভক্ত অলিকুল অমৃতের সন্ধান পাইয়াছেন, তাই এখানে যাতায়াত করিতেছেন।

শ্রীম-র পর্ণকুটীর নির্জন স্থানে অবস্থিত। অদূরে ইষ্টকনির্মিত গৃহে ব্রহ্মচারীগণ থাকেন। কুটীরের দুইটি প্রকোষ্ঠ — একটিতে শ্রীম থাকেন, অপরটিতে ভাণ্ডার — কখন কেহ থাকেন। পূর্বদিকের বারান্দায় ক্ষুদ্র দুইটি ঘর দুই পার্শ্বে — একটিতে রান্না হয়, অপরটি স্নান-ঘর। পাকাবাড়িতে, ভক্তরা আসিলে থাকেন।

কুটীর পূর্বমুখী — দক্ষিণে গোলাপ প্রভৃতি পুষ্প ও আম্রাদি ফলের উদ্যান। কুটীরের সম্মুখে একটি জম্বুবৃক্ষ আছে। তাহার চারদিকে গোলাকার ইষ্টক-নির্মত একটি বেদিকা রহিয়াছে। উহাতে বসিয়া ভক্তগণসঙ্গে শ্রীম ভাগবত পাঠ, শ্রবণ ও কীর্তন করিয়া থাকেন। অদূরে প্রান্তরে উত্তর দিকে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ রহিয়াছে। তাহার তলে বসিয়া শ্রীম ধ্যান করেন, এবং ভক্তগণসঙ্গে মাঝে মাঝে পবিত্র ধুনি রচনা করিয়া ঈশ্বরধ্যানে মগ্ন হন।

বিশ্রামলাভ ও নির্জনে ঈশ্বরচিন্তা — এই জন্যই এবার শ্রীম-র মিহিজামে আগমন। এই উপলক্ষ্যে কতকগুলি ভক্তের ধর্মজীবনের ভিত্তিমূলও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। ভক্তগণ, ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বক্সী প্রভৃতি মধ্যে মধ্যে কলিকাতা হইতে আসিয়া দুই-এক দিন ঈশ্বরচিন্তা করিয়া পুনরায় চলিয়া যান। বেলুড় মঠের স্বামী বিশ্বানন্দ, রাঘবানন্দ প্রভৃতি সন্ন্যাসীগণও কখন কখন যাতায়াত করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ দিতেন, ভক্তদের মধ্যে মধ্যে নির্জন বাস করা উচিত। গুরুদেবের এই উপদেশ আজীবন শ্রীম পালন করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে মিহিজাম আগমনেরও অন্যতম কারণ ইহাই। অপর কারণও বিদ্যমান। অল্পদিন মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিবারের কতকগুলি উজ্জ্বল মণি পর পর খসিয়া পড়িলেন। প্রথমে চলিলেন, ঠাকুরের প্রেমের ঘনমূর্তি অতি শুদ্ধ মহালক্ষ্মীর অংশসম্ভূত স্বামী প্রেমানন্দ। তারপর চলিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত সন্তান মহাযোগী স্বামী অদ্ভুতানন্দ। তারপর অন্তর্ধান করিলেন শ্রীশ্রীমা, এই সঙ্ঘের প্রাণস্বরূপিণী — জগজ্জননী। আবার কিছুকালের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ - গগনের অপর দুইটি জ্যোতিষ্ক কক্ষচ্যুত হইল — একটি ঠাকুরের মানসপুত্র অধ্যাত্ম-স্তম্ভ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, অপরটি তপোমূর্তি শুকদেবতুল্য স্বামী তুরীয়ানন্দ।

শ্রীশ্রীমায়ের শরীর ত্যাগের পর হইতে প্রায় সপ্ততিবর্ষীয় শ্রীম যেন মাতৃহীন বালকের ন্যায় শরীর ধারণ করিয়া আসিতেছেন। কখনও কখনও আক্ষেপ ভরে আপন মনে বলিয়া যাইতেন — যিনি সুদীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল আমাদের রক্ষা করে এসেছেন, সেই মা চলে গেলেন। ঠাকুরকে আমরা পেয়েছিলাম মাত্র পাঁচ বৎসর, কিন্তু মা পঁয়ত্রিশ বৎসর ধরে আমাদের পালন করে এসেছেন, তিনিই চলে গেলেন। এই সকল ঘটনাপরম্পরায় শ্রীম-র শরীর মন যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাই বিশ্রামলাভের প্রয়োজন, তজ্জন্যই তাঁহার মিহিজামে আগমন।

মিহিজামে তখন সবেমাত্র বিদ্যাপীঠ স্থাপিত হইয়াছে, কয়েকজন নিঃসম্বল সাধু-ব্রহ্মচারী দ্বারা। তাহারই অধ্যক্ষ ব্রহ্মচারী বিদ্যাচৈতন্যের (পরে স্বামী সদ্ভাবানন্দ) সাদর ও সশ্রদ্ধ আমন্ত্রণে শ্রীম এখানে আসিয়াছেন। এই শিশুশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটি প্রবীণ শিক্ষাব্রতী শ্রীম-র স্নেহোপদেশে বর্ধিত। দুই তিনটি বালক লইয়া এই বিদ্যাপীঠের কার্য আরম্ভ হয়। ব্রহ্মচারীগণই একাধারে ইহাদের শিক্ষক, বন্ধু ও মাতা। বৃক্ষতলে ভূমিতে বসিয়া ছেলেরা পড়ে, আর থাকে একটি পরিত্যক্ত ভগ্ন গৃহে সাধুদের সঙ্গে। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম অন্তরঙ্গ

পার্ষদ শ্রীম প্রথমে কিছুদিন এই আশ্রমে বাস করেন। ইহাই অধুনা বিখ্যাত দেওঘর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের ভিত্তি।

এই কালে শ্রীম-র ব্রহ্মচারী ও ভক্তগণসঙ্গে বাস দেখিলে সততই প্রাচীন বৈদিক যুগের সশিষ্য ঋষিগণসেবিত তপোবনের কথা মনে হইত। ভৃগু, পিপ্পলাদ কিংবা আরুণি ঋষি যেন শরীর ধারণ করিয়া আবার আসিয়াছেন। ভক্তগণের কেহ কেহ এরূপভাবে তপোবনে ঋষিসঙ্গে বাস করিবার ইচ্ছা আবাল্য পোষণ করিয়া আসিয়াছেন।

এই আশ্রমে কোনও ভৃত্য নাই। ব্রহ্মচারিগণ প্রাচীন তপোবনের আদর্শে যাবতীয় কার্য নিজ হস্তে সম্পন্ন করেন। বর্তমান সভ্য জগতের কোনও উপকরণ প্রায় এখানে দৃষ্টিগোচর হয় না। রন্ধনের জন্য মৃন্ময় পাত্র, আর ভোজনের জন্য বনজাত শালপত্র। শয্যাও ভূতলে, উপবেশন সামান্য আসনে — কেবল বার্ধক্যবশতঃ শ্রীম-র জন্য একটি তক্তপোষ, দুই-একটি থালা ও বাটি রহিয়াছে। আহার্যের মধ্যে ডালভাত। শ্রীম নিজে দিনে দুধ-ভাত, রাত্রে দুধ-রুটি আহার করেন। ব্রহ্মচারিগণ ভাত, আর মুগ ডাল সিদ্ধ করিয়া কিঞ্চিৎ হরিদ্রা ও লবণ সহযোগে আহার করেন। গব্য ঘৃত যৎসামান্য সকলেই গ্রহণ করেন। কলিকাতা হইতে ভক্তগণ বিবিধ খাদ্যদ্রব্য পূর্ণ পার্শেল সেবার্থ প্রেরণ করেন। কিন্তু শ্রীম এই সমস্তই ব্রহ্মচারিগণ দ্বারা পার্শ্ববর্তী গৃহসমূহে বিতরণ করিয়া দেন। দরিদ্র সাঁওতাল বালক-বালিকাগণও তাহার অংশ পাইয়া থাকে। শ্রীম বলেন, এখানে তপস্যার্থ আগমন। Life simplify (জীবনযাত্রা সহজ) করিতে না পারিলে তপস্যা হয় না। অভাববোধ যত কমিবে ততই ঈশ্বরীয় আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে। Plain living and high thinking (সরল জীবন উন্নত মনন) — ইহাই ভারতের ঋষিগণের আদর্শ। এই আদর্শের বলেই ভারতের সনাতন সভ্যতা আজও নানা বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়া মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে।

এই আশ্রমে সময়-নির্ণায়ক একটি ঘড়িও রাখিতে দেন নাই। শ্রীম বলেন, পূর্বে ঋষিগণ সূর্যকে অবলম্বন করিয়া দিবাভাগের যাবতীয়

কার্যক্রম নিরূপণ করিতেন। রাত্রিতে ধ্রুবতারা ঘড়ির কাজ করিত। এখানে ট্রেনের যাতায়াত ঘড়ির কার্য করিয়া থাকে। আশ্রমের যাবতীয় কার্যক্রম শ্রীম বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন, স্নানাহারাদির কার্য যত শীঘ্র হয় শেষ করিয়া ঈশ্বরচিন্তা কর। দিনের বেলা এগারটা, আর রাত্রিতে নয়টার মধ্যে আহারাদি সম্পূর্ণ করেন। শ্রীম নিজে ব্রহ্মচারিগণকে উপনিষদ্, গীতা, চণ্ডী, ভাগবত ও কথামৃত প্রায় নির্দিষ্ট সময়ে শ্রবণ করাইয়া থাকেন। আর তাহাদিগকে প্রভাতে ও অপরাহ্নে দূর দূর প্রান্তরে নির্জনে একাকী ধ্যানার্থ প্রেরণ করেন। ভক্তগণ কেহ কেহ এখানে বাস করিয়া বাহিরের জগৎ যেন ভুলিয়া গিয়াছেন। সর্বদা এক আনন্দময় ধামে বাস করিতেছেন। মন সদাই উচ্চভূমিতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেছে। পবিত্র ঋষিসঙ্গের ইহাই ফল।

আজ ২৯শে ফাল্গুন, ১৩২৯ সাল। ইংরেজী ১৩ মার্চ, ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ। কৃষ্ণপক্ষের একাদশী — মঙ্গলবার। আগামীকাল বারুণী। রাত্রি দশটার সময় একটি ভক্ত কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। এই স্থান কলিকাতা হইতে ১৪৪ মাইল, ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে লাইনের উপর একটি ক্ষুদ্র পল্লীবিশেষ। ইহা সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত একটি স্বাস্থ্যাবাস। রাত দশটায় সব নীরব হইয়া গিয়াছে। ভক্তটি ‘বিনয়, বিনয়’ বলিয়া দরজায় করাঘাত করিতেই অপর প্রকোষ্ঠ হইতে শ্রীম বাহির হইয়া আসিলেন। এখনও অল্প শীত থাকায় শ্রীম-র মাথায় একটি গরম কম্ফোর্টার রহিয়াছে।

শ্রীম দীর্ঘাকৃতি সুদৃঢ়বপু ও গৌরবর্ণ। তাঁহার ললাট উন্নত, বক্ষ সুবিস্তৃত, বাহু আজানুলম্বিত আর সম্মুখপ্রসারী বিশাল নয়নদ্বয় অনুক্ষণ প্রেমানুরঞ্জিত। আবক্ষ বিলম্বিত শ্বেতশ্মশ্রুশোভিত তাঁহার দিব্য বদনমণ্ডলে এক প্রশান্ত অতি গম্ভীরভাব বিরাজমান। সৌম্যদর্শন, সুরসিক ও মধুরভাষী রামকৃষ্ণভাববিভোর এই মহাযোগী অহর্নিশ রামকৃষ্ণ-গুনগান করিবার জন্যই যেন জীবন ধারণ করিতেছেন। মহাজ্ঞানী মহামনীষী হইয়াও তিনি নিরভিমান বিগ্রহ। এই নরদেবকে দর্শন করিয়া ভক্তের হৃদয়-মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। তিনি আপন

মনে ভাবিতেছেন, হরিপ্রেমোন্মত্ত নারদব্যাসতুল্য পূর্ণকাম, ছিন্নসংশয় বর্ষীয়ান এই মহর্ষি কেন এই নির্জন পর্ণকুটীরে বাস করিতেছেন! কেন এই কঠোর জীবন, কেনই বা এই তপোতন্ময়তা। ইহা কি হরিরস পান-মাদকতা — ইহাই কি অহৈতুকী ভক্তি? তাই বুঝি ভগবান ব্যাসদেব বলিয়াছেন,

'আত্মারামাস্তু মুনয়ঃ নিগ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং ইত্থম্ভুতগুণো হরিঃ॥'

আশ্রমে এখন তিন চারিজন ভক্ত আছেন। প্রণাম ও প্রাথমিক সম্ভাষণাদির পর শ্রীম ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন নবাগতের আহারের জন্য। ভক্তটি বারবার বলিতেছেন — 'আজ একাদশী, আমার উপবাস। যা খাবার তা খেয়ে এসেছি।' কিন্তু শ্রীম ভক্তের সঙ্গে আনীত ফল ও মিষ্টি হইতে দুইটি কমলালেবু, দুইটি সীতাভোগ ও তিনটি মিহিদানা নিজ হস্তে লইয়া শালপাতায় রাখিয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিলেন। শ্রীম প্রসাদ গ্রহণ না করিলে নবাগত খাইতেছেন না দেখিয়া, দুই তিনটি কমলালেবুর কোষ রাত্রি এগারটার সময় গ্রহণ করিলেন। ভক্ত ঠাকুরের সামনে বসিয়াই প্রসাদ খাইতেছেন। শ্রীম কলিকাতার ভক্তগণের সংবাদ লইতেছেন। আহারান্তে শালপাতাটি ফেলিবার জন্য ভক্ত বাহিরে আসিয়াছেন, ঘরে পুনঃপ্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শ্রীম নিজ হস্তে উচ্ছিষ্ট স্থান জলসংযোগে শুদ্ধ করিতেছেন। ভক্ত অবাক হইয়া ভাবিতেছেন, ব্রহ্মদ্রষ্টা মহাপুরুষগণের সকল ব্যবহার বাস্তবিকই অসাধারণ!

দ্বিতীয় অধ্যায়

লক্ষ্য — ঈশ্বরলাভ, নিষ্কাম কর্ম — উপায়

১

একটি ব্রহ্মচারী কুটির-প্রাঙ্গণ সম্মার্জনী হস্তে পরিষ্কার করিতেছেন। শ্রীম তাঁহাকে অন্তরালে ডাকিয়া কিছু বলিলেন। ব্রহ্মচারী ক্ষিপ্র গতিতে স্নান সমাপন করিয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। বেলা অনুমান সকাল আটটা।

ঠাকুরঘর শ্রীম-র শয়ন-গৃহেরই একাংশ — একটি পরদা দ্বারা পৃথক করা। সম্মুখে একটি প্যাকিংবক্স বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া তাহার উপর মাটির একটি বালগোপালের মূর্তি, আর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একটি ছবি রাখা হইয়াছে। ঠাকুরদের ছবি দক্ষিণাস্য। ভক্তগণ ঠাকুরদের আসনের সামনে মেঝেতে কম্বলে উপবেশন করেন। দেবমূর্তি ও কম্বলের মধ্যস্থলে তিন চারি হস্ত পরিমিত স্থান। মধ্যস্থলে পূজারী বসিয়া ফল মিষ্টি নিবেদন করেন। পূজারীর ডান ও বামদিকে দুইখানা আসন পাতা থাকে। তাহাতে বসিয়া ধ্যান হয়, বাম হস্তের আসনখানাতে শ্রীম নিত্য বসেন। সকাল সন্ধ্যায় ধূপ দেওয়া হয়, মধ্যাহ্নে ফুল এবং ফল ও মিষ্টি ভোগ নিবেদন করা হয়। উপনিষদ্ ও কথামৃত সকাল ও সন্ধ্যায় এই স্থানে বসিয়া শ্রীম পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। কখনও অপরে পড়েন, তিনি ব্যাখ্যা করেন।

কোনও আড়ম্বর নাই এই ঠাকুরঘরে। কিন্তু কি যেন এক অপূর্ব মনপ্রাণ-উন্নতকারী পবিত্র আবহাওয়ায় গৃহটি মণ্ডিত। যে প্রবেশ করে সে-ই ইহা হৃদয়ে অনুভব করিতে পারে। গঙ্গাসলিলে অবগাহনে শরীর যেমন শীতল হয়, তেমনি এই ক্ষুদ্র অনাড়ম্বর ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেও মন অতি উচ্চ পবিত্র ভাবে অভিভূত হইয়া আনন্দে পরিপূর্ণ হয়।

শ্রীম নিজ আসনে উপবিষ্ট। ইঙ্গিতে ব্রহ্মচারীকে তাঁহার সম্মুখে আসন গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। উভয়ে ধ্যান করিতেছেন প্রায় এক ঘন্টা। মঠের ভক্ত পুলিন মিত্র ও তাঁহার জামাতা রণদা কম্বলে ঠাকুরের সামনে আসিয়া বসিলেন। রণদা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষা পাশ করিয়াছিলেন। পুলিন সাংসারিক কোন এক অনভিপ্সীত অবস্থায় পতিত হইয়া অশান্তি ভোগ করিতেছেন। শ্রীমকে বলিতেছেন, আচ্ছা, মাস্টারমহাশয়, ঠাকুর আমাদের এই বিপদ দেন কেন? শ্রীম উত্তর করিলেন, তরঙ্গ না থাকলে শক্ত নাবিক হওয়া যায় না — Every one is a pilot in a calm sea. তাই বিপদের প্রয়োজনীয়তা। বিপদাপদের ভিতর দিয়েই সত্যের পথ। দেখুন, সংসারে যারা বড়, তাদের কত বিপদের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। Plain-sailing life weakness-এর (বাধাহীন অলস জীবন দুর্বলতার) আড্ডা। ঈশ্বর যাদের বড় করবেন তাদের বিপদে ফেলেন — মকরধ্বজ তৈরী হবে আগুনে পুড়ে অগ্নিবৃষ্টির ভিতর দিয়ে। তরঙ্গ, শক্তি বৃদ্ধি করে। গুরু বা গুরুস্থানীয়দের জীবনের ঘটনাগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতে হয়, চিন্তা করতে হয়। কত বিপদের ভিতর দিয়ে গিয়ে তবে ওঁরা অত বড় হয়েছেন! তবেই নিজেরও শক্তি বাড়বে ও মনে বল আসবে। দেখুন না মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) জীবন। তিনি স্ত্রীর জন্য কত ভাবতেন। সেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী হলেন। আবার তাঁর মৃত্যুর কথা শুনলেন পরিব্রাজক অবস্থায় লাহোরে — টেলিগ্রামে, শুনে আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। আবার বৃন্দাবনে তপস্যা করেছেন কুসুম সরোবরে — কি কঠোর তপস্যা! সামান্য রুটি ভিক্ষা করে জীবনধারণ! দিনের রুটি রাত্রিতে জলে ভিজিয়ে আহার। অত তরঙ্গের ভিতর দিয়ে গিয়ে ত তবে অত বড় হয়েছেন।

তা মহারাজ ইহা করবেন না ত কি? যিনি নিজের গুরু পরমহংসদেবের মুখে সর্বদা শুনেছেন, 'বাবা, ভগবানদর্শন মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। উহা না হলে জীবন বৃথা।' শ্রীগুরুর কথা শুনে অত কষ্ট ও বিপদের ভিতর দিয়ে গিয়েছেন বলেই অত বড়

হয়েছেন। পরমহংসদেব বলতেন কিনা অন্তরঙ্গদের, 'মাইরি বলছি, আমার চিন্তা যে করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে — যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে। আমার ঐশ্বর্য — জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, প্রেম, সমাধি।' গুরুর জীবন আলোচনা করতে হয়, তবে শক্তি বৃদ্ধি হবে। কিছু করলুম না আর অমনি ফস্ করে হয়ে যাবে — এ কেমন কথা! সম্মুখে সংসারতরঙ্গ মধ্যে গুরু-উপদেশ, অন্তে ঈশ্বরলাভ।

পুলিনবাবু শ্রীমহারাজের মন্ত্রশিষ্য। এখন অন্য কথা হইতেছে।

রণদা — একজন বিলিতি historian (ঐতিহাসিক), Six Great Men 'ছয়জন মহামানব' নাম দিয়ে একটি পুস্তক লিখেছেন, তাতে ঠাকুরের নাম নাই।

শ্রীম — ঠাকুরের কি তুলনা আছে যে লিখবে। ওরা জানবে কেমন করে, ওদের দোষ কি? তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। স্বামীজীর তুলনা করতে গিয়েই জুড়ি মিলে না ত ঠাকুরের।

পুলিন — শুনেছি, রাজপুতানায় স্বামীজী বিভিন্ন ভাষায় অকাট্য যুক্তিদ্বারা ধর্মতত্ত্ব ব্যাখা করে লোকদের মুগ্ধ করেন। নিরঞ্জন স্বামী স্বামীজীর প্রশংসা করেন তাতে। স্বামীজী নাকি শুনে বললেন, 'শালা খালি বিবেকানন্দ, বিবেকানন্দ করে। জানিস্ — গুরু প্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতী। আর জানিস, out of a handful of dust lacs of Vivekananda can be made by him — this Ramakrishna?' এক মুষ্টি ধূলিকণা থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ লক্ষ লক্ষ বিবেকানন্দ তৈরী করতে পারেন। আরো শুনেছি, মিঃ সেভিয়ার কাশ্মীরে যাবার জন্য অযাচিতভাবে আট শ' টাকা দেন। স্বামীজী অর্ধেক রেখে অর্ধেক ফেরৎ দেন — কি নির্লোভ!

শ্রীম — তা হবে না! স্বামীজী ঠাকুর ছাড়া কিছু জানতেন না। একবার তাঁর লিখিত আরাত্রিক ও স্তব পড়ে দেখবেন। স্তবে বলেছেন, 'তস্মাৎ ত্বমেব শরণম্ মম দীনবন্ধো'। আবার বলেছেন, 'মর্ত্যামৃতং তবপদং মরণোর্মিনাশং' — অর্থাৎ যে তাঁর চিন্তা করে তাকে আর জন্মমরণরূপ চক্রে পতিত হতে হয় না। মৃত্যুভয় দুর হয়। স্বামীজী

বলবেন তাতে আর আশ্চর্য কি!

বেলা এগারটা হইতে চলিল, আহারের আহ্বান আসিল। এদিকে আবার পুলিনবাবুর ভজনের আয়োজন হইতেছে। সাধারণতঃ এগারটার মধ্যে আহারাদি সব শেষ হইয়া যায়। শ্রীম বলিতেছেন, Man shall not live by bread alone. (— Matth. 4:4) (স্থূল আহারই জীবনধারণের একমাত্র উপকরণ নহে।) পুলিনবাবু সুমিষ্ট স্বরে হারমোনিয়ম সংযোগে চণ্ডীর স্তবগান করিতেছেন —

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্॥
রৌদ্রায়ৈ নমো নিত্যায়ৈ গৌর্যৈ ধাত্র্যৈ নমো নমঃ।
জ্যোৎস্নায়ৈ চেন্দুরূপিণ্যৈ সুখায়ৈ সততং নমঃ॥
কল্যাণ্যৈ প্রণতা বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ কুর্মো নমো নমঃ।
নৈর্ঋত্যৈ ভূভৃতাং লক্ষ্ম্যৈ শর্বাণ্যৈ তে নমো নমঃ॥
দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ॥
অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমো নমঃ।
নমো জগৎপ্রতিষ্ঠায়ৈ দেব্যৈ কৃত্যৈ নমো নমঃ॥* (৫/৯-১৩)

---

*দেবগণ মহামায়াকে স্তব করিতেছেন —

হে মাতঃ, আপনি জ্যোতির্ম্ময়ী, আপনি দেবগণের জননী, আপনি সতত মঙ্গলদায়িনী — অতএব আপনাকে প্রণাম। আপনি বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতিবিনাশকারিণী ত্রিগুণময়ী, আবার গুণাতীতা নিত্যা। আপনি জগদ্ধাত্রী গৌরী, আপনাকে প্রণাম। মা, আপনি বিমলচন্দ্ররূপিণী হইয়া সুশীতল কিরণোজ্জ্বল বিস্তারপূর্বক শস্যের পুষ্টিসাধন করেন, আপনি জনগণের সদা সুখদায়িনী, আপনাকে প্রণাম।

হে দেবি, আপনি জনগণকে সম্পদ ও ঐশ্বর্য প্রদান করিয়া থাকেন। আবার রাজন্যবর্গের কাহারও নিকট মহালক্ষ্মীরূপিণী, কাহারও নিকট অলক্ষ্মীরূপিনী। কিন্তু আপনি স্বয়ং সর্বদা কল্যাণকারিণী সর্বত্যাগিনী শিবশক্তি শর্বাণী। আপনাকে ভুয়োভুয়ঃ প্রণাম। দেবি, আপনি সংসারদুঃখহারিণী, সকলের জননী, আপনার দর্শন সুদুর্লভ। আপনি প্রয়োজন মত কৃষ্ণা, ধূম্রা নানা রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। আপনি কখনও প্রণতজনের নিকট সৌম্যমূর্তিধারিণী, আবার অসুরবিনাশিনী — ভয়ঙ্করা করালবদনা। মা, আপনি শুভাশুভরূপ দ্বন্দ্বাতীতা, জগতের আশ্রয় — আপনাকে শত শত প্রণাম।

২

প্রান্তরে অশ্বত্থমূলে শ্রীম একটি ভক্তসঙ্গে কম্বলাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ভক্তটি ল (আইন) পড়িয়াছেন। পরমার্থসুহৃদ কেহ কেহ তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছেন ল-এর সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে। তিনি শ্রীম-র সহিত এ বিষয়ে কথাবার্তা কহিতেছেন। সমস্ত কথা শুনিয়া শ্রীম বলিতেছেন ঃ

ল পড়া নিয়ে কেন? কোন কর্মেই আপত্তি হতে পারে না, যদি বিদ্যার সংসারের জন্য হয়। যা ভাল লাগে তা নিষ্কাম হয়ে করলে দোষ নাই। ঠাকুর সব করাচ্ছেন তাঁর কাজের জন্য। ল-তে অনেক শিক্ষা করবার আছে। Hindu Law, Mahomedan Law, Law of Succession, Jurisprudence (হিন্দু ল, মুসলিম ল, উত্তরাধিকার-বিধি, আইন-বিজ্ঞান) — এসব ত খুব ভাল জিনিষ! অল্পবিস্তর সকলেরই জানা উচিত। ল প্রভৃতি সব কর্ম করা যায় নিজে interest (স্বার্থ) না নিলে। তাঁর লীলা আস্বাদনের জন্য করছি — এই ভেবে করা। এই ল পড়ছো, তোমাকে হয়ত কোন news paper-এর (সংবাদপত্রের) কাজে রাখতে পারেন। যেমন ‘বেদান্তকেশরী’ criticism-এর (সমালোচনার) সময় ল জানার দরকার হয়। তাঁর কাজ আমরা কতটুকু দেখতে পাই। যাজ্ঞবল্ক্য ত্যাগী সন্ন্যাসী, তিনি ল নিয়েছিলেন। আবার মনুও ল রেখেছিলেন। এঁরা সব ল রেখেছিলেন শ্রীভগবানের কাজ জেনে, তাঁর সমাজ সংরক্ষণের জন্য। ল পড়া প্রভৃতি সব কাজেরই একটা relative value (ব্যবহারিক মূল্য) আছে। Absolute value (পারমার্থিক মূল্য) নয়। ঠাকুর ল পড়াচ্ছেন, Lawyer-দের (আইনজ্ঞদের) মধ্যে হয়ত তোমার দ্বারা কাজ করাতে পারেন। সব জানা থাকলে তখন কথা বলা সহজ হয়। যেমন Law of Evidence (সাক্ষ্যবিধি), Criminal Procedure Code (ফৌজদারী আইন), Civil Procedure Code (দেওয়ানী আইন) — এসব জানা থাকলে উকিলদের দেখান যায়, তোমরা যা করছো এতে মনুষ্যত্বের খর্ব হয়, ছোট হয়ে যায় মন। সব করবো, কিন্তু নিজে benefit (সুবিধা) নেবো না —

ইহা কর্মযোগের ideal (আদর্শ)। দেখ না, স্বামীজী কত পড়েছিলেন — History, Literature, Science, Astronomy, Law, (ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, আইন) আরও কত কি! কত লোকের contact-এ (সংশ্রবে) এসে deal (কাজ) করতে হয়েছে! সব জানা না থাকলে কি করে কথা বলতেন! Qualifications (নানা বিদ্যা) থাকা ভাল। এগুলি equipment (সাজসরঞ্জাম) বিশেষ।

ল পড়া ভাল, কিন্তু practice (ওকালতির পেশা) করতে নেই। অর্থের জন্য সত্যকে মিথ্যা করা উচিত নয়। তোমার যা ভাল লাগে তাই করবে। প্রকৃতিতে যা আছে তা করতেই হবে — অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ একথাই বলেছিলেন। 'ক্ষত্রিয়ের কাজ তোমাকে করতেই হবে আমি বলি আর না-ই বলি — প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি। তবে করবার পথ ও কৌশল বলে দিচ্ছি। নিষ্কাম হয়ে করবে যা কর, নামযশের জন্য নয়, রাজ্যের আশায় না, শুধু ভগবানলাভের জন্য। 'করাচ্ছেন করছি' বলা — যেখানে না পারি, আর যেখানে পারি সেখানে নিজের অহঙ্কার প্রকাশ, তাতে চলবে না। পারা না পারা সবই তিনি করাচ্ছেন। তাঁর উপর ভার দিলে তিনিই সব দেখেন।

ঠাকুর বেশ গল্প একটি বলতেন। একজন হরিনামে বিভোর হয়ে রাস্তায় চলছে — হুঁশ নাই। তাই ধোপার কাপড় মাড়িয়ে ফেলেছে। ধোপা লাঠি নিয়ে মারতে এসেছে। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী-নারায়ণ সিংহাসনে বসা। হঠাৎ নারায়ণ উঠে কোথায় চলে গেলেন। একটু পরেই আবার ফিরে এলেন। লক্ষ্মী জিজ্ঞেস করলেন, এই চলে গেলেন, আবার ফিরে এলেন! নারায়ণ বলছেন, আমার ভক্ত হরিনামে বিভোর হয়ে ধোপার কাপড় মাড়িয়ে দিয়েছিল, বাহ্যজ্ঞান ছিল না। ধোপা মারতে গিছলো, তাই তাকে রক্ষা করতে গিছলাম। কিন্তু যখন দেখলাম তার জ্ঞান ফিরে এসেছে, আর আত্মরক্ষার জন্য হাতে পাথর নিয়েছে, তখনই ফিরে এলাম। সম্পূর্ণ ভার তাঁকে দিলে তিনি সর্বদা রক্ষা করেন। রামও বলবো, কাপড়ও তুলবো* এ হলে হয়না।

---

* এক ব্যক্তি নদী পার হবার সময়ে পরণের কাপড় গুটাচ্ছে আর বলছে, 'রাম

যতক্ষণ তাঁর উপর ভার ততক্ষণ তিনি দেখেন।

ঠাকুর আর একটি গল্প বলতেন। একটি দেয়ালের উপর একটি নেউল বসে আছে, বেশ আরামে কোনও কষ্ট নেই। যেই ল্যাজে একটা ইঁট বেঁধে দেওয়া হলো অমনি যত যন্ত্রণা। মানুষও বেশ আছে, কিন্তু কর্মের বোঝা ল্যাজে বেঁধেই যত যন্ত্রণা।

ঈশ্বর এই সংসারে উকীল, পুলিশ, জজ, আদালত সব করেছেন। ল-টাও in relation to God (ভগবৎ উদ্দেশ্যে) পড়লে এ দিয়েও তাঁর লীলা বোঝা যায়। দেখ না, কত বড় বড় ঋষিরা এ নিয়ে ছিলেন — মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, ব্যাস, বৃহস্পতি প্রভৃতি কত ঋষি।

ঠাকুরের একটি মহাবাক্য আছে। নিজের প্রাণ নরুনেই নেওয়া যায়, অন্যকে মারতে হলে ঢাল তরোয়ালের দরকার। শুধু নিজের জন্য হলে ল, সায়েন্স, Literature (সাহিত্য) এসবের দরকার হয় না। কিন্তু অপরকে মারতে হলেই, অর্থাৎ জগতের লোকশিক্ষার জন্য এগুলির দরকার। স্বামীজীর কত knowledge (জ্ঞান) ছিল, তবে ত দ্বিগ্বিজয় করে এলেন! যে যে রকম লোক তার সঙ্গে সেইরূপ কথা বলে, সেই ভাবে বুঝিয়ে।

ঈশ্বরের কাজ আমরা কতটা বুঝতে পারি? আমার ডায়েরী লেখার অভ্যেস আগে থেকেই ঠাকুর করিয়ে নিলেন। হেয়ার স্কুলে থার্ড ক্লাসে যখন পড়ি 1867-এ, (১৮৬৭ খ্রীঃ) তখন থেকেই ডায়েরী লিখছি ক্রমাগত — দৈনন্দিন কি করলাম, কোথায় গেলাম, এই সব। আর (১৮৮২ খ্রীঃ-এর) ফেব্রুয়ারীর শেষে ঠাকুরের দর্শন হলো। তখন এই অভ্যেসটা কাজে এলো। Restrospective wayতে — অতীত জীবনটা দেখলে, বোঝা যায় সব তিনি করাচ্ছেন। যাকে দিয়ে যা করাবেন পূর্ব থেকেই সব ঠিক করে রাখেন ও তা করান। অনেকেই তো ছিলেন, কিন্তু আমার দ্বারাই ডায়েরী লিখালেন। তবে

পার করো।' পাড় থেকে অপর একজন বলল, 'ভাই তোমার রাম নাম মুখেই, মনে তো কাপড় বাঁচাবার চেষ্টা। হয় সর্বান্তকরণে রাম রাম করো অথবা নিজে চেষ্টা করো।

তো এই বই (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত) বের হলো। পনের বছর apprentice (শিক্ষানবিশ) খাটতে হয়েছিল। ওতে কত উপকার হতো, memory sharp (স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ) হতো, লিখবার কৌশল বাড়তো। ছয়-সাত ঘন্টা, এমন কি সারাদিনের ঘটনা পরপর, রাত্রিতে মনে পড়তো। এমনতর করেছিলেন ঠাকুর। গানগুলিরও একে একে প্রথম পদ মনে রাখতে চেষ্টা করতাম।

তাই বলি, তাঁর কাজ আমরা কতটা বুঝি। আর এই সব কাজেরই এটা relative value (ব্যবহারিক মূল্য) আছে। কিন্তু ideal (আদর্শ) Absolute (ঈশ্বরলাভ)। তাঁর দর্শনলাভের জন্যই এই সব আয়োজন। নিষ্কাম ভাবে এই সব কর্ম করতে করতে চিত্ত শুদ্ধ হলে তাঁর দর্শন হয়। তখনই মনুষ্যজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্যের সিদ্ধি আর কর্মেরও পরিসমাপ্তি।

৩

শ্রীম ইচ্ছা করেন এই ভক্তটি মঠে যোগদান করিয়া সন্ন্যাসী হন। কিন্তু ভক্তের ইচ্ছা শ্রীম-র কাছে থাকেন। তাই মঠজীবনের উচ্চ আনন্দময় উদ্দেশ্যের কথা তাঁর নিকট কীর্তন করিতেছেন।

শ্রীম — তোমার কোনও সাধু friend-এর (বন্ধুর) সঙ্গে কিছু আলাপ হলো?

ভক্ত — আজ্ঞে, হয়েছিল গঙ্গার উপর স্টীমারে। তিনি বললেন, চলে এসো, আর দেরী না হয়। আর বললেন, moral obligation -এর (নৈতিক কর্তব্যের) কথা ভাবলে, religous life lead (ধর্মজীবন যাপন) করা যায় না। ঘরবাড়ির সব সুবন্দোবস্ত করে ধর্মজীবন যাপন, এ প্রায়ই হয়ে উঠে না। অত ভেবো না, চলে এসো।

শ্রীম—ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন — moral obligationএর (নৈতিক কর্তব্যের) কথা ভাবলে হয়ে উঠে না। তার তো শেষ নাই — obligation-এর (কর্তব্যের)। একটার পর একটা হিসেব করে ত্যাগ হয় না। তাই রোখ চাই।

মঠে আজকাল কত ভাল লোক আসছেন। আর এখনকার

সন্ন্যাসজীবন — sannyasa life of present বড়ই সুন্দর। কলিতে অন্নগত প্রাণ কিনা, তাই যেন বোর্ডিং হাউসে থাকার মত। স্বামীজী বলতেন, মঠ করা কেন? না, যাতে ছেলেরা এসে এক মুঠো খেতে পায় আর সৎ জীবন যাপন করতে পারে, তার জন্যই মঠস্থাপন।

বোর্ডিং হাউসের মত থাকা বটে, কিন্তু ওখানকার ideal (আদর্শ) অতি উচ্চ। ঈশ্বরলাভ, পার্থিব কিছু নয় — ঈশ্বর, এই difference (পার্থক্য) আর একটু স্নেহ ত্যাগ করা। তা আবার বাড়ির খবরও পোস্টকার্ড লিখলে পাওয়া যায়। অতি স্নেহপ্রবণ হলে হয়ত দুই একদিন গিয়ে বাড়িতে থেকেও আসা যায়। লাভ সবই। পেটে খেলে পিঠে সয়। না হয় করতেই হলো একটু কাজ। সে-ও ঠাকুরের কাজ, তাঁর সেবা — এই বুদ্ধিতে করা। যেমন relief work (দুঃস্থ সেবা), লাইব্রেরী দেখা, medicine (ঔষুধ) দেওয়া, পড়ানো, পত্রিকা লেখা, ঠাকুরসেবা, সাধুসেবা, এই সব। যতটা advantage (সুবিধা) পাওয়া যাচ্ছে তার তুলনায় এসব কাজ অতি সামান্য। নিত্য সাধুসঙ্গ ও শ্রীভগবানের সান্নিধ্যে থাকা — এ কম সৌভাগ্যের কথা! কত বড় আশ্রম, (সন্ন্যাস আশ্রম) কত বড় ideal-এর (আদর্শের) সংস্পর্শে থাকা! মঠের আদর্শ ঠাকুর, — কিনা অবতার, অর্থাৎ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ মানুষ-শরীর ধারণ করে এসেছেন। এখন বড্ড chance (সুযোগ) — Whole atmosphere is surcharged with spirituality (চারিদিক আধ্যাত্মিকতায় ভরপুর)। ঠাকুর বলতেন, বান এলে ড্যাঙ্গায়ও এক বাঁশ জল। এখন বড্ড chance (সুযোগ)। আহা, কত স্থানেই মঠ হচ্ছে! তিনি লোকের সুবিধার জন্য এসব করাচ্ছেন। বেলুড়, ঢাকা, মাদ্রাজ, কাশী, মায়াবতী কত জায়গায় হয়েছে, আবার আমেরিকায়। এসব মঠের সঙ্গে যারা সম্পর্ক রাখবে তাদের পরম কল্যাণ হবে।

নিত্য সাধুসঙ্গ করতে হয় কষ্ট করে। আর প্রকৃতির সঙ্গে যুঝতে হয় গুরুর উপদেশ নিয়ে। সাধুসঙ্গ করতে করতে মন স্থির হয়। মন স্থির হলে সব হয়ে গেল। যেমন বহু কষ্ট করে প্রথমে বেহালার বাজনা শেখে। একবার শেখা হয়ে গেলে তখন আবার ঘরে বসেও

একা একা বাজাতে পারে। কিন্তু শিখতে হয় কষ্ট করে।

The world is a stage, men are actors, each plays his part (এই ভব-রঙ্গমঞ্চে জীবগণ নিজ নিজ অংশ অভিনয় করছেন)। যা করা যায়, নিষ্কামভাবে করলেই মোক্ষ — যার যা পার্ট। নয় তো বন্ধন।

কোনও বিষয় জানবার জন্য আন্তরিক প্রার্থনা করলে ঠাকুর জানিয়ে দেন। কেউ কেউ বলেন, সামনে এসেও বলে দেন — এই এই কর। আবার মনেতেও বলেন। শুদ্ধ মনে তিনি উদয় হন চিন্তারূপে। শুদ্ধ মন হয় আবার regular (নিয়মিত) সাধুসঙ্গে, নিত্য সাধুসঙ্গে।

আবার প্রার্থনা কি করে করতে হয় তাও শিখিয়ে দিছলেন। তিনি বলতেন, 'মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না।' তাঁর মায়াতেই সব ভুলিয়ে দিচ্ছে কিনা, তাই সর্বদা প্রার্থনা। তাঁর কৃপা না হলে এ মায়ার হাত থেকে নিষ্কৃতি নাই। এমনি দৈবী মায়া! তাঁর শরণাগত হওয়া আর প্রার্থনা — ভুলিও না মা, আমায় ভুলিও না।

ঠাকুর বলতেন, অল্প বয়সেই প্রতিবেশীদের দুই তিনটা ঘর দেখে মাকে বলেছিলাম, 'মা মোড় ফিরিয়ে দাও'। মা তাই করলেন। সব তিনি করছেন — মনে প্রাণে এ কথা বললে আর কিছু করতে হয় না। নাবালকের যেমন executor (অছি) থাকে, তেমনি তিনিই ভার লন।

ভক্ত — আচ্ছা, কার্যে ও যুক্তিতে একজনকে ভাল লোক বলে বোঝা গেল। পরের ইষ্ট ছাড়া কখনও অনিষ্ট করেন না, এমন লোকের উপরও বিশ্বাস স্থায়ী হয় না কেন? মনের মধ্যে সংশয় থাকে কেন?

শ্রীম — প্রকৃতি এ সব করাচ্ছে। প্রকৃতিতে যেমন কর্ম আছে তেমনি হচ্ছে। তবে নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করতে হয় তাঁর নিকট। আর সাধুসঙ্গ করতে হয়, তবে ও-সব দূর হয়।

ভক্ত — ব্যাকুল প্রার্থনা না এলে কি করা?

শ্রীম — প্রথম জোর করেই করতে হয় প্রার্থনা — মৌখিক।

এরূপ করতে করতে শেষে ব্যাকুলতা আসে।

ভক্ত — আজ্ঞে, সংসারে স্নেহ কাটে কি করে?

শ্রীম — ঐ সাধুসঙ্গে, আর প্রার্থনায়। পিতামাতার স্নেহ, তাও ওতেই ছিন্ন হয়। যাদের পিতামাতা গত হয়েছে, তাদের পক্ষে স্নেহ কাটা অতি সহজ — পথ অতি সোজা।

মুকুন্দ আসিয়া এতক্ষণে বসিয়াছেন অশ্বত্থতলে। তিনি রুগ্ন। শ্রীম তাঁহাকে দুই তিনবার খাইতে যাইতে বলিলেন। বেলা অধিক হইয়াছে। কিন্তু তিনি যান নাই। শ্রীম-র কথামৃত শুনিবার বাসনা। শেষে শ্রীম বলিলেন, friend-দের (বন্ধুদের) কথা শুনতে হয়। এইবার মুকুন্দ চলিয়া গেলেন।

এইবার কলিকাতার একটি ভক্তের কথা হইতেছে। তাঁহার অনেক বিষয় সম্পত্তি আছে, কিন্তু আত্মীয়স্বজন কেহ বাধ্য নহে। ঈশ্বরে মন আছে, বয়স পঞ্চাশের উপর।

শ্রীম — বাহাদুর লোক বটে, সংসারের সব করছেন! আবার বাড়ির চাকর-বাকরেরও সংবাদ সর্বদা নেন। আমরা এখানে আছি, আমাদের কত খবর করছেন। কত জিনিস পাঠান এখানে। আমাদের পরমাত্মীয় লোক! বড় ছেলের উপর সংসারের ভার দিয়ে interest-এ (টাকার সুদে) চালালে নিশ্চিন্ত মনে ঈশ্বর চিন্তা করতে পারেন।

প্রশ্ন — আজ্ঞে, প্রতিদানে কিছু না দিয়ে কারও সেবা গ্রহণ করা উচিত কি?

শ্রীম — ভক্তের সেবা নেওয়া যায়। ভক্তের অন্ন শুদ্ধ, ঠাকুর বলতেন। ভক্ত কোনও কামনা রেখে সেবা করেন না, এক ঈশ্বরকামনা। সকাম সেবা নিলেই বন্ধন হয়, চিত্তও মলিন হয়।

প্রশ্ন — মঠে উৎসবাদিতে উপবাস অনেকে করেন। একজনের যদি তা সহ্য না হয়, তবে কি দোষ হবে?

শ্রীম — তা কেন হবে! তবে অভ্যাস রাখা ভাল। উৎসবাদিতে মঠে গেলে পকেটে করে কিছু নিয়ে যেতে পারে। ঠাকুরদর্শন করে কিছু খেয়ে, শরীর মন সুস্থ রেখে তারপর ঈশ্বরচিন্তা কর। তা না হলে শরীর খারাপ হয়ে যাবে, কিছুই হবে না, অভ্যাস যখন নাই।

আর ওতে কিছু নেই, আসল কথা তাঁকে ডাকা। যাদের সহ্য হয় না উপবাস, তাদের খেয়ে যাওয়া উচিত। মন যাতে ঈশ্বরে থাকে তাই করা — এখন, উপোস কর আর নাই কর।

৪

এখন অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচটা। শ্রীম ভ্রমণ করিতে আশ্রমের বাহিরে যাইতেছেন, সঙ্গে কেহ কেহ আছেন। দক্ষিণ দিকের মাঠে চলিয়াছেন। এস.ডি মুখার্জীর বাড়ির নিকট রাস্তা হইতে শ্রীম শুনিতেছেন, একটি বাগানের মালী গান গাহিতেছে। গানের ভাব — এস জগবাসী, শ্রীভগবান নবদ্বীপের শ্রীবাসের আঙ্গিনায় হরিনামে বিভোর হয়ে নৃত্য করছেন। তাঁকে দর্শন করে জন্ম সার্থক কর। শ্রীম এই গান শুনিয়া ভাবে বিভোর হইলেন, দাঁড়াইয়া রহিলেন। চোখে মুখে এক অপার্থিব আনন্দের ছটা বহিয়া যাইতেছে। কিয়ৎকাল পরে বলিতেছেন, আহা, ঠাকুর এর মুখ দিয়ে কী কথাই শুনালেন — যিনি জগৎকে শিক্ষা দেবার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন তাঁরই কথা। তিনি স্বয়ং ঈশ্বর, মানুষশরীর ধারণ করে এসেছেন। তাঁর নিজের কিছু প্রয়োজন নাই, কিন্তু জগতের লোকের কল্যাণের জন্য সন্ন্যাস নিয়েছেন।

রাস্তায় চলিতে চলিতে একটি আম্রকাননের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুইটি বৃক্ষ একস্থানে দণ্ডায়মান। তাহা দেখিয়া শ্রীম বলিতেছেন, দেখ, কেমন সুন্দর স্থান! এখানে একটু বেদীর মত উঁচু হলে যোগীজনের উপযোগী হয়। 'যোগী যুঞ্জীত সততং আত্মানং রহসিস্থিতঃ।' এরূপ স্থানে বসলে, ভগবানের উদ্দীপন হয়। কেমন সুন্দর আর নির্জন! বেদে আছে, যোগের স্থান হবে মনের অনুকূল আর নয়নসুখকর সুদৃশ্য ও শান্ত। এইরূপে যাহা শুনিতেছেন বা যাহা দেখিতেছেন তাহা সমস্তই ঈশ্বরের উদ্দীপন করাইয়া শ্রীম অগ্রসর হইতে লাগিলেন, সঙ্গে ভক্তগণ। ইতিমধ্যে একদল লোক পশ্চিম দিক হইতে মিহিজামের দিকে আসিতে লাগিল। নিকটে আসিয়া তাহারা শ্রীমকে 'দণ্ডবৎ' করিল। ইহারা সাঁওতাল বরযাত্রী। বিবাহান্তে

বর-কনের সঙ্গে ফিরিতেছে। শ্রীমকে বর-কনে 'দণ্ডবৎ' এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া প্রণাম করিল। ইহারা চলিয়া গেলে বলিতেছেন, সংসারে এরা তাঁরই বিধানে প্রবেশ করছে। সংসার জ্বলন্ত অনল, ঠাকুর বলতেন। পূর্ণ ও ছোট নরেনের সমাধির অবস্থা ছিল, ঠাকুর বলেছিলেন। যখন তাদের বিয়ে হলো ঠাকুর শুনে কেঁদেছিলেন। নিজের চোখে নিজেই কাপড় বেঁধে বলছেন, আমি দেখতে পারছি না। ঠাকুর এই কথা বলেছিলেন। একটি ভক্ত ব্যারিস্টার, তারও সমাধির অবস্থা, কিন্তু সংসারে পড়ে সব অন্য রকম হয়ে গেল। এই ক্ষতি পূরণ হয় যদি কায়মনোবাক্যে তাঁর শরণাগত হওয়া যায়। মহামায়ার এমনি খেলা — তা হতে দেয় না। তাই সর্বদা প্রার্থনা — মা, ভুলিও না। তাঁর কৃপা হলে গৃহেই রাখুন, বা সব ত্যাগ করিয়ে নেন — কোনও ভয় নাই। তাঁর হাতে সব।

সন্ধ্যায় ধ্যান, কথামৃতপাঠ ও নৈশ ভোজন শেষ হইয়া গেল। এখন রাত্রি সওয়া নয়টা, কৃষ্ণপক্ষ। শিরোপরি অগণিত উজ্জ্বল নক্ষত্রখচিত বিস্তীর্ণ নভোমন্ডল। নিম্নে কৃষ্ণপক্ষীয় নৈশ অন্ধকার ঘনীভূত। অদূরে দুই একটি বৃক্ষ দৃষ্ট হইতেছে। নীরবতা যেন হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া এক প্রশান্ত গম্ভীর ভাবের সৃষ্টি করিতেছে। সুবিস্তৃত প্রান্তর মধ্যবর্তী কুটীর প্রাঙ্গণে ব্রহ্মচারিগণসহ শ্রীম বসিয়াছেন। শ্রীম-র দৃষ্টি উচ্চে, আকাশে নিবদ্ধ। ক্ষণকাল অতীত হইলে শ্রীম একটি ব্রহ্মচারীকে বলিতেছেন, আপনার Astronomy (জ্যোতিষ) ছিল কি? Astronomy-তে আকাশের জ্যোতিষ্কমন্ডলের আলাচনা করেছেন পণ্ডিতগণ। ভারতীয় যোগী বহু পূর্ব থেকে এই সব বিষয় চিন্তা করেছেন। নভোমণ্ডলের চিন্তা করলে ঈশ্বরের বিশালতার আভাস পাওয়া যায়।

এই দেখুন, সম্মুখে সপ্তর্ষিমণ্ডল, আর এই ধ্রুবতারা। সপ্তর্ষি ধ্রুবর চারিপাশে ঘোরে — চব্বিশ ঘন্টায় একবার প্রদক্ষিণ করে ধ্রুবকে। Four right-angles describe (চারিটি সমকোণ উৎপন্ন) করে চব্বিশ ঘন্টায়। ধ্রুবকে point-এ (কেন্দ্র) করে তার উপর একটা horizontal (সমান্তরাল) আর একটা perpendicular line (লম্ব

রেখা) টানুন। তাহলে ধ্রুব point-এ four right angles হলো। এখন সপ্তর্ষির উপরের তারা দু'টি join (সংযুক্ত) করে এই লাইনটি ধ্রুবে মিশিয়ে একটা angle (কোণ) হবে। এই য়্যাঙ্গলটি মেপে সময় বলা যায়। পনের ডিগ্রির য়্যাঙ্গল প্রতি ঘন্টায় হয়। পূর্বে এইরূপে সময় নির্ণয় করতো। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা সপ্তর্ষিকে Great Bear (গ্রেট বেয়ার) বলেন। কিন্তু এদেশের ঋষিগণ সমস্ত জিনিষের এমন নামকরণ করতেন যাতে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়।

দেখুন না ধ্রুবতারা — ভক্তপ্রবর ধ্রুবের নামে পরিচিত। রাজপুত্র ধ্রুব শিশু — কি কঠোর তপস্যা করে ঈশ্বরদর্শন করলেন। প্রথম রাজ্যলাভের জন্য তাঁকে ডাকেন। তিনি দেখা দিলে তখন আর রাজ্যভোগ তত নিতে চান নাই। Hindu mythologyতে (পুরাণ শাস্ত্রে) ধ্রুব ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল।

(ব্রহ্মচারিকে) সেন্ট জেভিয়র্স কলেজে ফাদাররা খুব পণ্ডিত আর সাধু। ওঁদের সঙ্গে আলাপ রাখলে আকাশের এই সব observe (পর্যবেক্ষণ) করা যায়। ওঁদের ভাল টেলিস্কোপ আছে। যান না, ওঁদের সঙ্গে পরিচয় করলে সব জানতে পারবেন। আমাদের বলবেন এসে। এলে গেলে মানুষের কুটুম। ইউনিভার্সিটিতে যাঁরা সায়েন্স টায়েন্সের নতুন theory (তত্ত্ব) বের করেন তাঁদের কাছে গিয়ে শুনতে হয়। বহু বৎসর ধরে পণ্ডিতগণ observation (পর্যবেক্ষণ) দ্বারা stars ও planets-এর (গ্রহ-নক্ষত্রের) গতিবিধি নির্ণয় করেছেন। এখনও West-এ (পাশ্চাত্ত্যে) খুব observation (পর্যবেক্ষণ) চলছে বড় বড় সব observatory-তে (মানমন্দিরে)। আমেরিকায় মাউন্ট উইলসনে একটি হয়েছে।

এইসব নক্ষত্রে যাওয়া possible (সম্ভব) হলে, এই পৃথিবীর মত সব অনন্ত মনে হবে। Time and space (দেশ ও কাল) অনন্ত, কিন্তু পণ্ডিতদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান দ্বারাও এই অনন্তের কথঞ্চিৎ সন্ধান করা হয়েছে। নক্ষত্রসমূহের ফটোগ্রাফ নিচ্ছেন আজকাল। বলছেন, কোটি কোটি তারা। আবার কেউ কেউ বলছেন, এক একটি তারা এক একটি সূর্যের চাইতেও বড়। অনেক দূরে আছে বলে ছোট

দেখায়। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, আমাদের এই solar system-এ (সৌরমন্ডলে) যেমন একটি সূর্য, আর নয়টি গ্রহ আছে — পৃথিবী যার একটি, সেইরূপ অসংখ্য সূর্য আছে, solar systems (সৌরমণ্ডল) আছে। ভারতীয় পুরাণ শাস্ত্রে 'অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড' বলেছেন। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের যিনি কর্তা তাঁকেই ঠাকুর 'মা, মা' বলে ডাকতেন — বেদে তাঁকেই ব্রহ্ম বলেছেন। শুধু ডাকতেন না, দর্শন করে কথা বলতেন। এই রহস্য ভেদ করে অবতার ছাড়া কার সাধ্য! ....neither knoweth any man the Father, save the son. (St. Matthew 11:27) (অবতারকে না দেখলে ঈশ্বরকে ঠিক বোঝা যায় না)।

৩০শে ফাল্গুন, ১৩২৯ সাল।
১৪ই মার্চ, ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ।
বুধবার, কৃষ্ণা দ্বাদশী।

তৃতীয় অধ্যায়

লৌকিকবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা লাভের সোপান

এখন সকাল; বেলা প্রায় দশটা। শ্রীম ও ভক্তগণ আহার করিতে বসিয়াছেন। প্রশ্ন হইয়াছে, ধর্মজীবনে সদাচারের আবশ্যকতা কি?

শ্রীম বলিতেছেন, বৈদিক আচারের বড় প্রয়োজন। বৈদিক আচারকেই সদাচার বলে, — ঋষিদের আচার। ধর্মজীবন যাপন করতে হলে এর বড্ড দরকার। রান্নাবান্না যা কিছু হয় সব শ্রীভগবানের জন্য, এই ভেবে করতে হয়। তাঁকে ভোগ নিবেদন করে সকলে প্রসাদ খাওয়া। এতে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হয়। নচেৎ কতকগুলি খেলেই হলো না। পশুরাও খায় — মানুষের সঙ্গে তাদের তফাৎ কোথায়? খাবারের দ্বারা শরীর বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ভগবানে নিবেদন করে প্রসাদ খেলে, তা দ্বারা শরীর বৃদ্ধি হয় আবার মনও ঈশ্বরমুখী হয়। জানোয়াররা সদাচার জানে না, মানুষ জেনেও যদি আচরণ না করে, সেও জানোয়ারের মত হয়ে যাবে। তাই সদাচার বড় দরকার হয়ে পড়েছে। যতক্ষণ না ঈশ্বর দর্শন হয়েছে ততক্ষণ ঋষিদের কথা শুনতে হয়। ভাল মন্দ বিচার — শুচি অশুচি, প্রসাদ অপ্রসাদ, পবিত্র অপবিত্র — এসব ভাব মেনে চলা উচিত। ঈশ্বরই সব এবং সর্বত্র, এই বুদ্ধি তত্ত্বজ্ঞান হলে হয়, তখন একথা বলা যায় এবং আচরণের অপেক্ষা থাকে না। যতক্ষণ তত্ত্বজ্ঞান না হয়েছে ততক্ষণ ঐ সব মানতে হয়। বাজনার বোল মুখে বললে কি হবে, হাতে আনতে হয়।

তাই তো গীতায় ভগবান বলেছেন,

‘যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।।” (গীতা ৯-২৭)

যা কিছু কর — আহার, পূজা, অর্চনা, দান, তপস্যা সব আমাতে অর্পণ কর। এইরূপ করতে করতে সর্বদা তাঁরই স্মরণ হয়, যোগে

থাকা যায় সর্বদা। আর পবিত্রভাবে কোনও জিনিষ প্রস্তুত না করলে তা ভগবানকে দেওয়া যায় না। ভগবানকে না দিয়ে উদরপূরণের জন্য যে আহার, তাকে চৌর্য বলা হয়েছে। আহার, বিহার, শয়ন প্রভৃতি সমস্ত জীবনটা দিয়ে তাঁর পূজা করতে হয়, তবে হয়। Parenthetically (লঘুভাবে) একটু ডাকলেই তাঁর ভজন হয় না। একজন হয়ত পূজা-অর্চা, লোক খাওয়ান বাড়িতে — এসব খুব করছে, লোকে বলছে খুব ধার্মিক। কিন্তু ভগবানের উদ্দেশ্যে না করলে সবই বন্ধনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাঁকে নিবেদন করলে আহার্যাদি সব — এতে মুক্তি হয়।

প্রশ্ন — আজ্ঞে, ধর্মজীবনে আহারাদি সম্বন্ধে ঠাকুরের মত কি?

শ্রীম — আহারাদি সম্বন্ধে ঠাকুর বলতেন, শাকভাত দু'টি মুখে দিয়ে সারাদিন ভগবানের নাম কর। পাঁচটা রান্না — মাছ, মাংস, নিরামিষ — অতোর কি দরকার? যাদের মন finite-এর (সংসারের) দিকে তাদেরই দৃষ্টি বাইরের দিকে, ভোগটোগ নিয়ে ব্যস্ত। তাদেরও দোষ নাই, তিনি যেমন রেখেছেন তেমনি করছে। কিন্তু যাদের কতক জ্ঞান হয়েছে, সৎসঙ্গ হয়েছে, কি গুরুলাভ হয়েছে, তাদের অত কেন? সামান্যতে সন্তুষ্ট থেকে তাঁর ভজন করা — যতদিন শরীর থাকে। একবার কামারপুকুরে ঠাকুরদের বাড়ি লাহাবাবুরা মেরামত করেছিলেন। খুব নক্সা ফক্সা করে দরজা সব তৈরী হচ্ছিল। ঠাকুর দেখে বললেন, 'ওকি করছো, অতোর দরকার কি? শেয়াল না ঢোকে এমনতর করে দাও।' এ দৃষ্টি কার আছে?

ঠাকুর নিজের জীবন দিয়ে human life-এর problem সব solve (মনুষ্যজীবনের সকল সমস্যার সমাধান) করে গেছেন। Simple (সাধারণ) আহারবিহার হলেই হলো। একটু শাকভাত খাওয়া আর বাকী সময় 'রাম রাম' করা। বলতেন কিনা, ব্রাহ্মণের বিধবা ছিল আমার আদর্শ! একটি কুটীর থাকবো, আর শাকটাক লাগাবো। ঐ শাক আর ভাত খাওয়া, আর সর্বদা ঈশ্বরের নাম করা। স্বামীজীকেও তাই বললেন, ডালভাত হলে হয়, এর বেশী না।

আহারান্তে শ্রীম বারান্দায় তক্তপোষে বসা, বেলা প্রায় বারটা।

একজন ভক্তের কথা হইতেছে। আহার, বিহার, শয়ন ও কার্যে অনিয়ম ও শৈথিল্য দেখিয়া শ্রীম বলিতেছেন, অত বড়লোকের দীক্ষিত ভক্ত, মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) মন্ত্রশিষ্য কিনা, আবার স্বামীজীকে দেখেছেন, কিন্তু কেবল ভোগ নিয়ে আছেন। গুরু যা কষ্ট করেছেন, তার দিকে লক্ষ্য নেই। ঠাকুরের ছেলেরা কত কষ্ট করেছেন, কতদিন অনাহারে কাটিয়েছেন। একবার স্বামীজী তিনদিন খেতেই পান নাই, তাতে মূর্চ্ছা হলো। বৃষ্টির জল গায়ে পড়ায় চৈতন্য ফিরে আসে, তখন পথ চলতে থাকেন। শেষে একটি শসা খেয়ে প্রাণ রক্ষা হয়। বৃন্দাবনে মহারাজ তপস্যা করতেন কুসুম সরোবরে। শুক্‌নো রুটি খেয়ে কাটাতেন। রাত্রিতে ঐ রুটি জলে ভিজিয়ে খেয়ে তপস্যা করেছেন। ঠাকুরের তখন শরীর আছে। রাখাল একবার বৃন্দাবনে বলরামবাবুর সঙ্গে গেছেন। অসুখ হলো, সেবা হচ্ছে না। অতি কষ্টে পাঁচ টাকা পাঠান হয় চিকিৎসার জন্য। পরে তো কত টাকা আসতো যেতো। এদিকে তাঁর লক্ষ্য নাই।

বেলা আটটায় শয্যাত্যাগ করা ভাল নয়। আবার রান্নাবান্নাতেই বেলা একটা দু'টো হয়ে গেল, দশ বিশ রকমের রান্না। অত ঘি, অত তেল মশলা খাওয়া কি ভাল? দিনে দশটার মধ্যে খাওয়া আর রাত্রিতে দশটার মধ্যে শোওয়া উচিত। যত simple (সহজ) করা যায় এসব খাওয়াদাওয়া। ঋষিদের আদর্শ — plain living and high thinking (সরল জীবন উন্নত মনন)। রাত্রিতে অধিক খেলে আলস্য হয়, ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠা যায় না। ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীগুরুর ধ্যান করতে হয়। বাবুদের বাড়িতে ব্রাহ্মমুহূর্ত তো দূরের কথা, সূর্যোদয় পর্যন্তও কেহ কখনও দেখে নাই। বাবু এখন মোকদ্দমার ফ্যাসাদে পড়েছেন। তা একটু দুঃখে, একটু শোকে পড়ে অত অভিভূত হলে, অত বড় সন্ন্যাসী গুরুর নিকট মন্ত্র নেবার কি প্রয়োজন ছিল? গৃহস্থ গুরুর নিকট নিলেই হতো। গুরুর অনুকরণ করা উচিত।

শ্রীম অশ্বত্থতলায় বসিয়া আছেন, সঙ্গে দুই একজন ভক্ত। এখন বেলা দেড়টা। কথাবার্তা হইতেছে। একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ্ঞে, ঈশ্বরলাভ জীবনের উদ্দেশ্য যদি হয়, তবে নানা বিদ্যাশিক্ষার

আবশ্যকতা কি?

শ্রীম বলিতেছেন, হাঁ, তাঁকে সর্বক্ষণ ডাকতে পারলে আর কিছুর দরকার হয় না। কিন্তু পারে কৈ লোক? তাই নানানখানা করতে হয়। নানানখানার মধ্যে বিদ্যালাভ খুব ভাল। The period of study is the period of Brahmacharya (ছাত্রজীবন ব্রহ্মচর্যের সময়)। বিদ্যা অর্জনে মনোনিবেশ করলে অনেক গোলমাল কেটে যায় আপনা থেকে। আর সব কাজই তাঁর জেনে করতে হয়। তাঁতে ফল সমর্পণ করে যা ভাল লাগে তা করা। উদ্দেশ্য, কিসে তাঁকে লাভ হয়।

লেখাপড়া শিক্ষা করা, various information (নানা বিষয়) জানা, এসবেরও প্রয়োজন আছে। ভগবানের জন্য সব করা যায়। নিজের জন্য বা অপরের জন্য নয়, সব তাঁর জন্য, এ বুদ্ধি নিয়ে করলে ক্রমে তাঁর দর্শনলাভ হয়। স্বামীজীর কত বিদ্যা আয়ত্ত ছিল, কত জানতেন, কত পড়েছেন, তবে তো সকলের সঙ্গে deal (ব্যবহার) করতে পেরেছেন ওদেশে! ঈশ্বর সবকে দিয়ে এক কাজ করান না। এক একজনকে দিয়ে এক একরকম করান। অনেক জানা থাকলে লোকের সঙ্গে deal (ব্যবহার) করা যায় সহজে। চৈতন্যদেব ব্যাকরণ, ন্যায় ও বেদান্তে মহাপণ্ডিত ছিলেন। এ সবই ত্যাগ করলেন। অথচ ইহা দ্বারাই বড় বড় পণ্ডিতদের হার মানিয়েছিলেন। (একজন ভক্তকে) সেই জন্য practice-এর (ওকালতির পেশা) জন্য ল ভাল নয়। ল জানা থাকলে lawyer-দের (উকীলদের) মধ্যে বিচার চলে ঐ সম্বন্ধে। আদপে জানলুমই না, তা বিচার হয় কি করে? ভগবানের কাজের জন্য এরও দরকার আছে । ঠাকুর বলতেন কিনা বারবার, নিজের প্রাণ নরুনেই নেওয়া যায়, কিন্তু অন্যের প্রাণ নিতে হলে ঢাল-তরোয়ালের আবশ্যক হয়। Retrospective way-তে দেখলে (অতীত জীবন আলোচনা করলে) বোঝা যায় এ সব জানার কত দরকার।

স্বামীজী কত জানতেন — গান, বাজনা, কুস্তি, বিভিন্ন শাস্ত্র, বিভিন্ন ভাষা, বক্তৃতা, সায়েন্স, আর্ট, সাহিত্য, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য

দর্শন, রন্ধন প্রভৃতি — কত কি! বেদে আছে নানা বিদ্যার নাম। নারদ সব বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন — দেববিদ্যা, গন্ধর্ববিদ্যা, ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব কত কি! স্বামীজী সর্ববিদ্যাসম্পন্ন ছিলেন। তার কোনটাই নষ্ট হয় নাই, সব কাজে লেগেছে। আহা, ওঁর শরীরটা আরও থাকতো কিছুকাল যদি কেউ ধরে নিয়ে যেত rest-এর (বিশ্রামের) জন্য হিমালয়ে, আমেরিকা থেকে আসার পর! কত বকুনি, আর কি খাটুনী, অবিরত — বিরাম নাই! অতিরিক্ত খেটে খেটে শরীর গেল।

লৌকিক বিদ্যার পরই ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যায় মন যদি একবারে না যায় লৌকিকবিদ্যা লাভ করা ভাল।

১লা চৈত্র, ১৩২৯ সাল। ১৫ই মার্চ ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ।
বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা ত্রয়োদশী।

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতের ভাব — যত কিছু ভাল সব ঈশ্বরে সমর্পণ

কলিকাতা হইতে একটি ভক্ত মিহিজাম আশ্রমের জন্য সর্বদা বহু দ্রব্যাদি প্রেরণ করেন, আর সকলের আহারবিহার সম্বন্ধে সংবাদ রাখেন ও ভাবেন। আজ চিঠি আসিয়াছে, তাহাতে শ্রীমকে রাত্রিতে লুচি করিয়া খাওয়াইতে লিখিয়াছেন। সেই চিঠি পড়িয়া শুনাইলে শ্রীম ভক্তদের বলিতেছেন —

দেখ, অত কাজের ভিতরও মনটা পড়ে আছে এখানে। প্রত্যেকের সংবাদ নিচ্ছেন। বুড়োদের ভালবাসেন কিনা, তাই অত ভাবেন। (সহাস্যে) কিন্তু আমার কি আর সেই শক্তি আছে ওসব হজম করবার। (জনৈক ভক্তকে) আপনি লিখে দিবেন, দিনে দুধভাত আর রাত্রে দুধরুটি আহার হয়। Old bottle-এ (পুরানো বোতলে) কি আর নূতন মদ রাখা উচিত? Old bottle cannot contain new wine (পুরানো বোতলে নূতন মদ রাখা যায় না)। পুরানো কাপড়ে আবার নূতন তালি দেওয়া চলে না। দিলে দুই-ই নষ্ট হয়। কি বলে, Neither do men put new wine into old bottles (St. Mathew 9:17) (পুরোনো বোতলে নূতন মদ রাখা উচিত নয়)। No man putteth a piece of new cloth unto an old garment (St. Mathew 9:16) (পুরানো কাপড়ে নতুন তালি দেওয়াও উচিত নয়)। জোয়ানরা যা খায় বুড়োদের তা চলে না। কল নরম হয়ে গেছে। যুবকদের ভিতর প্রচণ্ড অগ্নি প্রজ্বলিত, কলাগাছ ফেলে দাও, তাও ভস্মীভূত হয়ে যাবে। পূর্ব অভ্যাসবশতঃ যারা বৃদ্ধ বয়সেও যৌবনের নানানখানা আহার করে তাদেরই নানা কষ্ট হয়, রোগ, অজীর্ণ হয়। বয়সের সঙ্গে আহারসংযম করা একান্ত উচিত। (একটি রুগ্ন ভক্তকে) তুমি শুধু দুধভাত আর অল্প ঘি খাও,

সব রোগ সেরে যাবে। বেশী খেয়ে খেয়ে অভ্যেস হয়ে গেছে। ঐসব না পেলে মনে হয় বুঝি গেলুম, আর খাওয়া হবে না। But nature delights in simple food (শরীর সুপাচ্য আহারে ভাল থাকে)। Delicious dishes, dainties-এর (সুস্বাদু মুখোরোচক আহারের) অত দরকার কি? যত অসুখের কারণ অতিরিক্ত আহার। সাদাসিধে খাও আর ভগবান চিন্তা কর। আহারসংযম ধর্মজীবনের প্রধান অঙ্গ। শরীর সুস্থ রাখার প্রয়োজন। বেশী খেলে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে, ধর্মাচরণ হয় না। তাই আহারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। দই, লেবু গরমের দিনে ভাল। বেশী মিষ্টিতে অম্বল হয়। অধিক তরকারীতে অসুখ হয়। ঝোল জলের মত পাতলা ভাল। ঠাকুর কারুকে কারুকে গব্য ঘৃত, ভাত আর দুধ, খেতে বলেছিলেন। বলতেন, এই আহার ঋষিদের আহার।

আজ আহারান্তে শ্রীম একটি ব্রহ্মচারীকে থালাবাসন মাজা শিখাইতেছেন। অল্প জলে শীঘ্র শীঘ্র কি করিয়া কাজ শেষ হয় তাহা নিজে জল ঢালিয়া ও উপদেশ দিয়া দেখাইতেছেন। শ্রীম বলিতেছেন, ফার্স্ট, ভাত-টাতগুলি হাত দিয়ে পুছে নিতে হয়; সেকেণ্ড, একটু সামান্য জল দিয়ে ধুতে হয়; থার্ড, মাটি বা ছাই দিয়ে মাজতে হয় সামান্য; ফোর্থ, একটা থালায় একটু জল রেখে বাসনের ছাইমাটি ঐ জলে ধুতে হয়, ফিফ্‌থ, সর্বশেষে পরিষ্কার জলে ধুয়ে শুদ্ধ করা। এতে জল কম, পরিশ্রম কম, থালাবাসন ক্ষয়ও কম হয়।

জল পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না বলে তার যথেচ্ছ ব্যবহার করা কিংবা নষ্ট করা উচিত নয়। এতে নিজের স্বভাবে extravagance (অমিতব্যয়িতা) প্রবেশ করে। জলের দাম নাই বটে, কিন্তু এর reaction on one's character is immense (চরিত্রের উপর প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত অধিক)। তাই waste (অপব্যয়) না হয়, আবার কার্পণ্যও না হয় এমনতর ভাবে ব্যবহার করতে হবে। থালাবাসন মাজা, স্নান এ সব কাজে যতটা প্রয়োজন ততটা জল ব্যবহার করা উচিত। আবার বাসন মাজতে মাজতে ঐদিকে হয়ে গেল, ভেঙ্গেই গেল (হাস্য) — ও ভাল নয়। এক বাড়িতে একটি ভৃত্য ছিল, কাজে

ফাঁকি দেয়। বাসন ভাল মাজে না, শুধু জল দিয়ে ধুয়ে রাখে। একদিন খুব তিরস্কার করেছে বাড়ির লোক। সে রেগে এমন মাজা মাজলো যে, থালা ভেঙ্গে গেল (সকলের উচ্চ হাস্য)। থালা ভাঙ্গলো কেন জিজ্ঞাসা করলে উত্তর করলে, কেন আমি তো খুব মেজেছি, আপনারা মাজতে বলেছেন তাই। ভেঙ্গে গেল তা আমি কি করবো (উচ্চ হাস্য)। অমন না হয়।

ঠাকুরের সব দিকে দৃষ্টি থাকতো। ভক্তরা যাঁরা যেতেন তাঁর কাছে, তাঁদের এসব কাজ শেখাতেন হাতে কলমে। তিনি বলতেন কিনা, যে নুনের হিসাব করতে পারে সে চিনির হিসাবও করতে পারে। সাধারণ দৈনন্দিন ব্যাপারে যে অপটু, সর্বদা অমনোযোগী, তার ধর্মজীবনে উন্নতি কঠিন। এই মন নিয়েই তো তাঁকে পেতে হবে! মনেতে ফাঁকি, ভুলভ্রান্তি থাকলে তাঁকে লাভ হয় না। একটা ফাটা কড়াই কিনে এনেছিল বলে যোগেন স্বামীকে তিরস্কার করেছিলেন। বলেছিলেন, ‘দোকানদার কি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির? সে তো তার জিনিস চালাবেই। তুই দেখে আনলি নে কেন? তোর তো চোখ আছে।’ তক্ষুনি আবার ফেরৎ পাঠান বদলে আনতে। একজন বাহ্যে করে গঙ্গায় শৌচ করতো। ইহা লক্ষ্য করে একদিন বারণ করলেন আর বললেন, ‘এই ঘটি নিয়ে যাবি, হাঁসপুকুর থেকে জল নিয়ে শৌচ করবি। গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি, তাতে শৌচ করতে নেই।’ পঞ্চবটীতে একজন ছাতা ফেলে এল। ঘরে এসে ঠাকুর বললেন তিরস্কারের সুরে, ‘এখানকার (ঠাকুরের) কাপড় গায়ে থাকে না তবুও অমন ভুল হয় কই?’ Whole life (সারা জীবন) ধর্মজীবন, সর্ব কার্যে ধর্মাচরণ। খানিকটা ধর্মাচরণ আর খানিকটা অন্য রকম, ওতে হয় না। আহার বিহার, শয়ন, স্বপন, জপ, ধ্যান, পূজা-পাঠ — সর্বাবস্থায় মনের এক ভাব থাকবে — এক উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ।

২

আকাশ ঘন মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছে। এখন অপরাহ্ণ প্রায় চারটা। মেঘের সঙ্গে হাওয়া প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। শ্রীম স্বীয়

কুটীর হইতে বাহিরে জম্বুতলে আসিয়াছেন। কি ভাবে যেন মনপ্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মুখমণ্ডল উজ্জ্বল, নয়নপথে আনন্দ বিচ্ছুরিত হইতেছে। তাঁহার দৃষ্টি আকাশে নিবদ্ধ।

কিয়ৎকাল পরে ভাববিজড়িত কণ্ঠে শ্রীম ভক্তদের বলিতেছেন —

আকাশে মেঘ দেখে প্রাচীন ঋষিদের কথা মনে হচ্ছে। তাঁরা ষড়ঋতুর ভিতর দিয়ে গিয়ে তবে তাঁকে পেয়েছেন। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত, এসব ঋতুর উল্লেখ তাঁদের কথার ভিতর প্রকাশ পায়। কথামৃতেও আছে ষড়ঋতুর কথা। Between the lines (অভিনিবেশসহকারে) পড়লে ধরা যায়, কোন্‌টা কোন্ সময়ে বলেছেন। ঠাকুর বলতেন, আমার প্রথমাবস্থায় একজন সাধু এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে, আকাশে মেঘ দেখলে নৃত্য করতেন।

নদীতীর, সাগর, প্রান্তর এসব স্থানে ভগবানের উদ্দীপন হয়। তাই দার্জিলিং থেকে ফিরে এলে আমায় একটিমাত্র কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'হিমালয় দেখে উদ্দীপন হয়েছিল তো?' অন্য কোনও কথা নয়। আমি দূর থেকে হিমালয় দেখে কেঁদে ফেলেছিলাম, তাই বললুম। তবুও অজানা ভাবেই উদ্দীপন হয়েছিল। ঠাকুর বলতেন, লঙ্কা না জেনে খেলেও ঝাল লাগবে।

আহা, এমন সব স্থানে — বনে, প্রান্তরে ঋষিরা বাস করতেন — মিহিজামের মত। এখানে নির্জন প্রান্তর সরলপ্রাণ কৃষক, বন, আকাশে মেঘ, প্রভাতে সূর্যোদয়, সন্ধ্যায় সূর্যাস্ত — এসব দর্শন হয়। এখানকার সব সুন্দর, শান্ত, স্বাভাবিক। কৃত্রিমতা নেই। শহরের মত চাঞ্চল্যকর ঘটনা এসব স্থানে নেই। রাজনীতি, সমাজনীতি, হৈ-চৈ এখানে নেই। আছে প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্যের ভাণ্ডার, পবিত্র শান্ত ঈশ্বরীয় ভাব, উদ্দীপন। আর রাত্রিতে অগণিত নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশ আর শুক্লপক্ষের চন্দ্রকিরণ। এই সব ঐশ্বর্য ভোগ ঋষিরা করতেন।

দেখ, আকাশে মেঘ উঠে তাকে কি সুন্দর করেছে! ঐ দেখ, রামধনু উঠছে! কি সুন্দর! কি সুন্দর!! প্রকৃতির এই সৌন্দর্যভাণ্ডার উপভোগ করতেন ঋষিরা। সব জিনিসে ভগবানের উদ্দীপন।

ভারতের হিন্দু life-টা (জীবন) — শ্রীম ভাবোন্মত্ত ভাবে বলিয়া

যাইতে লাগিলেন, একটা continual worship (অবিরাম উপাসনা-প্রবাহ)। Art, literature, architecture, science, philosophy, education, poetry, painting, song, commerce, agriculture, medicine (শিক্ষা ও শিল্প, চিত্র ও কাব্য, দর্শন ও বিজ্ঞান, সঙ্গীত ও সাহিত্য, কৃষি ও বাণিজ্য, চিকিৎসা ও স্থপতিবিদ্যা) এদেশের সবই তাঁর জন্য উৎসর্গীকৃত। এ দেশের ভাল ভাল আর্ট-এর কাজ তাঁরই উদ্দীপন করছে। Best Literature-ও (সৎসাহিত্য) তাঁকে নিয়েই হয়েছে। রামায়ণ, মহাভারতে তাঁরই লীলাকাহিনী বর্ণিত। যত ভাল painting (চিত্র) সব ঈশ্বরীয় লীলা অঙ্কন। উত্তম সঙ্গীত সব তাঁকে নিয়ে গ্রথিত। ভারতে মন্দির — যেমন মাদুরার মীনাক্ষী মন্দির, কোণারক, ভুবনেশ্বর, পুরী প্রভৃতি স্থানের মন্দির, এ সব তাঁতে সমর্পিত। দিলওয়ারা, অজন্তা, ইলোরা, সব তাঁর জন্য। এদেশের ভাবই এই — যত কিছু ভাল সব ঈশ্বরে সমর্পণ। এই ভাবটি worship-এর (উপাসনার) ভাব — অন্য দেশে হওয়া বড় শক্ত। বিশেষ, বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্ত্যে এর বড়ই অভাব। তারা খালি আহারবিহারাদি সার করেছে। তাদের মধ্যেও ভাল লোক আছে, কিন্তু ওদেশে স্থান পায় না। ওদের জাতীয় ভাব এই কিনা — ইহকাল সর্বস্ব। ওসব দেশের ভাল ভাল লোকেরা এদেশের দিকে তাকিয়ে আছে। সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে আসে এখানে ঈশ্বরীয় ভাব সম্ভোগ করতে। এই বেলুড় মঠে কত সাহেব মেমেরা আসছেন। কতজন পবিত্র মুমুক্ষু জীবন যাপন করছেন। কেউ কেউ আবার সাধু হয়েছেন। এঁরা সব মহৎ লোক। কিন্তু ওঁদের দেশে ওঁদের স্থান নাই, কেউ তাঁদের বুঝতে পারে না। আহা, কত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে ওঁরা আসছেন এদেশে ঈশ্বরানন্দ উপভোগ করতে! কিন্তু এ দেশের লোকেরা এ ভাব হাওয়া বাতাসে breathe (প্রতি নিঃশ্বাসে) অনুভব করছে। আমাদের পক্ষে এ ভাব অতি natural (স্বাভাবিক)। ইহা ভারতের বৈশিষ্ট্য। ইহাই হিন্দু সভ্যতার, আর্য সভ্যতার আদর্শ। আগে ঈশ্বর, তারপর সব। ঈশ্বরলাভ না হলে কিছুই হলো না। রূপ গুণ ধন জন যৌবন সব ঈশ্বরে সমর্পণ

করলেই সার্থকতা — নচেৎ বৃথা ভাবধারণ। গর্ভাধান থেকে আরম্ভ করে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত life-টাই (জীবন) একটা একটানা worship (উপাসনা)।

ভগবৎভাবে বিভোর শ্রীম-র এই তেজোময়ী উদ্দীপনাপূর্ণ বাক্যাবলী যেন মন্ত্রের মত কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। কেহ কেহ শুনিয়া ভাবিতেছেন, এইরূপেই কি প্রাচীন ভারতের ঋষিকণ্ঠবিনিঃসৃত মহাবাক্যসকল ভারতের জনগণ শ্রবণ করিতেন! এখনও সেই ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি সম্মুখে দণ্ডায়মান মহাপুরুষের মুখ হইতে বিনিঃসৃত হইতেছে। কেহ কেহ আবার ভাবিতেছেন, ঋষিসঙ্গে তপোবন বাসের আবাল্যসঞ্চিত বাসনার এই কি পরিপূরণ! প্রাচীন ভারত বুঝি আবার নবকলেবরে সম্মুখে দণ্ডায়মান!

২রা চৈত্র, ১৩২৯ সাল। ১৬ই মার্চ, ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ।
শুক্রবার, অমাবস্যা।

পঞ্চম অধ্যায়

আগে ঈশ্বর, পরে সব — 'আমায় ধর'

মিহিজাম আশ্রম। বারান্দায় শ্রীম চেয়ারে উপবিষ্ট। পাশেই তক্তপোষে সত্যবান ও ফণী, পরে মুকুন্দ ও জগবন্ধু। ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠিয়া ধ্যান সমাপনান্তে স্নানাদি শেষ করিয়া বারান্দায় সকলে সমবেত হইয়াছেন। প্রায় রোজই এই সময়ে একত্রিত হন ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণ করিবার জন্য। ইতিমধ্যেই 'ডাক' আসিয়াছে। এখন সকাল সাড়ে আটটা।

সত্যবান ও ফণী রামপুরহাটের স্কুলের ছাত্র, পনের যোল বৎসর বয়স। মুকুন্দ ঐ স্কুলের রেক্টর, তিনি এম.এ. পাশ করিয়া শিক্ষকতা করেন। বিবাহ করেন নাই। প্রায় বাল্যাবধি শ্রীম-র অনুগত। তিনি অসুস্থ হইয়া শরীর ও মনের বিশ্রামের জন্য শ্রীম-র কাছে মিহিজামে আসিয়াছেন। মুকুন্দর সেবার জন্য দুই একটি স্কুলের ছাত্র কখনও থাকেন।

ডাকের চিঠি পড়া হইতেছে। ছোট জিতেন লিখিতেছেন — আজ প্রভাতে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণের বারান্দায় উপবিষ্ট ধ্যানরত সাধুগণকে যুক্তকরে প্রণাম করিয়াছেন।" ছোট জিতেন অফিসে কর্ম করেন। শ্রীম-র আদেশে অফিসের পর নিত্য কলিকাতা হইতে বেলুড় মঠে গিয়া রাত্রিবাস করেন আর সাধুসঙ্গে ধ্যানভজন করিয়া থাকেন। সকালে আবার অফিসে যান। আহারাদি কলিকাতার বাসায় সম্পন্ন করেন। তাঁহার মঠবাসের বিবরণ প্রায় নিত্য শ্রীমকে পত্রদ্বারা জানান। আজও পত্র আসিয়াছে। মহাপুরুষ মহারাজ ধ্যানমূর্তিকে প্রণাম করিয়াছেন এই কথা শুনিয়া শ্রীম বলিতেছেন, ধ্যানমূর্তি কম? ঠাকুর বলতেন, গঙ্গায় জোয়ার এলে খাল সব ভরে যায়। গঙ্গায়ও গঙ্গাজল, খালেও গঙ্গাজল।

গঙ্গায়ও জোয়ার, খালেও জোয়ার। এখানে ইলিশ মাছ, ওখানেও ইলিশ মাছ (সকলের হাস্য)। তেমনি ধ্যানে — ধ্যাতা আর ধ্যেয়, সব এক হয়ে যায়। তাই তো প্রণাম করলেন মহাপুরুষ। এরই চরম অবস্থায় সমাধি। তখন ধ্যান, ধ্যাতা, ধ্যেয়ের ভেদ চলে যায়। বেদান্তবাদীরা ত্রিপুটী ভেদ বলে। সমাধিতে সব ভেদ লুপ্ত হয়। তখন এক কি দুই, তা-ও বলা যায় না। মনের মনত্ব নাশ হয়ে যায়। তাকেই শুদ্ধ মন বলা হয়। শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ আত্মা — ঠাকুর এক বলেছেন।

মঠে বাস করলে এমন সব ঘটনা দেখা যায়। লাখ বই পড় আর যাই কর, অমন কিছুতে হয় না। হাজার উপদেশে যা না হয়, 'মহাপুরুষের ধ্যানরত সাধুগণকে প্রণাম' — দর্শন দ্বারা তার ঢের বেশী হবে। মনে এ দৃশ্য দৃঢ়বদ্ধ হয়ে থাকবে। কেন এ প্রণাম, আর কে করেছেন — না, মঠের অধ্যক্ষ। এই সব অমূল্য সম্পদের অধিকারী হওয়া যায় মঠের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখলে, আনাগোনা করলে।

ভক্তরা যাতে মঠে নিত্য যেতে পারেন, তাই ঠাকুর স্টীমার করে দিয়েছেন, যখনই মনে হবে তখনই চলে যেতে পারবেন। রাত্রিতে থাকলে দু'বেলার ধ্যান দর্শন হয় সকাল সন্ধ্যায়। আর সন্ধ্যারতি ও মঙ্গলারতিও দর্শন হয়। সাধুদের দর্শন করতে হয় serious moments-এ, তাঁদের ঈশ্বরচিন্তার সময়। তবেই ওঁরা যা করেন তা করতে ইচ্ছা হবে। বাবুরা যান চুরুট মুখে দিয়ে, ইস্টিক হাতে ওঁদের সঙ্গে ইয়ার্কি দিতে — politics-এর (রাজনীতির), খবরের কাগজের আলোচনা করতে। কিন্তু best time-এ (উপযুক্ত সময়ে) সাধুদের catch করতে (ধরতে) হয়। সাধুরা যদি দৈবাৎ অন্য কথায় রত থাকেন, তখন প্রণাম করে গাছতলায় চলে আসতে হয়। মন সাময়িক নিচে নামলেও তাঁরা ইচ্ছামাত্র উপরে উঠিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু বাবুদের তা হওয়া কঠিন। তাই best time-এ (শুভক্ষণে) তাঁদের ধরতে হয়। Higher life-এর, Spiritual life-এর (ধর্ম জীবনের) ideal (আদর্শ) যা, সব ওখানে পাওয়া যায়। নিত্য গঙ্গাস্নান, দক্ষিণেশ্বর দর্শন, সাধুসঙ্গ, সবই দুর্লভ।

জনৈক ভক্ত — আজ্ঞে, সন্ধ্যাবন্দনা সম্বন্ধে ঠাকুর কি বলতেন?

শ্রীম — ঠাকুর বলতেন সন্ধ্যা করতে। ওতে নিত্য প্রাণীহিংসাদি-জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। আর ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়। আবার দৈনন্দিন কাজের ভালমন্দ ধরা পড়ে ঐ সময়ে বসলে। সন্ধ্যা, মানে সন্ধিক্ষণে — রাত যায় দিন আসে, দিন যায় রাত আসে, আর মধ্যাহ্নে — এ সময়ে ভগবানের নাম করা।

তিনি বলতেন, সন্ধ্যার থেকে বড় গায়ত্রী, গায়ত্রী থেকে বড় ওঁকার। বলতেন, সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয়, গায়ত্রী লয় ওঁকারে। অর্থাৎ গায়ত্রী সর্বদা জপ করলে সন্ধ্যার প্রয়োজন হয় না। আবার ওঁ সদা জপ করলে গায়ত্রীর প্রয়োজন নাই। বলতেন কিনা, একবার ওঁ উচ্চারণ করলে কোটি সন্ধ্যার ফল হয়। আর যার ব্রহ্মদর্শন হয়েছে, সমাধিলাভ হয়েছে, তার কিছুরই দরকার নাই।

ওঁকারের উপাসনা আবার আছে। অ, উ, ম — ওঁকারের এই তিন মাত্রাকে — ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর — জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা করে। বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ, আবার বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বরের সঙ্গেও তুলনা করে। ওঁকারের এই তিন মাত্রাই অপরমার্থ রূপ। তুরীয় বা চতুর্থ মাত্রাই পরমার্থ রূপ।

আবার লয় চিন্তন আছে। 'অ' 'উ'তে লয় করতে হয়। 'উ' 'ম'তে। অর্থাৎ স্থূল বা বিরাট হিরণ্যগর্ভে, সূক্ষ্মে। হিরণ্যগর্ভ কারণে বা ঈশ্বরে। কারণ মহাকারণে লয় করতে হয়।

স্থূল সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম কারণে, কারণ মহাকারণে বা ব্রহ্মে লয় হয়। ঠাকুরও বলেছিলেন এই লয় চিন্তনের কথা। ইহাই অনুলোম চিন্তা।

অমাত্র রূপ ব্রহ্মই আমি, এ চিন্তা করতে করতে মুক্ত হয়। বেদান্তবাদীরা এইরূপ চিন্তা করেন।

যে সর্বদা ধ্যান জপ করে তার সন্ধ্যার দরকার হয় না। ঠাকুর গান গাইতেন, 'ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়। সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফিরে কভু সন্ধি নাহি পায়॥' এ সিদ্ধ অবস্থায় হয়।

প্রবর্তকদের নিত্য নিয়মিত সময়ে ধ্যান জপ করতে হয়। শত

কাজ থাকলেও অন্ততঃ সকাল সন্ধ্যায় বসতে হয়। বিদ্যাসাগরমশায় রাঁধতেন বাপ-ভাইদের জন্য, আর ফাঁক পেলেই পড়তেন। অভ্যেস করলে সব সহজ হয়ে যায়। পাঁচটা কাজও এক সঙ্গে করতে পারে। ঠাকুর বলতেন, তিনটার সময় উঠতে হয় রাত্রে, না হয় চারটায়। চার পাঁচ ঘন্টা নিদ্রা কি কম! ঐ সময়ে উঠে ঈশ্বরচিন্তা করতে হয়। ব্রাহ্মমুহূর্তে চিন্তা করলে সহজে হয়ে যায়। ঐ সময়ে সাধু মহাপুরুষরা সব ঈশ্বরচিন্তা করেন। একটা spiritual current (আধ্যাত্মিকতার স্রোত) বইতে থাকে তখন।

রাত্রের আহার সম্বন্ধে সাবধান না হলে সকালে উঠা যায় না। তাই ঠাকুর বলতেন, 'দিনে বারুদ-ঠাসা খাবে আর রাত্রে সামান্য জলযোগ।' শ্যামপুকুরের বাড়িতে আমায় বলেছিলেন, 'গীতা পড়ো, এতে যুক্তাহারবিহারের কথা আছে। যোগীদের আহার যুক্তাহার। বেশীও না অতি অল্পও না অথচ খুব simple and substantial (সরল ও পুষ্টিকর), সহজে যা হজম হয়। রাত্রিতে খুব light (অল্প) খেতে হয়। রাত্রে বেশী খেলে ঝিমুনি আসে, আলস্য বাড়ে, পেট পুটপাট করে, মন চঞ্চল হয়, চিত্ত স্থির হয় না, ধ্যান জপে মনোযোগ হয় না, অসুখ করে। ওরা (সাঁওতালরা) খালি একটু সীমসিদ্ধ দিয়ে ভাত, কিংবা শাকভাত খায়, দেখ কেমন শরীর!

যারা সাধন ভজন করবে তাদের খাওয়া যত কমানো যায়, to the reasonable minimum (যুক্তিসঙ্গত মত কম)। অন্য লোকের কথা আলাদা। মশলা ফসলা কিছু না। বেশী খাও dyspepsia (অজীর্ণ) হবে। অনাদি মহারাজ ডিস্‌পেপসিয়া রোগী, পাঁচ বৎসর ভুগছে, ঘিভাত দু'টি খেয়ে খেয়ে আরাম হয়ে গেল। ডাল পর্যন্ত হলেই হলো ভাতের সঙ্গে না হয় আর একটু ঘি হলো। যারা রুগ্ন বা বৃদ্ধ, তাদের দুধভাত আর একটু ঘি খেলেই যথেষ্ট। বাবুদের বাড়িতে একটা পর্যন্ত রান্নাই হচ্ছে নানান খানা, শেষে টের পাবে।

গীতার শ্লোকটি মনে আছে?

'যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥' (গীতা ৬-১৭)

এই দেখ, 'যোগো ভবতি দুঃখহা' বলেছেন। এই সংসারের দুঃখহরণকারী যোগ। অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। এই দুর্লভ পদার্থ লাভ হয়, যুক্তাহারবিহারের দ্বারা। কিন্তু শোনে কে? ভগবান ডঙ্কা মেরে বলেছেন একথা, কিন্তু প্রকৃতি শুনতে দিচ্ছে না।

ভগবান direct (প্রত্যক্ষভাবে) নিষেধ করেন না। ফলই বলছে, বেশী খাও পর, বিলাসিতা কর, ফলও পাবে তেমনি শেষে।

অধর সেনকে নিষেধ করেছিলেন ঘোড়ায় চড়তে। তা সত্ত্বেও চড়লো। কিন্তু পড়ে গিয়ে খুব কষ্ট পায়। হাত-পা ভাঙ্গে আর তাতেই দেহ যায়। ঠাকুর কিন্তু প্রথমবার ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার পরই বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন, পালকী তো বেশ, ওতে ভয় নাই। অধর সেন তা শুনেন নাই, তাই শেষে প্রাণ যায়।

একবার একজন ভক্ত বেলায় শয্যাত্যাগ করায়, ঠাকুর তাকে তিরস্কার করেছিলেন। বলেছিলেন, 'অত বেলা অবধি শুয়ে না থেকে রামলালকে বাজারে শীঘ্র যাওয়ার জন্য সাহায্য করা তোর উচিত ছিল।' এমন করে ঠাকুর ideal of life (জীবনের আদর্শ) নিজে দেখিয়ে গেছেন, আর নিজ হাতে ভক্তদের শিখিয়ে গেছেন।

জপ ধ্যান সর্বদা করতে হয়, এর শেষ নাই। কেউ কেউ একটু জপ ধ্যান করেছিল, তাতে লোকমান্য হলো। মনে করলে বেশ হয়েছে, এর বাড়া বুঝি আর নাই। কিন্তু তা নয়। ঠাকুর বলতেন, যত যাও ততই পাবে, এগিয়ে পড়। প্রথমে চন্দনের বাগান, তারপর রূপার খনি — হীরে মুক্তো কত কি পাওয়া যাবে। তার শেষ নাই। যার যতটুকু আধার তাতে ততটুকু ধরবে। ছোট আধার হলে একটুতেই পূর্ণ হয়ে যায়। বড় আধারে যত দাও, আরও চায়। এর ইতি নাই। কাশীপুরে ঠাকুর বললেন, মা এখনও কত অবস্থার ভিতর দিয়ে নিচ্ছেন, এখনও বদলাচ্ছেন। শেষ নাই।

দেখ, অবতার যিনি তিনি বলছেন, এখনো বদলাচ্ছে, শেষ নাই। আর মানুষগুলি কি করে বলে একটু কিছু করেই আমার সব হয়ে গেছে?

শ্রীম — ঠাকুর নির্জনবাসের কথা খুব বলতেন। এমন সব নির্জন

স্থানে এলে sense of infinity develop (অসীমের উদ্দীপন) করে। এখানে nature (প্রকৃতি) শিক্ষা দেয়। আমরা ঐ দক্ষিণের মাঠে একটি স্থান discover (আবিষ্কার) করেছি পুকুর পাড়ে। কয়েকটি বৃক্ষ আছে, ভারি সুন্দর স্থান। খুব উদ্দীপন হলো। ঠাকুর যে সব গভীর কথা আমায় বলেছিলেন, সেসব কথা মনে উদিত হতে লাগলো।

তিনি বলেছিলেন কিনা, মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ভগবানদর্শন! ভগবানদর্শন না হলে কিছুই হলো না। ইহাই ideal of life and end of life (জীবনের আদর্শ ও চরম লক্ষ্য)। এছাড়া সব মিছে। আগে ঈশ্বর, পরে সব। আগে সব, পরে ঈশ্বর, নয়। শুধু কি বলেছেন! — নিজে করেছেন, আবার অন্তরঙ্গদের দিয়ে করিয়েছেন। তারাও তাঁর কথা বিশ্বাস করলো, তাই তাদের জীবন মধুময় হয়েছে। অন্যরা যারা তাদের বিশ্বাস করছে, তার ভাগ পাচ্ছে — শান্তি পাচ্ছে।

নিজে infinite-এর (অসীমের) সঙ্গে কথা কইতেন। যাকে infinite (নিরুপাধিক ব্রহ্ম) বলে তাকেই তিনি 'মা মা' বলে ডাকতেন। একঘর লোক বসা। বলছেন, 'মাইরি বলছি, মা এসেছেন'। বর্তমান ভোগসর্বস্ববাদ মনের সরল বিশ্বাস নষ্ট করে ফেলেছে, তাই অমন করে বলতেন — 'মাইরি বলছি, মা এসেছেন।' আবার কথা কইছেন। এক পক্ষের কথা শুনতে পাচ্ছে সকলে, অপর পক্ষ অদৃশ্য।

বললেই কি বিশ্বাস হয়, সংশয় আসে পদে পদে। ঠাকুর বিশ্বাস সম্বন্ধে বলতেন, এর আবার ডিগ্রি আছে। যেমন দুধের কথা কেউ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে আবার কেউ দুধ খেয়েছে। একটা থেকে আর একটা বড়। যে খেয়েছে তার বিশ্বাসই পাকা বিশ্বাস। অবতারাদির বিশ্বাস পাকা বিশ্বাস, যেমন ক্রাইস্ট, ঠাকুর।

এই দুঃখময় সংসার থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে, 'আমায় ধর' এই তাঁর message (মহাবাক্য)! এ কথা অন্তরঙ্গদের বলতেন, সকলে নিতে পারবে না কিনা!

তাই তাঁর ধ্যান ভজন সর্বদা করতে হয়। ব্যাকুল হয়ে নির্জনে

গোপনে কাঁদতে হয় — প্রভো, দেখা দাও, দেখা দাও, এই বলে। ধ্যান জপ ছাড়া বেতালা মানুষকে তিনি দেখতে পারতেন না। ড্যাঙ্গার মাছের মত তিনি ছটফট করতেন — ওরূপ লোকের সঙ্গে। এসব করতে করতে তাঁর ওপর ভালবাসা আসে। ভালবাসা এলেই সব সহজ হয়ে গেল। তাঁর নিকটে আসা গেল। তখন অনেকটা শান্তি। তিনি যদি কৃপা করে দর্শন দেন, তখন পরিপূর্ণ শান্তি, পরিপূর্ণ সুখ। তখনই মনুষ্যজীবনের পূর্ণ সফলতা।

২

জম্বুতল। অপরাহ্ন চারি ঘটিকা প্রায়। ভাগবত পাঠ হইয়া গেল। শ্রীম পূর্বাস্য চেয়ারে। মুকুন্দ ও জগবন্ধু উত্তরাস্য। আশ্রমবাসী একটি স্কুলের ছেলে কুলির নিকট হইতে কাঁচা কয়লা খরিদ করিয়াছে। ঐ কয়লা গতকাল মাঠে জ্বালাইতেছিল। শ্রীম উহা দেখিয়া মুল্য কত জিজ্ঞাসা করায় ছেলেটি বলে, বার আনা। সন্দেহ হওয়ায় একটি ভক্তকে সত্য নির্ধারণের জন্য বলেন। আরও বলেন, ছেলেরা প্রায়ই আসা যাওয়া করে, রেলের ভাড়া এত কোথায় পায়? ভক্ত সব কথা জানিয়া শ্রীমকে নিবেদন করিতেছেন।

ভক্ত — কয়লা চার আনা দিয়ে কিনেছে, দুই আনা কুলি খরচ। অত সস্তা বলে পাছে ধরা পড়ে আর আপনি মন্দ বলেন, তাই বার আনা বলেছে। রেলে ছেলেরা প্রায়ই ভাড়া দেয় না।

শ্রীম — ও সব ভাল নয় — অত্যন্ত খারাপ। তাদেরই বা দোষ কি, সংস্কার রয়েছে রক্তে। বেড়ালের ছানা মায়ের পেট থেকে বের হয়েই খামচাতে শেখে কেন? না, ওর রক্তে পিতামাতার সংস্কার রয়েছে। জন্ম, কর্ম, শিক্ষা কোনটাই ভাল পায় নাই। জন্ম ভোগবিলাসে, কর্মও তদ্রূপ, শিক্ষাও অশিক্ষা। হেগো গুরুর পেদো শিষ্য, ঠাকুর বলতেন। এই সংস্কারের জন্যই মনে কর পূর্বে গুরুগণ ব্রাহ্মণ শরীর শিষ্য করতেন। ওদের ভিতর জপ, ধ্যান, পূজা অর্চা প্রভৃতি সদাচারের সংস্কার রয়েছে তাই।

ঠাকুরও জানতে পারতেন কার ভিতর কিরূপ সংস্কার। নিজের

লোকদের দেখলেই চিনতে পারতেন এবং ক্রমশঃ তাদের সংস্কার কাটাতে চেষ্টা করতেন। বলতেন, কারো কারো ভিতর সোনা আধ সের মাটির নিচে আছে। কারো ভিতর আধ মণ। কে যায় কোদলাতে আধ মণ মাটি!

সদ্‌গুরু যিনি তিনিই জানেন পূর্বের history and past life (অতীত জীবনের সকল কথা) এবং তিনিই শুধু সংস্কার বদলাতে পারেন। সদ্‌গুরু যিনি তিনি highest ideal reach (চরম আদর্শ অর্থাৎ ভগবৎ সাক্ষাৎকার) করেছেন। তিনি জানেন জীবনের গ্রন্থি কোথায়। যে ভাবে চালিত করলে গ্রন্থিমোচন হয় ক্রমশঃ তাই করেন। হাতে ধরে রেখে সংস্কার বদলিয়ে দেন। যেদিকে সংস্কারের প্রবল গতি সেদিকে ছেড়ে দেন, কিন্তু সূত্র ধরে রাখেন নিজ হাতে। যেমন মাছ নিয়ে খেলে — প্রথম সূতো ছেড়ে দেয়, পরে অবশ হলে টেনে তোলে, তেমনি করেন! সদ্‌গুরু ঈশ্বর-অবতার।

ঠাকুর অন্তরঙ্গদের সমস্ত সংস্কার আর past history (অতীত জীবনের ঘটনা) সব জানতেন, আর সেভাবে গঠিত করে নিতেন। এমনি করতেন, একজনকে হয়ত কাছে রাখলে ভাল হয়, তাকে যেতে দিবেন না কলকাতার বাড়িতে। যদি বলা হত বাড়িতে অসুখ বিসুখ — বলতেন, ‘হলোই বা অসুখ বিসুখ — পাড়ার লোক এসে দেখবে যদি তেমন দুর্ঘটনা হয়। তুমি থেকে যাও’ — এই কথা বলে জোর করে রেখে দিতেন। মানে, অসুখ বিসুখ, দুঃখ যন্ত্রণা, এ তো সংসারে সর্বদা আছে ও থাকবে, কিন্তু আমি তো আর বরাবর থাকবো না। তাই রেখে দিতেন জোর করে। 'but Me, ye have not always'. (St. Mathew)

একদিন একটি ভক্তকে দক্ষিণেশ্বরের বাগানে বেলতলায় ধ্যান করতে পাঠালেন। ভক্তটি চক্ষু মুদ্রিত করে পূর্বাস্য হয়ে ধ্যান করছেন। ধ্যানান্তে চক্ষু মেলে যাঁকে ধ্যান করছিলেন তাঁকেই সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখতে পেলেন, অমনি ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হয়ে পাদমূলে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করলেন। তিনি বলেই ক্ষান্ত হতেন না, দেখতেন করে কিনা। না পারলে, মায়ের মত যত্ন করে ও ভালবেসে শিখিয়ে দিতেন।

একটি ভক্ত কিছুকাল দক্ষিণেশ্বরে বাস করছেন ঠাকুরের আজ্ঞায়। কলকাতার বাড়ি থেকে একজন গিয়ে চিঠি নিয়ে হাজির তার কাছে। চিঠি দেখেই সর্পদর্শনজনিত আতঙ্কে ঠাকুর বলে উঠলেন, 'ওকি, ওকি — ফেলে দাও!' ভক্তটি তৎক্ষণাৎ বিষবৎ উহা পরিত্যাগ করলেন। অর্থাৎ, এখানে বাস করে একটানা ভাব সঞ্চারিত হচ্ছে ভক্তটির মধ্যে। সংসারের বিষয়কথায় উহা নষ্ট হয়ে যাবে — এই ভেবেই পড়তে দিলেন না। উজান পথে চালাচ্ছেন কিনা ওদের, তাই অত সাবধান। সংসারের পথ স্রোতের অনুকূলে। ঠাকুর ঐ পথের বিপরীত দিকে গিয়েছিলেন, আর অন্তরঙ্গদেরও ঐ বিপরীত পথে চালিত করেছেন।

নরেন্দ্রের টাকার দরকার। বাপ মারা গেছেন, সংসারে মা ভাইরা সব আছে। বড় বিপদ। ঠাকুরকে ঐ কথা বলায় তিনি বললেন, যা মন্দিরে গিয়ে মাকে বল্‌, যা চাইবি তাই তিনি দিবেন। কালীমন্দিরে নরেন্দ্র বারংবার গিয়েও টাকা চাইতে পারলেন না। চাইলেন জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য। কেন চাইতে পারলেন না? না, এতদিন যে hammering (বারবার আঘাত) করেছেন ঠাকুর, তা কি বিফলে যায়? বলতেন কি না, ঈশ্বরের কাছে লাউ কুমড়ো চাইতে নাই, অমৃতত্ত্ব চাইতে হয়।

একটি ভক্তকে জিজ্ঞাসা করছেন ঠাকুর, 'বাড়ির সব কেমন আছে, ভাল তো?' ভক্তটি বললেন, 'ও এক রকম চলে যাচ্ছে। আর আপনিই তো বলেছেন এখানে অন্য কথা হবে না, কেবল ঈশ্বরীয় কথা।'

খুব খুশি হলেন শুনে।

পরে অপর লোকের নিকট ঐ ভক্তের বাড়ির সব খবর নিতেন। একজন ভক্তের আমাশয় হয়েছে। ঠাকুর বললেন, অমুক কবরেজের ওষুধ ভাল। ভক্ত কিন্তু ঐ কবরেজের কাছে গেলেন না। কেননা, ওঁরা যে গুরুর নিকট ঔষধের জন্য যান নাই। অন্য স্থান থেকে ঔষধ খেয়ে ভাল হয়ে গেলেন।

গিরিশ ঘোষ বলেছিলেন, 'আমার চাকরের ছয়দিনের জ্বর আপনার

প্রসাদ খেয়ে ভাল হয়ে গেল।'

অমনি ধমক! ঠাকুর বললেন, 'তোমার কেমন হীনবুদ্ধি, ঈশ্বরের কাছে লাউ কুমড়ো চাও। তাঁর কাছে চাইতে হয় অমৃতত্ব।'

কাশীপুরের বাগানে একজনকে বলেছিলেন, 'সন্ধ্যের সময় কি হৈ হৈ করে বেড়াচ্ছিস্? আয়, আমার সামনে বসে ধ্যান জপ কর। নয় ত কি শেষে পরের বৌ ঝি টেনে বের করবি?'

একদিন ঠাকুর এক কথা পাড়লেন। তখন একজন ভক্ত বলে উঠলেন, ও তো সিদ্ধাই, ও আর কি? তখন ঠাকুর নিজেই বললেন, হাঁ হাঁ, ও ঐ রকমই।

ভক্তদের পরীক্ষার জন্য ওরূপভাবে কথা বলতেন।

সিদ্ধাই তিনি চাইতেন না — পেঁড়া বের করা পেট থেকে, হেঁটে নদী পার হওয়া, ওসব তিনি শুনতেই পারতেন না।

সাধুসঙ্গে সংস্কার বদলায় — নিত্য সাধুসঙ্গে। সাধুরও সাধুসঙ্গের দরকার। সাধুদের মধ্যে যারা শেষে গিয়ে লোকালয়ে বাস করে, বুঝতে হবে তাদের পূর্ব সংস্কার জাগ্রত হয়েছে। সংস্কার এমনি শক্ত! নিত্য সাধুসঙ্গ চাই।

এই যে ভক্তরা নিত্য সাধুসঙ্গ করছেন আর গঙ্গাস্নান, দক্ষিণেশ্বর দর্শন, আর ধ্যানমূর্তি দর্শন এতেই নূতন সংস্কার হয়ে যাচ্ছে। আর কিছুর প্রয়োজন হবে না।

তাই দু'বেলা অন্ততঃ ধ্যানঘরে বসতে হবে। ও চাই-ই। অভ্যাস রাখা চাই। অর্জুনকে এই কথা বলেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ — অভ্যাসের দ্বারা মনকে বশে আনতে হয়। ঠাকুরের একটি ছবি রাখবে, দু'বেলা ধূপ আর সন্ধ্যায় প্রদীপ দেখাবে আর রোজ ওখানে বসবে। কোনও বাজে কথা কইবে না ওখানে; এ করলে অন্য লোকও এতে বদলে যাবে।

এই মিহিজামেই প্রথম কয়দিন পাড়ার বাবুরা আসতেন আর অন্য সব কথা বলতেন। যেমন হয়ে থাকে চেঞ্জে এলে বাবুদের। তারপর যেই ঠাকুরঘর হলো, ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হলো, অমনি আর আসেন না ওঁরা। কেউ এলে বলা হতো, আসুন আমাদের ঠাকুরঘর

দর্শন করুন। ব্যস্‌, আর আসেন না।

শত কাজ থাকলেও দু'বেলা ঠাকুরঘরে বসবে।

জগবন্ধু — আজ্ঞে তীর্থাদি সম্বন্ধে কিরূপ করা উচিত?

শ্রীম — তীর্থস্থানগুলি একবার দেখে নিতে হয়। কারণ একবার দেখা থাকলে, পরে স্মরণমাত্রই তীর্থে যাওয়ার কাজ হয়ে যায়। শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাবাক্য রয়েছে, 'মনই সব — যেন ধোপাঘরের কাপড়, যে রং এ ছোপাবে সেই রং ধরবে।' এর significance (তাৎপর্য) আছে; intellectual invention (মনগড়া কথা) নয়, ঠিক কথা।

ঠাকুর একটি গল্প বলতেন। দুই বন্ধু বেড়াতে বের হলো। একজন রাস্তায় ভাগবতপাঠ হচ্ছে দেখে সেখানেই বসে পড়লো। আর একজন বেশ্যালয়ে গেল। যে ভাগবতপাঠে ছিল, সে ভাবতে লাগলো — বন্ধু আমার কি মজাই করছে, আর আমি! যে বেশ্যালয়ে ছিল সে ভাবছে — হায়, আমি কি নরকেই এসেছি, বন্ধু আমার কি আনন্দেই আছে! মৃত্যুর পর যে ভাগবতপাঠে ছিল সে গেল যমালয়ে। আর যে বেশ্যালয়ে গিছলো তাকে বিষ্ণুদূত বৈকুণ্ঠে নিয়ে গেল। এই গল্পের সার এই — মনই সব। যে রং-এ ছোপাবে সেই রং ধরবে।

তীর্থ একবার দেখা থাকলে ভাল করে, পরে ইচ্ছা করলেই তার অনুচিন্তন করা যায়। কেউ যদি মনে করে, আজ দু' ঘন্টা ঁবিশ্বনাথ দর্শন করবো — এখানে বসে মনকে পাঠিয়ে দিলেই তা হতে পারে। এইরূপে বৃন্দাবন প্রভৃতি সব স্থানই হতে পারে দর্শন। মঠে যারা নিত্য যেতে পারে না, তারাও যদি একবার বা মাঝে মাঝে গিয়ে সব ভাল করে দেখে আসে, তাহলে বাড়িতে বসেই মনকে পাঠিয়ে দিলেই হলো। এখন আরতি হচ্ছে, কিংবা এখন ধ্যানের সময়, আচ্ছা আমিও আরতি দর্শন করছি কি সাধুসঙ্গে বসে ধ্যান করছি, — এ মনে করলেই হয়ে যাবে। হিমালয়ের সুন্দর সুন্দর scenery (দৃশ্য), নির্জন স্থানের, নদী, পাহাড়, এই স্থানের মত উন্মুক্ত প্রান্তরের দৃশ্যগুলি মনে গেঁথে ফেলতে হয়। পরে স্মরণমাত্রেই ঐখানে যাওয়া যেতে পারে। এমন সব স্থানে sense of infinity

develop করে (অসীমের অনুভূতি বাড়ে)।

প্রশ্ন — আজ্ঞে, সত্য পালন সম্বন্ধে ঠাকুর কি বলতেন?

শ্রীম — ঠাকুর একদিন গাড়িতে বলেছিলেন শোভাবাজারের মোড়ে — 'সত্যকে ধরে থাকলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়'। একবার অসুখের সময় কবরেজের নিকট বললেন, ছয় মাস জল খাবেন না। তা ভক্তদের অনুরোধসত্ত্বেও খেলেন না। বললেন, 'যেকালে বলেছি খাব না, তা খাবই না।'

ঠাকুর মানুষ চিনতে পারতেন, কে সত্য পালন করতে পারবে, কে পারবে না। কখনও কখনও একই সংবাদ দুইজনের কাছে উপর্যুপরি বলতেন। যদি বলা হতো, এ সংবাদ তো অমুককে বলা হয়েছে, হেসে উত্তর করতেন, 'প্রথমে যাকে বলেছি, সে ঐ সংবাদ বলবে না। সে সত্য পালন করতে পারে না তা আমি জানি।' কি করে হবে? জন্মদোষ, সংস্কারদোষ রয়েছে পিছনে, আর সঙ্গ ও শিক্ষাদোষও আছে। আর ওদেরই বা দোষ কি? লোক জিজ্ঞেস করছে, 'তোর বাপ বাড়ি আছে?' বাপ ছেলেকে বলছে 'বল — নাই।' এই ত শিক্ষা!

কিন্তু সাধুসঙ্গ সব করতে পারে, সব রোগের ঔষধ। এ ছাড়া উপায় নাই!

৩

এখন অপরাহ্ন প্রায় পাঁচটা। শ্রীম ও মোহন জম্বুতলে বসিয়া আছেন, কথাবার্তা হইতেছে।

মোহন — আজ্ঞে, অবতার যখন আসেন সেই সময়ের বৈশিষ্ট্য কি?

শ্রীম — অবতার যখন আসেন তখন লোকের ব্যাকুলতা বাড়ে। ঈশ্বরকে জানবার ইচ্ছা প্রবল হয়। দেশময় একটা নূতন ভাব জেগে ওঠে। Higher life-এর ideal (আধ্যাত্মিক জীবনের আদর্শ) তখন দেখা যায়। অন্য সময় লোক বাহ্য পূজা পার্বণে রত থাকে। নিয়মমাত্র হয়ে দাঁড়ায়। সুখভোগ, নামযশ, এসবের জন্য পূজাদি করে।

আন্তরিকতা ঈশ্বরলাভের জন্য প্রায় দেখা যায় না। ব্রত, পূজাদি দ্বারা ভগবানকে তুষ্ট করে রোগ দারিদ্র্য, এ সবের হাত থেকে নিষ্কৃতির চেষ্টা করে। কিন্তু অবতার এসে দেখিয়ে দেন, ও সব কিছু নয়। কামিনীকাঞ্চন ছেড়ে ঈশ্বরলাভ করতে হবে। ইহাই মানুষের birth-right (জন্মগত অধিকার)। আর বলেন, এ দেহ তো থাকবে না, তবে এর সুখ নিয়ে এত ব্যস্ত কেন? যে সুখ চিরকাল থাকবে, সেই সুখের সন্ধান কর। Eternal life-এর (অমৃতত্বের) সন্ধান বলে দেন, আর বিশ্বাসী ভক্তগণ তার সন্ধানে ছোটে।

মঠের সাধুদের ঐ উচ্চ আদর্শ, eternal life! ওরা অন্য কিছু চায় না। Name, fame — the last infirmity in human character (বিফলকারী অভিলাষ, নাম আর যশ) এসব তারা চায় না। চায় শুধু ঈশ্বর।

তাই এদের সঙ্গ করতে হয়। অন্য সাধুর সঙ্গ করলে এ হবে না। অন্য সাধুরা ধর্মের গ্লানিতে পড়েছে। শুধু routine work-এর মত একটু জপ ধ্যান, একটু পাঠ করবে। কিন্তু মঠের সাধুরা eternal life-এর (অমৃতত্বের) সন্ধানে রয়েছে, তারা এ সংসারের কিছু চায় না। তবে দেহধারণের জন্য যা দরকার — যেমন ভিক্ষা, সাধুসেবা, গুরুসেবা — এই মাত্র রেখেছে। রোজ যারা মঠে যাবে তাদের সংস্কার বদলাবেই। ঐ-টি কেমন সুবিধা করে দিয়েছেন ঠাকুর — স্টীমার হওয়ায়। ভোর চারটায় উঠে ভক্তরা মঠে যেতে পারে — right (ভাল) ঘড়ির সঙ্গে wrong (খারাপ) ঘড়ি মিলান হয়। সাধুসঙ্গ ছাড়া আর অন্য পথ নাই চরিত্র বদলাবার। যারা যাবে — তারাই উঠবে। আহা, ঠাকুর কত সুবিধে করে দিয়েছেন স্টীমার হওয়ায়; নয়ত এক নদীতে বিশ ক্রোশ হতো। এক বছরেও অনেকের যাওয়া হয়ে উঠতো না।

হাজার হাজার বছরের সংস্কার কেটে যাবে ওতে করে। মানুষ তা করতে চায় না। প্রথম প্রথম জোর করে করতে হবে। উজান পথে চলতে হবে। It's commodity, my Lord, it's commodity (Shakespeare) – বিষয়ভোগ আমার ভালে লাগে,

এ বললে চলবে না।

অন্তরঙ্গদের বলতেন, আর একটি আছে, সে-টি অহৈতুকী ভক্তি — শুদ্ধাভক্তি। ঈশ্বরের কাছে শুধু ঐ-টি চাইতে হয় — সংসারের সুখ, ঐশ্বর্য নয়। কারণ ওসব তো কিছু থাকবে না কিনা। তিনি বলতেন আর দেখতেনও, চারদিকে সব বস্তুতে মৃত্যুর ছাপ লেগে রয়েছে। তাই eternal life — অমৃতত্ব চাই।

সাধুর প্রচলিত অর্থই হয়ে দাঁড়িয়েছে রোগ-সারানো, সিদ্ধাই দেখান — এই সব। কিন্তু ঠাকুর এসে উলটিয়ে দিয়েছেন এই সব। তিনি বললেন, এসব পার্থিব বস্তু থাকবে না। ওসব চাই না। লাউ-কুমড়ো নয়, অমৃতত্ব চাই। ধর্ম অর্থেও লোক ঐ বোঝে — সিদ্ধাই শেখা।

ঠাকুর অসুখের সময় এক বছর কি কষ্ট পেয়েছেন। এর অর্থ কি? না, সুখ অসুখ, দুঃখ কষ্ট, রোগযন্ত্রণা সব অবস্থাতেই তাঁকে ডাকতে হবে — humanity in infirmity-তেও ভগবানকে ডাকো। এত শরীরের কষ্টের ভিতরও সর্বদা 'মা মা'। এই দেখে তবে তো লোক সাহস পাচ্ছে কিছু। তারা ভাবছে কি, তিনি এত কষ্টে পড়েও সর্বদা 'মা মা' করছেন, সর্বদা সমাধিস্থ, আমরাও অসুখে পড়ে তাই করবো এবং ভাল অবস্থাতেও তা করবো, তাঁকে ডাকবো।

৪

অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটা। শ্রীম ছান্দোগ্য উপনিষদ্ নিজে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। নারদ-সনৎকুমার সংবাদ।

নারদ নানা বিদ্যায় পারদর্শী হয়েছেন। চার বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, দেববিদ্যা, গন্ধর্ববিদ্যা, গণিত, astronomy (জ্যোতিষ) প্রভৃতি সর্ববিদ্যায় পারদর্শী। কিন্তু মন চঞ্চল, শোকে মোহে অভিভূত হয়ে পড়ে। তাই ঋষি সনৎকুমারের নিকট শিষ্যভাবে উপস্থিত।

নারদ বললেন, প্রভো আমি ঋষিদের মুখে শুনেছি যে আত্মবিৎ অর্থাৎ ঈশ্বরকে যিনি জেনেছেন, তিনি শোকে মোহে উদ্বেলিত হন

না। আমাকে সেই আত্মবিদ্যা প্রদান করুন। কৃপা করে শোকমোহের পারে নিয়ে চলুন।

সনৎকুমার ক্রমে ক্রমে সগুণ উপাসনার কথা বলতে লাগলেন। শেষে বললেন, যা ভূমা অর্থাৎ বৃহৎ, তাই সুখ, অল্পে সুখ নাই! আবার ভূমার লক্ষণ দিচ্ছেন। সে অবস্থায় জীব অন্য দেখে না, শুনে না, জানে না। অর্থাৎ, এক সত্য বস্তুর সত্ত্বা সর্বত্র অনুভব করে, ঈশ্বর বই তখন অন্য কিছু দেখতে পায় না।

অন্তরে বাহিরে তিনি।

যখন পৃথক জ্ঞান থাকে, জ্ঞাতা জ্ঞান ও জ্ঞেয় থেকে পৃথক বোধ করে, সেই জ্ঞান অল্প বলছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া সব নশ্বর, আর নশ্বর বস্তুতে সুখ নাই। 'যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্।'

ঠাকুর সেই ভূমাকেই 'মা মা' বলে ডাকতেন। কখনও কখনও সমাধিতে বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে যেত। সেই অবস্থায় কি হয় তা মুখে বলা যায় না।

এক কি? তা-ও বলবার যো নাই।

অনেকটা নিচে এসে কখনও বলতেন, মোমের বাগান, মোমের গাছ, মোমের মালী — সব মোমের বোধ হচ্ছে। অর্থাৎ, নাম রূপ বোধ হচ্ছে যখন নেমে আসছেন। মোম যেন বা কোন বস্তু নয় — সে যেন ছায়া। তথাপি ছায়াবৎ, ডাইমেনসনাল নয়। কিন্তু সব সচ্চিদানন্দময়, তাই মোমের বলছেন। এর উপরের অবস্থার কথা বলা যায় না, তাই বলতেন।

একেই ব্রহ্মজ্ঞান, একেই আত্মজ্ঞান বলে। ভক্তের ভাষায় ভগবানদর্শন বলা হয়। আত্মজ্ঞ ব্যক্তির অন্য বস্তুতে মন নাই, প্রীতিও নাই, তাই আত্মারতি। অন্য খেলা, অর্থাৎ অন্য ব্যাপার নাই, তাই আত্মক্রীড়া। আত্মার সঙ্গে রমণ, সংযোগ, তাই আত্মমিথুন। আবার আত্মা ছাড়া, অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ ছাড়া, অন্য বিষয় আনন্দ গ্রহণ করে না, তাই আত্মানন্দ হন। স্বরাট্ অর্থাৎ সম্রাট হন। তৈত্তিরীয় উপনিষদেও বলেছেন, 'আপ্নোতি স্বরাজ্যম্' — স্বরাজ লাভ করেন,

কারো অধীন নহেন, ব্রহ্মস্বরূপ হন। ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনিও ব্রহ্ম। গীতায়ও বলেছেন, জ্ঞানী আমার আত্মস্বরূপ, তাই সম্রাট। জাগতিক সম্রাটের তবুও ভয় আছে — রোগ, শোক, মৃত্যুর ভয়। ভগবৎদ্রষ্টা অভয় পদ লাভ করেন। ইহাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য। ক্রাইস্ট ইহাকেই বলেছেন, eternal life (অমৃতত্ব)।

এখন সন্ধ্যা। ভক্তগণ সঙ্গে ঠাকুরঘরে শ্রীম ধ্যান করিতেছেন। তারপর কথামৃতপাঠ হইতেছে। শ্রীম-র সম্মুখে বসিয়া জগবন্ধু দ্বিতীয় ভাগ, প্রথম খণ্ড পাঠ করিতেছেন। সুকুমার, আশুও বসিয়া আছে। ইহারা স্কুলের ছাত্র, রামপুরহাট হইতে আসিয়াছে। পাঠ চলিতেছে। শ্রীম বলিলেন, ভক্তিই সার। ঠাকুর বলছেন, ভক্তি থাকলে ব্রহ্মজ্ঞানও পাওয়া যায়। গোপীদের ব্রহ্মজ্ঞানও ছিল।

ভক্তি থাকলে বিবেক বৈরাগ্য আপনি আসে বলছেন। তখন আর কষ্ট করে নাক টিপে সংযম করতে হয় না। বাঘ যেমন ছাগল কপ্‌কপ্ করে খেয়ে ফেলে, তেমনি কামক্রোধাদি নষ্ট হয়ে যায়। কিছু করতে পারে না ওরা — সব খসে পড়ে যায়।

রাত্রির আহার শেষ হইয়াছে, এখন প্রায় দশটা। শ্রীম কুটীর-প্রাঙ্গণে বসিয়া আছেন চেয়ারে উত্তরাস্য। চারিদিকে গাঢ় অন্ধকার — সব নিস্তব্ধ। বৃক্ষেরও পত্র নড়িতেছে না। একটি ভক্ত পাশে বসিয়া আছেন, তিনি যুবক। হঠাৎ শ্রীম তাহাকে বলিতেছেন, ভাব তো এই নক্ষত্রমণ্ডিত আকাশতলে নির্জনে বৃক্ষের নিচে কম্বলাসনে উপবিষ্ট সাধুর psychology (মনের চিত্রটি)!

যুবকটির ভবিষ্যৎ জীবনের চিত্রপট কি তাহার সম্মুখে শ্রীম ধারণ করিলেন?

৩রা চৈত্র ১৩২৯ সাল।
১৭ই মার্চ, ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ।
শনিবার, শুক্লা প্রতিপদ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

লীলায় বিচিত্রতার প্রয়োজন

উপদেশ দিয়াই শ্রীম ক্ষান্ত থাকিতেন না। তাঁহার নিকট যে সকল ব্রহ্মচারী ও ভক্তরা থাকেন, তাহাদের উপর সর্বদা লক্ষ্য রাখিতেন কে কি করে। আজ মধ্য রজনীতে বারটার পর একটি ব্রহ্মচারী ঘর হইতে বাহির হইয়া অশ্বত্থমূলে ধ্যান করিতেছেন। অন্ধকার রজনী। শ্রীম তাঁহার কুটীর হইতে উহা জানিতে পারিয়াছেন। বাহিরে আসিয়া একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন চুপি চুপি অশ্বত্থমূলে লইয়া আসিলেন এবং আলো অতি ক্ষীণ করিয়া অশ্বত্থবৃক্ষের অন্তরালে উহা রাখিয়া চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মমুহূর্তে ধ্যানান্তে উহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। পরে প্রভাতে ঠাকুর প্রণাম করিতে গৃহে প্রবেশ করিলে শ্রীম ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, আজকাল বন্য শূকর বের হচ্ছে, আলো দেখলে ওরা আসে না, তাই হ্যারিকেন রাখা হয়েছিল। সাধুরা এই জন্য ধুনি রাখেন।

সকাল প্রায় সাড়ে সাতটা। এখন শ্রীম ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছেন। রাস্তা ধরিয়া দক্ষিণের মাঠের দিকে চলিলেন, সঙ্গে একজন ব্রহ্মচারীকে ডাকিয়া লইলেন। বনে একটি বৃক্ষকুঞ্জ দেখিয়া বলিলেন, এ স্থানটি অতি সুন্দর, যেন পঞ্চবটী। ঠাকুর আমায় যে সব গভীর উপদেশ দিয়েছিলেন, এখানে বসে সেসব কথা আমার মনে হতে লাগলো। যেমন, ঈশ্বরদর্শন না করলে কিছুই হলো না। রূপ, জীবন, যৌবন, বিদ্যা, বুদ্ধি — সব তাঁর পাদপদ্মে অর্পণ করলেই সব সার্থক। ঈশ্বরই বস্তু — সংসার কাকবিষ্ঠাবৎ পরিত্যাজ্য।

নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তিনি দেখা দেন। তাঁর এই সব মহাবাক্য স্মরণ হতে লাগলো।

ভক্তটি কৃতার্থ মনে করিলেন আর ভাবিতেছেন, একেই বুঝি অহেতুক কৃপা বলে। নিরভিমান সিদ্ধ আচার্যদের উপদেশপ্রণালীই ভিন্ন। বৃক্ষকুঞ্জকে অবলম্বন করিয়া ভক্তটিকে তাঁহার জীবনের আদর্শ

নিরূপণ করিয়া দিবার কি অপূর্ব কৌশল!

অদূরে দুই মাইলের মধ্যে পশ্চিম দিকে একটি পাহাড় দেখা যাইতেছে। কৌতূহলবশতঃ সঙ্গী ব্রহ্মচারী এই পাহাড়ের কথা উত্থাপন করিলেন। শ্রীম তৎক্ষণাৎ বলিলেন, যান না একবার ফস্ করে দেখে আসুন না। এই তো দূর! ব্রহ্মচারী গমনোদ্যত হইলে বলিলেন, ফিরতে দেরী হবে, তখন রৌদ্র উঠবে, এই ছাতাটা নিয়ে যান।

ব্রহ্মচারী ঐ পাহাড়ে উঠিয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ বন, গ্রাম সব দেখিয়া লইলেন। বহুদূর পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়। একটি গুহাতে বসিয়া তিনি ধ্যান করিতেছেন — শ্রীম-র মুখনিঃসৃত সদ্যপ্রাপ্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাবাক্য — 'ঈশ্বরদর্শন না করলে কিছুই হলো না। রূপ, জীবন, যৌবন, বিদ্যা, বুদ্ধি সব তাঁর পাদপদ্মে অপর্ণ করলেই সব সার্থক।'

এখন বেলা সাড়ে দশটা। একটি ভক্ত আশ্রমপ্রাঙ্গণে শ্রীম-র বিছানাদি রৌদ্রে দিতেছেন। তাঁহার কোমরে গামছা বাঁধা। ইহা দেখিয়া কৌতুকচ্ছলে শ্রীম বলিতেছেন — দেখুন, দেখুন, কেমন — যেন কর্মকর্তা। দেখেন নাই, বাড়িতে কিছু উৎসব হলে কর্মকর্তা গামছা বেঁধে লাগে।

কিন্তু সব কর্মের মালিক একজন। মালিককে ধরলে আর কর্মবন্ধনে পড়তে হয় না, নচেৎ মুস্কিল। তাই সব কর্ম ঈশ্বরের জেনে নিষ্কাম ভাবে করতে হয়। তখন কর্ম অকর্ম হয়, গরল অমৃত হয়।

আহারান্তে শ্রীম অশ্বত্থমূলে গিয়া বসিয়াছেন। নিকটে মুকুন্দ ও একজন ব্রহ্মচারী আছেন। মনোরঞ্জনও আসিয়া বসিলেন। ইনি আজ কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। একটি ভক্ত কিছুদিন পূর্বে ঁপুরীধামে গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত জগন্নাথদর্শন ও শ্রীচৈতন্যের পুণ্যনামসংযুক্ত রাধাকান্ত মঠ, গম্ভীরা, সিদ্ধ বকুল, হরিদাস সমাধি, টোটা গোপীনাথ, সমুদ্র প্রভৃতি সম্বন্ধে কথা হইতেছে। ভক্তটি বলিতেছেন, পুরীতে মাসখানেক ছিলাম, কি আনন্দেই দিনগুলি কেটেছে। যেন স্বপ্নরাজ্যে ছিলাম। আপনার আদেশমত চৈতন্য-চরিতামৃত অন্ত্যলীলা পাঠ করতাম আর মন্দিরদর্শন, বাসুদেববাবা প্রভৃতি মহাত্মাদের দর্শন, সমুদ্রস্নান, মহাপ্রসাদসেবন, বিভিন্ন মঠদর্শন ও নির্জন সমুদ্রতটে ধ্যান — এই

করে দিনগুলি অতি আনন্দে কেটে গিছলো। আসবার সময় কাঁদতে লাগলাম।

শ্রীম — তা আর বলতে! ঠাকুর অন্তরঙ্গদের ওখানে পাঠিয়ে দিতেন। নিজে যেতেন না। বলতেন, 'পুরীর জগন্নাথ আর আমি এক।' অন্যদের এ কথা বলতেন না।

নরেন্দ্রকে আবার বলেছিলেন, 'নদের গৌরের কথা শুনিস্ নি? সেই গৌর আমি।'

চৈতন্যদেব ওখানে প্রায় বিশ বৎসর কাটিয়েছেন, শেষের আঠার বৎসর একটানা। অন্ত্যলীলার বার বৎসর প্রায়ই মহাভাবে থাকতেন। ওসব আগুন তো ওখানে রয়েছে। তাই আনন্দ হয় ওখানে গেলে।

আর যুগযুগান্তর ধরে কত সাধু ভক্ত ভগবানদর্শন করেছেন — কতজনে কত কাঁদছেন দর্শনের জন্য ওখানে। তা আর বলতে, আনন্দের কথা! ভাগ্যে থাকলে হয় ঐসব দর্শন! এসব স্থানে (মিহিজামে) আগুন নিজে জ্বালতে হয় কাঠখড় পুড়িয়ে, আর ওখানে মনে কর দাবানলের মত জ্বলছে আগুন সর্বদা।

'সরসামস্মি সাগরঃ' (গীতা ১০-২৪) — সমুদ্রও তাঁর একটি রূপ কিনা! তাই ঈশ্বরীর ভাবের এত আবির্ভাবস্থল পুরী। সমুদ্র, জগন্নাথ, বন, বিস্তীর্ণ আকাশ, সাধু, অবতারের লীলাস্থল, সবই উদ্দীপক।

শ্রীম — (ভক্তের প্রতি) কোনও সাধুর সঙ্গে কিছু কথা হলো?

ভক্ত — আজ্ঞে, একজনের সঙ্গে বেশ কথা হয়েছিল। সাধুটি দক্ষিণ দেশের, নাম স্বামী শিবানন্দ। আপনার নাম করে গিয়ে আমাদের কাছে ছিলেন। কিন্তু কি অদ্ভুত লোক! এদিকে আমাদের সঙ্গে থাকবেন খাবেন সব, আবার ঠাকুরের নিন্দেও করবেন।

শ্রীম — (সহাস্যে) ঠাকুর বলতেন শত্রুভাবে সাধন করলে তিন জন্মে হয়। তার মানে, সর্বদা তাঁর চিন্তা হয়ে যাচ্ছে কিনা, তাই শীঘ্র হয় — যেমন কংস, শিশুপাল।

ওকে ঘুরে ফিরে এখানেই আসতে হবে। তাঁর ইচ্ছায়ই এ রকম হয়ে থাকে। (সহাস্যে) তিনি বলতেন, জটিলে কুটিলে থাকলে লীলা পোষ্টাই হয়। এখানেও এসেছিল, কলকাতায় না পেয়ে, তারপর

আপনাদের ঠিকানা নিয়ে পুরী যায়।

ভক্ত — সাধুটি বললেন, আপনার সঙ্গে দেখা করে গেছেন, আর খুব আলাপ আছে। আপনার উপর ভালবাসা আছে দেখলুম, interesting personality (মজার লোক)!

শ্রীম — তাই বটে। এদিকে আসাযাওয়া আছে, আবার নিন্দেও করছে। তা তাঁর ইচ্ছাতেই এসব variety (বৈচিত্র্য) হয়, নচেৎ একঘেয়ে হয়ে যাবে যে। লীলাতে এসব বিচিত্রতা থাকে। কিছু কথা হলো এর সঙ্গে?

ভক্ত — আজ্ঞে, কথা কি কইবো— সর্বদাই চড়ে আছেন (সকলের উচ্চ হাস্য)। একদিন আমার ঘরে একজন বন্ধুর সঙ্গে কথা হচ্ছে। কথায় কথায় শিবানন্দজীর কথাও হলো। আমরা তাঁকে কথাপ্রসঙ্গে মাদ্রাজের সাধুজী বলে উল্লেখ করেছিলাম। বাবা, আর রক্ষা নাই। তাঁর ঘর থেকে ঐ কথা শুনতে পেয়ে তীরবেগে বের হয়ে এলেন। কপালের উপর চোখ রেখে চীৎকার করে বলতে লাগলেন, 'মাদ্রাজকা সাধুজী কেঁও তুম বোলা? বোলো — স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ' (সকলের উচ্চ হাস্য)

একদিন আমার একজন বন্ধুকে বলছেন, 'এ ল্যাড়কা বহুত আচ্ছা থা, ফির রামকৃষ্ণ দলমে ঘুস্ গিয়া — খারাপ হো জায়েগা'। (শ্রীম-র হাস্য)।

শ্রীম — আর কি?

ভক্ত — আজ্ঞে, আমরা একদিন ভাণ্ডারা দিলাম! সব শুদ্ধভাবে রান্না করে ঠাকুরকে ভোগ দেওয়া হল। পূজনীয় খোকা মহারাজ ভোগ নিবেদন করলেন। ঐ সাধুটিও সব জানেন, দেখলেনও সব ঠাকুরের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। সকলে প্রসাদ পেতে বসেছেন, খোকা মহারাজও। তখন বলে বসলেন, 'ম্যায় দুসরাকা জূঠা নেহি খাতা।' আবার পাতে যা সব দেওয়া হয়েছিল — ঘিভাত-টাত তার এক কণাও রাখেন নাই। আমরা ভেবেছিলাম, ওঁকে বাজার থেকে কিছু কিনে এনে দেব, কিন্তু ঐ সবই খেয়ে ফেললেন। প্রথমে কোনও কথাই বলেন নাই, শেষেও চেটে খেলেন। কিন্তু মাঝখানে এই কীর্তি!

এঁকে দেখলে আমার মনে হত ছেলেদের খেলার কথা। ছেলেরা কোন কোন লোককে খেপায়, বলে 'তুমারি টিকিমে রাধাকিষণ'। সে ব্যক্তি ক্রোধের অভিনয় করে — গাল দেয়, মারতে যায়। ছেলেরাও দৌড়ায়। একটা মজা হয়। এও ঠিক সেইরূপ।

শ্রীম — (সহাস্যে) হবে হয়ত। একজন atheist (নাস্তিক) ছিল। ঠাকুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতেই ঠাকুর ওর পিঠ চাপড়িয়ে বললেন, 'না, না, ও নাস্তিক হতে যাবে কেন?' উনি চিনতে পারতেন কি না — কার ভিতর কি! বলতেন, 'যেমন কাঁচের আলমারির সব দেখা যায়, তেমনি আমি দেখতে পারি, কার ভিতর কি আছে।' বুঝেছিলেন, যেকালে এখানে এসেছে, ও নাস্তিক হতে পারে না।

ভক্ত — অমুক ব্রহ্মচারীর অধঃপাত ঘটেছে লোকে বলে।

দুঃখিত হইয়া শ্রীম বলিলেন — দেখ, এও লোকশিক্ষার জন্য। এমনতর তিনি করান। একে দেখে সাবধান হবে অন্যেরা। এতে কি আর এর কোনও দোষ আছে? তিনি যেমন করান তেমনি হবে, মহামায়ার সঙ্গে চালাকি! ঢ্যালা দিয়ে ঢ্যালা ভাঙ্গছেন তিনি। হরিদাসকে চৈতন্যদেব ত্যাগ করলেন পরম ভক্তিমতী মাধবীর সঙ্গে আলাপ করেছিলেন বলে। মাধবী আশী বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা। হরিদাস কি খারাপ লোক ছিলেন? কেন এ-টি করলেন — না, লোকশিক্ষার জন্য। সন্ন্যাসীর আদর্শ কত কঠিন, তাই ধরলেন জগতের সামনে, হরিদাসকে এই ত্যাগ দ্বারা।

জুডাস্ ইসকেরিয়েট যীশুকে ত্যাগ করলেন ত্রিশটি মুদ্রার জন্য। এতে তাঁর দোষ নাই। এতে এই শিক্ষা হচ্ছে — কাঞ্চন এইরূপ! যিনি ঈশ্বর, অবতার হয়ে এসেছেন তাঁকেও ত্যাগ করে কাঞ্চনের জন্য। এসব লোকশিক্ষার জন্য তিনি করান। ওঁদের দোষ নাই।

তাই তো ঠাকুরের মহাবাক্য — কামিনীকাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ। এই দু'টি নিয়েই সংসার চলছে। তার জন্যই সর্বদা প্রার্থনা, 'তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না, মা'। ঠাকুর নিজে এই প্রার্থনা সর্বদা করতেন। 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়'।

৪ঠা চৈত্র, ১৩২৯ সাল। ১৮ই মার্চ, ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ, রবিবার।

সপ্তম অধ্যায়

সত্যস্বরূপ ঠাকুরকে ধরেছেন, আর ভয় নাই

১

ঠাকুরঘরের মেঝেতে কম্বলে শ্রীম উত্তরাস্য ও একজন ব্রহ্মচারী পূর্বাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। কথোপকথন হইতেছে।

শ্রীম ব্রহ্মচারীর প্রতি বলিলেন, শু-বাবুর পত্র এয়েছে। পড়ুন তো কি লিখেছেন। আচ্ছা, আপনি কিছু লিখেছিলেন খাওয়াপরা, ভোগবিলাসাদি কমানোর কথা, life simplify (জীবনযাত্রা সরল) করবার কথা?

ব্রহ্মচারী — আজ্ঞে, direct (সোজাসুজি) লিখি নাই, তবে এখানে যা কথা হচ্ছে, তা লিখে দিছলাম। যেমন আহারবিহার জীবনের উদ্দেশ্য নয়, ভগবানদর্শনই উদ্দেশ্য। আর আপনি বলেন, plain living and high thinking (সরল জীবন, উন্নত মনন) না হলে ধর্মজীবন যাপন হয় না। অর্থোপার্জনেই সব সময় চলে যায়। তার উপর আবার এসব নিয়ে যদি অত ভাবতে হয় তবে সময় কোথায় ঈশ্বরচিন্তার! এই রকম সব লিখেছিলাম।

শ্রীম — দেখছি, লেগেছে মনে! নইলে এসব আক্ষেপ উক্তি হয় কি? লিখেছেন, সংস্কার ও অভ্যাস এত খারাপ আমাদের যে, সব বুঝেশুনেও কিছু করতে পারছি না। এখন ঠাকুর সম্বল আর ঠাকুরের সন্তানরা। এঁরা স্নেহ করেন, এই ভরসা।

ব্রহ্মচারী — আজ্ঞে, ঠিক প্রাণের কথাই লিখেছেন। অনেক সময় কাঁদেন, বলেন, 'এত আটকে গেছি, নিজের শক্তি নাই উঠি। এখন ঠাকুর ভরসা।'

শ্রীম — আহা, ঠাকুরের উপর ভার যদি দিল, তবে আর কি রইলো বাকি? তিনিই করিয়ে নেবেন যা যা দরকার। সংসারে এত

আটকে যায় বলে নিত্য সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা করতে বলতেন। আর ঐ মাঝে মাঝে নির্জনবাসে চলে যাওয়া। এই যে objectionable environments, sticky quagmire of the householder's life (পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থা, বিপদসঙ্কুল গার্হস্থ্যজীবন), এ থেকে মাঝে মাঝে সরে যেতে হয়। ঠাকুর এর উপর খুব জোর দিতেন। তখন compare (তুলনা) করা চলে কোথায় ছিলুম, কোথায় এলুম। মরণের কথা স্মরণ হয়, ঈশ্বরচিন্তা হয়।

ব্রহ্মচারী — আমাদের দেখে বলেন, 'তোমরা ছেলেমানুষ এই সব করছো, আর আমরা বুড়ো হয়ে গেছি এখনও কি নিয়ে রয়েছি।' এই বলে কাঁদেন।

শ্রীম করুণামাখা স্বরে বলিলেন, আহা, ঠাকুরকে ধরেছেন আর ভয় নাই। তিনিই সব করে দেবেন। তাঁর কাছে কাঁদলে সহজ হয়ে যায়। যা স্বপ্নের অগোচর তা তিনি সহজ করে দেন। অসম্ভব সম্ভব হয়। গুরুদেব, গুরুদেব, গুরুদেব। ঠিক পথে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি, চোখের জলে সব শুদ্ধ হয়ে যায়। আচ্ছা ঐ চিঠিখানা পড়ুন তো।

ব্রহ্মচারী অন্য একখানা চিঠি পড়িতেছেন, এখানাও শু-বাবুর লিখিত। চিঠিতে তিনি জনৈক ভক্তকে মিহিজামে লিখিতেছেন, '... এখন অমৃতসাগরের উপকূলে পোঁছেছ। আর ভয় কি? সব সংশয় দূর হবে। এখন প্রাণপণে সেবা করে জন্ম সার্থক কর। আমি এমনই ফাঁদে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি, আর কোথাও যাবার উপায় নাই। সময় সময় বসে ভাবি, শ্রীশ্রী ঠাকুরের কৃপায় অনেক ঝঞ্ঝাট কি ভাবে যে কাটান হচ্ছে তা দেখলে চমৎকৃত হতে হয়। কিন্তু এর নিবৃত্তি তো হয় না! এক যায় আর এক আসে, এই চাপে চাপেই জীবন কেটে গেল। ভক্তিভাব বড় মনে স্থান পায় না — সৎকথাও বড় আসে না। কত কত জন্মের সঞ্চিত কুসংস্কার — সর্বদা মনে আসছে যাচ্ছে। শ্রীশ্রীম-র শ্রীচরণে আমার কথাও জানাবে। তিনি সবই করে দিতে পারেন।'

শ্রীম — বড় ঝঞ্ঝাটে পড়েছেন। ঠাকুর সৎবুদ্ধি দিবেন। এই-ই সংসারের ছবি। সকলেরই এই। যাঁদের চৈতন্য হয়েছে কতক,

তাঁরা এই চিত্র ধরতে পারেন। ঠাকুরের কৃপা হয়েছে, নচেৎ নিজের ভুল ধরতে চায় না মানুষ। পড়ুন তো বাকিটা।

ব্রহ্মচারী পড়িতেছেন, ‘আমাদের বয়স হয়েছে, দিন ফুরিয়ে আসছে। এই মনুষ্যদেহ পেয়ে কি করলাম? কেবল কামকাঞ্চনের মধ্যেই পড়ে রইলাম। তোমাদের কথা ভাবি, আর মনে হয় তোমরা কি ভাগ্যবান। আমরা পূর্বে ঠাকুরের কথা কত পড়েছি ও শুনেছি এবং সর্বত্যাগীদের দেখেছিও, কিন্তু ভাব হৃদয়ে ধারণ করতে পারি নাই। কিন্তু এখন যখনই তোমাদের মত শিক্ষিত অবিবাহিত যুবক ভক্তদের দেখি আর তোমাদের ত্যাগ বৈরাগ্যের কথা ভাবি, তখনই প্রাণে খুব আঘাত লাগে। ভাবি, এরাও আমাদের মত মানুষ ও সংসারে থাকে। কিন্তু, তাদের এত ভক্তি-ভাব, আর আমার হয় না কেন? মাস্টারমহাশয়ের উপদেশও সব ঠিক ঠিক পালন করতে পারি না। আমার জীবনের বাকি সময় কি এই ভাবেই কাটবে? কি হবে মনে হলেই বিষম যাতনা পাই। তুমি খামের মধ্যে ভাল করে ওখানে যে উপদেশ পাও তা দিবে। ঐ সকল কথা জানবার জন্য মন বড়ই ব্যাকুল হচ্ছে। তুমি কিছু জিজ্ঞাসা কর নাই (আমার বিষয়) কিন্তু আপনা থেকেই সব উত্তর পাইয়াছ। দেখ কি কৃপা।...’

শ্রীম — তাই ঠাকুর বলতেন ভক্তের চিঠি হলে ছুঁতে পারি। ভক্তের চিঠি পুরাণ।

ঈশ্বরের কথা এতে থাকে — বিষয়ের কথা কিছু নাই। দেখুন, কেমন ব্যাকুল হয়েছেন। অত বয়স হয়েছে, অত বড় সংসার, অত বিষয়আশয়, টাকাকড়ি, সম্পত্তি, এতে সুখ পাচ্ছেন না।

এই সংসারের অবস্থা! যে সংসারের এই চিত্র বুঝতে পারে, ঠাকুর বলতেন, তার ঘোর কেটে গেছে, ঈশ্বরের কৃপা হয়েছে। তাঁর কৃপা হলে যেমন বলতেন, হাজার বছরের অন্ধকার ঘর এক মুহূর্তে আলোকিত হয়ে পড়ে। এসব ঠাকুরের hopeful message — (ভরসাপ্রদ আশার বাণী)।

এই যে চিঠিখানা লিখেছেন, এতে কবিত্ব নাই — hard naked truth of সংসার (সংসারের কঠোর সত্যের নগ্ন ছবি)। Essay

(প্রবন্ধ) লেখা যায় — এ খুব সহজ, কিন্তু যে গোলক ধাঁধায় পড়েছে সে-ই বুঝতে পারে ব্যাপার কি। এ চিঠিখানাতে সংসারের একটি true picture (খাঁটি চিত্র) দিচ্ছেন। আর এ ছবিও পাওয়া যাচ্ছে যে, কৃপা করে তিনিই এই সংসারের গোলকধাঁধার বাইরে নিয়ে যান। দেখুন, কি সুন্দর নিজের অবস্থা বর্ণনা করেছেন! ঠাকুরের উপর যদি ভার দিল, তবে বাকি রইল আর কি? তাই ক্রাইস্ট বলেছিলেন, Repent; for the Kingdom of Heaven is at hand. (Math 4:17) (Daughter,) thy faith has made thee whole (St. Mark 5:34). অনুশোচনা আর বিশ্বাস — এ হয়ে গেলেই হলো।

২

কুলির নিকট হইতে আশ্রমবাসী একটি বালক কয়লা খরিদ করিয়াছিল — এখন তাহারই কথা হইতেছে।

শ্রীম জনৈক ব্রহ্মচারীর প্রতি বলিলেন, একে তো চোরাই মাল সম্ভবতঃ, দ্বিতীয় মিথ্যা কথা। আমি দাম জিজ্ঞেস করলে বললে বার আনা। কিন্তু শুনলুম দাম চার আনা আর মুটে খরচ দু' আনা। এমনি সব সংস্কার। আমাদের এতে রান্না করা উচিত নয়, মন মলিন হয়ে যায়। আপনি কি বলেন?

ব্রহ্মচারী — আজ্ঞে হাঁ, কিছুতেই উহা আমাদের ব্যবহার করা উচিত নয়।

শ্রীম — এমন অনেক ব্রহ্মচারী আছে যারা অপরিগ্রহ, কারো কিছু গ্রহণ করবে না। তার উপর আবার চোরাই কয়লায় রান্না, ও কিছুতেই হবে না। (সহাস্যে) ছয় আনার জন্য নরকে যাওয়া ভাল নয়। এত সোজা ভাল নয়, কি বলেন? এমন যে আধার স্বামীজী তাঁকেও ঠাকুর বলেছিলেন, তোর এখনও হয় নাই। কাশীপুরের বাগানে শেষ অসুখের সময় কাছে ডেকে নিয়ে একদিন বললেন, আমায় খাইয়ে দে তো। নিজের হাতে স্বামীজীর হাত নিয়ে মুখে তুলতে যাচ্ছেন, হাত অনেকটা উঠেছে, কিন্তু মুখের চার আঙ্গুল

নিচে রয়ে গেল — আর উঠছে না। তখনই বললেন এই কথা। স্বামীজীকেই এই কথা — অত বড় আধার যাকে বলতেন, এখন অন্যদের কথা কি! তিনি বলতেন, ভগবান পাওয়া অতি শক্ত কথা। সুতোর ভিতর ফেঁসো থাকলে ছুঁচে ঢুকবে না — এমন শক্ত! গীতায়ও তাই বলেছেন, 'কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ' —(গীতা ৭-৩) — কেউ কেউ আমায় ঠিক ঠিক জানতে পারে। অগণিত মানুষের মধ্যে ভগবানদর্শনের জন্য কেউ কেউ চেষ্টা করে। তাদের ভিতর আবার 'কশ্চিৎ', কেউ জানতে পারে। এত শক্ত। আবার উপনিষদে আছে, 'ক্ষুরস্য ধারা' — ক্ষুরের ধারের মত তীক্ষ্ণ ও দুর্গম পথ। এই কয়লা ফেলে দেওয়া হবে, স্পর্শ করাও পাপ!

(ব্রহ্মচারীকে) আপনি যতীনবাবুকে বলে আসতে পারেন — একমাস যখন আরো আমাদের থাকার কথা — এক গাড়ি কয়লা দিতে পারেন কিনা? যাক্ ঐ পয়সা, এতে বিক্রেতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আমাদের উচিত কোথায় ওকে (কুলিকে) বারণ করা — তা না করে আরো প্রশ্রয় দেওয়া হলো, encourage (উৎসাহিত) করা হলো। ওসব ভাল না। ট্রামগাড়িতে টিকিট করলাম না, ছ'পয়সা ফাঁকি দিলাম, অথবা আজের ট্রানস্ফার টিকিটে কাল গেলাম — এ শিক্ষা! চিত্তশুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন। চিত্তশুদ্ধি না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না।

এইবার শ্রীম চুপ করিলেন।

ব্রহ্মচারী — আজ্ঞে, চিত্তশুদ্ধি কা'কে বলে? ঠিক ঠিক চিত্তশুদ্ধি হলে কিরূপ হয়?

শ্রীম — চিত্তের শুদ্ধি, কিনা আমি ঈশ্বরের দাস, সন্তান ইত্যাদি, কিংবা আমি ঈশ্বর — এর যে কোনও একটি ভাব চিন্তা করতে করতে চিত্তের যে অশুদ্ধ ভাব রয়েছে, জন্মজন্মান্তরের সংস্কার, তা নষ্ট হয়ে যায়। চিত্তের অশুদ্ধ ভাব এইগুলি — আমি মানুষ, অমুকের ছেলে, অমুক স্থানে বাড়ি, ইত্যাদি। যখন চিত্ত শুদ্ধ হয় তখন, আমি ঈশ্বরের দাস, তাঁর সন্তান — এই সব ভাব উদিত হয়।

চিত্তের অশুদ্ধ ভাব — আমি মানুষ, ব্রাহ্মণ, ইত্যাদির সঙ্গে

সংঘর্ষ হয় চিত্তের শুদ্ধ ভাবের — যেমন আমি ঈশ্বরের দাস, তাঁর সন্তান — কিংবা সোঽহং ইত্যাদির। এই শুদ্ধ ভাব দ্বারা অশুদ্ধ ভাব নিবারিত হয়ে যায়। তখন বস্তুলাভ হয়, ঈশ্বরদর্শন হয়। যেমন clean mirror-এ reflection (পরিষ্কার দর্পণে প্রতিবিম্ব) পড়ে। চিত্তের ঠিক ঠিক শুদ্ধ ভাব, আর আত্মদর্শন — ঈশ্বরদর্শন এক কথা। Extreme purified state of the mind is God — শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ আত্মা এক।

বেদান্তে এই চিত্তশুদ্ধিকে 'ত্বম্' পদার্থের শোধন বলে। 'তৎ ত্বম্ অসি'। 'তৎ' হলো ব্রহ্ম — ঈশ্বর, 'ত্বম্' জীব। জীবের জীবত্ব নাশ করার প্রক্রিয়াকেই 'ত্বম্' পদার্থের শোধন বলে 'ত্বম্' খুঁজে খুঁজে এগিয়ে গেলে 'তৎ' হয়ে যায়। পাশমুক্ত জীব শিব হয়ে যায়।

ঠাকুর এ কথাটাকেই কত সহজে বলেছেন — 'আমি'টাকে খুঁজেছিলাম, পেলাম না। দেখছি সবটাই তুমি, মা।' আবার বলতেন অন্তরঙ্গদের, 'তোদের কিছু করতে হবে না। আমি কে আর তোরা কে জানলেই হবে।' অর্থাৎ আমি ঈশ্বর, যাকে 'তৎ' বলেছে বেদে, আর তোরা আমার সন্তান, 'ত্বম্'। পিতাপুত্র একই বস্তু, একই জাতি। তাই অদ্বৈত।

এ-ও অদ্বৈত জ্ঞান। ভক্তরা এইভাবে অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করে। আর এক রাস্তা আছে জ্ঞানপথ।

সাধক প্রথমে 'তৎ'-এর সন্ধান নেয়। ঈশ্বর আছেন, এ বিশ্বাস প্রথমে হওয়া চাই। তারপর ঈশ্বরের স্বরূপের সম্বন্ধে ধারণা করা। পবিত্র শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাববান ঈশ্বর কিংবা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। কেউ কেউ বলেন, সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ। এই ধারণাটা দৃঢ় হলে তখন আপনা থেকেই প্রশ্ন উঠে, আমি কে, আমার স্বরূপ কি? তখনই 'আমি'টার খবর হয়। শেষে দেখা যায়, তুমিও যে পদার্থ , আমিও সেই পদার্থ। পদার্থ এক — দুই নয়। এই জন্য তিনি বলেছেন, 'অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর।'

প্রথমে নিজের দেবত্ব স্থাপন করে যেভাবে ঈশ্বরকে সম্ভোগ করতে চাও — কর, ক্ষতি হবে না। কিন্তু আগে একটা সম্বন্ধ পাকা

না করে গেলেই যত গোল।

সেই জন্য চিত্তশুদ্ধি ছাড়া কিছু হয় না। এই চিত্তশুদ্ধির জন্যই সাধনভজন, নিষ্কাম কর্ম, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি নানা যোগ।

For wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction. (Math. 7:13) – নরকের পথ প্রশস্ত। Because straight is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life (Math.) 7:14). And narrow is the path to life — আর জীবনের পথ সঙ্কীর্ণ। Life (জীবন) মানে, eternal life, বেদে যাকে অমৃতত্ত্ব বলেছে। বাইরে পরিষ্কার থাকলে কি হবে? হাজার চোখই বোজ, আর ভস্মই মাখ, আর অনশনই কর, কিংবা জলেই দাঁড়িয়ে থাক, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না ভিতর পরিষ্কার না হলে। অন্তর শুদ্ধ চাই। খুব হয়ত লোকমান্য, নামযশ, টাকা-কড়ি এসব হলো। ব্যস্ এই পর্যন্ত — এর বেশী নয়।

তাই ঠাকুর বলতেন, ‘মন মুখ এক কর, তাঁকে যদি চাও।’

ঘোলা জলে প্রতিবিম্ব পড়ে না। এইরূপ মন মলিন থাকলে ভগবানলাভ হয় না। ঠাকুর ছিলেন শুদ্ধস্বরূপ, একেবারে নির্মল — ‘শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্’। তাই স্বামীজীর হাতের খাওয়া পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারলেন না।

একজন ভক্ত ছিল, পঁচিশ টাকা মাইনে পেত। ঠাকুরের জন্য রাবড়ী এসব আনতো কখন কখন। ঠাকুর আমাদের বলেছিলেন, ‘দেখ, ওর ঐসব জিনিস গু’র মত মনে হচ্ছে।’ পরে জানা গেল, সে পঁচিশ টাকা মাইনে পায়, আর নাকি ত্রিশ টাকা মিথ্যা বিল লিখে আনে। তাই ঐরূপ দেখতেন । ওর দেওয়া জিনিস খেতে পারতেন না। এই যে সব কাজ (অফিসাদিতে কর্ম) করতে হয় লোকদের, এতেও চিত্তশুদ্ধ হয় যদি নিষ্কামভাবে করে, নয়ত বন্ধন।

৩

আশ্রমপ্রাঙ্গণে তিনটি সাঁওতাল বালক দাঁড়াইয়া আছে। রৌদ্র বেশ একটু প্রখর হইয়াছে। তাহাদের তিনজনকে তিনটি পয়সা দিতে বলিলেন। অনেকগুলি বালকবালিকা এইরূপ পয়সা ও খাবার লইতে প্রায়ই আসিয়া থাকে। শ্রীম ইহাদের খুব ভালবাসেন। নিয়ম করিয়া প্রতি বুধবারে তাহাদের পয়সাদি বিতরণ করা হয়।

ইতিমধ্যে মুকুন্দ আসিয়া ঠাকুরঘরের দরজায় দাঁড়াইলেন, ক্রমে মনোরঞ্জনও আসিলেন। শ্রীম ব্রহ্মচারীকে যে সকল উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহারই কিয়দংশ পুনরায় তাহাদিগকে বলিলেন।

শ্রীম — ঠাকুর বলতেন, আমাকে ধ্যান করলেই হবে। কেন বলতেন, এতদিনে একটু বুঝতে পারছি। তখন ভাবতাম কেন এ কথা বলেন? তিনি বলতেন, ‘আমাকে যে চিন্তা করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে।’ অন্তরঙ্গদের, ভক্তদের একথা বলতেন, অন্যদের নয়। অন্যদের বলতেন, মিছরীর রুটি যে ভাবেই খাও, মিষ্টি লাগবে। তাঁকে চিন্তা করলে মনের কুসংস্কারে ঘা লাগে আর সত্য পবিত্রতা লাভ হয়।

আবার কোনও সময় কোন ভক্তকে বলতেন, ‘আমি কি বলি? মা-ই বলেন সব — আমার কথা নয়।’ কোনও ভক্তকে হয়ত পদসেবা করতে দিলেন। আবার বলছেন, (নিজের শরীর দেখাইয়া) ‘এর ভিতর যদি কিছু থাকে, তবে পায়ে হাত বুলালে ভাল।’ ভক্তগুলি হেতুবাদী, তাই আবার বলতেন, ‘আমি’-টা বার করবার জন্য বহু খুঁজলুম, কিন্তু কোথাও পেলুম না। দেখছি, মা-ই সব স্থানে জুড়ে রয়েছেন। অর্থাৎ, আমার পদসেবা নয়, মায়ের সেবা। আমি আর মা এক। রামপ্রসাদও ‘আমি’-টাকে খুঁজে পেতেন না — খালি ‘মা’। আরও কত কথা বলতেন, কিছুই বুঝতাম না তখন। এখন নির্জনে বসে চিন্তা করলে কিছু কিছু বোঝা যাচ্ছে।

আবার কখন কখন regret (দুঃখ) করে বলতেন, ‘আর কা’কেই বা বলি, কেই বা শোনে।’ ওঁর কথা কি বুঝবার ক্ষমতা ছিল কারো — ‘শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।’

কি কথাই যে বলতেন সব! মহাবাক্য!

কয়লার কথা স্মরণ করিয়া নিজেই বলিয়া চলিলেন, গোড়ায় দোষ সংস্কারে। তারপর জন্ম, কর্ম, শিক্ষা কোনটাই ভাল হয় নাই। তাতেই তো ওসব মিথ্যা কথা, মিথ্যা আচরণ হয়। শুভ সংস্কার থাকলে তবে ঠাকুরকে ভাল লাগে, তাঁর কথা পালন করতে চেষ্টা করে, সৎ পথে আসে।

আমায় বলতেন, 'আচ্ছা, তোমাদের পাড়ায় এত লোক, তারা আসে না, আর তুমিই বা একা আস কেন?' তাই বলতে হয়, সংস্কার থাকলেই আসা সম্ভব। যে সব কথা বলেছেন সকলকেই তা মান্য করতে হয় — জগৎ তাক্ লেগে আছে। অমুক বড় speech (বক্তৃতা) দেয়, অমুক বড় ধনী, অমুক বড় মানুষ, কিন্তু কেউ শোনে না তাদের কথা। ঠাকুরের কথাই বা মানে কেন? সব class of men (সকল শ্রেণীর লোকই) মানে — সকলেই respect (সম্মান) করে। মুখে না বললেও instinct (সংস্কার) আছে, যা মানায় (মান্য করায়)। আহা, কি যে ছিলেন তিনি, কি ideal-ই দেখিয়ে গেছেন — জগৎ স্তম্ভিত!

ঐশ্বর্যে ঈশ্বর বশীভূত নন। একজন পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে ভোগ দিলেও তা acceptable (গ্রহণযোগ্য) নয়, আর একজনের শাকান্ন acceptable (গ্রহণীয়)। মা-ঠাকরুন একবার কালীঘাটে এক দরিদ্র ভক্তের বাড়িতে যান নেমন্তন্ন খেতে। তার সামান্য মাত্র দু'খানা খোলার ঘর। আমিও ছিলাম সঙ্গে। ডাল আর ভাত জোগাড় হয়েছে, তাই এমন খেলেন যে সকলে অবাক। খালি চাইছেন, দাও — আরও দাও। মেয়েরা ভিতর থেকে report দিলেন, মা আজ এমন খাওয়া খাচ্ছেন, জন্মেও কেউ কখনও এত খেতে দেখে নাই। এত খেলেন সেদিন!

বিদুর অত বড় রাজা দুর্যোধনের আশ্রয়ে ছিলেন, কিন্তু তোয়াক্কা নাই। রাজার অন্ন খাবেন না, ভিক্ষা করে খাবেন। কারণ তিনি সত্যপরায়ণ।

শ্রীকৃষ্ণ — অত বড় রাজা দুর্যোধন সাধাসাধি করছে খাওয়ার

জন্য — খেলেন না। কিন্তু বিদুরের ঘরে গিয়ে ওঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, বিদুর কোথায়? ভিক্ষায় গিয়েছে বলায় বিদুরের স্ত্রীর নিকট খুদকণা চেয়ে খেলেন।

অকিঞ্চন না হলে সেবা নেন না ভগবান। দেখ না, সাধুরা যে কমণ্ডলুতে শৌচ করে আবার তারই জল শিবের মাথায় দেয়, তাতেই তুষ্ট শিব। কেন না, ওরা তাঁর জন্যই সংসার ছেড়েছে। সাধু নিজের জন্য কিছু রাখে নাই, সব ভগবানে নিবেদন করেছে। ভিক্ষা করে খায়, বড় পবিত্র সে অন্ন! ভগবানকে ভালবাসলে, ঠাকুরকে ভালবাসলে আর ভাবনা নেই, সব করে দেন তিনি।

একবার মথুরবাবুর সঙ্গে বিষ্ণুঘরে গিছলেন ঠাকুরদের গয়না চুরির সময়। মথুরবাবু (ঁরাধাকান্ত বিগ্রহকে উদ্দেশ্য করে) বললেন, কি ঠাকুর, তুমি নিজের গয়না রাখতে পারলে না, আর বাঁশবেড়ের হংসেশ্বরী কেমন চোর ধরিয়ে দিলে। তৎক্ষণাৎ বজ্রস্বরে ঠাকুর উত্তর করলেন, এ তোমার কেমন কথা? তাঁর ঐশ্বর্যের অভাব, স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁর সেবা করেন? তাঁর আবার সোনার গয়না পাহারা দেওয়া? এ বড় হীনবুদ্ধির কথা! তাঁর কাছে কয়খানা মাটির ঢেলা বই তো নয় — তোমার কাছেই সোনা। ভগবান ঐশ্বর্যে বশ নন। বাইরে হাজার জাঁকজমক দেখাও, চাকচিক্য থাকুক, তাতে তিনি তুষ্ট নন। সত্য, পবিত্রতা, ভক্তিতে কেবল বশ হন। যারা তাঁকে চায়, তারা তাঁর ঐশ্বর্য পায় — যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র পায়। যে ঠাকুরকে ভজনা করে সে তাঁর ঐশ্বর্য পাবেই — 'বাপকা বেটা সিপাহিকা ঘোড়া। বহুৎ ন হো তো থোড়া থোড়া।'

শ্রীম — সত্যকে আশ্রয় করে থাকতে হয়, তবে ভগবানদর্শন হয়। 'সত্যমেব জয়তে নানৃতম্' — এ বেদের কথা। ঠাকুরের সব কথা সত্য। ঠাকুর যা বলে গেছেন তা পালন করতে হয় — অন্ততঃ চেষ্টা করতে হয়। কিছুই করলুম না, গুরু সব করে দেবেন, ঈশ্বর সব করবেন বলা — এ কেমন কথা? প্রথমে চেষ্টা করে পরে বরং বলা যেতে পারে একথা। তাই ক্রাইস্ট বলেছিলেন, And why call ye me, Lord, Lord, and do not the thing which

I say? (Luke 6:46). আমার কথা পালন না করে শুধু আমার দোহাই দিলে কি হবে?

মানুষের চরিত্র একটা ছিদ্র কলসীর মত! কলসীতে একটা ছিদ্র থাকলে আর রক্ষা নাই — জল থাকবে না, সব পড়ে যাবে ঐ ছিদ্র দিয়ে। সত্যে আঁট না থাকলে রক্ষা নাই। ঐ পথেই একেবারে অধঃপাত হয়। মিলটনের ‘প্যারাডাইজ লস্টে’ satan (শয়তান) নরক সম্বন্ধে স্বয়ং বেশ বলেছে, And in the lowest deep a lower deep — সত্যচ্যুত হলে অতল তলে পড়ে যায়।

ভগবান যা করতে বলছেন, তা পালন করব না — খালি বলা, আমার উপায় কি প্রভো? এ কোন কাজের কথা নয়।

এক বোতল মদ খেলাম, আবার মাতাল হলাম কেন, এ প্রশ্ন বাতুলতামাত্র, প্রলাপ ভিন্ন কিছু নয়। No Compromise — মানবো না। লোক সুবিধাই খোঁজে, আরাম চায় — মানবো না একথা। সত্যের পথ ধরবো, যা হবার হবে। — এমনি দৃঢ়সঙ্কল্প চাই, এমনি প্রতিজ্ঞা! Rebellious (বিদ্রোহী) হতে হবে। ঢিমে তেতালার কর্ম নয়। Brave, very brave (একদম বেপরোয়া) হতে হবে।

(সহাস্যে) ঠাকুর কলকাতায় যাচ্ছেন গাড়িতে — থার্ড ক্লাস ঘোড়া। একটু টেনেই ঘোড়া থেমে যাচ্ছে। ‘কি হলো রে’ — ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন। ‘এই ঘোড়া দম নিচ্ছে, আজ্ঞে।’ (সকলের হাস্য)। রসিকপুরুষ ছিলেন কিনা, তাই এসব কথা বলে আনন্দ করতেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার উপদেশও হয়ে যাচ্ছে। ওটা যে মরা ঘোড়া, টানতে পারছে না — প্রাণপণে যদিও চাবুক মারছে। এরূপ হলে ভগবানদর্শন হয় না।

ভিতর পরিষ্কার হওয়া চাই, তবেই তেজ বাড়ে, নচেৎ যেমন আঠার মাসে বছর। ‘ন বলহীনেন লভ্যঃ’ — বেদের কথা। ক্রাইস্ট তাই তিরস্কার করেছিলেন — Ye are like unto whited sepulchres (St. Math. 23:27). চুনকাম করা কবর — ভিতরে হাড়, নোংরা কিন্তু বাইরে চুনকাম। তেমনি মলিনচিত্ত মানুষ।

সত্যের জন্য প্রাণ পর্যন্ত পণ করতে হয়।

পোন্টিয়াস পায়লেট ছিলেন রোমান গভর্নর। যীশুকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এসব কেন করেছ? যীশু উত্তর করলেন, সত্যের জন্য। Jew-দের (ইহুদী) সকলের মতে তাঁকে ফাঁসি দিলে — crucify করলে। গভর্নরের মতভেদ ছিল। সে বুঝেছিল, ক্রাইস্ট innocent (নিরপরাধ)। কিন্তু দুর্বলচিত্ত হওয়ায় ভয় পেয়ে গেল। Jew priest-দের (ইহুদী পুরোহিত) ভয়ে গভর্নর বিবেকের বিরুদ্ধে crucifixion-এর order (ক্রুশবিদ্ধের আদেশ) দিলে।

সত্য কথা বলায় ক্রাইস্ট crucified (ক্রুশবিদ্ধ) হলেন। কিন্তু ক্রাইস্টই জগতে চিরস্মরণীয় হয়ে রইলেন। মিথ্যা কথা বলে যারা তাঁকে মারলো তাদের কথা কেউ জানে না। তাই বলে, সত্যের জয়। জীব শিব হয়ে যায় সত্য আশ্রয় করে। জীব মানে, ইন্দ্রিয়ের দাস — মানুষ, শিব — ইন্দ্রিয়াতীত, ঈশ্বর।

শ্রীম স্নান করিতে উঠিয়া গেলেন। ব্রহ্মচারী ঠাকুরপূজার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

৪

এইবার আহারের সময় উপস্থিত। শ্রীম সকলের সঙ্গে ভাণ্ডারঘরে আহার করিতে বসিলেন। শালপাতাতে ভাত আর ভাতের উপর ডাল ও এক চামচ ঘি সকলকে পরিবেশন করা হইল। শ্রীম শুধু দুধ ভাত খাইতেছেন। নানা কথা হইতেছে।

শ্রীম — (আহার করিতে করিতে সহাস্যে) শিষ্য বলছে, ‘উপনিষদং ভো ব্রূহি’ — উপনিষদ্ বলুন। ঋষি বললেন, ‘উক্তা তে উপনিষদ্’ — এই যে তোমায় বলা হলো উপনিষদ্। উপনিষদ্ বলতে একটা অদ্ভুত কিছু মনে করে লোক। উপনিষদ্ — অর্থ ভগবৎপ্রসঙ্গ, অর্থাৎ যাতে ভগবানদর্শন হয়, সংসার নাশ হয়। যেমন গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, কথামৃত — এসবও উপনিষদ্!

ঠাকুর যা বলেছেন — সব বেদ, উপনিষদ্। ঠাকুরের ভাব পূর্ববঙ্গে বেশী নিয়েছে। ওদেশে মনুষ্যত্ব আছে। ঠাকুরের ইচ্ছা ছিল একবার পদ্মা দেখার। বলতেন, ‘একবার পদ্মা দেখলে হয়।’ চৈতন্যদেব

ওদেশেরই লোক ছিলেন কিনা! ঠাকুর বলেছিলেন, 'নদের গৌরাঙ্গ, ক্রাইস্ট আর আমি এক।' তাই ওদেশের কথা মাঝে মাঝে বলতেন। পূর্ববঙ্গ চৈতন্যের দেশ, পশ্চিমবঙ্গ বাবুর দেশ।

আহারান্তে শ্রীম বারান্দায় উত্তরাস্য তক্তপোষে বসিয়া আছেন। মুকুন্দ দরজার কাছে, আর একজন ব্রহ্মচারী বালতি হাতে করিয়া জল আনিতে যাইতেছেন। শ্রীম ব্রহ্মচারীকে ডাকিয়া ফিরাইলেন। মনোরঞ্জন, সুকুমার ও ফণী রান্নাঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

শ্রীম — (সকলের প্রতি) একবার আমি ও (স্বামী) শান্তানন্দ কাশীতে ছিলাম — এক বাগানে। ওখানে পেয়ারার বাগান ছিল। খুব পেয়ারা খাওয়া যেত। আমরা অনেক দিন ধরে পেয়ারা খাচ্ছি, না বলে। শেষে শান্তানন্দ বললেন, ওদের পেয়ারা না বলে খাওয়ায় আমাদের পাপ হয়েছে, এখন করা যায় কি? আর খাওয়া হবে না। ভেবে ভেবে স্থির হলো যা খেয়েছি তার দাম হিসাব করে গরীবদের দেওয়া যাক। পরে তাই করা হলো।

সুকুমার মুখার্জী পনর ষোল বছরের বালক, স্কুলের ছাত্র। বসিয়া খাওয়ার একটি পিঁড়িতে জল দিয়া হাতে ঘর্ষণ করিয়া পরিষ্কার করিতেছে। একজন ভক্ত শিক্ষক তাহাকে সাবধান করিয়া বলিলেন, 'দেখো, যেন লোহা হাতে না বিঁধে?' একথা হইতে না হইতেই শ্রীম ব্রজকণ্ঠে গর্জন করিয়া উঠিলেন।

শ্রীম — (ভক্ত শিক্ষকের প্রতি) বিঁধলোই বা, না হয় একটু রক্ত পড়বে। কিন্তু ওদের সামনে যা দেখতে পাচ্ছি, যা কষ্ট, তা দেখে ভয় হয় এবং কাঁদতে ইচ্ছা হয়। বিয়ে করে সংসারে ঢুকলে যে কি জ্বলন্ত অনলে পড়বে! এর তুলনায়, হাতে লোহা বিঁধলে যা কষ্ট, এটি কিছুই নয়! Manliness (পুরুষালী) শিক্ষা দিবে। হাতে বিঁধে বিঁধুক, অভ্যাস হোক। ছেলেদের অল্প বয়স থেকে manliness (নির্ভীকতা) শিক্ষা দিতে হয়। আর সর্বদা ভবিষ্যতের চিত্রপটখানা সামনে এনে ধরতে হয়, তবে যদি মন বিপরীত পথে চালিত হয়। Life-এর (জীবনের) একটা aim (লক্ষ্য) ধরতে হয় প্রথমে, এদের সামনে ছেলেবেলা থেকেই। শুধু খেলুম আর কিছুই করলুম না। শেষেও

তাই কিছু করতে পারে না — ভেবাচেকা খায়।

মনের রোখ চাই। ঠাকুর একটি গল্প বলতেন — চাষারা গরু কিনতে যায়। কেনার সময় গরুর ল্যাজে হাত দেয়। শান্ত গরুটি তাতে চোখ বুজে বেশ আরামে ঘুমিয়ে পড়ে। আর তেজী গরু ল্যাজে হাত দিতে না দিতেই ছন্‌ফন্‌ করে লাফিয়ে উঠে। এটার রোখ আছে। তাই এটার দাম পঁচাত্তর টাকা। আর আরামে যে নেতিয়ে পড়ে ওটার দাম পাঁচ টাকা। মানুষেরও পঁচাত্তর টাকার গরুর মত হওয়া চাই — no compromise — আরাম চাই না।

শ্রীম কঠোপনিষদ্‌খানা লইয়া আসিতে বলিলেন। যম-নচিকেতার কথোপকথন পাঠ ও বাংলায় অন্বয় করিয়া যাইতে লাগিলেন। পাঠান্তে বলিতেছেন, দেখ, যমকে নচিকেতা বলছেন, তুমি যখন সামনে দাঁড়িয়ে আছ তখন আর আমি কি চাইব? তুমি যদি না থাকতে তবে আর কিছু চাইতাম। যম, অর্থাৎ মৃত্যু যে সব হরণ করে নিয়ে যায়! তাই এই বর দাও — আত্মজ্ঞান।

শ্রীম — (জনৈক ভক্তের প্রতি) সাধারণ মানুষ প্রেয়ের দিকেই যায়, শ্রেয় খুব কম লোক চায়। 'It's commodity my Lord' — মন চাচ্ছে প্রেয়, রোখ করে শ্রেয়ের দিকে নিতে হয়। পঁচাত্তর টাকার গরুর মত হঠ করতে হয় — না যাব না তোমার সঙ্গে। সংসারী লোক প্রেয়তেই সহজে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। প্রেয় মানে, The pleasurable (ক্ষণিক, ইন্দ্রিয়সুখকর); শ্রেয় — the everlasting (নিত্য, চিরস্থায়ী)।

ঠাকুর ও মা দু'জনেই বলতেন, 'উঃ, কি ভীষণ অগ্নিকুণ্ড সংসার — কি নরকযন্ত্রণা! কি করে বলি ওদের (ছোকরা ভক্তদের) ওখানে ঢুকতে। বরং না খেতে পেয়ে মরুক, কি ভিক্ষা করে খাক্‌, তবু বলতে পারি না, বিয়ে কর্‌।'

পাকা খেলোয়াড় না হলে এর ভেতর থেকে বের হতে পারে না। শিক্ষা চাই। কিন্তু কোথায় শিক্ষা, সে সব কিছুই নাই। (সুকুমার, ফণী প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া) — বিয়ে করা যে কী ভীষণ, কি যে কষ্ট! ভক্তদের একজনের (স্বামীজীর) বিয়ের কথা শুনে, ঠাকুর

কেঁদে কেঁদে একেবারে মায়ের (মা কালীর) পা জড়িয়ে ধরে বসলেন আর বলতে লাগলেন, ‘মা, ওকে রাখ, ওকে বাঁচাও। এ আগুনে পুড়তে দিয়ো না।’ ঠাকুর এসব হাতেনাতে শেখাতেন।

একবার গড়ের মাঠে সার্কাস্ এলো। ঠাকুরও গেলেন, আমরাও গেলাম। আট আনার টিকিট। শীতকাল। গ্যালারীতে বসে ঠাকুর বললেন, ‘বেশ তো দেখা যাচ্ছে — হাঁ খুব ভাল দেখা যাচ্ছে।’ আনন্দ আর ধরে না, যেন বালক! একটা ঘোড়া ring-এ ঘুরছে বেদম। একটি মেম রিং-এর ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝে যাচ্ছে আর ফস্ করে এক পায়ে এই চলন্ত ঘোড়ার উপর দাঁড়িয়ে চড়ছে। বাইরে এসে গাড়িতে উঠবার সময় ঠাকুর বললেন, ‘দেখ, ঘোড়ার উপর চড়বে, তা কত করে অভ্যাস করে তবে দাঁড়াতে পারছে। তেমনি সংসারচক্র ঘুরছে। পাকা খেলোয়াড় হলে চড়তে পারে। নইলে ঘোড়া থেকে পড়ে !সব শেষ হবে। সংসার এমন ভীষণ।’

গুরুকৃপা ব্যতীত শ্রেয়ের পথে যেতে পারে না। স্বামীজী প্রভৃতি ভক্তদের এবারে ঠাকুর রক্ষা করেছেন। এ উল্টো পথে চলা — সম্পূর্ণ বিপরীত পথ। কার সাধ্য চলে গুরুকৃপা ছাড়া।

কত তরঙ্গ সংসারে। একটা যায় তো আর একটা আসে। ব্রহ্মপুত্র, পদ্মার আর কি তরঙ্গ! সাগরের তরঙ্গকেও যে হার মানায়, তা থেকেও ভীষণ! তরঙ্গের পর তরঙ্গ। প্রথমে বিয়ে করতে চায় বটে, মন প্রেয়ের দিকে যায়। কিন্তু একটু পরেই বুঝতে পারে, জীবনটা কি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমার বয়স তখন বার বৎসর — নদী পার হচ্ছিলাম নৌকায়। ভারি তরঙ্গ। অনেক জল নৌকোতে উঠেছে। কিন্তু একটি ব্রাহ্মণ বেশ বসে স্থির হয়ে তামাক খাচ্ছে, আর আমাকে বলছে, ‘বসো, আর দু’টো’। আমি ভাবলাম, বাবা, একটাতেই এই, আরও দুটো হলে না জানি কি হবে। ও কিন্তু বসে বসে তামাক খাচ্ছে। অমন কত ঢেউ সংসারে লাগবে। এত বড় শক্ত পথ বলেই ঠাকুর বলতেন ভক্তদের, ‘এখানে এলে গেলেই হবে। আর কিছু করতে হবে না।’

৫

মধ্যাহ্ন আহারের পর এখন বেলা প্রায় একটা। শ্রীম মনোরঞ্জনের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম — মনোরঞ্জনবাবু, কাল আপনি ক'টার গাড়ীতে যাবেন?

মনোরঞ্জন — আজ্ঞে, বিকেলের গাড়িতে।

শ্রীম — (হঠাৎ) আচ্ছা, শু-বাবুর বাসাখরচ মাসে পাঁচ শ' টাকা হবে।

একটি ভক্ত — পনের শ' প্রায়।

শ্রীম — ও বাবা! এত টাকা খরচ করতে পারেন আর সাধুসঙ্গের জন্য একখানা গাড়ী কি তিনি করতে পারেন না? বলবেন করতে, আমরাও চড়বো।

ভক্ত — তা তো পারেন, কিন্তু করেন না ঘোড়ার প্রাণান্ত হবে বলে। গাড়ী হলে বাড়ির লোক আর মাটি ছোঁবে না, এখনই প্রায় ছোঁয় না।

শ্রীম — ও, তা হলে হয় না — সব বাবু। আচ্ছা, অধর সেনের মত রোজ আড়াই টাকা খরচ করে সাধুসঙ্গ করতে পারেন না? অত টাকা খরচ হচ্ছে, আর নিজের জন্য মাসে ষাট সত্তর টাকা খরচ করতে পারেন না? আপনারা বলে তা করান না কেন? আচ্ছা, কত ভাড়া নেবে বেলেঘাটা থেকে বড়বাজার আসাযাওয়ায়, কি শুধু আসার? আচ্ছা, রিক্সা — তাও করতে পারেন। ওঁর অত সব চাকরবাকর, কুলীমজুর, একজন বড়বাজার পোঁছে দিয়ে গেল, আবার নিয়ে গেল — বেশ হয় এতে।

ভক্ত — ওঁর মত হবে কি, মানুষের কষ্ট হবে বলে?

শ্রীম — বিদ্যেসাগরমশায় বেশ করতেন। ঘোড়ার গাড়িতে কখনও চড়তেন না, কিন্তু পালকিতে চড়তেন। তিনি বলতেন, মানুষের কষ্ট হলে বলতে পারে, কিন্তু পশুরা তা পারে না — dumb (মূক)।

প্রত্যহ মঠে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। নিত্য সাধুসঙ্গ ছাড়া উপায় নাই। ঠাকুর ভক্তদের এই কথা সর্বদা বলতেন। সাধুসঙ্গ করলে সব ভাল হয়। তখন সব যন্ত্রণা দূর হয়। Right (ভাল)

ঘড়ির সঙ্গে wrong (খারাপ) ঘড়ি মিলান যায়। ওটিতে সব হয়। ভোগ ত্যাগ, সুখ দুঃখ, স্বেচ্ছা ঈশ্বরেচ্ছা, পুরুষকার কৃপা, যোগ যোগী, প্রভৃতি spiritual world (আধ্যাত্মিক জগৎ)-এর সবগুলি problems solved (সমস্যার সমাধান) হয়ে যায়। কোন্‌টা শ্রেয় কোন্‌টা প্রেয় তা জানা যায় — কে আপন, কে পর, কে বন্ধু, কে শত্রু — এসব বোঝা যায়।

তা না হলে মাকড়সার মত মরতে হবে। (জনৈকের প্রতি) দেখেন নাই, শুকনো মাকড়সা দেওয়ালে বা চালে? ও অনেক বাচ্চার মা হয়েছে। এদের আহার জোগাতে পারে না। কোত্থেকে আনে অত! শেষে বলে, খা আমার শরীর। ওরা খেয়ে খোলসমাত্র বাকি রাখে। এই রকম হবে। আত্মার কল্যাণের জন্য, নিজ সুখের জন্য, ওঁর অন্ততঃ মাসে ষাট সত্তর টাকা খরচ করা উচিত। নিত্য সাধুসঙ্গ আর গঙ্গাস্নান করা উচিত।

সুশিক্ষা পেয়ে, গুরুকৃপায় মোড় ফিরলে, পাকা খেলোয়াড় হতে পারলে, তখন সংসার করা যায়। অর্থও উপার্জন করা যায়, যদি বিদ্যার সংসারের জন্য হয়। আরও হয় দেবসেবা, সাধুসেবা, ভক্তসেবা, দরিদ্রনারায়ণসেবা — এ সব করলে। এই কথা ঠাকুর একদিন বলেছিলেন একজন ভক্তকে।

(উত্তেজিত ভাবে) ছেলেবাবুরা, জামাইবাবু — এরা রিক্সা, গাড়ি সব চড়তে পারে সর্বদা, আর তিনি পারেন না? এ কেমন কথা! তা-ও আত্মার কল্যাণের জন্য। (সহাস্যে) একটু কার্পণ্যদোষ আছে — ব্যবসায়ী লোক কিনা! এমন সুবিধা কি আর হয়? কলকাতার লোকদের এখন বড্ড chance — ঠাকুর ছাড়া গতি কি?

স্বামীজী যখন রোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন তখন বলেছিলেন, আমি কি রোগ বা মৃত্যুকে ডরাই? আমি যে ঠাকুরের পা ছুঁয়েছি। আমার কি ভয়?

ঠাকুরের ভিতর জগজ্জননী বিরাজমান। ঠাকুর আর জগতের মা — এক। আর ব্রহ্ম শক্তি অভেদ।

রোখ চাই। যারা শ্রেয় চায় তারা সংসারের দুঃখকষ্ট, ভোগবিলাস, আহারবিহার, এসব গ্রাহ্য করে না। চায় শুধু ভগবানকে। মানুষজীবনের

উদ্দেশ্যও কেবল তাই। স্বামীজী তিনদিনের উপবাসে ম্রিয়মাণ, মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। বৃষ্টির জলে জ্ঞান ফিরে এলে আবার চলতে লাগলেন। কিন্তু কি বীর, কিছুই গ্রাহ্য নাই — কেবল শ্রেয়!

সাধুসঙ্গে নবজন্ম লাভ হয়, নচেৎ spiritual world-এর (ধর্মজগতের) কিছুই বোঝা যায় না। তাই ঠাকুর এত করে বলতেন, সাধুসঙ্গ কর, সাধুসঙ্গ কর। ক্রাইস্টও তাই বলেছিলেন, Except a man be born again he can not see the Kingdom of God (St. John 3:3) — নবজন্ম বিনা ধর্মজগতে প্রবেশাধিকার নাই। কেশব সেন একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন এই বিষয়ে। দু'তিন হাজার লোক হয়েছিল, কিন্তু শুধু ইংরেজি শুনতে, ভাব নিতে নয়।

আর প্রত্যহ গীতা, ভাগবত, উপনিষদ্, কথামৃত প্রভৃতি সময় করে আধ ঘন্টা পড়ার অভ্যাস ভাল। এখানেও সকালে উপনিষদ্, মধ্যাহ্নে গীতা, বিকালে ভাগবত, আর সন্ধ্যার পর কথামৃত হচ্ছে।

এখন বিকাল সাড়ে তিনটা-চারটা। জম্বুতলে কম্বল পাতা হইয়াছে। মুকুন্দ, ফণী, সুকুমার ও মনোরঞ্জন আর জগবন্ধু বসিয়া আছেন। শ্রীম চেয়ারে উত্তরাস্য বেদীর নিচে বসা। মুকুন্দ ভাগবত পাঠ করিতেছেন — দশম স্কন্ধ, নবম ও দশম অধ্যায়।

শ্রীম — (পাঠের মধ্যে) দেখ, নারদ বলছেন, দরিদ্রের ভগবানলাভ বরং সহজ। কিন্তু, ধনীর — ঐশ্বর্যশালী লোকদের বড় কঠিন। দরিদ্রের শুধু ভোগবাঞ্ছা আছে, কিন্তু ধনীর ভোগও আছে, ভোগের বাঞ্ছাও আছে। ভোগ ছাড়া কম কথা নয় — বড় শক্ত!

তাই ক্রাইস্ট বলেছিলেন, 'It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the Kingdom of God (St. Mark 10:25). ছুঁচের ভিতর দিয়ে উটের যাওয়া বরং সম্ভব, কিন্তু ধনাসক্তের ঈশ্বরলাভ সম্ভব নহে। যীশুর নিকট একজন বললেন, উপায় কি প্রভো? তিনি উত্তর করলেন, Go and sell that thou hast and give to the poor and follow me. (St. Math, 19:21) — তোমার সব গরীবদের বিলিয়ে দাও, আর তুমি আমাকে অনুসরণ কর।

ভক্তটি মাথায় হাত দিয়ে বসে রইল, for he had great possessions (কারণ সে প্রভূত ধনের অধিকারী ছিল), পারলে না। এই দেখুন না, শু-বাবু ঐশ্বর্য আছে বলে কত কষ্ট পাচ্ছেন মনে। বাড়িতে যন্ত্রণা — আবার কোথাও যেতে পারছেন না। আর একজন এসেছিলেন যীশুর কাছে। তিনি দশ কোটি টাকার সম্পত্তি দিয়ে একটি বহুমূল্য হীরক খরিদ করলেন — 'one pearl of great price' — অর্থাৎ সব ছেড়ে ভগবানকে অন্তরে দর্শন করেছিলেন। তাই গরীবদের বড় সুবিধে।

অধর সেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, তিনশ' টাকা মাইনে পায়। মাসে এক হাজার টাকার চাকরীর জন্য চেষ্টা করায় ঠাকুর বলেছিলেন, তুমি ডেপুটি, কম? ওদেশে (কামারপুকুরে) ঈশান ঘোষাল ডেপুটি তাজ মাথায় দিয়ে যেত — মস্ত বড় লোক। অধর সেনকে তিরস্কার করেছিলেন, একে ত একজনের দাস হয়েছ, আবার যাবে কার দাস হতে?

(সহাস্যে) একটি গল্প বলেছিলেন ঠাকুর। একটি মৌলবী গেছেন এক বাড়িতে। সেখানে পেচ্ছাব পেল, চলে আসছেন। তখন ঐ বাড়ির একজন স্ত্রীলোক বললে, এখানেই হোক্ না — কেন যাচ্ছেন আবার, এখানেও বদনা আছে। মৌলবী বললে — না, যে বদনার কাছে লজ্জা ছেড়েছি একবার, সেখানেই যাব। স্ত্রীলোকটি নষ্টা ছিল, বুঝলে। তাই লজ্জা একস্থানে ছাড়াই ভাল।

আধ ঘন্টা পাঠ হইয়া গেল। শ্রীম এবার বন্ধ করিতে বলিলেন। আরও বলিলেন, বেশী পড়া ভাল না এইসব। আধ ঘন্টা যথেষ্ট। তারপর আলোচনা আর চিন্তা।

৬

সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় শ্রীম ঠাকুরঘরে ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। এখন ধ্যান করিতেছেন। আটটা বাজিলে কথামৃত-পাঠ আরম্ভ হইল। স্বামীজীর কথা পাঠ হইতেছে। শ্রীম-র ইচ্ছায় কয়েক দিন ধরিয়া বাছিয়া বাছিয়া স্বামীজীর কথা পাঠ হইতেছে। সুখ দুঃখের কথা উঠিল।

শ্রীম (পাঠান্তে) — ভগবানকে ডাকলেই যে সব সময় সুখ হবে তা নয়। সুখ-দুঃখের সঙ্গে এর কিছু সম্বন্ধ নেই। এ লীলা বোঝা বড় কঠিন, প্রায় বোঝা যায় না।

ভীষ্মদেব শরশয্যায়। পাণ্ডবেরা গেছেন দেখতে। তিনি কাঁদছেন। শ্রীকৃষ্ণও সেখানে রয়েছেন। কান্না দেখে অর্জুন কৃষ্ণকে বললেন, পিতামহও কাঁদছেন মৃত্যুভয়ে। তিনি মহাজ্ঞানী ছিলেন কিনা! আবার সত্যবাদী আর জিতেন্দ্রিয়, বিয়ে করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ ইঙ্গিত করলেন ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞেস করতে। তিনি বললেন, ভাই, মৃত্যুভয়ে কাঁদছি না। এই দেখে কাঁদছি — তোমাদের সঙ্গে স্বয়ং ভগবান সর্বদা, কিন্তু তোমাদের দুঃখের শেষ নাই। এই ভেবে কাঁদছি — তাঁর লীলা কিছুই বুঝতে পারলাম না!

ঠাকুর থাকতেও নরেন্দ্রের দুঃখ গেল না। দুঃখকষ্ট শরীর ধারণ করলে থাকবেই। তবে ঈশ্বরে মন থাকলে অতটা বোধ হয় না। কাবু করতে পারে না ঈশ্বরবিমুখীদের মত। স্বামীজী কত কষ্টের ভিতর দিয়ে গিয়ে তো অত বড় মহাপুরুষ হলেন। তাই স্বামীজী বলতেন, ‘যারা দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়ে যায় নাই তারা আবার মানুষ! ধনী হোক্, বিদ্বান হোক্, কি নব্বুই বছরের বৃদ্ধই হোক — তারা babies, little babies (শিশু, দুগ্ধপোষ্য শিশু)!’ তাঁর জীবনটা আগাগোড়া দুঃখে কষ্টে গেছে। তপস্যায় গেলেন, আলমোড়ায় আসন লাগিয়েছেন, অমনি সংবাদ গেল, তোমার ভগ্নী শরীর ত্যাগ করেছে। ভগ্নীটিকে ভালবাসতেন। একবার ঋষিকেশে অসুখে প্রাণ যায় যায় হয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ নাই — কেমন বীর!

বেদে আছে, ‘নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ’। মনের জোর চাই। ঘটনাচক্রে মন দুর্বল হয়ে পড়লে তখন আদর্শের কথা, অর্থাৎ ঠাকুরের মহাবাক্য স্মরণ করতে হয়। তিনি কি কি বলেছেন ঐ বিষয়ে। দুঃখকষ্ট থাকবেই শরীর ধারণ করলে। স্বামীজী দারিদ্র্যের ভিতর দিয়ে গিয়েছেন বলে চিরকাল দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি ছিল। তাই তো সেবাশ্রম ও দরিদ্রনারায়ণসেবা!

জীবনে এক লক্ষ্য থাকলে সর্বদাই যোগে থাকে মানুষ। নয় তো

দুপুরে পাশের বাড়িতে গিয়ে তাস খেলছে। যার লক্ষ্য ঠিক আছে, তার সময় থাকে না সারা দিনরাত্রি ধরে।

দুঃখকষ্টের সময় স্বামীজীকে স্মরণ করতে হয়। বীরের ন্যায় দাঁড়াতে হয় বিপদে। আসে আসুক বিপদ — এ আমার কিছুই করতে পারবে না, এই বলে। মন দুর্বল হয়ে পড়লে মার নিকট প্রার্থনা করতে হয়। বীর হওয়া চাই। নচেৎ বাইরের দুঃখকষ্ট আর ভিতরের কামক্রোধাদির গতিরোধ হবে কি করে? অন্তরে বাহিরে শত্রু।

শ্রীম (সুকুমারের প্রতি) — তুমি গায়ত্রী জপ কর ক'বার?

সুকুমার — আজ্ঞে, কখনও একশ' আটবার করি। কিন্তু বেশীর ভাগই হয় দ্বাদশ বার।

শ্রীম — ঠাকুর বলেছিলেন তিনবার করলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। গায়ত্রীর অর্থ খুব সহজ। জগৎ ব্যেপে তিনি আছেন! সূর্যের তেজও তিনি, মনের শক্তিও তিনি। এঞ্জিনের যেমন চালক, তেমনি মনের চালক তিনি। দেখ, ব্রাহ্মণের কত সুবিধে, গায়ত্রী জপ করতে পারে। এ যার তার কাছে বলতে নেই।

ঠাকুর আবার বলতেন, ভক্তদের কোনও জাত নাই। তারা সব এক জাত। সব শুদ্ধ, যেখানে জন্ম হোক না কেন, সব শুদ্ধ।

শ্রীম — তোমাদের বাড়িতে দোল দুর্গোৎসব হয়?

সুকুমার — আজ্ঞে হয়, কাকা দেখেন।

শ্রীম — তোমার বাপ নাই?

সুকুমার — আজ্ঞে না, মা-ও নাই।

শ্রীম — বেশ, তোমায় ভগবান দেখবেন। বাপ-মা'র উপর ভার দেন ঈশ্বর, দেখবার জন্য। বাপ-মা না থাকলে নিজেই ভার নেন, কিংবা অন্য কারও উপর ভার দেন।

দেখ, স্বামীজী কেমন বীর। আর, বিয়ে করায় বড় কষ্ট। মা-ঠাকরুন বলতেন — বাবা, বিয়ে করলে রাত্রিতে শান্তিতে ঘুমুতে পারবে না।

৫ই চৈত্র, ১৩২৯ সাল।
১৯শে মার্চ, ১৯২৩ খ্রীঃ, সোমবার।

অষ্টম অধ্যায়

যথার্থ বীর কে? — প্রেয়কে তুচ্ছ করেছে যে

মিহিজাম কুটীর। ঠাকুরঘরে শ্রীম বসিয়া আছেন মেঝেতে কম্বলের উপর। ডাক আসিয়াছে। এখন সকাল সাড়ে আটটা। একজন ব্রহ্মচারীকে একখানা পত্র পড়িতে বলিলেন। পত্রখানি কলিকাতার কোনও ভক্ত লিখিয়াছেন।

ব্রহ্মচারী পড়িতেছেন, '... তোমরা কত আনন্দেই আছ, fountain of peace পেলে, আর কি চাও? এই ঝরণার দুই এক ফোঁটা শান্তিবারি প্রাণের ভিতর পড়লো, এই রকম আজ অনুভব করছি। I am always thinking of the Satsang of Mihijam. But Lord has consoled me by partly fulfilling my earnest prayer. (মিহিজামের সৎসঙ্গের কথাই সর্বদা আমি ভাবছি। কিন্তু ভগবান আমার ব্যাকুল প্রার্থনার কথঞ্চিৎ পূর্ণ করে এখানে রেখেই কিছু সান্ত্বনা দিয়েছেন)। শ্রীশ্রীম-র শ্রীচরণে আমার কথাগুলি পড়ে শুনাবে। তাঁর কৃপা যে কত অসীম সকলের উপর, তা কিছুই বুঝলাম না। কৃপার মধ্য দিয়েই উহা realise করতে হবে।

আজ বেলা সাড়ে ন'টার সময় কলকাতার আকাশ কিছু মেঘাচ্ছন্ন ছিল। বেঞ্চে বসে ছিলাম। হঠাৎ মন যেন thoughtless (শান্ত) হয়ে গেল, বাহ্যিক anxieties (উদ্বেগ) বড় ছিল না। And I felt coolness in my heart. Such a thing very scarcely happened — (আর চিত্তে আমি গভীর শান্তি অনুভব করলাম। আমার জীবনে এ ঘটনা অতি দুর্লভ।) ... যা যা বলেন সব নোট করবে। নোট না করলে পরে অনেক ভুল হয়ে যাবে। আমাদের জন্য তো কিছু আনতে হবে!'

শ্রীম — ধন্য শু-বাবু, ধন্য! দেখ, মনটা পড়ে রয়েছে এখানে। ঠাকুর দুই বন্ধুর গল্পে বলতেন — মনই সব।

প্রাতর্ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীম কুটীরপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছেন, নিকটেই মুকুন্দ ও জগবন্ধু।

শ্রীম — (চোরাই কয়লাদৃষ্টে রহস্যচ্ছলে) ছ' আনার জন্য কেন hell (নরক) হতো। হতো এক কোটি টাকা, না হয় বরং যাওয়া যেতো — ভিক্টর হুগোর 'লা মিজারাব্‌ল'-এর (জিন ভালজিনের) মত। দস্যু ছিল, শেষে ভাল হলো। ছদ্মবেশ ধরে অনেক টাকা উপায় করলে। অনেক উপকার করলো ঐ টাকাতে। আর অনেক লোকহিতকর কাজে লাগান হলো। বৃদ্ধবয়সে তার পূর্বকৃত পাপের জন্য অপর একজন নিরপরাধ লোক ধৃত হয়, আর তার ফাঁসির হুকুম হয়। জিন ভালজিন একবার ভাবছে, আমি গিয়ে ধরা দিই, আর সত্য কথা সব বলি। আবার ভাবছে, আমি থাকলে তো অনেক লোকের উপকার হবে, অতএব সত্য গোপনে দোষ হবে না। শেষে রাত্রে আর মন মানছে না, সকালে গিয়ে ধরা দিল।

(উদ্বেগের সহিত) ঠাকুরের নিকট মঘা নক্ষত্রে একজন ক্যাম্প খাট নিয়ে গিছলো। ঠাকুর ফিরিয়ে দিলেন কলকাতায় এই বলে, 'ও বাবা, এ যে আমায় খেতে আসছে দেখছি।'

আজ অপরাহ্নে শীঘ্র শীঘ্র ভাগবত পাঠ শেষ হইল — 'শ্রীকৃষ্ণ-উদ্ধব সংবাদ'। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে সব ছাড়িয়া হরিভজনে যাইতে বলিতেছেন।

মনোরঞ্জন আজ কলিকাতায় যাইতেছেন। শ্রীম তাঁহাকে আশ্রমের জিনিসপত্র লইয়া যাইতে বলিলেন।

শ্রীম — (মনোরঞ্জনের প্রতি) ওসব জিনিসপত্র সঙ্গে থাকলে আমার বড় চিন্তা হয়। যত কম হয় ভাল। আমার ইচ্ছা, মাটির হাঁড়ি ও পাতা দিয়েই সব শেষ করা। ত্যাগ কি কম কথা — কত শক্ত!

তাইতো ঠাকুর কাউকে গেরুয়া দিতেন না, ভারি শক্ত!

সুখ দুঃখ, দু'টো ছাড়লে তবে ত্যাগ হয়। সংসারের দুঃখ কষ্ট দেখে ছাড়লে ত্যাগ হলো না। সুখ দুঃখের পার হওয়া চাই —

তারই নাম ত্যাগ। দুঃখময় সংসার না বলে, সুখ-দুঃখময় সংসার বললেই more logical and more consistent (অধিক যুক্তিসহ ও ন্যায়সঙ্গত) হয়। এই সুখ-দুঃখের পার হতে বুদ্ধদেব রাজপুত্র হয়েও সংসার ছাড়লেন।

সুখ — নাম, যশ, অর্থ, মেয়েমানুষ, এই সব। দুঃখ — জরা, মৃত্যু, রোগশোক, এই সব। এই দুইয়ের পার গেলে, তবে ঈশ্বরলাভ হবে — 'নেতি নেতি' করে। খুব শক্ত! কর্মফল ত্যাগ না হলে ত্যাগই হলো না। সুখ-দুঃখ কর্মফল।

বুদ্ধদেবের মতকে ওরা, Western-রা (পাশ্চাত্যরা) pessimistic philosophy (দুঃখবাদ) বলে। সব হিন্দুমতকেই প্রায় একরকম ঐ কথাই বলে। আর ওরা ও খবর পেলে তো বলবে, এ কি! মোটেই ওদিকে যায় নাই, তা বলে কি করে? Optimistic (সুখবাদ) কাকে বলে, ওরা জানে না— কিছুই। ওদের philosophy (দর্শনশাস্ত্র) ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের কাছে ক, খ। Optimistic (সুখবাদী) হয়ে ওরা কি করছে? টাকা, নাম, যশ, মান, মেয়েমানুষ, ইন্দ্রিয়সুখ, এইগুলি নিয়ে কি হবে? পার্থিব যে কিছু থাকবে না। রামরাজ্য গেল, দ্বারকা গেল, Rome (রোম) গেল।

সবই তো ছিল, আবার গেল।

ঠাকুর বলতেন, আর একটা পথ আছে। ওতে বিচার করতে হয় না। শুধু নামকীর্তন, প্রার্থনা, কাঁদাকাটা করলেই ভগবানদর্শন হয়। তারপর আপনা আপনি সব খসে পড়ে যায় — ত্যাগ হয়ে যায়। জোর করে ত্যাগ করা বড় কঠিন — বিচার করে করা বড় শক্ত। তিনি বলতেন, 'ওপথ তো বেশ কলির জন্য, ভয় নাই, অত।' এপথে ভগবানে সব ভার অর্পণ করে তাঁকে ডাকলে তিনি সব সুবিধে করে দেন। এটা constructive path (সুগম) আর ওটা destructive path (দুর্গম)।

যারা pleasurable sensation-এ yield (ইন্দ্রিয়সুখের বশ্যতা স্বীকার) করে না, feminine attraction-এ charmed (নারীর কুহকে বিমোহিত) হয় না, তারাই যথার্থ ত্যাগী।

ওদেরই দাম পঁচাত্তর টাকা। আর যারা আরামপ্রিয় গরুর ন্যায় ল্যাজ টিপলেই শুয়ে পড়ে ইন্দ্রিয়সুখে, আরামে যারা নুইয়ে পড়ে, ওদের দাম পাঁচ টাকা।

আর, এসব সম্যক্ বোঝা যায় না নির্জনে বাস না করলে। পাঁচজনের সঙ্গে থেকে ও হয় না। ঠাকুর বলতেন, গাছ দেখে আমার তপোবন আর ঋষিদের উদ্দীপন হতো। এই সব স্থানে ঋষিরা থাকতেন। আর দেখতেন — অনন্ত আকাশ, প্রাতঃসূর্য, এই সব।

কিন্তু এখানে যারা আছে — কৃষকরা, এরা খালি খাওয়াদাওয়া আর সন্তান উৎপাদন নিয়ে আছে। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য, আর অতুল ঐশ্বর্য, শুধু ঋষিরা দেখতেন। উপনিষদের অন্য নাম আরণ্যক — এমন সব স্থানেই এর উৎপত্তি। অরণ্যে হয়েছিল বলেই আরণ্যক।

সন্ন্যাস আর কি? পাঁচজনের সঙ্গ থেকে আলাদা থাকার নামই সন্ন্যাস।

শ্রীম যেন এখন ঋষিভাবে ভরপুর।

শ্রীম একটি ভক্তকে বলিলেন, শু-বাবু বেশ একটি আড্ডা করেছেন শিমুলতলায়। মাঝে মাঝে ওখানে গিয়ে দিনকতক থাকলে তো বেশ হয়। মনোরঞ্জনকে বলিলেন, আমাদের suggestion, মাঝে মাঝে দিনকয়েক গিয়ে ওখানে থাকতে। এই পুলিনবাবু থাকছেন না! ওঁর নাম করে বলবেন। ইনি তিন চারদিন থেকে আবার কলকাতায় চলে যান। ইনিও তো অত কাজের লোক। বলবেন, একা যেতে, সঙ্গে কেউ নয়। নির্জনে ভগবানের উদ্দীপন হয়। Family (পরিবারবর্গ) নিয়ে একবার যেতে হয়, তারপর একা একা।

জনৈক ভক্ত — আজ্ঞে, একবার নবদ্বীপে আমি গিছলাম, সঙ্গে অনেক লোক ছিল। তাদের হেপাজত করতে করতে ঈশ্বরচিন্তার সময় হতো না।

শ্রীম — দু'বার যেতে হয়, একবার সবাইকে নিয়ে, আর একবার একা একা। সবাইকে নিয়ে গেলে ছেলেকে চরণামৃত খাওয়ান আর রান্নাবান্নাতেই সব সময় কেটে যায়।

সাঁওতালদের কয়েকজন বালকবালিকা আসিল। তাহাদের

কমলালেবু দেওয়া হইতেছে। মাত্র উনিশটি কোষ আছে। শ্রীম-র আদেশমত বড় তিনটি ছেলেকে তিনটি কোষ ও ছোট দুইটি ছেলেকে দুইটি করিয়া চারিটি কোষ আর তিনটি মেয়েকে চারিটি করিয়া বারটি কোষ দেওয়া হইল। ছেলেমেয়েদের পয়সাও দেওয়া হইল। ইহারা আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে গান গাহিতে লাগিল।

শ্রীম জনৈক ভক্তকে বলিলেন, মেয়েদের বেশী করে দিন। ওরা মায়ের জাত। ওদের আগে দিতে হয়, আর বেশী। একটি শ্যামবর্ণ মেয়ে দেখে ঠাকুরের জগজ্জননীর উদ্দীপন হয়েছিল। ঐ মেয়েটি রাজমিস্ত্রীদের কাজে যোগান দিত।

ত্যাগের পথে বিঘ্ন, স্নেহ। স্নেহতেই সংসার চলছে। সংসারই স্নেহ। এইটি ঈশ্বরের চাতুরী। এ দিয়ে তিনি জগৎকে বেঁধে রেখেছেন।

ছেলেরা বড় হলে বাপের তেমন ভাবনা থাকে না। কিন্তু অন্ধ আতুর হলে স্বভাবতই তারা বেশী স্নেহ পায়। পশুপক্ষীদেরও ঐ রকম। কিন্তু যারা প্রকৃত ত্যাগী, তারা মোটেই ধরা দেয় না এতে। তারা স্নেহ সমূলে বলি দিয়েছে। এ হলো আলাদা থাক্। এরা খুব শক্তিশালী। পাঁচত্তর টাকার গরুর মত এরাই। পাঁচ টাকার গুলো পিছু পড়ে যায়।

যোগারূঢ় যারা, তারা সুখদুঃখের পার। কেউ দুধ শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ খেয়েছে। এঁরা দুধ খেয়েছেন — যেমন ঠাকুর প্রভৃতি।

যীশু এক স্থানে গিয়েছেন। অনেক ভক্ত একত্র হয়েছে। একজন বললে, প্রভো, আপনার মা-ভাইরা সব এসেছেন। তিনি ভাবে ছিলেন, বললেন, কে আমার মা, কে ভাই? এই তোমরাই আমার মা, ভাই, বাপ, বন্ধু সব। ভক্তরা এমন সুহৃদ! বিষ্ণুপ্রিয়াকে ঘরে দিলে চৈতন্যদেব খাটের পায়া ধরে কাঁদতে লাগলেন, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে। রাজা প্রতাপরুদ্র দর্শন করতে চাইলে আপত্তি করলেন। ধমক দিয়ে ভক্তদের বললেন, বেশী বল তো এখনই আলালনাথে চলে যাব। পরে সার্বভৌম ও রায় রামানন্দ প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করে রাজা দীনহীন বেশ ধারণ করলেন। হাতে ঝাড়ু, রথাগ্রে রাস্তা পরিষ্কার করছেন, ভগবান যাবেন

বলে। আর চন্দনজল ছড়াচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে গোপীগীতাও আবৃত্তি করছেন।

'তব কথামৃতং তপ্তজীবনং, কবিভিরীড়িতম্ কল্মষাপহং।
শ্রবণমঙ্গলম্ শ্রীমদাততং, ভূবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।।'

— তোমার কথামৃত তৃষিতজনের নিকট সুশীতল জলস্বরূপ, ঋষিগণ ইহার সেবা করিয়া থাকেন। ইহা সর্বপাপনাশক সম্পদ ও ঐশ্বর্যযুক্ত এবং শ্রবণমাত্রই কল্যাণ বিধান করে। কেবল উদার ব্যক্তিগণই ইহার কীর্তন করিতে সমর্থ। তখন এসে চৈতন্যদেব ভাবে রাজাকে আলিঙ্গন করলেন।

ত্যাগ, স্নেহত্যাগ, সংসারত্যাগ এঁদের হয়েছিল — বুদ্ধ, ক্রাইস্ট, চৈতন্যদেব, ঠাকুর এঁদের। গঙ্গাদাস পণ্ডিত এসে কত রকম করে বোঝালেন সংসারে থাকতে। চৈতন্যদেব হাত জোড় করে উত্তর করলেন, প্রভো, আমি থাকতে পারছি না। ইচ্ছা হয় থাকি, কিন্তু হয়ে উঠছে না। সব আপনা থেকে ছেড়ে গেল। অধ্যাপনা অতি পবিত্র উচ্চ কাজ, এ কথা বলেও বোঝালেন, কিন্তু তবুও পারলেন না থাকতে সংসারে।

শ্রীম — (ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া) এখানকার মত অন্য লোকেও ঋষি, অবতার — এসব আছে হয়ত, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যখন। তাঁরা আমাদের মত মানুষ নাও হতে পারেন। ওঁদের ভাগবত সব আছে হয়ত, কিন্তু আমরা সব দেখতে পাচ্ছি না।

(ব্যগ্রভাবে) না না, এ সব intellectual (বুদ্ধির) বিচার ভাল নয়। সব তিনি জানেন। ভক্তদের বিচার করা দেখে ঠাকুর মার কাছে plead (সুপারিশ) করতেন — 'মা, এক একবার বিচার না করে ওরা কি করবে?' এই কথা বলতেন কেন? না, বিচারের দ্বারা ওঁর মনে কষ্ট হলে মাকেই সে কষ্ট দেওয়া হলো। তিনি আর মা অভেদ। বলতেন, 'আমিটা' খুঁজেছিলাম, দেখলাম মা-ই সব হয়ে রয়েছেন। ভক্তবৎসল নিজেই ক্ষমা করতেন, কিন্তু মার নাম করে। তাঁর এক প্রার্থনা, মা আমি বিচারটিচার জানি না, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও — শুদ্ধা, অমলা অহৈতুকী ভক্তি, আর কিছু না।

যতীনবাবুর একটি ছেলে আসিয়াছে, বয়স ছয় সাত বৎসর। তাহাকে দেখিয়া শ্রীম জিজ্ঞাসা করিলেন, বিদ্যালাভ হচ্ছে তো? তারপর ভক্তদের বলিলেন, প্রকৃত বিদ্যা হল ব্রহ্মদর্শন, ঈশ্বরদর্শন হয় যাতে। স্বয়ং বেদ বলেছেন, ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব, ছয় বেদাঙ্গ, ইতিহাস, পুরাণ — এসব অবিদ্যা। 'যয়া তৎ অক্ষরম্ অধিগম্যতে' — যার দ্বারা অক্ষরকে জানা যায়, তাই বিদ্যা। অক্ষর মানে ব্রহ্ম — ভগবান।

৬ই চৈত্র, ১৩২৯ সাল।
২০শে মার্চ, ১৯২৩ খ্রীঃ।
মঙ্গলবার, শুক্লা দ্বিতীয়া।

নবম অধ্যায়

মেয়েরা মায়ের জাত

মিহিজাম আশ্রমের বারান্দা। এখন সকাল সওয়া আটটা। শ্রীম মুকুন্দকে বলিতেছেন, ছেলেদের পাঠিয়ে দাও, ওদের পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে। জগবন্ধু আর তুমি আছ। (জগবন্ধুর প্রতি) কেমন পারবেন না আপনারা দু'জনে? জগবন্ধু সম্মতি জানাইলেন।

শ্রীম বলিলেন, ওরা তো পড়া কামাই করতে পারলে বাঁচলো।

মুকুন্দ হাসিয়া বলিল, শরীরটা আর একটু সবল হোক্। রবিবার না হয় যাবে।

শ্রীম —কেন, তুমি এইমাত্র বললে, শক্ত হয়েছি? Inconsistent (কথার নড়চড়) হওয়া ভাল নয়। ননীর পুতুল হলে চলবে কি করে? বীরের ন্যায় দাঁড়াতে হবে। সংসারে কত তরঙ্গ, রোখ করে দাঁড়ালে তবে রক্ষে। পঁচাত্তর টাকার গরুর মত হতে হবে। পাঁচ টাকা দামের গরুর মত হলে হবে না। Pleasurable sensation (ইন্দ্রিয় সুখ) সকলেই চায়। ছেলেদের ছেলেবেলা থেকে ননীর পুতুল না করে সাহসী করতে হয়। None but the brave deserves the fair — বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

জগবন্ধু — আজ্ঞে, ছোট অমূল্য লিখেছেন এখানে আসতে পারেন। বাড়িতে বড় ধাক্কায় পড়েছেন।

শ্রীম — হবে না, প্রকৃতি যে পেছনে পেছনে চলছে। মা, স্ত্রী, বিবাহ উপযুক্তা কন্যা ঘরে। তারা হয়ত মনে করছে, বের হয়ে বুঝি গেল। এখন কি ছাড়বে, পিছু পিছু দৌড়ে যাবে। তারপর সংসারের রস নিঙ্ড়িয়ে খেয়ে তবে ছাড়বে।

অবিদ্যার শক্তি অতি প্রবল। বিদ্যা takes God-wards (ঈশ্বরের দিকে নিয়ে যায়) অবিদ্যা, away from God (নিয়ে যায় সংসারে)।

Discretion (বিচার) দ্বারা বেঁচে যেতে পারে। ননীর ভাণ্ড হাতে আছে, সংসারও পিছু পিছু যাচ্ছে। কৌশলের দ্বারা ওটা ছেড়ে আগে চলে গেলে, আপনা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ওটাই যত গণ্ডগোল।

যারা বুক বাড়িয়ে তরঙ্গ রোধ করতে পারে তারাই তো brave (বীর)! ওরাই ভগবানকে পায়। প্রকৃতি বড় শক্ত। প্রকৃতি মানে, weakness-এর (দুর্বলতার) জমাট বাঁধা বস্তু — quintessence of weakness.

ঠাকুরদের সব কাজ নিজে করতে হয়, তবে ভক্তি বৃদ্ধি হয়। একটি পয়সা দিয়ে প্রণাম করে দেখেছি বেশী কাজ হয় মনের উপর, শুধু হাতে দেখার চাইতে। মনে মনে ভক্তি থাকলে হয় বটে, কিন্তু বাইরের কাজের সঙ্গে যোগ থাকলে আরও ভাল হয় — একটা impression (সংস্কার) লেগে যায় সহজেই। নিজহাতে ফুল তুলে নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজা, আর মনে মনে পূজা, এতে তফাৎ আছে। মনে পূজা বড় কঠিন, অন্যটি সহজ।

ঠাকুর ভক্তদের নিয়ে মায়ের মন্দিরে যেতেন। প্রণাম করার পর কিছু দিতে বলতেন। প্রথম প্রথম পয়সা হাতে আসে না — অপ্রস্তুত।

একবার আমি বাগবাজারে সিদ্ধেশ্বরী-মাকে ষোলটা ডাব মানৎ করেছিলাম। আজ না কাল, এই ভেবে আর দেওয়া হয়ে ওঠে না। একদিন একটি পয়সা দেবো মনে করেছি, আর একটা আধুলি বের হয়ে গেল। আমি ভাবলাম, মা এভাবেই নেন। (সহাস্যে) আচ্ছা, আমিও আর দেবো না। ঠাকুর দেবতাকে পূজা করতে হয় কিছু দিয়ে, অগত্যা একটি পয়সা দিলেও চলতে পারে।

ব্রহ্মচারী — অমুক লিখেছেন, দিনকতক মন বেশ ছিল, এখন কামাসক্ত হয়েছে।

শ্রীম — তা আর হবে না, দুর্জয় প্রকৃতি রয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। বিশ হাজার বৎসর পূর্বে ঋষিরা এসেছিলেন — অষ্টবক্রাদি।

ওঁদেরই, প্রকৃতির বিপাকে, রাত্রে seminal discharge (বীর্যপাত) হয়ে গেল। নিদ্রা থেকে উঠে অমনি ক্রন্দন। এদিকে হয়ত সারাদিন পূজা হোম, যজ্ঞাদিতে নিরত ছিলেন।

প্রকৃতি বড় শক্ত!

প্রকৃতি বদলায় সৎসঙ্গে আর প্রার্থনায়। স্বল্পতোয়* যারা, তারা সৎসঙ্গ সহ্য করতে পারে না। এই যে মঠে যায় ভক্তরা, তাদের কত জন্মের তপস্যা ছিল, তবে তো সাধুসঙ্গটি হচ্ছে, আর ভাল লাগছে।

একটি গর্ভবতী শূকরী সম্মুখে দিয়া চলিয়া যাইতেছে। উহা দেখিয়া শ্রীম-র মাতৃভাবের উদ্দীপন হইয়াছে। বলিতেছেন, যদি মনে করা যায় মেয়েরা মায়ের জাত, তবে কোথায় কামটাম পালিয়ে যায়। যে মায়ের নামে চক্ষে জল আসে — সেই মায়ের জাত।

অদূরে কয়লার প্রজ্জ্বলিত অগ্নিদৃষ্টে বলিলেন, এই হলো ব্রহ্মের আর একটি রূপ।

কেউ আশ্চর্য মনে করে না।

মনে করে রোজই তো উহা দেখছি।

সূর্যও আর একটি প্রকাশ ব্রহ্মের।

ওতেও লোক আশ্চর্য মনে করে না। ভাবে, এ তো রোজই ওঠে, রোজই দেখি, কিন্তু কি আশ্চর্য বস্তু!

৭ই চৈত্র, ১৩২৯ সাল।
২১শে মার্চ, ১৯২৩ খ্রীঃ, বুধবার।

---

*স্বল্পতোয় - ছোট আধার

দশম অধ্যায়

সদাচার বড় দরকার

আজ শ্রীম একটি ভক্তকে রান্না শিক্ষা দিতেছেন। ভক্ত কখনও রান্না করেন নাই। খুব আগ্রহসহকারে ভক্তটি রাঁধিতেছেন। শ্রীম মাঝে মাঝে রান্নাঘরের সম্মুখে আসিয়া সদাচার শিক্ষা দিতেছেন।

শ্রীম ভক্তকে বলিলেন, সদাচার বড় দরকার। নোংরা হাতে রান্নার কোনও জিনিস ছুঁতে নাই, ভগবানের ভোগ হবে কিনা ওতে। পবিত্র না হলে ভোগ দেওয়া যায় না। মন্দিরে ঠাকুরদের সামনে দিলেই কি শুধু ভোগ হয়!

নিত্য যা খাওয়া যায়, এও ভোগ — যদি তাঁকে নিবেদন করা যায় প্রথম, তারপর প্রসাদ পাওয়া।

সাধু ভক্তরা নিজের জন্য কিছু করে না, সব ভগবানের জন্য। তাই শুদ্ধাচারের বড্ড দরকার।

রাঁধতে রাঁধতে হয়ত নাকে হাত গেল কিংবা পায়ে — তক্ষুনি হাতে জল দেওয়া উচিত। পরিষ্কার শুদ্ধ বস্ত্র পরে শুদ্ধ দেহে রান্নাঘরে আসতে হয়। ঘরের ভিতর সব সুন্দর সুশৃঙ্খলভাবে রাখতে হয়। মেঝে পরিষ্কার রাখতে হয়। হাতে জল নিয়ে, জায়গায় হাত বুলিয়ে তার উপর খাদ্যদ্রব্য রাখতে হয়। পায়ে-মাড়ান স্থানে রাখলে অশুদ্ধ হয়ে যায়। যেমন এক গ্লাস জল রাখতে হবে, হাত ধুয়ে জল গ্লাসে নিয়ে এক ফোঁটা জল ঐ গ্লাস থেকে মাটিতে ফেলে এর উপর গ্লাস রাখতে হয়। আর সর্বদা বসে বসে 'রাম রাম' জপ করতে হয়। নিজের ইষ্টমন্ত্র জপ করলে খাদ্যদ্রব্য সব শুদ্ধ হয়ে যায়। তখন ভগবানে নিবেদন করা যেতে পারে। জপ, সর্বদা জপ কর বসে বসে, আর রাঁধ। ঠাকুর ভক্তদের নিজে হাতে রেঁধে খেতে বলতেন। এতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। ডাল, ভাত কিংবা ভাতে-ভাতে আর ঘি। আমাকে

দুধ-ভাত আর গাওয়া ঘি খেতে বলেছিলেন। বলতেন, রান্নার জন্য পরের মুখাপেক্ষী হতে নাই। সাধু ভক্তরা নিজেরটা নিজে করে নেবে, নইলে এক মুঠো ভাতের জন্য মেগের দাস হতে হয়।

বারান্দায় পায়চারী করিতে করিতে শ্রীম আবার রান্নাঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরে উঁকি দিয়া বলিতেছেন, এদিকে পশ্চিমে রাখবেন মগ। আর যেই ডাল ভাত এসব নামাবেন তখন অমনি একটু জল দিয়ে জায়গাটাতে হাত বুলিয়ে নেবেন। আর দু'হাত এঁটো থাকলে, অথবা সকড়ি থাকলে, আমরা এমন করে (দুই হাতের পিঠের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দিক দিয়া মগটা ধরিয়া) একটা হাত শুদ্ধ করে নি।

অতি আগ্রহের সহিত রান্না করিলেও রন্ধনদ্রব্য ভাল হয় নাই, কারণ রন্ধনকারী একেবারে নূতন। কিন্তু শ্রীম-র ইহাতে লক্ষ্য নাই। তিনি ইহাই অমৃত বলিয়া গ্রহণ করিলেন আর সকলের কাছে অসংখ্য সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন। ভক্তটির আজই রন্ধনকার্যে হাতেখড়ি।

সকালের গাড়িতে বিনয় আসিয়াছেন, সঙ্গে ছোট অমূল্য। তিনি কার্যোপলক্ষে দিন কয়েকের জন্য বাহিরে গিয়াছিলেন।

ফণী, সুকুমার আর সত্যবান আজ যাইবে। একটি ছেলে মিহিজামে কয়েকবার যাওয়াআসা করিতেছে। জানা গিয়াছে সে প্রায়ই রেলের টিকিট করে না। তাই আজ তাহাকে শ্রীম খুব শাসন করিয়াছেন, আর চোরাই কয়লা কেনা এবং মিথ্যা কথা বলার জন্য প্রচুর তিরস্কার করিলেন।

শ্রীম — (জনৈক ভক্ত শিক্ষকের প্রতি) হিসেব কর, কত ফাঁকি দিয়েছে রেল কোম্পানীকে। আজ তুমি ঐ টাকার টিকিট কিনে ছিঁড়ে ফেল, তাহলে ওদের প্রাপ্য ওদের দেওয়া হবে।

ছেলেরা বিকালে আড়াইটার গাড়িতে চলিয়া যাইতেছে। তাহাদের সঙ্গে ভক্তরা কেহ কেহ স্টেশনে আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে দুইজনকে শ্রীম বলিয়া দিয়াছেন টিকিট কিনিয়া উহা ছিন্ন করিয়া রেল লাইনের উপর ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে কিনা, এই সংবাদ শীঘ্র আসিয়া তাঁহাকে বলিতে। একটি ভক্ত শিক্ষক ছেলেরা যে

কয়টাকা রেল কোম্পানীকে ফাঁকি দিয়াছে, সেই কয়টাকার টিকিট খরিদ করিয়া উহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন লাইনের উপর। শ্রীমকে আসিয়া এ সংবাদ দিলে তিনি যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

সময় বেলা চারিটা। জম্বুতল। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়া গেল দশম স্কন্ধ, অষ্টম হইতে একাদশ অধ্যায়, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা। সন্ধ্যায় ধ্যানজপের পর কথামৃত চতুর্থ ভাগ পাঠ হইতেছিল। কলিকাতায় অধর সেনের গৃহে ঠাকুর আসিয়াছেন। ভক্তগণ শ্রীশ্রী ঠাকুরের এই অমিয় লীলাকথা তদীয় অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীম-র সম্মুখে বসিয়া শ্রবণ করিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন, যেন এই নিত্যলীলা তাঁহাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে। গানগুলি সবই শ্রীম ভক্ত সঙ্গে গাহিতেছেন। এক অপার্থিব আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইল।

৮ই চৈত্র, ১৩২৯ সাল।
২২শে মার্চ, ১৯২৩ খ্রীঃ, বৃহস্পতিবার।

একাদশ অধ্যায়

ঠাকুরের তিন মন্ত্র

অতি প্রত্যুষে ভক্তগণ অশ্বত্থমূলে ধ্যান করিতে বসিলেন। শ্রীমও গিয়া বসিয়াছেন। এখন ব্রাহ্মমুহূর্ত। ক্রমে পূর্বদিক ঊষার আগমন সূচিত করিয়া দিতেছে। পূর্বাকাশ ঈষৎ প্রকাশিত। ঈষৎ রক্তিমাভা আকাশের গায়ে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছে। বিহগকুল এখনও জাগ্রত হয় নাই, এখনও তাহারা ঈশ-গুণগান করিতে আরম্ভ করে নাই। বসন্তের মৃদুমন্দ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে। ভক্তগণ ত্রিকালজ্ঞ ঋষির সঙ্গে বসিয়া ধ্যানমগ্ন। কি পবিত্র ভাব, কি পবিত্র সময়, কি সুপবিত্র স্থান! ধর্মপথে এই দৃশ্য কি দুর্লভ নহে? রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত হইয়া ঊষার নবীন আলোকের সম্পাত হইয়াছে। ভক্তগণ কি ভাবিতেছেন — শ্রীশ্রী ঠাকুরের কৃপায় আমাদেরও কি এইরূপ অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইয়া জ্ঞানালোক প্রকাশিত হইবে? এ কি দুরাশা? ব্রহ্মদর্শনে না জানি কি অপরিসীম সরসতা!

ভক্তগণ ঠাকুর প্রণাম করিয়া একে একে সকলে চলিয়া যাইতেছেন। এইবার একজন গৃহে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীম — (ভক্তের প্রতি) ফুল তুলবে কে?

ভক্ত — আজ্ঞে, আমিই তুলবো।

শ্রীম — যতীনবাবুর বাড়ি থেকে চারটি ফুল আনবেন, বেশী না। অত পয়সা খরচ করে বাগান করেছে।

ভক্ত — আজ্ঞে, হাঁ।

শ্রীম — ওরা বেশী আনতে বললেও বেশী আনা উচিত নয়।

ভক্ত — আজ্ঞে, আচ্ছা।

এইবার ভক্ত প্রণাম করিয়া উঠিয়াছেন।

শ্রীম — আজ ঠাকুরের আসন ও পূজার স্থানটি পরিষ্কার করলে

হয়, আর একটা বেঞ্চে প্রসাদী জিনিসগুলি রাখলে ভাল হয়।

ভক্তটি একটা বেঞ্চ আনিয়া উহার উপর সব রাখিয়া দিলেন। তিনি গৃহ পরিষ্কার করিতেছেন।

শ্রীম — দেখুন, অমুকের তিনটা দোষ আছে। প্রথম — একগুঁয়ে, দ্বিতীয় — নোংরা, আর তৃতীয় – waste (অপব্যয়) করে বড্ড বেশী। কয়লা-টয়লা রান্নার জিনিস। আপনাকে বলে রাখলাম, জানা থাকলে আর friction-এর আশঙ্কা থাকে না। একজনের সঙ্গে একদিন লাঠালাঠি হবার যোগাড়। কি করা যায় বলুন? সংস্কার রয়েছে। ঠাকুর বলতেন, দোষেগুণে মানুষ। দোষগুলি জানা থাকলে charitable view (উদার দৃষ্টি) রাখা যায়।

ওরা, পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণ 'free will, free will' (স্বাধীন ইচ্ছা, স্বাধীন ইচ্ছা) করে, আর all men are equal (সকলেই সমান) বলে। তা বলবেই তো! তাদের তো আর insight (অন্তদৃষ্টি) নাই। Materialist (জড়বাদী) কি না, যোগ নাই। কোথায় ওসব free will (স্বাধীন ইচ্ছা)? আর এক একজন এক এক রকম হচ্ছে। হবে না কেন? Inherited (জন্মগত) সংস্কার আর রক্তের দোষ রয়েছে। আবার acquired ideas, upbringing, environments, surroundings (শিক্ষা, সঙ্গ ও পারিপার্শ্বিকতা) কত সব রয়েছে। কি করে হয় — free will (স্বাধীন ইচ্ছা) কোথায়?

ব্রহ্মচারী — ওরা বলেন, মানুষ ইচ্ছা করলে সব করতে পারে।

শ্রীম — কি করে বলে ও কথা? সকলেই তো ইচ্ছা করে বড় হতে। নেপোলিয়ন কি আলেকজান্ডার হতে পারে কই?

ব্রহ্মচারী — Opportunities (সুযোগ ও সুবিধা) সমান পেলে সকলেই ওঁদের মত হতে পারে — ওঁরা এরূপ বলেন।

শ্রীম — তাই তো predestination (অদৃষ্টবাদ)! Opportunities (সুযোগসুবিধা) সমান পায় না ঐ জন্য। ওদের ঐরূপ ছিল কর্ম পূর্বজন্মের — তাই নেপোলিয়ান, আলেকজাণ্ডার হলো।

ব্রহ্মচারী — All men are equal (সকলেই সমান) — এর তো practical demonstration (পরীক্ষা) চলছে সোভিয়েত

রাশিয়াতে। সব wealth (সম্পত্তি) একরকম সমান ভাগে ভাগ করবার চেষ্টা চলছে। Marx (মার্কস) বলেন, সকলেই যদি ঈশ্বরের সন্তান তা হলে তাঁর ঐশ্বর্যে সকলের সমান অধিকার।

শ্রীম — সে তো হলো। কিন্তু, কতদূর চলছে এই নীতিতে, দেখ। এখনই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে মাইনের তফাৎ হয়ে যাচ্ছে। কম বেশী হচ্ছে roubles-এর distribution-এ (অর্থের বন্টনে)। রাশিয়ার এ নীতি চলবে না বেশী দিন। চললে ভাল হতো, কিন্তু চলবে না। তবে কোনও revolution-এর (বিদ্রোহের) পর এরূপ হয়। ধর্মের নামে, church-এর নামে, খুব অত্যাচার হয়েছে কি না। তাই revolution-এর (বিদ্রোহের) পর এরূপ সাম্যবাদ চলছে। ও থাকবে না — এ থাকতে পারে না। হিন্দুরা বলে কর্মফল।

ব্রহ্মচারী — আজ্ঞে, হিন্দুরাও সাম্যবাদ প্রচার করেছেন — 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।' 'সর্বভূতে নারায়ণ' — এসব তো বেদের কথা।

শ্রীম — স্বরূপতঃ মানুষ ঐ — নারায়ণ, ব্রহ্ম। কিন্তু প্রকাশের তারতম্য আছে না? ওটি থাকবে। সূর্যের প্রকাশ জলে, আর্শিতে, মাটিতে, বৃক্ষে, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে, কম বেশী হয়। স্বরূপতঃ এক ব্রহ্ম হলেও শক্তি প্রকাশের তারতম্যে জগতে ছোট বড়, এসব হচ্ছে। এ মানতেই হবে — নচেৎ জগৎ থাকে না। বৈচিত্র্যই জগতের বৈশিষ্ট্য। এ কুকুরের ল্যাজ — সোজা করা চলে না। সর্বভূতে ব্রহ্মবুদ্ধি করলে ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হয়, তারপর ব্রহ্মদর্শনের পর তখন দেখা যায় তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। কারুকে নিন্দা করবার যো নাই। তবুও ব্যবহারে তারতম্য হয়, ও থাকবে।

শ্রীম — হাঁ, যা বলছিলাম। তিনটি বিষয়ে ঠাকুর আমাদের warn (সাবধান) করে দিছলেন। ফার্স্ট — allowance (কিছু বাদসাদ) দিবে, সেকেণ্ড — ফোঁস করবে, আর, থার্ড — দূরে থাকবে। প্রথমটি ঐ, charitable view (উদার দৃষ্টি) নিতে হয়। দোষগুণে মানুষ — এটা স্মরণ রাখতে হয়। দ্বিতীয়টি, একটু তেজ দেখাতে হয়। সংসারে থাকতে গেলে একটু ধমক দিতে হয়, নচেৎ এখানে থাকা কঠিন! ও চাই। তবে বিষ ঢালতে নাই। তাই ফোঁস করতে হয়। মনে করুন,

একজনের একটা firm (কারবার) আছে। ওটা রাখতে হলে লোকের সঙ্গে deal করতে হবে, তখন ফোঁসের খুব প্রয়োজন। হাবা সাজলে, ভেড়া সাজলে, চলবে না। ফোঁস করতে হবে, ধমক দিতে হবে। ও যদি করতে চাও তবে গাছতলায় যাও আর বসে বসে হরিনাম জপ কর। কিন্তু সংসারে থাকলে ফোঁসের দরকার।

একজন ভক্ত ঠাকুরকে বলছে, আমার কেমন স্বভাব, বিড়াল পাত থেকে আহারের সময় মাছ নিয়ে যায়, আর আমি কিছু বলতে পারি না। শুনে ঠাকুর অমনিই protest (আপত্তি) করলেন আর দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, কেন অমন হবে? মারলেই বা এক ঘা, এতে আর বিড়াল মরে যাবে না। ভক্তটি ভেবেছিলেন, ঠাকুর তার কথা শুনে appreciate (অনুমোদন) করবেন। কিন্তু তিনি বললেন ঠিক উল্টো কথা। এর নাম অহিংসা নয়, মহা তমোগুণ, আলস্য।

তৃতীয়, কারো ভিতর বেশী দোষ দেখতে পেলে দূর থেকে নমস্কার করবে। যেমন বাঘ-নারায়ণকে নমস্কার করে লোক। কিন্তু নারায়ণ জেনে নমস্কার করবে। তোমাকে খপ্ করে খেয়ে না ফেলতে পারে, এরূপ ভাবে দূর থেকে নমস্কার করবে।

এতক্ষণে মুকুন্দ আসিয়া ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন এবং শ্রীম-র পাশে কম্বলে আসন গ্রহণ করিলেন। একজন ব্রহ্মচারী হাঁটু গাড়িয়া ঠাকুরের আসনের সম্মুখভাগ পরিষ্কার করিতেছেন।

শ্রীম — (ব্রহ্মচারীর প্রতি) আমি বুড়ো মানুষ। একা পারি না ঠাকুরঘর, ভাঁড়ারঘর, রান্নাঘর সব পরিষ্কার রাখতে। ঠাকুরঘর চাই খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সাজানো গোছানো, ঢুকলেই যেন মন শান্ত হয়ে যায়।

একটি ভক্তের বাড়ির কথা হইতেছে। ভক্তটির উপর কাহারও কাহারও অত্যধিক স্নেহ। এই কথা শুনিয়া শ্রীম বলিতেছেন, সংসার এই রকম — স্নেহের বাঁধনে বাঁধা। সবই তাঁর হাতে। চাবিকাঠি তাঁর হাতে। এমনি করলে (হাতে তালা খোলার অভিনয় দেখাইয়া) খুলে যায় আর এমনি করলে সব সত্য বলে ধারণা হয়। কাল ভাগবতে পড়া হচ্ছিল, যশোদা ত্রিভুবন দেখলেন শ্রীকৃষ্ণের মুখে। কিন্তু, যেই বাৎসল্য

ভাব এলো আর কিছুই দেখতে পেলেন না। সব সত্য বলে মনে হলো। মায়ায় আচ্ছন্ন হলেন। ঠাকুর বলতেন, পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে। লোক মরছে রোজ, তবুও যারা বেঁচে আছে, মনে করে, আমরা বেঁচেই থাকবো চিরকাল। অসত্যকে সত্য বলে জেনে এরূপ করে। মায়ার ফাঁদ। তাই ঠাকুর প্রার্থনা করতেন, মা তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় ভুলিও না।

এই যে তিনটি বিষয় ঠাকুর সাবধান করে দিয়েছেন — allowance (উপেক্ষার দৃষ্টি), ফোঁস করা আর দূর থেকে নমস্কার করা — এ মন্ত্রবিশেষ। কেউ পালন করলে সিদ্ধ হয়ে যায়। আহা, ভক্তদের জন্য কত ভাবতেন, কিসে তাদের ভগবানে মন যায়! এসব কেন বলে দিয়েছিলেন? না, তাহলে সংসারে শান্তিতে থাকতে পারবে আর ঈশ্বরকে ডাকতে পারবে। সংসারে tact-এর (কৌশলের) দরকার কিনা, এইগুলি tact (কৌশল)! তাও শিখিয়েছেন। তাই তো গুরুর ঋণ শোধ হয় না বলেই অহেতুক কৃপাসিন্ধু বলে। অমনটি আর দেখবো না, কি যে ছিলেন তিনি! নিজের পরনের কাপড়ের ঠিক নাই, কিন্তু কতদিকে দৃষ্টি, ভক্তদের কল্যাণের জন্য।

বেশী দোষ দেখে কারো কখনও ধৈর্যচ্যুতি হতে পারে, এতে দোষ নাই। যীশু খ্রীস্ট কখনও চটে গিয়ে Jew-দের (ইহুদীদের) গালাগাল করতেন, 'A wicked, and adulterous generation seeketh after a sign' : (St. Math. 16:4); 'for ye are like unto whited sepulchre' (St. Math. 23:27) (কপট অসংযমী সমকালীন জনগণ পাপকাজেই আগ্রহশীল। তোমরা বাহির -শুভ্র কবরের মত)। এসব কথা বলতেন। একবার মন্দির থেকে দোকানদারদের মেরে বের করে দিছলেন, বলেছিলেন — But ye have made it a den of thieves (St. Math. 21:13) — পবিত্র মন্দিরকে তোমরা তস্করের আড্ডায় পরিণত করেছ।

শ্রীম-র কখনও গভীর উপদেশ, কখনও হাসিতামাসা। এইবার হাসিতামাসার পালা। ব্রহ্মচারী ঠাকুরের আসনের পিছন দিকটা পরিষ্কার করিতেছেন। একটা স্থান হাতে নাগাল পাইতেছেন না। শ্রীম রহস্য

করিয়া বলিতেছেন, কেন বাড়িয়ে দিন না পেতনীর মত (সকলের হাস্য)। একটা ছোট গল্প পড়েছিলাম। এক পেতনী এক বাড়িতে বউ সেজে একতলায় রান্না করছিল। লাকড়ীর দরকার, হাত বাড়িয়ে তিনতলা থেকে লাকড়ী নিয়ে এলো। শাশুড়ী দেখে বললে, বউমার শরীর রইল একতলায়, হাত কেন তিনতলার ছাদে? ও জানতো ওঁদেরই বউ রাঁধছে। (ব্রহ্মচারীর প্রতি) অমনি করে দিন না বাড়িয়ে হাতটা (হাস্য)।

২

এখন শ্রীম বারান্দায় আসিয়াছেন — স্নান করিবেন। ছোট অমূল্য রান্নাঘরে, বিনয় ভাণ্ডারে, মুকুন্দ বারান্দায়, আর জগবন্ধু সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া আছেন। শ্রীম পায়চারী করিতেছেন আর একজন ভক্তকে বলিতেছেন, স্নানটান কাজগুলি যত শীঘ্র সেরে নিতে হয়। এখানে আসাই শুধু ভগবানকে ডাকার জন্য। সব সময় এতে গেলে ডাকবো কখন? যত সংক্ষেপে করতে হয় এসব। আর বাকী সময় ঠাকুরঘরে বসে বসে জপ করবে। যখনই অবসর হবে তখনই ঠাকুরঘরে এসে বসবে। সময় নষ্ট না হয় — make the best use of time.

কথা কহিতে কহিতে শ্রীম রান্নাঘরের সামনে আসিয়া পড়িলেন, ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছেন।

শ্রীম — (স্বগত) ভগবান কি ঐশ্বর্যে বশীভূত? তা নন। একবার শম্ভু মল্লিকের বাড়িতে গিয়েছেন। শম্ভুবাবু তখন রোগশয্যায় — তাঁর অন্তিম সময়। ঠাকুরকে বললেন, 'আমি মনে করেছি সব ঠাকুরদের (কুলদেবতা) নামে লিখে দিয়ে যাই।' অমনি ঠাকুর গর্জন করে বললেন, 'এ তোমার কেমন হীনবুদ্ধির কথা গা? তিনি কি তোমার ধনের কাঙ্গাল? কুবের, লক্ষ্মী যাঁর ভাণ্ডারে তাঁকে আবার ধনের প্রলোভন?'

সেজোবাবুও (মথুরবাবু) ঐ রকম বলেছিলেন বিষ্ণুঘরের গয়না চুরি গেলে — 'কি ঠাকুর, তোমার গয়না রাখতে পারলে না?' অমনি বললেন, 'ছি তোমার এ কি কথা! তোমার মাটির ঢ্যালার প্রত্যাশী ঠাকুর? জ্ঞানভক্তির প্রত্যাশী তিনি। বিবেকবৈরাগ্য, জ্ঞানভক্তি তিনি চান।'

যদু মল্লিকের বাড়িতে সভা, অনেক লোক এসেছে — কয়েক হাজার। কেশববাবু সেখানে বক্তৃতা দিলেন। কেশববাবুকে বারবার জিজ্ঞাসা করছেন ঠাকুর, ‘বল, আমি কতখানি — ওজন বল’। প্রথম কয়েকবার বলায়ও কেশববাবু উত্তর দেন নাই। পরে জেদ করায় with diffidence (সসঙ্কোচে) উত্তর করলেন, ‘আপনি ষোল আনা।’ তৎক্ষণাৎ ঠাকুর জবাব দিলেন, ‘তোমার কথায় বিশ্বাস হয় না। তুমি টাকাকড়ি, নামযশ এসব নিয়ে রয়েছ। তোমার কথায় বিশ্বাস করতে পারছি না। নারদ শুকদেব হলে বরং কিছু বিশ্বাস হতো।’

সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য কখন কখন তাঁকে অপ্রিয় সত্য বলতে হতো। অত বড় সভার মাঝে কেশব সেনকেই এই কথা! কেশব, যিনি তখনকার দিনে 'cynosure of the neighbouring eyes' (প্রতিবেশীদের মনোযোগ আকর্ষণের কেন্দ্রস্থল) ছিলেন, তাঁকেই এই কথা! যাঁর মৃত্যুতে তিনি স্বয়ং কেঁদেছিলেন — অত ভালবাসা যাঁর জন্য তাঁকেই এই কথা — আর সাধারণ আনাড়ী লোকদের কথার কি মূল্য আছে? সভায় তাদের হাততালির কি দাম? কলকাতার সভাসমিতিতে উচ্চ হাততালির কোন মূল্য নাই।

তিনি proper place-এ lancet (উপযুক্ত স্থানে অস্ত্র) চালাতে জানতেন। Surgeon (ডাক্তার) ছুরি চালায় operation-এর (অস্ত্রোপচারের) জন্য। এতে রোগী কষ্ট পায় বটে, কিন্তু তার ভালর জন্যই করে। এতে ক্ষতস্থানের রক্তপূঁজ সব বের হয়ে যায় — আর ক্ষতস্থান শীঘ্র শুকিয়েও যায়, রোগীর আনন্দ হয় তখন। ঠাকুরের এইরূপ স্পষ্ট কথায় এক একজন লোককে মানুষ করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়, উহা জগতের লোকের পক্ষেও অমূল্য রত্ন। কেননা, ওকথা যে ধ্যান করবে, চিন্তা করবে, তার কল্যাণ হবে। এই জন্যই তো তিনি বললেন, ‘আমাকে ধ্যান করলেই হবে, আর কিছু করতে হবে না।’ তাঁর এক একটি কথা, আর এরূপ এক একটি কাজ ধ্যান করলে ভগবানদর্শন হয়। অদ্ভুত চরিত্র! নিজ জীবনে দেখিয়ে গেছেন সনাতন হিন্দুধর্ম কি। এই সনাতন হিন্দুধর্মের embodiment (বিগ্রহ) তিনি! তাঁর সারাটি জীবন ইহারই demonstration (প্রত্যক্ষ প্রমাণ)!

জাগতিক ভালবাসা in terms of pound, shilling and pence (টাকা-আনা-পাই) দিয়ে measure (পরিমাপ) করা হয়। সমভাব কোথায় এখানে? ঐশ্বর্যে ভালবাসা, কিন্তু ভগবান এতে বশীভূত নন। জ্ঞান-ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্যতে তিনি বশীভূত হন। তাই তো তিনি শম্ভু মল্লিক ও কেশব সেনের দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাচ্ছেন সমভাব কি।

European-রা materialists (পাশ্চাত্ত্যবাসীরা জড়বাদী), ওরা ওতেই ওজন করে ভালবাসা। এত বড় poet Shakespeare (কবি শেক্‌স্‌পিয়ার)! দিনকয়েক হয় একখানা বই আমার হাতে পড়েছিলো, তাতেও দেখলাম ঐ কথা। অত বড় বইখানায় আগাগোড়া ঐ কথা কেবল। ঈশ্বরে ভালবাসা, প্রেম — Gospel of Love-এর mention (উল্লেখ) একস্থানেও নাই। সব in terms of pound, shilling and pence — ভোগের কথা।

এরূপ গল্পও শোনা যায় ওদেশের। বাপ ছেলের বাড়ি গেল, ছেলে Governor. বাড়িতে যেতেই ছেলে বাপকে দেখাচ্ছে, এটা আমার drawing room (বসবার ঘর), এটা dining-এর (আহারের) জন্য, এটা bath room (স্নান ঘর), এটা bed room (শোবার ঘর), এটা Study (পড়বার ঘর)। (সহাস্যে) বুড়ো বাপ ছেলের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে তখন রেগে বললেন, 'Where do I go in then, man (বাবা, আমায় তাহলে কোথায় ফেললে)? এ দেশের ideal (আদর্শ) আর ওদেশের ideal (আদর্শ) সম্পূর্ণ বিপরীত। এখানে, ‘পিতৃদেবো ভব, মাতৃদেবো ভব’ — এই বেদের বাণী। আবার, ‘আচার্যদেবো ভব, অতিথিদেবো ভব’ — পিতা, মাতা, আচার্য ও অতিথিকে দেববৎ পূজা করবে।

শ্রীম স্নানঘরে ঢুকিতেছেন। মুকুন্দ স্নানজলের বালতি ঘরে রাখিতে যাইতেছেন। শ্রীম বারণ করিয়া বলিলেন, না, তুমি রুগ্ন। (একজনকে দেখাইয়া) এই ইনি করবেন, এঁরা সব রয়েছেন, a right man in the right place (ঠিক জায়গায় ঠিক লোক) হবে। এই ভক্তটি জলের বালতি ঘরে রাখিয়া আশ্রমপ্রাঙ্গণ ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করিতেছেন। মুকুন্দ ও অমূল্যকে ডাকিয়া শ্রীম বলিতেছেন দেখুন

দেখুন, কেমন পরিষ্কার করছেন, ইনি নিত্য স্নানের পূর্বে এইটি করেন। ও না হলে কি আর আশ্রমের মত দেখায়?

শ্রীম-র প্রধান আহার দুধ — দিনে দুধভাত, রাত্রিতে দুধরুটি। আজ গোয়ালা দুধ দিতে পারে নাই। মধ্যাহ্ন আহারের মত সংগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু নৈশ আহারের দুধ সংগ্রহের জন্য অনুসন্ধান চলিতেছে বেলা সাড়ে তিনটা হইতে ছয়টা পর্যন্ত। পল্লীগ্রাম, কয়েক স্থান দেখিয়া দুধ না পাইয়া একটি ভক্ত হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীম উহা দেখিয়া বলিলেন, এই যতীনবাবুর বাড়ি একবার দেখলে হয় না? বলবেন, আমাদের একটি বুড়ো ছেলে আছেন, দুধ না হলে হয় না। ওদের বাড়ি থাকা সম্ভব, ছানাপোনা নিয়ে ঘর।

দুধ ওখানে পাওয়া যাইবে না, এই নিশ্চয় করিয়া গেলেন ভক্তটি। কিন্তু গিয়া তাঁহাদের বলিতেই পরম আহ্লাদে তাঁহারা দুধ দিয়া দিলেন। দুধ লইয়া আনন্দে ভক্তটি আসিয়া জম্বুতলে দাঁড়াইয়াছেন।

শ্রীম আহ্লাদে ভক্তকে বলিলেন, দেখুন, আপনি তো চেষ্টা ছেড়ে দিছলেন, না গেলে তো ও-টি হতো না। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করতে হয়। Try, try again; if at first you don't succeed, try try again (হার বা জেত, পুনঃ পুনঃ চেষ্টা কর)। ও একটি mentality (মনোবৃত্তি) আছে, শেষ না দেখে ছাড়ে না।

নরেন্দ্র ঠাকুরকে বললেন, 'কালীর ধ্যান তো কত করলুম, কিছুই তো দেখতে পেলাম না।' ঠাকুর বললেন, 'দেখ, ধৈর্যসহকারে নির্জনে গোপনে তাঁকে ডাকতে হয়, তা হলে অবশ্য দেখা দেন।' বললেন, 'তুমি যাঁকে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বল, ব্রহ্ম বল, তিনিই কালী।

মনে কর, সব জলে জলময়, তাতে একখণ্ড বরফ ভাসছে।
ঐ হলো সাকার কালী অবতার।
যেই শক্তি সেই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম শক্তি অভেদ।
চেষ্টা কর, দেখতে পাবে।'

আর একজন ভক্তকে বললেন, 'তুমি নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদো, নিশ্চয় দেখা পাবে।'

এক চিন্তা, একভাব, অন্য কথা নাই, অন্য কাজ নাই — তৈলধারার

মত নিরবিচ্ছিন্ন চিন্তা। এরূপ হলে তবে দর্শন হয়।

কর্মকাণ্ডে থাকলে লোককে শীঘ্র ওদিকে (ঈশ্বরের দিকে) যেতে দেয় না। একটি লোক গালার ছাপ দিবে। একবার গলিয়ে রেখেছে, এমন সময় বাড়ির ভিতর থেকে চিনি আনতে বাজারে যাবার জন্য তাড়া এলো। বাজারে চলে গেল। দ্বিতীয় বার যেই গলিয়েছে অমনি ডাক্তার এলো, বাড়িতে রোগী আছে — হলো না। এইরূপ হবো হবো হয়েও হচ্ছে না।

একটু জপধ্যান করে, কি দু'পাতা শাস্ত্র পড়ে, কি শ্লোক আওড়িয়ে, তাঁকে পাওয়া যায় না। একটু ও রকম কিছু করেই লোকে বলে, 'অনুভব করেছি — ঈশ্বরকে জেনে ফেলেছি'।

ও রকম হয়, যখন অবতার না আসেন। তিনি এলে ও রকম বলা চলে না। তিনি এসে বলেন, 'ওগো, ধ্যানই কর, আর সমাধিই লাভ কর, যাই কর test (পরীক্ষা) হচ্ছে ওখানে — তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে কথা কয়েছ কিনা। তা না হলে কিছুই হলো না।'

Test (পরখ) ওখানে — কথা কয়েছ কিনা।

ঠাকুর এসেছিলেন এই কথা বলতে, অবতার আসেন এই জন্য।

Jesus (যীশু) সামনে দেখতেন, কথা কইতেন। জ্যোতিঃ দেখে Peter (পিটার) মূর্চ্ছিত হয়েছিলেন। Moses (মুসা) burning bush (জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড) দেখেছিলেন। দর্শন, আবার কথা কওয়া এই হলো test (পরীক্ষা)! এঁদের তা হয়েছিল — Moses, Christ (ইসা, মুসা), ঠাকুর — এঁদের।

শ্রীম ঠাকুরঘরে বসিয়া আছেন তাঁহার আসনে, সম্মুখের আসনে একটি ভক্ত। মুকুন্দ, ছোট অমূল্য ও বিনয় ঠাকুরের সম্মুখে কম্বলাসনে মেঝেতে উপবিষ্ট। পুলিনবাবু প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে জামাতা রণদা। উভয়ে কম্বলাসনে বসিলেন। এখন সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা। ধূপের সুমিষ্ট সৌরভে গৃহ সুবাসিত। সকলে ধ্যান করিতেছেন। বিনয় কিছুক্ষণ থাকিয়া রান্না করিতে উঠিয়া গেলেন। এইবার কথাবার্তা হইতেছে।

পুলিন — (সকাতরে) মাস্টারমহাশয়, মোকদ্দমা বড় বিপদে ফেলেছে। মন কিছুতেই স্থির হচ্ছে না। বড় বিপদে পড়েছি।

শ্রীম সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে পুলিনকে বলিলেন, সুখদুঃখেই জীবন, এই সংসার।

পুলিন — আজ্ঞে, আমার স্ত্রীও এ কথা বলেছেন। তিনি বলেন এ বিপদে তোমার ভাল হবে।

একথা শুনিয়া শ্রীম আনন্দে বলিলেন, ঐ তো ঠাকুর আপনার স্ত্রীর মুখ দিয়ে ঐ কথা বলেছেন। সতীলক্ষ্মীর মুখের বাণী সত্য হয়। বিদ্যাশক্তি তো আপনার স্ত্রী। এ কি কম? ঠাকুর বলতেন, 'এই যে শক্তি (শ্রীশ্রীমাকে) আমি সামনে রেখেছি, এর দ্বারাই সংসার বন্ধন মোচন করবো।' ঠাকুরের উপর নির্ভরতা এলে তিনিই সব করেন। তিনি ছাড়া আমাদের গতি নাই। ক্রাইস্ট বলতেন, Do not lean on a broken reed, for such is man — মানুষ দুর্বল, কি করতে পারে, কি বোঝে, কি বলবে? তাঁর 'হাঁ'-তে হাঁ হয়, 'না'-তে না হয়। — The everlasting 'yea' and 'nay' (Carlyle). আমরা কি করতে পারি? হাজার গাঁটওয়ালা একটা দড়ি যাদুকর এনে দিলে। কেউ একটা গাঁটও খুলতে পারলে না। কিন্তু সে নিজের হাতে নিয়ে নাড়িয়ে নাড়িয়ে সব খুলে ফেললে। তেমনি ঈশ্বর, তিনি সব পারেন। তাঁর উপর ভার দিতে হয় — শরণাগত, শরণাগত। With men this is impossible, but with God all things are possible (St. Math. 10:15) — মানুষের পক্ষে অসম্ভব হতে পারে, কিন্তু ভগবানের পক্ষে কিছু অসম্ভব নয়।

পুলিনবাবুর তীব্র কাশি হইতেছে তাই ঘর হইতে উঠিয়া গিয়া বারান্দায় চৌকিতে বসিয়া মনঃসংযোগ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ক্ষণকাল পরে শ্রীম বলিতেছেন, আগামীকাল ভুবনেশ্বর মঠে বাসন্তী পূজা হচ্ছে, আজ ষষ্ঠী — বোধন। মায়ের আগমনী গান গাওয়া যাক। এই বলিয়া নিজে গান ধরিলেন —

'গিরি, গণেশ আমার শুভকরী।
বিল্ববৃক্ষ মূলে পাতিয়া বোধন
গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন।
ঘরে আনবো চণ্ডী, শুনবো কত চণ্ডী

আসবে কত দণ্ডী, যোগী জটাধারী॥'

গান শেষ হইল। শ্রীম রণদাকে বলিলেন, গান না আপনি একটি। ভক্তদের সকলকে বলিলেন, গান না আপনারা সব মায়ের নাম। ঠাকুর বলতেন কিনা দুই বন্ধুর গল্প বলে, 'মনই সব'।

এই পূজার কয়দিন যদি আমরা মনকে পাঠিয়ে দি' ভুবনেশ্বরের মঠে তাহলেও এখান থেকে আমাদের পূজা করা হবে।

(পুলিন গৃহে প্রবেশ করিলে) শুনছেন পুলিনবাবু, ঠাকুর বলছেন, 'মনই সব'।*

পুলিন — (হতাশভাবে) মাস্টারমশায়, মনটা বড়ই খারাপ হয়েছে। বাস্তবিক বড্ড খারাপ — কিছুই ভাল লাগছে না।

শ্রীম অতি নরম করিয়া বলিলেন, ওরূপ তো হবেই। তরঙ্গ এক উঠবে আর যাবে। মেঘে আকাশ ঢাকবে, আবার সূর্য উঠবে। ঠাকুর বলতেন, 'ব'য় আকার 'ল' (সকলের উচ্চ হাস্য) — হাঁ, খুব রসিক ছিলেন কিনা, ও যতই সিধে করতে যাও না কেন ও সিধে হবে না। মনও সেইরূপ। সংসারে থাকলে ও' হবেই। সংসারের আর এক নাম কর্মকাণ্ড। সংসারে এ' হবেই। যারা মনে কর ত্যাগী, ইচ্ছা করলে গাছতলায় থাকতে পারে, তাদের ভিতরেও যে তরঙ্গ রয়েছে, এর কি হবে? মানুষ, যারা সংসারে আছে তাদের হওয়া আর আশ্চর্য কি? তবে তাঁর শরণাগত হলে তিনি দেখেন। অনুপযুক্ত শরণাগত নাবালকের জন্য তিনি বেশী ভাবেন। যেমন পিতামাতার স্নেহ ও যত্ন অক্ষম অন্ধ আতুর পুত্রের জন্য বেশী থাকে। কিন্তু লায়েক পুত্রকে তেমন দেখে না, কারণ সে উপার্জন করে খেতে পারে। তেজচন্দ্রকে বলতেন ঠাকুর, 'তোর জন্যই তো আমার ভাবনা বেশী, তুই বিয়ে করে ফেলেছিস্।' সংসারীদের জন্য ভগবানের অত ভাবনা।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে দেখে বললেন, গয়া থেকে সন্ন্যাস নিয়ে এলে পর, 'এখন এর অবস্থাটি বেশ, সব ছেড়েছে। কিন্তু শিবনাথের অনেক কাজ,খবরের কাগজ লেখা, বক্তৃতা করা, কত কি করতে হয়'!

* মন যেন ধোপাঘরের কাপড় — যে রংএ ছোপাবে সেই রং ধরবে।

একটা চিল পায়ে করে একটা মাছ নিয়ে উড়ছিল। রাজ্যের যত কাক, চিলটার সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগল। শান্তি নাই, যেখানে যায় স্থির হতে দিচ্ছে না। পেছু পেছু সব চলেছে। শেষে মাছটা ফেলে দিলে, তখন সব চলে গেল।

মৎস্যশূন্য হলে নিস্তার, তখন শান্তি। তবে মাছ নিজে ছাড়তে পারে না। গুরু কৃপা করলে তবে হয়। চিল নিজে ছাড়ে নাই, গুরু ছাড়িয়ে নিয়েছেন।

পুলিনকে বলিলেন, ভয় কি, গুরু রয়েছেন আপনার। গুরু তো ভগবান, তিনিই সব দেখবেন। আমি কিন্তু এইটে ঠিক করে নিয়েছি — আমরা অকর্তা, তিনি কর্তা। সব তিনি হয়ে রয়েছেন, সব করাচ্ছেন।

পুলিনবাবু শ্রীম-র পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে অগ্রসর হইলেন। শ্রীম কখনও প্রায় কাউকে পায়ে হাত দিতে দেন না, তাই বাধা দিয়া বলিলেন, ও রকম করতে নেই, ঠাকুর সামনে। বাইরে গেলে বরং হতে পারে। এখানে না।

পুলিন — (শ্রীম-র পায়ের ধূলা লইতে ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া) আশীর্বাদ করুন, এ যেন বুঝতে পারি, ধারণা হয়।

শ্রীম — (কিঞ্চিৎ ভাবান্তরের পর) নন্দ বসুর বাড়ি থেকে ফিরে যাচ্ছেন ঠাকুর, সঙ্গে অনেকেই আছেন। গিরিশবাবু বাড়ির দাওয়ায় বসা। নারাণ ওঁকে দেখিয়ে ঠাকুরকে বললে, 'এই ইনিই চৈতন্যচরিত লিখেছেন।' ঠাকুর চৈতন্যচরিতের অভিনয় পূর্বেই দেখে এসেছেন। ঠাকুরের যেমন স্বভাব ছিল, গিরিশবাবুকে যুক্তকরে নমস্কার করলেন। গিরিশবাবু পিছু পিছু বলরামবাবুর বাড়ি এসে হাজির। বসেছেন, তখন ঠাকুর বললেন, 'বেশ লিখেছেন, আমাদের কত আনন্দ দিলেন।' গিরিশবাবু উত্তর করলেন, 'মশায়, আমার কথা আর বলবেন না। আমি যেখানে বসি সেখানকার সাত হাত মাটি অশুদ্ধ অপবিত্র হয়ে যায়।' ঠাকুর অমনি ভাবোন্মত্ত হয়ে গান গাইতে লাগলেন —

গান

আমি দুর্গা দুর্গা বলে যদি মা মরি।
আখেরে কেমনে না তার জানা যাবে গো শঙ্করী।।
নাশি গো ব্রাহ্মণ, হত্যা করি ভ্রূণ, সুরাপানাদি বিনাশি নারী।
এ সব পাতক না ভাবি তিলেক আমি ব্রহ্মপদ ল'তে পারি।।
দুর্গা দুর্গা বলে যদি মা মরি।

এ গান শুনে গিরিশবাবু ভরসা পেলেন। ঠাকুরের কৃপা হয়েছে। পরে কলকাতায় কবে কোথায় যাবেন ঠাকুর, আগে থাকতেই খবর নিয়ে সেখানে গিয়ে বসে থাকতেন। ময়ূর আফিম খেয়েছে। গিরিশবাবুকে কৃপা করেছেন কিনা! গিরিশবাবু আশ্বাস পেলেন। ক্রমশঃ ভাল হতে আরম্ভ করলেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে হাজির গাড়ি করে, সঙ্গে একজন বন্ধু আছেন। দু'জনেই dead drunk (পুরো মাতাল)। গিরিশবাবু ঠাকুরকে ধরে গান গাইছেন, 'কোথায় তোমার রাই বিনোদিনী।' ঠাকুর পরে বলেছিলেন, 'গিরিশের কি বিশ্বাস, আঁকড়ে পাওয়া যায় না এত গভীর!'

আমরা কি করে বুঝবো তাঁর লীলা, তাঁর কথা, এইটুকু বুদ্ধিতে। যাকে আমরা খারাপ লোক, বদমায়েস বলে ঘৃণা করতাম তাকেই আবার তিনি ভালবাসতেন। এমনও অনেক ঘটনা হয়েছে। আমাদের standard-ই (মাপকাঠি) বা কতদূর? এ দিয়ে মাপা চলে?

রণদা — আচ্ছা মাস্টার মশায়, পরমহংসদেবের শেষটা কেমন হলো?

শ্রীম — কাশীপুরে একটা বাগানে অসুস্থ হয়েছিলেন। গলায় cancer হয়েছিল। খুব যন্ত্রণা পেতেন। প্রায় এক বছর ছিলেন এইভাবে। ভক্তরা সব সেবা করতো। কিন্তু অত যন্ত্রণার ভিতরও সর্বদা ভগবৎপ্রসঙ্গ — অষ্টপ্রহর। যত সব ভক্তরা ওঁর সেবা করেছিলেন, সব্বাইকে তিনি তরিয়ে দিয়ে গেলেন।

পুলিন — আচ্ছা মাস্টারমশায়, স্বামীজীকে নাকি ঠাকুর চলে যাবার আগে শক্তি দিয়ে গিছলেন?

শ্রীম — হাঁ, ঠিক তেমন নয়। যাবার আগে অনেককেই নিয়ে

খালি ঘরে একা একা কথা কইতেন — অন্তরঙ্গদের। স্বামীজী আমাকে একদিন বললেন, 'আপনি প্রতিজ্ঞা করুন, আমাদের অন্য কারুর নিকট বলবেন না। ঠাকুর আমাকে শক্তি দিয়েছেন।'

এখন তিনিও নাই। অনেকেই নাই, তাই বলছি।

যখন তাঁর শরীরটা খুব খারাপ হলো, আমরা সব নিচে ছিলাম। তিনি সবাইকে ডাকলেন এই বলে, 'তোরা সব আয়, আমার শরীরটা বড্ড খারাপ।' সকলে তখন ওপরে গেল। 'মা মা, কালী' — এই নাম উচ্চারণ করলেন। ব্যস্, অমনি নিস্তব্ধ সব। তখন কাপ্তেনকে খবর দেওয়া হলো কলকাতায়। তিনি যোগ জানতেন, বুঝতে যদি পারেন — কি অবস্থা। শেষে বেলা তিনটে চারটের সময় certified (নিশ্চয়) হলো যে চলে গেছেন।

তিনি যে কি ছিলেন কি আর বলবো, কি-ই বা বুঝি! তিনি ছিলেন the highest criterion of truth (সত্যের কষ্টিপাথর)। ভক্তরাও যারা আগে আসতো, রোগ দেখে কেউ কেউ পালাল।

বলতো, You heal us but you cannot heal thyself (নিজের ভাল নিজে করতে পারছে না, আমাদের ভাল করবে কি?)। কেউ বুঝতে পারে না অবতারলীলা। তিনি শিখালেন, অসুস্থ শরীর নিয়েও তাঁকে ডাকতে হয়। অবতারলীলা বোঝা এ ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে হয় না। এক ছটাক বুদ্ধিতে কি করে হবে?

ক্রাইস্টও অবতার, কিন্তু অপরের হস্তে cross-এ (ক্রুশে) নিহত হলেন। রাম সরযূতে সীতা ও লক্ষ্মণের শোকে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধের হাতে গেলেন। কি রহস্যময় এ লীলা! এ বোঝে কার সাধ্য? অর্জুনের ন্যায় যে উত্তমাধিকারী, তিনিও বুঝতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ নিজে বলেছিলেন বলে বিশ্বাস করলেন। তাঁর নিকট শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া কাউকে আর ভাল লাগতো না। অর্জুন বলেছিলেন, মুনিরা সব, অসিত, দেবল, ব্যাস — বলেন যে, তুমি অবতার। আবার তুমি নিজে বলছো, আমি অবতার। তাই বিশ্বাস করছি!

ঠাকুরও যাবার সময় বলে গেছেন অন্তরঙ্গদের ডেকে এনে, 'কি গো, কি বল তোমরা, ওরা যে ঐ (অবতার) বলে।' তাঁকে কি বুঝবো

আমরা প্রবর্তক হয়ে — beginner (প্রবর্তক) হয়ে কি বুঝবো? তিনিই নিজেকে নিজে জানেন।

রণদা — আজ্ঞে, আমরা কেন beginner (প্রবর্তক) ভাবি?

শ্রীম — তা না করে উপায় কি? Beginner means — (প্রবর্তক মানে) যার গুরু আছেন। গুরু থাকলেই তো শিক্ষার, learning এর শেষ নেই। নূতন নূতন শিক্ষা নিতে হয় নিত্য। গুরু থাকার নামই beginner — প্রবর্তক।

রণদা — আচ্ছা মাস্টারমশায়, বাইরেই কি তিনি নেই?

শ্রীম — আছেন, তবে কোথাও বেশী প্রকাশ, কোথাও কম। এখানে ভগবানের নাম করা হয় তাই বেশী প্রকাশ। সব স্থানেই তিনি রয়েছেন। কিন্তু মাটিতে চাইলে যত উদ্দীপন হয় আকাশে চাইলে তার ঢের বেশী হয়। যেমন জল সর্বত্রই আছে, তবুও পুকুর দীঘি কিংবা গঙ্গায় যাই জল আনতে। এখানে ওখানে খুঁড়ি না, যদিও সর্বত্র আছে। সেইরূপ যেখানে তাঁর কথা হয়, স্মরণ, মনন, ধ্যান, পূজা হয়, সেখানে তাঁর বেশী প্রকাশ। এই থেকেই পূজা-অর্চার, চার্চ, মন্দির, মসজিদের সৃষ্টি।

তাঁর কথা আমাদের এক ছটাক বুদ্ধিতে কি বুঝবো? যেমন পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গিয়ে এক দানাতেই ভরপুর। এখন সবটা আনে কি করে? একটা ছোট খুরিতে যত জল ধরবে, একটা কলসীতে তার চাইতে বেশী, একটা জালাতে আরো বেশী। এইরূপে reservoir-এ (রিজরভারে) আরো বেশী।

দুই-এক পাতা সায়েন্স কি ফিলসফি পড়েই আমরা তাঁকে বুঝে ফেলতে চাই। Limited knowledge (সীমাবদ্ধ জ্ঞান) দিয়ে unlimited (অসীমকে) কি করে বুঝবো? P.C. Roy (পি.সি. রায়) যে বলেছেন, একটি blade of grass (একগাছি ঘাস) বুঝবার ক্ষমতা কারো নাই — ঠিক কথা। সক্রেটিস বুঝেছিলেন এই কথা। তাই যখন Delphic Oracle-এ (ডেলফির দৈববাণী) বলল, in Greece Socrates is the wisest man (গ্রীসদেশে সক্রেটিস শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী), তিনি তখন ভাবতে লাগলেন, কেন এ কথা

বললে? ভেবে পরে বললেন, 'ও, বুঝেছি কেন বলেছে। আমি জানি যে আমি কিছুই জানি না।'

রণদা — একজন বলেছিলেন, 'তবে আমি কোন্ দিকে পা রাখি?' পশ্চিম দিকে পা রেখে শুয়েছিলেন, তাতে একজন বললে, 'মক্কার দিকে রাখলে।' তিনি উত্তর দিলেন, 'তবে কোন্ দিকে রাখি — কোন্ দিকে ঈশ্বর নাই?'

শ্রীম — ওটা জ্ঞানের কথা, সিদ্ধ হলে একথা বলা চলে।

রণদা — আচ্ছা, ব্রজের রাখালরা তো কৃষ্ণকে ভগবান বলে জানতো না, তাদের হলো কি করে?

শ্রীম — ঠাকুর বলতেন, লঙ্কা না জেনে খেলেও ঝাল লাগবে। ঝাল লাগলেই হলো। ভালবাসলেই হলো। ভালবাসা দিয়ে কথা।

ব্রাহ্মসমাজের একজন বলেছিলেন, 'ফুল চন্দন, এসব তো ভগবানের জিনিস। তাঁর জিনিস দিয়ে তাঁর পূজা, এ কি রকম, এ ভাল নয়।' ঠাকুর শুনে বললেন, 'তারা কি দিয়ে তাঁর পূজা করে — মনে ধ্যান করে করছে তো? আচ্ছা, মনটা কি তাদের বাপের বাড়ি থেকে এনেছে নাকি?'

এবার মূর্খ পুরোহিতদের কথা উঠিল। শ্রীম বলিতেছেন, একজন বলেছিলেন, ঠাকুরঘরে এক পুরোহিতের পেচ্ছাব পেয়েছে। কি আর করে তখন, ঘরের নর্দমায়ই কর্ম সেরে নিলে। একজন দেখতে পেয়ে বলে উঠলো, কি করলেন পুরোতমশায়, এ কি করলেন (সকলের হাস্য)? পুরোত বললেন, কি করা বড্ড পেয়েছিল। (সকলের উচ্চহাস্য) অমনি হয়েছে ধর্ম সব।

পুলিন — আচ্ছা মাস্টারমশায়, শুনেছি, ঠাকুর কলকাতা থেকে দক্ষিণেশ্বর যাচ্ছিলেন গাড়ি করে। রাস্তায় একজনকে তাড়ি খেতে দেখেই সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন?

শ্রীম — 'কারণ' এই নাম শুনেই সমাধি হতো — দেখেও হতো। 'কারণ' এই নাম শুনে জগৎকারণের কথা মনে হতো, তাতেই বেঁহুশ একেবারে। একবার জগন্নাথঘাটে নৌকো থেকে নেমে চললেন। ভাবে একেবারে বেঁহুশ, পা টলছে। একজন মাতাল দেখে বললে,

বেশ বাবা, বেশ টেনেছে! একজন ঈশ্বরচিন্তায় মত্ত, অন্যজন অন্য রকম।

ঠাকুর বলেছিলেন, 'আমার তিনটে সাধ আছে। একটি, বেগুনের ঝোল খাব। দ্বিতীয়, শিবনাথের সঙ্গে দেখা করবো। আর একটি, তিন চারজন (তন্ত্র সাধক) আমার সামনে কারণ পান করবে, আর আমি তা দেখবো।'

পুলিনবাবু আগামীকাল কলিকাতা যাইতেছেন, তাই শ্রীম-র অনুমতি ও আশীর্বাদ চাহিতেছেন।

শ্রীম সুপ্রসন্নভাবে পুলিনকে বলিলেন, সুখদুঃখ সংসারে থাকবেই। রামলক্ষ্মণ বনে গেছেন। একস্থানে মাটিতে ধনুক পুঁতে তাঁরা স্নান করতে গেলেন। এসে দেখেন সব রক্তাক্ত। করুণহৃদয় রাম জমি খুঁড়ে দেখতে পেলেন, একটা কোলা ব্যাং, তার মর মর অবস্থা। রাম তখন সস্নেহে পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, আমায় ডাকলে না কেন বাছা! সাপে ধরে যখন তখন তো খুব চেঁচাও। ব্যাং উত্তর করলে, প্রভো, সাপে যখন ধরে তখন 'রাম রক্ষা কর', ' রাম রক্ষা কর' বলে চেঁচাই। এখন তুমি নিজেই মারছ, কাকে ডাকি? সবই এইরূপ।

সুখ-দুঃখ সব তাঁর দান। তিনি মারেন তো মারবেন, রাখেন তো রাখবেন। তাঁর উপর ভার দিয়ে বসে থাকা।

৯ই চৈত্র, ১৩২৯ সাল।
২৩শে মার্চ, ১৯২৩ খ্রীঃ।
শুক্রবার, ঁশ্রীবাসন্তীবোধন।

দ্বাদশ অধ্যায়

চাতক অন্য জল খাবে না

ব্রাহ্মমুহূর্তের পূর্বে অতি প্রত্যূষে একটি ভক্ত অশ্বত্থমূলে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। শ্রীম ধীরে ধীরে গিয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। পাশেই আসন গ্রহণ করিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে ভক্তটি চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন শ্রীমও ধ্যানমগ্ন তাঁহারই পাশে।

এই অতিমানবের সান্নিধ্যপ্রভাবে তাঁহার হৃদয় মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি বসিয়া ভাবিতেছেন — আমরা কত সৌভাগ্যবান, আমরা ধন্য! অবতারের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ আমাদের সন্নিকটে উপবিষ্ট।

ভগবান শঙ্করাচার্যের কথা — মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব আর মহাপুরুষ-সংশ্রয় এই তিনটি পদার্থ দুর্লভ। ভক্তটি উহা পড়িয়াছেন, চিন্তাও করিয়াছেন। কিন্তু আজ ইহার এক নূতন অর্থ, সরস ভাব হৃদয়ে উপলব্ধি করিলেন। শুভ ব্রাহ্মমুহূর্ত, বিস্তীর্ণ নির্জন প্রান্তর, 'অশ্বত্থ সর্ববৃক্ষাণাম' (গীতা ১০-২৬) — তাহার পবিত্র পাদদেশ, অবতারের পার্ষদ, এ সংযোগ কি সুদুর্লভ নহে?

আজ জগন্মাতার বাসন্তীপূজা! ভক্তগণ, ব্রহ্মচারিগণ ও শ্রীম সকাল সকাল স্নানাদি সমাপন করিয়াছেন। ঠাকুরের মূর্তি আজ বিশেষভাবে পত্রপুষ্পসহযোগে সজ্জিত করা হইয়াছে। এখন বেলা নয়টা প্রায়। শ্রীম ঘর হইতে বারান্দায় আসিতেই ডাক্তার কার্তিক বক্সী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। তিনি কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন, M.B. (এম. বি.) পাশ — খুব practice (পশার)! ঈশ্বরের জন্য অতি ব্যাকুল। শ্রীম কলিকাতায় থাকিলে নিত্য আসিয়া দর্শন করেন এবং প্রায়ই মঠ ও দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। বয়স ত্রিশের উপর। তিনি

সৎসঙ্গের জন্য এইমাত্র আসিয়াছেন। তাঁহাকে লইয়া শ্রীম বারান্দায় বসিয়াছেন।

শ্রীম ডাক্তারকে বলিলেন, বেশ হয়েছে, মা চলে গেছেন। এখন অনেকটা হাল্‌কা হলো!

ডাক্তারের মাতৃবিয়োগ হইয়াছে সম্প্রতি।

ডাক্তার — (বিনীতভাবে) আজ্ঞে, কই কি আর হলো? মন তো ঠিক হয় না!

শ্রীম বলিলেন, মন — এ মলিন হবেই। এ কি সোজা কথা! মনের অঙ্কট-বঙ্কট থাকবেই। তাঁকে লাভ করা সোজা কথা! অনেক জন্মের চেষ্টায় তাঁকে পাওয়া যায়। 'অনেকজন্ম সংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিং' (গীতা ৬-৪৫) — গীতায় এই কথা বলেছেন ভগবান।

ভগবান বলেছেন, সকলেরই গন্তব্য স্থান ওখানে, সবাইকে ওখানে যেতে হবে, আগে আর পরে। কত শত জন্ম কেটে যায় তবে তাঁর নিকট পোঁছান যায়। অবতারের সঙ্গে যে কয়জন সাঙ্গোপাঙ্গ আসেন তাঁদের কথা আলাদা। তবে অবতার এসে, ঈশ্বর গুরুরূপে অবতীর্ণ হয়ে, সোজা পথ দেখিয়ে দেন। সকলে গ্রহণ করতে পারে কই তাঁর কথা? তিনি একহাজার দু'হাজার বছরের ahead (পূর্বেই) কথা ক'ন। In advance (অগ্রিম) সব বলে যান। ততদিন পরে বুঝবে লোক তাঁর কথা। এখন মনে করছে সামান্য কথা। অত কি সোজা ভগবান লাভ করা! তবে যারা সংস্কারবান্ তাদের কথা আলাদা। তারাই ব্যাকুল হয়ে তাঁকে পাবার চেষ্টা করে।

অবতার না এলে ব্যাকুলতা থাকে না। তিনি এসে এটি করে দেন। অবতার যখন না আসেন তখন হচ্ছে হবে করে লোক। মালা-তিলকধারণ, তীর্থ, জপধ্যান, গঙ্গাস্নান, ব্রতউপবাস, এই সব একটু করেই মনে করে ওতেই বেশ হলো। কিন্তু অবতার এসে এর উপরও একটি দেখান — ব্যাকুলতা।

সাধনভজনেরও দরকার হয় বা না হয়। খানদানি চাষা একবছর দু'বছর ফসল না হলেও চাষ করবে। জিজ্ঞেস করলে বলে, কি করি! বাপ পিতামহ থেকে ঐ করছি — হয় বা না হয়, ও করতেই হবে।

তিনি এসে বলে দিয়েছেন, যদি কেউ নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কাঁদে আর প্রার্থনা করে, ‘প্রভো, আমার যেন আর জন্ম না হয়’ — তবে তিনি কমিয়ে দেন।

খুব রোখ চাই। অবতার পঁচাত্তর টাকা দামের গরুর মত সব শিষ্য চান, পাঁচ টাকা দামের চান না। যারা pleasurable sensation-এ yield (আরামের অনুভূতির বশ্যতা স্বীকার) করে না, পঁচাত্তর টাকা দামের গরুর মত একটু ল্যাজে হাত পড়লেই যারা ছিনিমিনি খেয়ে ওঠে, অবতার তাদের ভালবাসেন। যারা একটু pleasurable sensation-এ (আরামের অনুভূতিতে) নেতিয়ে পড়ে, তাদের চান না। Pleasurable sensation হলো কামিনীকাঞ্চন!

যারা সংস্কারবান তারাই চৈতন্য লাভ করে। আর একটু yield (বশ্যতা স্বীকার) করলেই দশ জন্ম পিছিয়ে পড়লো। মুনিঋষিদেরও কি এক জন্মে হয় সকলের?

তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে গেলেও চাতক বৃষ্টির জল ছাড়া কিছু খাবে না — গঙ্গা, যমুনা কত কি রয়েছে! সাত সমুদ্র তের নদী সব জলে ভরপুর, তবুও খাবে না। এমনি রোখ — কিছুতেই বশীভূত হবো না। ভগবান দর্শন করবো এই জন্মেই — এইরূপ মনের বল!

যাদের বর্তমান জন্মে ঈশ্বরে মতিগতি আছে, আর ব্যাকুল — বুঝতে হবে তারা অনেক জন্ম ধরে ঐ চেষ্টা করছে।

এই যে একজনের হয়ত চৈতন্য হয়ে যায় একটুতেই, এর মানে কি? তার পূর্বের করা ছিল। এমন মনে করা চাই — না, আমি আর কিছুই চাই না — কেবল ভগবানকে চাই। অন্য পথ জানি না, অন্য কিছু জানি না, কেবল ভগবানকে চাই, চাতকের মত।

যার যত বড় আধার তার ততটুকুই হবে। যেমন জল খুরিতে একটু, কলসীতে কিছু বেশী; জালা, reservoir (রিজারভার), পুকুর, নদী, সাগর — একটা থেকে অপরটাতে বেশী ধরে।

আবার যার যেমন প্রকৃতি তাকে সেই প্রকার পথেই চলতে হবে। যেমন একটা square hole, একটা round, আর একটা triangular hole (একটা চৌকোণ, একটা গোল, একটা ত্রিকোণ

আধার)। যেমন আধার, তেমনি পথ।

অদূরে একটি ব্রহ্মচারী কুটীরপ্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিতেছিলেন। শ্রীম তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলেন ঈশ্বরীয় কথা শ্রবণ করিতে রন্ধনশালা হইতে ছোট অমূল্য আসিলেন, আর বিনয় পূর্ব হইতেই বারান্দায় বাক্সের উপর বসিয়া আছেন। সকলে সুসমাহিত চিত্তে এই অমূল্য উপদেশ শ্রবণ করিলেন।

এখন বেলা দশটা। শ্রীম ঠাকুরঘরে বসিয়া আছেন। সম্মুখে একটি ব্রহ্মচারী। পুলিনবাবু আসিয়াছেন, মায়ের ভজন হইবে। ডাক্তার, অমূল্য, মুকুন্দ, বিনয় প্রভৃতি ভক্তগণও আসিয়া একত্রিত হইলেন। ভুবনেশ্বর মঠে আজ শ্রীশ্রীবাসন্তীপূজা। পুলিন হারমোনিয়াম সহযোগে সঙ্গীত ধরিলেন মধুর উদাত্ত কণ্ঠে —

বল রে বল শ্রীদুর্গা নাম।
দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে পথে চলে যায়।
শূলহস্তে শূলপাণি রক্ষা করেন তায়॥
তুমি দিবা তুমি সন্ধ্যা তুমি যামিনী।
কখন পুরুষ হও মা কখন কামিনী॥
তুনি বল ছাড় ছাড় আমি না ছাড়িব।
বাজন নূপুর হয়ে মা চরণে বাজিব ॥
মীন হয়ে রব জলে নখে তুলে লবে।
শঙ্করী হইয়ে মা গো গগনে উড়িবে॥
নখাঘাতে ব্রহ্মময়ী যখন যাবে গো পরাণী।
কৃপা করে দিও রাঙ্গা চরণ দুখানি॥

স্তিমিত লোচনে শ্রীম উপবিষ্ট। সমস্ত শরীর স্থির স্পন্দনহীন। দুই নয়ন বহিয়া প্রেমাশ্রুধারা গঙ্গা-যমুনাবন্যায় অবিরত প্রবাহিত। দীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রুবিলম্বিত মুখমণ্ডল এক অপূর্ব স্বর্গীয় আভায় উদ্ভাসিত। নিদ্রাবিষ্টের ন্যায় বহু চেষ্টা করিয়াও যেন মন বহির্জগতে রাখিতে পারিতেছেন না। ইহা কি ভাবাবেশ?

পুলিন আবার গাহিলেন চণ্ডীর স্তব —

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্॥ ইত্যাদি

এই অনতিদীর্ঘ ঠাকুরমন্দিরে আজ এ কি অপূর্ব ভাবের সঞ্চার হইয়াছে! উপস্থিত সকলেই স্থির প্রশান্ত চিত্তে এই ভাবস্পর্শ উপভোগ করিতেছেন। গতকল্য শ্রীম বলিয়াছিলেন, মনই সব, এখান থেকে ভুবনেশ্বরে মন পাঠিয়ে দিলে আমরাও পূজায় দেবীদর্শন করতে পারি। আজ কি মা আসিয়াছেন এখানে মনোরথে! নচেৎ এ তন্ময় ভাব কোথা হইতে আসিল, আর এই অজ্ঞাত আনন্দই বা কোথায় ছিল! ভক্তগণ কেহ কেহ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন, একমাত্র সঙ্গীতের সুমধুর স্বরলহরী কর্ণে বাজিতে লাগিল। শেষে তাহাও বন্ধ হইল। বাহ্যজগতের কোনও বোধ আর রহিল না, বোধ রহিল এক নিরতিশয় আনন্দের আর তন্ময়তার!

একটি ব্রহ্মচারী সম্মুখের আসনে বসিয়া শ্রীম-র মুখমন্ডলে প্রতিবিম্বিত এই অমানবীয় ভাবদৃশ্য অনিমেষ নয়নে দেখিতে লাগিলেন। তিনি কখনও এরূপ ভাবোন্মেষ দর্শন করেন নাই আর এরূপ আনন্দও তাঁহার ভাগ্যে প্রায় ঘটে নাই। তিনি বিহ্বল চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, আমরা ধন্য! হায়, এই অমূল্য সম্পদের নিকট বাস করিয়াও চিনিতে পারি নাই! অবতারের পার্ষদগণ কত গভীর! ঐশ্বর্য প্রকাশ না হইলে বিশ্বাস করিতে চাহি না, এরূপ সংশয়াচ্ছন্ন মন আমাদের! এই সব মহাপুরুষের সন্নিকটে বাস করি, কিন্তু তাঁহাদের যথোচিত শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস প্রদান করিতে অসমর্থ।

ব্রহ্মচারী ব্যাকুলভাবে গীতার কথায় প্রার্থনা করিতেছেন —

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥

* * * * *

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্॥*

(গীতা ১১-৪১/৪২/৪৪)

*অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন —

পুলিন আবার গান ধরিলেন —

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী।।
অনন্ত আঁধার কোলে, মহা নির্বাণহিল্লোলে
চিরশান্তি-পরিমল অবিরল যায় ভাসি।।
মহাকাল রূপ ধরি, আঁধার বসন পরি,
সমাধি-মন্দিরে ওমা কে তুমি গো একা বসি।।
অভয়পদ কমলে, প্রেমের বিজলী খেলে,
চিন্ময় মুখমণ্ডলে শোভে অট্ট অট্টহাসি।।

ভজন শেষ হইল, কিন্তু কিছুক্ষণ ধরিয়া আনন্দময় নীরবতা ভঙ্গ করিতে কেহ সাহসী হন নাই। অবশেষে শ্রীম অতি সুমিষ্ট কোমল সুরে কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীম — কর্মফলভোগ, এও আছে। আবার তাঁর অপরিসীম কৃপা, তাও আছে। কালু সর্দার বন্দী হয়ে পাথর চাপায় আছেন। মা দুর্গাকে স্মরণ করছেন — মার বরপুত্র তিনি। দেবী দর্শন দিলেন — তখন বলছেন, 'মা, বড় কষ্ট হচ্ছে। কেন এই দুঃখ দিলে মা?' সস্নেহে দেবী উত্তর করলেন, "বাবা, পূর্বে একটু কর্ম করেছিলে, তার ফল পাবে না?' 'কি কর্ম করেছিলাম মা?' কালু জিজ্ঞেস করায় দেবী বললেন, (সহাস্যে) 'পূর্ব জন্মে কত শত শত পাখী মেরেছ, তার

হে দেব, আপনার বিরাটরূপের মাহাত্ম্য না জানিয়া আপনাকে সখা মনে করিয়া, প্রমাদ বা প্রণয়বশতঃ হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে এইরূপ সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছি, আর হে অচ্যুত, বিহার, শয়ন, আসন, ভোজনকালে একাকী বা অপরের সমক্ষে পরিহাসচ্ছলে আপনাকে যে অসম্মান করিয়াছি, হে অপ্রমেয়, তজ্জন্য আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

হে দেব, সেই অপরাধের জন্য আমি আপনাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেছি। আপনি পূজনীয় ঈশ্বর, আপনার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি। পিতা যেরূপ পুত্রের, সখা যেরূপ সখার এবং প্রিয়জন যেরূপ প্রিয়জনের অপরাধ ক্ষমা করেন, আপনিও সেইরূপ আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।

একটু ফল না হয় ভোগ করলেই বা।’ প্রতিপক্ষ রাজাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে কালুকে কারামুক্ত করে দিতে বললেন। কবিকঙ্কণে এরূপ আছে।

ভক্ত হলে, মার শরণাগত হলে, মা দোষ ধরেন না। ক্ষমা করেন। ভক্ত না হলে এ ভোগ করতে হয়। ভক্ত হলে মা বলেন, ‘ও থাক্, একটু — ও কিছু নয়।’ ভক্তের জন্য এত স্নেহ! ঠাকুরের কথার অর্থ — Never think of your past, I will see to that. But you think of me (অতীতের কথা ভেবো না — সেটা আমি দেখবো — তুমি কেবল আমার চিন্তা কর)।

২

কুটীরপ্রাঙ্গণ। জম্বুতল বেদিকা। ভক্তগণ উপবিষ্ট। শ্রীম তাঁহার শয্যায় কুটীরাভ্যন্তরে লম্বমান। তাঁহার বয়স সপ্ততিবর্ষ হইয়াছে। আজ সকালের ভাবাবেগের প্রতিক্রিয়া শ্রীম-র শরীর ও মনে এখনও কার্য করিতেছে। তাই শয্যায় লম্বমান। এখন অপরাহ্ন চার ঘটিকা। গৃহ হইতেই বলিতেছেন, ভাগবত পাঠ আরম্ভ হউক — কালীয়দমন। দশম স্কন্ধ, ষোল হইতে আঠার অধ্যায়, পাঠ চলিতেছে। ইতিমধ্যেই তিনি বাহিরে আসিয়াছেন এবং কুটীর ও জম্বুতল বেদিকার মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপিত আসনে উত্তরাস্য উপবেশন করিলেন। সম্মুখে কার্তিক ডাক্তার, মুকুন্দ, ছোট অমূল্য, বিনয় ও জগবন্ধু। ভাগবত পাঠ সমাপ্ত হইল।

শ্রীম — (ডাক্তারের প্রতি) দেখুন, বিদ্যাশক্তি স্ত্রী হলে কেমন সুবিধা। কালীয়ের জন্য তাঁর স্ত্রীগণ plead (সুপারিশ) করাতে ভগবান কৃপা করলেন। বিদ্যাশক্তি স্ত্রী অমন হয়। ওঁরা জ্ঞানী ছিলেন। (সহাস্যে) আবার কেমন বুদ্ধি, ছেলেদের অগ্রে করে উপস্থিত।

শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করছেন, আমরা আপনার কিঙ্করী। মূঢ় জীব আপনার স্বরূপ অবগত নহে। এই সর্প আপনার ক্ষমার্হ। আপনার স্বভৃত্যের প্রথমাপরাধ ক্ষমা করুন। এ দণ্ড নিশ্চয়ই আমাদিগের প্রতি অপনার অনুগ্রহ। কেননা, অসজ্জনের প্রতি আপনার যে দণ্ডবিধি তাহাতে তাহারই পাপ নষ্ট হয়। আপনার এ ক্রোধ আমাদের মঙ্গল

বিধায়ক। এ সর্পরাজ আমাদের পতি। প্রভো, প্রসন্ন হউন। সর্পরাজের প্রাণ যে যায়। ইহার মৃত্যুতে আমাদের দুর্দশার অবধি থাকিবে না। অতএব আপনি আমাদের পতির প্রাণ দান করুন।

দেখুন, কেমন সুন্দরভাবে সব কথা গুছিয়ে বলছেন। ভিতরে ভক্তি থাকলে ভাষা আপনি আসে, আর তাতে লোক মুগ্ধ হয়ে যায়। কেমন বললেন, আমরা আপনার আশ্রিতা কিঙ্করী, পতির মৃত্যুতে সন্তানগণসহ আমাদের দুঃখের অবধি থাকবে না। তাই ভগবানের দয়া হল। যে স্বামীর ঈশ্বরলাভে সহায় হয় ঠাকুর তাকেই বলতেন, বিদ্যাশক্তি, বিদ্যাস্ত্রী।

ইংলন্ডে হয়েছিল একবার যখন উইলিয়ম্ অব অরেঞ্জ সিংহাসনে ছিলেন। লর্ড রাসেলের স্ত্রী ব্যারিস্টারদের অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন, কেমন করে plead (জেরা) করতে হবে। কিন্তু execution (ফাঁসি) হয়ে গেল, বাঁচাতে পারলে না স্বামীকে।

আবার Shakespeare (শেক্সপীয়র) এর একটি character (চরিত্র) আছে। স্ত্রীলোক তিনিও, নাম তাঁর Portia (পোর্শিয়া)। Shylock, the Jew (ইহুদী শাইলক্) নালিশ করছে for a pound of flesh from the bosom of Antonio (য়্যানটোনিওর বক্ষের এক পাউণ্ড মাংসের জন্য)। পোর্শিয়া একজন যুবক উকীলের বেশ ধরে এসে বললেন, হাঁ মাংস নাও কিন্তু খবরদার, এক ফোঁটা রক্ত না পড়ে। পোর্শিয়া য়্যানটোনিওর বন্ধুপত্নী।

এ দু'টি অবশ্য এদিককার বিষয় নিয়ে। তা হলেও এঁরা সতী স্ত্রী — একজন স্বামীর রক্ষার জন্য চেষ্টা করেছেন, আর একজন স্বামীর বন্ধুর।

শ্রীম — (জনৈক ভক্তের প্রতি) হাঁ, আপনি পরেশবাবুর নিকট থেকে astronomy-র (জ্যোতিষের) কোন পুস্তক থাকলে আনবেন। আর মিলটন থাকলেও আনবেন। কুমারসম্ভব যদি থাকে সেটিও বরং নিয়ে আসবেন। এটিতে বেশ description (চিত্র) আছে হিমালয়ের, যেখানে মহাদেব বসে তপস্যা করছেন।

(আপন মনে) শুধু বিদ্যা থাকলে হয় না, ভক্তি থাকা চাই।

ভট্টাচার্য অত বড় লোক, একটা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, খুব বিদ্বান, সংস্কৃতে master (অগাধ পাণ্ডিত্য) — আবার ফিলজফিও জানতেন। Fellow (ফেলো) ছিলেন ইউনিভারসিটির, খুব পণ্ডিত লোক। একবার লেফটেনেন্ট গর্ভনর এলেন, তাঁকে কিছু বলতে বলা হলো। সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে একঘন্টা বক্তৃতা দিলেন — খুব well-informed, well-posted (বহুদর্শী ও সুপণ্ডিত) ছিলেন। তবুও তিনি love-এ (প্রেমে) পড়ে গিছলেন। বিদ্যাসাগরমশায়রা গেলে বললেন, দেখুন আমি সব বুঝি, তবুও ছাড়তে পারছি না। হাওড়ায় বাড়ি, সেখানে স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, জামাই সব রয়েছে। তবুও বিডন স্ট্রীটে এক বাড়িতে থাকতেন। সঙ্গে দু'টি বুড়ী। আমাদের একজন বন্ধু একবার ওঁকে খুঁজতে ওখানে গিছলো। জিজ্ঞেস করায় বললে, আছেন। তখন তাঁর বয়স পঁচাশি বৎসর আর স্ত্রীলোক দু'টি বুড়ী। ভালবাসা এমন চিজ! Positive Philosophy (প্রত্যক্ষবাদ) খুব জানতেন, জাস্টিস্ দ্বারকা মিত্র এই দলের লোক ছিলেন।

অত বড় পণ্ডিত মানুষ কিন্তু পরমহংসদেবের সঙ্গে দেখা নাই। কেশব সেন কিন্তু দেখা পেলেন, আর বিদ্যাসাগরমশায়কে নিজেই দেখতে এসেছিলেন। ওঁদের অন্য পথ, তাই ওঁর খোঁজ নেন নাই, নাম শুনেও।

তাই ক্রাইস্ট বলতেন, O Father, thou hast hid these things from the wise and prudent and hast revealed them unto babes (St. Math 11 : 95). (হে পিতঃ আপনি এই সকল পণ্ডিত ও বিচক্ষণ লোকের নিকট এই সব দূরে রাখিয়া দেন; কিন্তু সরল শিশুর নিকট প্রকাশ করিয়াছেন)। দেখ না, নিরক্ষর জেলেমালোরা সরল বিশ্বাসের ফলে ভগবানকে পেল। কিন্তু পণ্ডিতরা পায় না, যেমন উইয়ের ঢিপিতে জল দাঁড়ায় না, নিচু ভাল।

অনেকে principle (নীতি) সম্বন্ধে preach (প্রচার) করতে পারে, উহা intellectual discussion-এর (জ্ঞানবিচারের) পক্ষে ভাল — হয়ত good philosophy — যুক্তিবিচারের দিক দিয়ে ভাল হলো। কিন্তু practice-এ (ব্যবহারিক কাজে) না আনতে

পারলে কিছুই দাম নাই। জীবনে দেখান চাই।

শুধু speech (বক্তৃতা) দিলে কি হবে? যেমন আতর আছে শিশিতে, এতে কিছু গন্ধ পাওয়া যাবে না। তুলায় নিতে হবে নাকের কাছে ধরতে হবে, তবে গন্ধ পাওয়া যাবে। শুধু principle (নীতি) সম্বন্ধে বললে কি হবে, উহা philosophy (দর্শন) বটে, কিন্তু religion (ধর্ম) নয়। The end of philosophy is the beginning of religion (দার্শনিক আলোচনা বন্ধ হলেই ধর্মজীবন আরম্ভ হয়)। Principle practice-এ (নীতিকে ব্যবহারিক প্রয়োগে) পরিণত করার নামই religion (ধর্ম)। Practice-এ (অভ্যাসে) পরিণত হলে তখন লোকের বিশ্বাস হবে।

পরমহংসদেব যা বলেছেন এসব তাঁর নিজের জীবনে ঘটেছে — হাতে এনেছেন (অর্থাৎ নিজে করে দেখিয়েছেন)।

তবে তো লোক ওঁর কথা এত নিচ্ছে এখন। বিশ্বাস করছে, বলছে — হাঁ এমন একটি লোক ছিলেন, যিনি নিজ জীবনে এসব কথা, এসব তত্ত্ব অনুভব করেছেন — যিনি ঈশ্বরদর্শন করে কথা কয়েছিলেন। অতএব আমরা তাঁর কথা শুনবো। এতে আমাদের কল্যাণ হবে। যদি শুধু বলতেন, জীবনে না দেখাতেন, হাতে না আনতেন, কেউ শুনতো না।

It is personality that matters (জীবন্ত আদর্শের প্রয়োজন) — এ বড় সত্য কথা! দেখ না ক্রাইস্ট, তাঁর সঙ্গে থেকে নিরক্ষর ধীবরগণ আর সামান্য লোক সব জগৎগুরুর আসনে আসীন হলেন। Towering personality-র (অতিমানবের) কাছে থাকলে নিরক্ষর কৃষক — rustic-ও God (দেবতা) হয়ে যায়। যীশুর অন্তরঙ্গরা প্রায় সবই ঐ রকম ছিলেন।

নিজের মায়ের 'অন্তর্জলি'র সময় বকুলতলার ঘাটে পায়ে ধরে ঠাকুর বললেন, 'মা, তুমি কে গো আমায় গর্ভে ধারণ করেছ।' নিজেকে নিজে জানতেন কিনা — ঈশ্বর মানুষশরীর ধারণ করে এসেছেন, তাই এই কথা বললেন!

ঠাকুর বলতেন, এ সংসারের সবই মা। মা-ই বৃক্ষ লতা, পশু-

পক্ষী, কীট পতঙ্গ, মনুষ্য দেবতা — এ সব তিনি। তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। বেদে আছে — তুমিই পুরুষ, তুমিই স্ত্রী, তুমিই কুমার, তুমিই কুমারী, তুমিই যুবক, তুমিই বৃদ্ধ — হাতে লাঠি নিয়ে চলছো। সবই তিনি, জগন্মাতা। চণ্ডীতে আছে, যত স্ত্রী সব তাঁর অংশভূতা, সব মাতৃমূর্তি।

ডাক্তার — আজ্ঞে, ভগবানদর্শন হলে তো সর্বভূতে তাঁকে, জগন্মাতাকে দেখা যাবে?

শ্রীম — দর্শন না হলেও গুরুবাক্যে বিশ্বাস হলেই হয়ে গেল। গুরুবাক্যে বিশ্বাসই alternative (উপায়ান্তর)।

সন্ধ্যা এইবার সমাগতা। শ্রীম ঠাকুরঘরে ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া ধ্যান করিতেছেন। ধ্যানান্তে কথামৃত পাঠ হইল। তৎপর পুলিনবাবু ভক্তিপূর্ণ চিত্তে মায়ের কয়েকটি সুমিষ্ট ভজন গাহিলেন। ভজনও সমাপ্ত হইল।

শ্রীম ডাক্তারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, সবাইকে যদি মা মনে করা যায়, তবে তো হয়ে গেল। মা এমন জিনিস! একজন ভক্ত (শ্রীম) জিজ্ঞেস করেছিলেন, নিজ গর্ভধারিণীর মূর্তি ধ্যান করতে পারেন কিনা। তাতে ঠাকুর উত্তর করলেন, 'হাঁ খুব পার, মা আদ্যাশক্তিরূপিণী, ব্রহ্মস্বরূপিণী। মায়ের কথা স্মরণ হলে ইন্দ্রিয়-টিন্দ্রিয় আপনা আপনি দমন হয়ে যায়।'

পুলিন — মহারাজ একটি মন্ত্র বলেছিলেন। বললেন, এটি যদি কেউ আবৃত্তি করে আর কামরূপে কামাখ্যা দেবীর দর্শন ও স্পর্শন করে, সে সিদ্ধ হয়ে যেতে পারে।

শ্রীম — মন্ত্রটি কি বলুন তো?

পুলিন — মনোভব গুহামধ্যে রক্তপাষাণরূপিণী।
যস্যা স্পর্শমাত্রেন পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

মহারাজ বলতেন, কামাখ্যায় গেলে এ মন্ত্র উচ্চারণ করে দেবীকে স্পর্শ করতে হয়।

শ্রীম — তাই তো দেখুন, গুরুর নিকট এমন অমূল্য রত্ন পেয়েছেন, বিশ্বাস করলেই হয়ে গেল। ঠাকুর ছাগলের দলে বাঘের

বাচ্চার গল্প বলতেন। বাঘের বাচ্চা ছাগলের সঙ্গে থেকে থেকে ভ্যা ভ্যা করছে। নিজে যে বাঘ তা জানে না। (পুলিনের প্রতি) আপনার অবস্থাও এরূপ হয়েছে। জানেন ত গল্পটা। একটা বাঘিনী মরে যায় একটা বাচ্চা প্রসব করে। ছাগলের দলকে আক্রমণ করেছিল কিনা। এখন বাচ্চাটি ছাগলের দলে বড় হতে লাগলো। ঘাস খায়, আর ভ্যা ভ্যা করে ওদের মত। একদিন আর একটা বাঘ ঐ দল আক্রমণ করতে এসে দেখে একটা বাঘের বাচ্চা। ওটাকে এসে ধরে ফেললে। আর ওটা অমনি ভ্যা ভ্যা করতে আরম্ভ করে দিলে। শেষে জলের কাছে নিয়ে গেল। জলে প্রতিবিম্ব দেখালে, আর খানিকটা মাংস মুখে গুঁজে দিলে। বললে, এই দ্যাখ্, তুইও যা আমিও তা — তুই বাঘ।

(পুলিনকে) আপনিও জানেন না আপনাকে, তাই আপনার এরূপ অবস্থা।

১০ই চৈত্র, ১৩২৯ সাল।
২৪শে মার্চ, ১৯২৩ খ্রীঃ।
শনিবার, ঁবাসন্তী সপ্তমী।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

পুরুষকার আর কৃপা — বস্তু একটি

আজ বাসন্তী মহাষ্টমী। আশ্রমবাসী সকলে শীঘ্র স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া ঠাকুরমন্দিরে সমবেত হইয়াছেন। শ্রীম তাঁহার নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট। পুলিনবাবু অতি সুমিষ্ট স্বরে চণ্ডীর দেবীস্তুতি হারমোনিয়াম সহযোগে গান করিতেছেন।

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমো প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্॥ (৫/৯)

সম্পূর্ণ স্তুতিটি গাহিলেন। তারপর গাহিতেছেন দেবীপ্রার্থনা —

দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ, প্রসীদ মাতর্জগতোঽখিলস্য।
প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং ত্বমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য॥
আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদাপ্যায়তে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্যে॥
ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ॥
বিশ্বেশ্বরি ত্বং পরিপাসি বিশ্বং বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।
বিশ্বেশবন্দ্যা ভবতী ভবন্তি বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ॥*
(১১/৩-৬ এবং ৩৩)

---

*দেবগণ অসুরবধের পর দেবীকে স্তব করিতেছেন —

হে দেবী, আপনি ভক্তজন-দুঃখহারিণী, অতএব আমাদের প্রতি আপনি প্রসন্না হউন। হে জগজ্জননী, হে বিশ্বেশ্বরী, আপনি প্রসন্না হইয়া বিশ্ব পরিপালন করুন। হে মহাশক্তিরূপিণী, আপনি পৃথিবীরূপে বিরাজমানা হইয়া একাকিনীই জগতের আশ্রয়। আপনি আবার জলরূপে পরিণত হইয়া সমগ্র বিশ্বের পুষ্টিসাধন করিতেছেন।

এখন প্রণামমন্ত্র গাহিয়া ভজন শেষ করিতেছেন।

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।(৫/৭১-৭৩)
সর্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।। (১১/১০)
সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥ (১১/১১)
শরণাগতদীনার্ত-পরিত্রাণপরায়ণে।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।** (১১/১২)

অনেকক্ষণ ধরিয়া সকলে ধ্যান করিতেছেন। ঠাকুরঘরে একটি প্রশান্ত গম্ভীর ভাব বিরাজ করিতে লাগিল। এইবার শ্রীম কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীম — তাঁর শরণাগত হলে আর ভাবনা নাই। ‘বিশ্বাশ্রয়া যে ত্বয়ি ভক্তিনম্রাঃ।’ তাঁর শরণাগত যাঁরা, তাঁদের তো কল্যাণ হবেই,

---

হে দেবী, আপনি অসীম শক্তিশালিনী, আপনি বিষ্ণুর জগৎপালিনী মহাশক্তি। আপনি বিশ্বের আদিকারণ মহামায়া। আপনি বিশ্বকে বিমোহিত করিয়া আছেন, আবার প্রসন্না হইয়া প্রণতজনের মুক্তিবিধান করেন। হে দেবী, সকল বিদ্যা আপনারই অংশ, নানাগুণ-বিভূষিতা সকল স্ত্রী আপনারই রূপ। জননীরূপিণী আপনিই এই বিশ্বের অন্তরে বাহিরে বিরাজিতা রহিয়াছেন। আপনি বাক্‌রূপিণী, অতএব বাক্যরূপ স্তবদ্বারা কি করিয়া আপনার স্তব করিব?

হে দেবী, আপনি ব্রহ্মাদি দেবগণের পরম পূজনীয়া। আপনি বিশ্বরূপিণী, আপনিই বিশ্বপালিনী। আপনারই কৃপায় আপনার ভক্তগণ সুখশান্তি বিধান করিয়া জগজনের আশ্রয়স্থল হইয়া থাকেন।

**দেবগণ দেবীকে প্রণাম করিতেছেন —

হে দেবী, আপনি সর্বমঙ্গলা আবার সর্বমঙ্গলদায়িনী। আপনি ত্রিনয়নী গৌরী। আপনি বিশ্বের আশ্রয়রূপিণী, আপনাকে প্রণাম। হে দেবী, আপনি সৃষ্টিস্থিতি-সংহারকারিণী মহাশক্তি। আপনি সনাতনী, গুণাতীতা হইয়াও গুণময়ী। আপনাকে প্রণাম। হে দেবী নারায়ণী, আপনি শরণাগত, দীন ও আর্তজনের মুক্তিদায়িনী। আপনি জীবগণের ত্রিতাপনাশিনী, আপনাকে প্রণাম। হে দেবী, হে মাতঃ, আপনি সর্বভূতে স্নেহরূপিণী মাতৃশক্তি। আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম।

আবার তাঁরাই বিশ্বের আশ্রয়। এই সংসারে যথার্থ সুখশান্তি নেই। তাঁর ভক্তগণ জগতে এই সুখশান্তির পথ জনগণকে দেখিয়ে দেন। তাই তাঁরা বিশ্বের আশ্রয়স্বরূপ। কত বড় কথা! তাই বলে, 'আমার ভক্তি যেবা পায়, সে যে সেবা পায় হয়ে ত্রিলোকজয়ী।' ভক্ত এত বড় জিনিস! দেখতে মনে হয় সামান্য, কিন্তু দেবতারাও ভক্তের এই গভীর মাহাত্ম্য কীর্তন করছেন।

তাই তো ঠাকুর বলেছেন, 'ভক্ত মরলেও লাখ টাকা, বাঁচলেও লাখ টাকা — যেমন হাতী।' গীতায় বলেছেন, 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।' — আমার ভক্তের বিনাশ নাই। ভক্তের বিনাশ হলে বাঁচবে কে? তাই চণ্ডীতে এই কথা — 'ভক্ত জগতের আশ্রয়'। বেদেও বলেছেন — 'আপ্নোতি স্বারাজ্যম্'। ভক্ত সাম্রাজ্য লাভ করে জগতের অধীশ্বর হন। বাহ্য জগতের নয়, অন্তর্জগতের, ধর্মজগতের। তাই তো নেপোলিয়ন বলেছিলেন সেন্ট হেলেনাতে ম্যাপে জেরুসালেমকে দেখিয়ে — His kingdom will last for ever, my kingdom is gone (এঁর সাম্রাজ্য চিরকাল থাকবে, আমার সাম্রাজ্য এরই মধ্যে বিনষ্ট হয়ে গেল)। ক্রাইস্টকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন এই কথা। নেপোলিয়নের রাজ্য রইল না, কিন্তু যাবৎ জগৎ থাকবে, ক্রাইস্টের ধর্মরাজ্য তাবৎ থাকবে।

ভক্ত এমন জিনিস! তাই বেদে বলেছেন, 'ভূতিকাম' অর্থাৎ জাগতিক মঙ্গলও যারা চায় তারাই তো ভক্তের পূজা করবে। ভক্ত মানে, যারা ঈশ্বরকে জেনেছেন অথবা জানবার জন্য ব্যাকুল।

এই চণ্ডীতেই এক স্থানে বলেছেন দেবতারা — 'ত্বমাশ্রিতাম্ হি আশ্রয়তাং প্রয়ান্তি'। তোমাকে যাঁরা আশ্রয় করেন অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তগণ, তাঁরা অপরের আশ্রয়স্থল। তাঁদের সেবা করে, সঙ্গ করে, তাঁদের কথা শুনে সুখদুঃখপূর্ণ সংসারের জনগণ শান্তি পায়।

তাই বিপদে পড়ে তাঁকে ডাকতে হয় — মা শরণাগত, মা শরণাগত — এই বলে। দেবতারা বড্ড বিপদে পড়েছিলেন কিনা! তাই ডেকেছিলেন। দেবী অসুর বধ করলেন। তখন আবার তাঁকে শান্ত করবার জন্যও স্তব করতে লাগলেন, নইলে জগৎ থাকে না।

সম্পদে বিপদে সর্বদা তাঁকে ডাকতে হয়।

(সহাস্যে) দেবতাদের অহংকার হয়েছিল একবার। একটি তৃণ দিলেন, 'পোড়াও তো এটা।' এত বড় দেবতা অগ্নি — পারলেন না পোড়াতে। পবনও পারলেন না নাড়াতে। শেষে বুঝি ইন্দ্র এসে জানতে পারলেন যে, ব্রহ্মশক্তি ছদ্মবেশে এসেছিলেন। দেবতাদের কৃপা করতে মা এসেছিলেন। বেদে আছে এ গল্পটি।

তাই তাঁর পূজা করতে হয়। সুরথ রাজা এই বসন্তকালে মায়ের পূজা করেছিলেন। রাবণবধের পূর্বে রামচন্দ্র মায়ের পূজা করেছিলেন — অসময়ে শরৎকালে। ব্রহ্মশক্তির পূজা। ঠাকুর এই ব্রহ্মশক্তিকে 'মা, মা' বলে ডাকতেন। শুধু ডাকতেন না, সর্বদা দেখতেন। বেদে যাঁকে বলেছে 'নিগূঢ়া' — অর্থাৎ খুব কঠিন তাঁকে জানা। ভোগবাসনা থাকলে জানতে পারে না। তবে তাঁর কৃপায় সহজ হয়ে যায়।

এ সময় ঠাকুর না এলে এসব কথা কেউ বিশ্বাসই করতো না। তিনি দেখলেন, কথা কইলেন, আবার অন্যদের দেখালেন। Max Muller (ম্যাক্সমূলার) বুঝি বলেছিলেন এই কথা — রামকৃষ্ণ না এলে বেদাদি শাস্ত্র বর্তমান যুগে অপ্রমাণ হয়ে যেতো। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যসন্তান বলে তাই স্বামীজীকে কত আদর, কত সম্মান করলেন!

'মা, প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও' — এ বলে পূজো করতে হয়। ফুলচন্দন ছাড়াও তাঁর পূজা হয় তাঁর শরণাগত হয়ে। প্রার্থনাও তাঁর পূজা। শুধু নমস্কার করলেও তাঁর পূজা। নমস্কারের মানেই এই, মা আমি তোমার শরণাগত, শরণাগত।

তাঁর মায়াতে জগৎ 'সম্মোহিত'। কার সাধ্য এ মায়া ভেদ করে? দেবতারাও পারেন নাই। তাই সর্বদা প্রার্থনা। শরণাগত না হলে এ মায়া ভেদ হয় না। গীতায়ও তাই বলেছেন। মায়া ভেদ হলেই চিরশান্তি।

জগতের সমস্ত স্ত্রীলোক, তা-ও তিনি — দেবতারা বলেছেন এ কথা। তাই স্ত্রীলোকদের পূজা করতে হয় 'মা' বলে, জগন্মাতার অংশসম্ভূতা বলে। কামটাম কোথায় যায় তখন!

ঠাকুর এই মা বই কিছুই জানতেন না, সব কথাতেই মা!

তোতাপুরী জিজ্ঞেস করলেন, বেদান্তসাধন করবে? 'আচ্ছা মাকে জিজ্ঞেস করে আসি' — এই বলেই মন্দিরে গেলেন। সহাস্য বদনে এসে বললেন, 'হাঁ, মা বলেছেন।' তোতাপুরী তো অবাক, কোথায় এর মা? উনি মনে করেছিলেন গর্ভধারিণীর অনুমতির জন্য গেছেন। ঠাকুর বললেন, 'কেন, ঐ মন্দিরে মা রয়েছেন।' তাই, মা বই কিছু জানতেন না। মায়ের ছেলে — child of the universe — the eternal babe — বিশ্বের সনাতন শিশু!

ঐ স্তবে দেবতারা বলেছেন, যাঁরা জগন্মাতার আশ্রিত, তাঁরা জগতের আশ্রয়। এর দৃষ্টান্ত ঠাকুর। এদিকে মায়ের ছেলে, শিশু। আবার সমস্ত জগৎ তাঁকে পূজা করছে — সকলের আশ্রয়। অতুলনীয় পুরুষ!

একবার মা-ঠাকরুন একটি স্ত্রী ভক্তকে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ মা কত সাধু দেখলাম; কিন্তু ঠাকুরের সঙ্গে তুলনা হয় না।' স্ত্রী ভক্ত বললেন, 'মা যে কি বল! অন্য সাধুরা আসেন উদ্ধার হতে, আর তিনি এসেছেন উদ্ধার করতে।' মা সহাস্যে বললেন, 'তাই মা!' ভক্তটির পরীক্ষার জন্য বলেছিলেন।

গীতায় তাই বলেছেন,

'পরিত্রাণায় সাধূনাং, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ (গীতা ৪-৮)।

সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কর্মকারিগণের বিনাশ, আর ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।' সাধুগণের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর অবতীর্ণ হন, মানুষশরীর ধারণ করেন। ব্রহ্মশক্তি মানুষ হয়ে আসেন। তাই কোথায় পাবে তাঁর তুলনা? তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ বলতেন, আবার ব্রহ্মশক্তিরই অবতার ঠাকুর। অবতার কি চারটিখানি কথা!

আহা, কি বস্তু যে ছিলেন তিনি, আপনারা দেখেন নাই কিনা! সর্বদা মায়ের কোলে শিশু। সর্বদা, 'মা, মা' — মা ছাড়া কিছু জানেন না। তাই Digby (ডিগবি) সাহেব বলেছেন, he revealed God unto weary travellers (শ্রীরামকৃষ্ণ পথশ্রান্ত পথিককে

ঈশ্বরদর্শন করাইয়াছেন)! আবার কুম্ভকারের মত মানুষের মন নিয়ে খেলতেন। কুমোর, দেখেন নাই, মাটির তাল হাতে নিয়ে ঘট, সরা সব তৈরী করছে — ইচ্ছামত গড়ছে, ভাঙ্গছে? তেমনি ছিলেন তিনি। মানুষের মনকে ইচ্ছামত গড়তেন, ভাঙ্গতেন। এদিকে শিশু, আবার ওদিকে বিধাতা। Avatar is the meeting-point of all contradictory forces (সকল বিরুদ্ধভাবের সম্মেলনক্ষেত্র অবতার)।

যাদের লক্ষণ ভাল দেখতেন তাদের অন্তত তিনদিন কাছে রেখে দিতেন। কারণ তিনদিন কাছে থাকলেও ওঁর কতক সত্ত্বা এসে পড়বে তার উপর। একবার একজন ভক্ত তিনদিন রয়েছেন। ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, 'ক'দিন হলো?' ভক্তটি বললেন, 'আজ্ঞে তিন দিন।' ঠাকুর বললেন, 'তবে আর কি? যাও মার কাছে, গিয়ে বল, মা সব করবেন।'

সব মার নামে। নিজের অহঙ্কার নাই কিনা! করে দিলেন সব নিজে, কিন্তু বললেন মার নামে — 'যাও, মার কাছে গিয়ে বল, মা সব করবেন।' তিনি বলতেন, 'ঈশ্বরকোটির অহঙ্কার যায় — জীবকোটীর যায় না।' ঈশ্বরকোটি যেন মূলোগাছ, উপড়ে আন, একেবারে শিকড়শুদ্ধ চলে আসে। আর জীবকোটি যেমন অশ্বত্থ গাছ — আজ কাট কালই আবার ফেঁকড়ি বের হবে। অবতার মূলোগাছ।

আজ সকালে রামপুরহাট স্কুলের দুইজন শিক্ষক ও একটি ছাত্র আসিয়াছেন তাঁহারা আজই চলিয়া যাইবেন।

২

একটি বয়স্ক ভক্ত কথাপ্রসঙ্গে যুবতী স্ত্রী, কামটাম এসব কথা উত্থাপন করিলেন। শ্রীম তৎক্ষণাৎ কথার স্রোত বিপরীত দিকে প্রবাহিত করিলেন। একটি ব্রহ্মচারীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হাঁ, কাল পুলিনবাবুর ঐ শ্লোকটা কি ছিল বলুন তো। ব্রহ্মচারীর কণ্ঠস্থ — বলিলেন,

'মনোভব গুহামধ্যে রক্তপাষাণরূপিণী।
যস্যা স্পর্শমাত্রেণ পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।'

শ্রীম — এই দেখুন, এটি একটি মন্ত্রবিশেষ। একজন যদি সারা জীবন কেবল ঐটি জপ করে তো সিদ্ধ হয়ে যায়, ভগবানদর্শন করতে পারে। করে কই লোক? খালি বকে আবোল তাবোল!

চণ্ডীতে আছে, মা-ই সব স্ত্রী হয়ে রয়েছেন — জগন্মাতা। মাতৃভাব আনলে কোথায় যায় কামটাম তার নাই ঠিক। মাতৃভাব অতি শুদ্ধভাব। ঠাকুর বলতেন, 'আমার মাতৃভাব, সব মাতৃযোনি।'

এইবার ডাক্তার বক্সী ও ছোট অমূল্যকে লইয়া শ্রীম বারান্দায় আসর করিয়াছেন। এরা উভয়েই বিবাহিত। অবিবাহিতদের এ আসরে স্থান নাই। গার্হস্থ জীবন কি করিয়া যাপন করিতে হয়, স্ত্রীপুত্রাদিকে কি ভাবে দেখিতে হয়, অর্থোপার্জন, সাধনভজন প্রভৃতি নানাবিষয়ক কথা হইতেছে। কখনও গাম্ভীর্য, কখনও রসিকতা চলিতেছে। অদূরে কার্যব্যাপৃত জনৈক ভক্ত শুনিতে পাইলেন রহস্যচ্ছলে শ্রীম বলিতেছেন —

তিব্বতে একজন স্ত্রীলোককে ছয়জনে বিয়ে করে (সকলের উচ্চহাস্য)। আমাদের দেশের কথায় ওরা বলে, ওমা, কি স্বার্থপর লোক এরা, একজন স্ত্রীলোককে একজন পুরুষ একা রাখে (সকলের হাস্য)। যারা বিয়ে করেছে তাদের অন্তত এক মাস গিয়ে ওদেশে থেকে আসা উচিত।

শ্রীম — (গম্ভীরভাবে) মন কখন কি ভাব ধারণ করে — তাই সর্বদা প্রার্থনা, আর হুঁশিয়ার হয়ে থাকতে হয়। আর যা যা বলেছেন ঠাকুর, তা পালন করতে হয়, অন্তত চেষ্টা করতে হয়। চেষ্টা করলে খেদ মেটে, শেষে মনকে বোঝান যায় — না, আমি করেছি কিছু। মন বড় treacherous (বিশ্বাসঘাতক) — এই ভাল, এই মন্দ। এই স্বর্গে উঠিয়ে দিচ্ছে, আবার নরকে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে নির্মমভাবে। তাই শরণাগত, সর্বদা প্রার্থনা — মা, প্রসন্ন হও, মা প্রসন্ন হও। ঠাকুর কি সাধে বলতেন, পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে! ব্রহ্মা বিষ্ণু অচৈতন্য। অবস্থা বড় গুরুতর! জলধর সেন পণ্ডিত লোক, বৈরাগ্য করে সাত বৎসর হিমালয়ে তপস্যায় কাটালেন। কিন্তু শেষে এসে বিয়ে করলেন এই বুড়ো বয়সে। বড় ভীষণ চিজ্ সংসার! তাই

সর্বদা প্রার্থনা নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে, রক্ষা কর প্রভো, রক্ষা কর — বলে।

আর সর্বদা সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গে অনেক রক্ষা। ঐটি করলে অনেক বিপদ কেটে যায়। ভক্তদের তাই নিত্য মঠে যাওয়া উচিত। না গেলে পস্তাতে হবে পরে। যখন শক্তি থাকে শরীরে, জোর করে করতে হয় সাধুসঙ্গ। অনেকের চৈতন্য হয় পরে, but then it is too late — কিন্তু তখন আর সময় থাকে না। ইচ্ছা থাকলেও পারে না। শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে মনও অবসন্ন হয়। তাই শক্তি থাকতে থাকতে করে নিতে হয়।

(একটু চুপ থাকিয়া স্বগত) সং—সার! সং-ই সার এখানে। অহরহ সং চলছে! তাঁর ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে। তাঁর শরণাগত হলে সং সাজতে হয় না। খাটুনি কমে যায়, ছুটি দিয়ে দেন। শরণাগত শরণাগত, প্রভো।

অশ্বত্থতল, অপরাহ্ন একটা। শ্রীম ও অন্তেবাসী বসিয়া আছেন। ঈশ্বরের কথাপ্রসঙ্গ হইতেছে। অন্তেবাসীর কয়েকটি সংশয় উপস্থিত হইয়াছে তাই প্রশ্ন করিতেছেন।

অন্তেবাসী — আজ্ঞে সবই যদি ঈশ্বরের কৃপায় হয়, তবে পুরুষকারের স্থান কোথায় ধর্মজীবনে?

শ্রীম — পুরুষকার ব্যতীত কৃপা সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। তাই কৃপা বুঝবার জন্যও পুরুষকারের প্রয়োজন, যেমন ক্ষুধার্ত হলেই অন্নের প্রয়োজনীয়তা কত বড় বোঝা যায়, তেমনি। পুরুষকারও তাঁর দান। 'পৌরুষং নৃষু'। তিনি নিজেই পৌরুষরূপে মানুষে আছেন। আবার কৃপাও তিনিই। পুরুষকার ও কৃপা পৃথক বস্তু নহে, একই জিনিস অবস্থা ভেদে দু'রকম দেখায়। তাঁর ইচ্ছাতেই কারো কারো ভিতর তীব্র পুরুষকার দেখা যায়।

একজন কঠোর ভজনে নিমগ্ন, এই যে পুরুষকার, এ তাঁরই দান। সাধক মনে করছে, আমি দিবানিশি ধ্যান করে তাঁকে দর্শন করবো। তাই কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন। এও ঈশ্বরের দেওয়া। তাঁরই ইচ্ছায় এরূপ দৃঢ় সংকল্প হয়েছে। তপস্যা সব তিনিই করিয়ে নেন, কেন

করান — তার অর্থ, লোকশিক্ষা। কতকগুলিকে দিয়ে করিয়ে নেন, তবে অন্যরাও দেখে করবে সব, তাই। ঠাকুর বলতেন, তিনি মাছের তেলে মাছ ভাজেন। তাই কতকগুলির ভিতর তীব্র পুরুষকার দেন।

যেমন বুদ্ধদেব, কি কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন! শেষে একটি করে তিল দিনে খেতে লাগলেন। শরীর কঙ্কালসার হয়ে গেল। কেন এ উদ্যম, এ চেষ্টা? না, লোকশিক্ষার জন্য।

ঠাকুর বলতেন, পঞ্চবটীতে পড়ে পড়ে কাঁদতুম, আহার নিদ্রা নাই। মাটিতে পড়ে আছি। হয়ত সাপ উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। কাঁদতুম আর বলতুম, 'মা দেখা দাও, মা দেখা দাও — আর একটা দিন গেল মা, দেখা দাও।' এই উদ্যম, উৎসাহ দেখালেন কেন? জগতের শিক্ষার জন্য। তাঁর নিজের কি প্রয়োজন? স্বয়ং ঈশ্বর মানুষশরীর ধারণ করে এসেছেন। এখন লোকশিক্ষা দিতে হবে, তাই এত সব করলেন। তা দেখে অন্যেরাও করবে।

ঠাকুর বলতেন, 'বনত বনত বনি যাই' — এ ভাব আমার ভাল লাগে না। উঠে পড়ে লাগতে হবে, এক্ষুনি চাই — 'বনত বনত' নয়, আজ এই মুহূর্তে। ডাকাতপড়া ভাব।

চেষ্টা উদ্যম ছাড়া জগৎ চলে না। গীতায় তাই বলেছেন, 'উৎসীদেয়ু ইমে লোকাঃ'। (গীতা ৩-২৪) - বললেন, এ সংসার উচ্ছন্ন যাবে যদি আমি কাজ না করি, চেষ্টা না দেখাই। আমি না করলে কেউ করবে না। তাই নিজে তিনি পুরুষকার দেখান অবতার হয়ে। আবার কতকগুলিকে দিয়ে ঐ সব করিয়ে নেন অপর সকলের শিক্ষার জন্য।

যেমন, একটি লোক মস্ত একটা বোঝা উঠাবে। রাস্তার পাশে চেষ্টা করছে প্রাণপণ, উঠাতে পারছে না। এর এই চেষ্টা দেখে একজন লোক এসে উঠিয়ে দিলে। এই ব্যক্তির অনুগ্রহ কত তা বুঝতেই পারতো না, যদি প্রাণপণ চেষ্টা না করতো। আবার এই চেষ্টা দেখেই অপর ব্যক্তিরও দয়া হলো।

তাই পুরুষকারের স্থান ধর্মজীবনে অতি উচ্চে। এ চাই-ই, এ ছাড়া ধর্মজীবন গঠিতই হতে পারে না। একজন সোঽহং-ভাবে

সাধন করছে, পদে পদে তার বিপরীত ভাবের সঙ্গে যুঝতে হচ্ছে। অর্থাৎ আমি মানুষ, দুর্বল ইত্যাদি depressing (হতাশ) ভাব সব আসছে। এর সঙ্গে দিনরাত লড়াই করতে হবে — আমি আত্মা, আমি ব্রহ্ম, এই ভাব নিয়ে — তবে পাকা হবে। অভ্যাস চাই। উদ্যম ছাড়া অভ্যাস হয় না। তাই এর অতি প্রয়োজন। একজন ভক্ত — সে কাঁদাকাটা, প্রার্থনা এই সব কাজ করছে, এতে উদ্যম নাই? প্রভো, আমি দুর্বল, শক্তি দাও, এটা করে দাও, এগুলি কি? এ সবই পুরুষকার। বসে বসে কৃপা কৃপা করলে কৃপা হয় না। কৃপা লাভের জন্য অবস্থার প্রয়োজন। নিজের উদ্যম ও চেষ্টায় যখন ধরতে পারছে না, কম পড়ে যাচ্ছে, তখনই তাঁর কৃপা হয়। তখন প্রার্থনাও ঠিক হয়।

'ডানা ব্যথা করা', ঠাকুর বলতেন। উড়ে উড়ে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে পাখী তখন চুপ করে বসে শান্তভাবে। ঠাকুর একটি গল্প বলতেন, একটা বন্দরে জাহাজ লাগলো। তখন একটা পাখী মাস্তুলে এসে বসে আছে। জাহাজ বন্দর ছেড়ে সমুদ্রের ভিতর অনেক দূর চলে গেছে। পাখীটা তখন তীরে আসবার জন্য পূর্ব পশ্চিম সব দিক উড়তে লাগলো। কোনও দিকে কুলকিনারা না দেখে ফিরে এসে মাস্তুলে চুপ করে বসে রইল। তখন শান্তি তখনই নির্ভরতা — যা কর তুমি। আর তখনই তাঁর কৃপাও হয়। ঠাকুর বলতেন, তাঁর জন্য এক হাঁটু জলে নামলে, তিনি গলা জল থেকে এসে উঠিয়ে নেন। তাই চেষ্টা ও উদ্যমের বড়ই প্রয়োজন। বেদেও বলেছেন, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' — ওঠ, জাগো — মানে চেষ্টা কর। চেষ্টা ছাড়া হয় না।

দেখ না, বাইরের জগতেও উদ্যম, চেষ্টার কত দরকার। জীবনধারণই হতে পারে না এ ছাড়া। হাঁ, একটা অবস্থা আছে তখন বাহ্য চেষ্টা থাকে না। তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যায়। যেমন, ভক্ত ধোপার কাপড় মাড়িয়ে দিলে ধোপা মারতে এলো, তখন ঈশ্বর নিজে রক্ষা করতে এলেন। এ অবস্থা — সে অনেক দূর!

West-এর (প্রতীচীর) লোকেরা উদ্যমশীল এই সাংসারিক বিষয়ে। কেমন পুরুষকার — তাই বীরভোগ্যা বসুন্ধরা ভোগ করছে,

সমস্ত জগৎটা। পার্থিব বিষয়েই যদি পুরুষকারের এত দরকার, ধর্মজীবনে এর প্রয়োজন কত অধিক! কিন্তু হিন্দুদের বৈশিষ্ট্য আত্মানুশীলনের উদ্যমপ্রকাশে।

ধ্রুবর কি পুরুষকার, পাঁচ বছরের শিশু! আবার কিশোর নচিকেতা — কি uncompromising (অদম্য) মনের জোর! এসব দৃষ্টান্তও তিনি লোকশিক্ষার জন্য করেছেন।

পুরুষকার আর কৃপা — বস্তু একটি। এক end-এ (প্রান্তে) পুরুষকার অপর end-এ (প্রান্তে) কৃপা।

অন্তেবাসী — (বিনীতভাবে) আজ্ঞে, আমাদের সংশয় কিন্তু যেতে চায় না।

শ্রীম — ঈশ্বরদর্শন করলে তবে সংশয় যায়, তার আগে থাকে — 'ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ' তখনই। ভয়ের কারণ নাই, এ থাকে। কিন্তু চেষ্টা করতে হয়। উদ্যম ছাড়তে নাই। ক্রমে তাঁর কৃপায় সংশয় যায়।

অন্তেবাসী — আজ্ঞে তেমন চেষ্টাও তো আসে না, পুরুষকারও তেমন নাই।

শ্রীম — ক্রমে ক্রমে হচ্ছে। তাঁকে প্রার্থনা করলে তিনি সব করিয়ে দিবেন। তিনি সর্বদা দেখছেন, ভয় নাই — যেমন বাপ ছেলেকে দেখে।

৩

মিহিজাম আশ্রমপ্রাঙ্গণ, জম্বুতল। ভাগবত পাঠ হইতেছে। ডাক্তার, ছোট অমূল্য, বিনয়, মুকুন্দ, জগবন্ধু আর ছোট জিতেন বসিয়া আছেন বেদীর উপর। শ্রীম চেয়ারে বসা। ছোট জিতেন আজ কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। ভাগবত দশম স্কন্ধ, ত্রয়োবিংশ অধ্যায় পাঠ চলিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণের দ্বারা যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদের নিকট অন্নভিক্ষা চাহিতেছেন।

শ্রীম — দেখ, তাঁর কিরূপ মায়া, চিনতে দিলে না ব্রাহ্মণদের। যিনি স্বয়ং ভগবান তিনি ভিক্ষা চাইছেন, কিন্তু দিলে না। তাদের

কি দোষ, যেমন তিনি রেখেছেন। এদিকে অত বড় পণ্ডিত সব — বেদজ্ঞ আবার বহুদর্শী, কিন্তু তাঁকে চিনতে পারলে না।

পাঠ চলিতেছে — শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'তোমরা বিপ্রপত্নীগণের নিকট গিয়ে আমার নাম করে চাও'। শ্রবণমাত্রই বিপ্রপত্নীগণ চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য ও পেয় — সব রকমের আহার্য নিয়ে এসে উপস্থিত।

শ্রীম — তাঁর খেলা। বিপ্রপত্নীরা বুঝতে পারলেন। তাঁরা পতি, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণের বারণ না মেনে চলে এলেন। তিনি যখন টানেন তখন কেউ রাখতে পারে না। এঁরা কারো কথা শোনেন নাই। ভগবান তাঁদের স্বাগত করলেন। বলছেন, 'আপনারা উত্তম কার্য করিয়াছেন। আমি সকলের আত্মা। আমার সহিত সম্পর্ক আছে বলিয়াই প্রাণ, মন, জ্ঞাতি, জায়া, পুত্র, সম্পত্তি প্রভৃতি সকলেরই প্রিয়। আপনারা, সকল প্রিয়ের প্রিয় যে আমি, সেই আমাকে ভালবাসেন। আপনারা, কৃতার্থ। আপনাদের যাগযজ্ঞের প্রয়োজন নাই!' তাঁকে দেখলে আর কিছু চায় না।

যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে এই কথাই বলেছিলেন, আত্মার সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলেই পতি, পুত্র, পত্নী, বিত্ত সব প্রিয় — 'আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি'।

সেই পরমাত্মাই মানুষশরীর ধারণ করে আসেন। তাঁকে পেলে আর কিছু চায় না। ব্রাহ্মণপত্নীগণ তাঁকে ছেড়ে যেতে চান নাই। অনেক বলে তবে বাড়ি পাঠান; যজ্ঞ পত্নী ছাড়া হয় না কিনা, তাই। তাঁদের বলেছেন ভগবান — 'আমার নামকীর্তন, নামশ্রবণ, আমাকে দর্শন ও চিন্তন এবং গুণকীর্তন করলে আমাতে যেরূপ প্রেম হয়, সর্বদা কাছে থাকলে সে প্রেম অসম্ভব।'

শ্রীম — ব্রাহ্মণগণ তাঁদের পত্নীগণকে দেখে তখন চৈতন্য লাভ করলেন — সৎসঙ্গের এইরূপ প্রভাব! স্ত্রীদের হয়ে গেল, কিন্তু পতিদের অহঙ্কার ছিল তাই হলো না। স্ত্রীদের সৎসঙ্গে এদের জ্ঞান ফিরে এলো। নিজেদের ধিক্কার দিতে লাগলো। বলছে, আমরা তাঁর মায়ায় বিমোহিত ছিলাম তাই অন্ন দিই নাই। নচেৎ লক্ষ্মী স্বয়ং যাঁর সেবারতা তাঁকে আবার ভিক্ষা! আমাদের স্ত্রীগণ ধন্যা — আমরাও

ধন্য তাদের স্বামী বলে!

ব্রাহ্মণরা বলতে লাগলো, স্ত্রীলোকদের উপনয়ন নাই, তারা বেদ পাঠ করে নাই, গুরুগৃহেও বাস করে নাই। তপস্যা নাই, আত্মানুচিন্তন নাই, শৌচ, সন্ধ্যাবন্দনাদি নাই, তথাপি শ্রীকৃষ্ণে তাদের মতি হলো। আমাদের এ সব থেকেও চিনতে পারলাম না। এ তাঁর ভাগবতী মায়া, যোগীরাও মোহিত হয়ে যান, তা আমরা হবো এ আর আশ্চর্য কি?

দেখুন, বিদ্যাশক্তি হলে কিরূপ হয়! পতিদেরও তারা চৈতন্য করিয়ে দিলে। বিদ্যাশক্তির লক্ষণ হচ্ছে, তাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে এবং ইন্দ্রিয়াদি সংযত। আর স্বামীর যাতে ঈশ্বর ভজনের অবসর হয় তার চেষ্টা করে। খরচপত্র বেশী করে না, যাতে স্বামীকে বেশী খাটতে না হয়। আর সর্বদা ঈশ্বরীয় বিষয় নিয়ে থাকে — যেমন পূজাঅর্চা, ব্রত, উপবাস।

কি অদ্ভুত লীলা, কার সাধ্য বোঝে! যাদের লোকে মূর্খ বলে সেই মেয়েরা চিনলে। আর পণ্ডিতগণ বুঝতে পারলে না। এ mystery (রহস্য) বোঝা কারো কর্ম নয়। যাকে তিনি বোঝান, সে-ই বোঝে। কুল, শীল, বিদ্যা, ধন, জন, বীরত্ব কিছুরই কর্ম নয়। তাই শরণাগত, শরণাগত।

এখন সন্ধ্যা। শ্রীম ঠাকুরঘরে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। ভক্তরাও সকলে উপবিষ্ট। আজ অষ্টমী পূজা। সুগন্ধি ধূপের গন্ধে গৃহ আমোদিত হইয়াছে, আর উত্তম গোলাপপুষ্পেও গৃহ সুবাসিত। ধ্যানান্তে ভজন হইতেছে, সব মায়ের নাম — ঠাকুরের প্রিয় সঙ্গীত। শ্রীম-র সঙ্গে ভক্তগণ সমবেত কণ্ঠে গাহিতেছেন —

গান

মজলো আমার মন-ভ্রমরা শ্যামাপদ নীলকমলে।
শ্যামাপদ নীলকমলে কালীপদ নীলকমলে।
যত বিষয়মধু তুচ্ছ হলো কামাদি কুসুম সকলে॥
চরণ কালো ভ্রমর কালো, কালোয় কালো মিশে গেল।
পঞ্চতত্ত্ব প্রধান মত্ত রঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিলে॥

কমলাকান্তেরি মনে, আশাপূর্ণ এত দিনে।
সুখ দুঃখ সমান হলো আনন্দসাগর উথলে॥

গান

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফিরে কভু সন্ধি নাহি পায়॥
জপ যজ্ঞ পূজা হোম আর কিছু না মনে লয়।
মদনের যাগযজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়ে॥
কালীনামের এত গুণ কেবা জানতে পারে তায়।
দেবাদিদেব মহাদেব যার পঞ্চমুখে গুণ গায়॥

গান

কখন কি রঙ্গে থাক মা শ্যামাসুধাতরঙ্গিণী।
তুমি রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দাও জননী॥*
লম্ফে ঝম্পে কম্পে ধরা, অসিধরা করালিনী।
(তুমি) ত্রিগুণা ত্রিপুরা তারা ভয়ঙ্করা কালকামিনী॥
সাধকের বাঞ্ছা পূর্ণ কর নানারূপধারিণী।
(কভু) কমলের কমলে** নাচ মা পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী॥

শেষের দুইটি পদ — বিশেষ করিয়া, 'কমলের কমলে নাচ মা পূর্ণব্রহ্ম সনাতনী' এই লহরটি পুনঃ পুনঃ উন্মাদনার সহিত গীত হইতে লাগিল। শ্রীম যেন এক্ষণে প্রেমোন্মাদ।

১১ই চৈত্র, ১৩২৯ সাল, ২৫শে মার্চ, ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ।
শনিবার, বাঁসন্তী মহাষ্টমী।

---

* মা তুমি আপনার রঙ্গ ভঙ্গি দ্বারা কামদেবের (অনঙ্গে) কটাক্ষকে (অপাঙ্গে) নষ্ট করে দাও।

**কমলের কমলে - কমলাকান্তের হৃদ্-কমলে

চতুর্দশ অধ্যায়

দ্বৈতভাব থেকে অদ্বৈত

১

ব্রাহ্মমুহূর্তের পূর্বে শয্যাত্যাগ করিয়া আশ্রমবাসিগণ কেহ কেহ অশ্বত্থমূলে, কেহ বা জম্বুতলে, কেহ বা অন্যত্র ধ্যান করিতেছেন। আজ ভোর পাঁচটা হইতে ছয়টার মধ্যে সন্ধিক্ষণ — অষ্টমী যাইয়া নবমী পড়িবে। শ্রীম গতকল্য বলিয়া দিয়াছেন, সন্ধিক্ষণে সর্ব কর্ম পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করিতে হয়। তাই সকলে এই শুভক্ষণে ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন।

বসন্তের প্রভাত। সুশীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে। বিহগকুল আনন্দে কলতান করিতেছে। শ্রীম একটি ব্রহ্মচারীর সহিত আশ্রমের বহির্ভাগে ভ্রমণ করিতেছেন। উভয়ে নির্জন প্রান্তরে এক বৃক্ষকুঞ্জের সমীপবর্তী হইলেন। শ্রীম হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, এই দেখুন, এই দেখুন — কি আশ্চর্য! ব্রহ্মচারী বিস্মিত হইয়া দেখিলেন, বিটপীশ্রেণীর অন্তরালে বালসূর্য উদিত হইতেছে। পত্রনিচয়ের মধ্য দিয়া দিনমণির উজ্জ্বল মৃদু কিরণ বিচ্ছুরিত হইতেছে। এ এক অপরূপ সৌন্দর্য — অতি পবিত্র ভাব!

শ্রীম ভাবে ভরপুর হইয়া বলিতেছেন, এই সূর্যের ভিতরই গায়ত্রীদর্শন করেছিলেন ঋষিগণ। 'তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্' এই বলে ব্রহ্মজ্যোতিকে নির্দেশ করেছিলেন। এই সূর্য ভগবানের একটি রূপ। সূর্যমন্ডলবর্তী পুরুষকে দেখিয়া ঋষিগণ তাই সানন্দে গেয়েছিলেন, 'যোঽসাবসৌপুরুষঃ সোঽহমস্মি'। কি আশ্চর্য বস্তু নিত্য দেখছে, লোকে তাই আশ্চর্য মনে করে না!

শ্রীম বৃক্ষকুঞ্জে উপবেশন করিলেন। ব্রহ্মচারীও অনুমতি পাইয়া সম্মুখে বসিলেন।

শ্রীম — (ব্রহ্মচারীর প্রতি) শ্বেতকেতু ছিলেন একজন ঋষি। গুরুগৃহ থেকে ফিরে এলে পিতা আরুণি ঋষি জিজ্ঞেস করলেন, বাবা, তুমি কি এমন 'আদেশ' পেয়েছো — অর্থাৎ উপদেশ পেয়েছো যার দ্বারা সব জানা যায়? এমন জ্ঞান লাভ করেছো কি যা জানলে অন্য কিছু জানবার বাকি থাকে না — অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান? শ্বেতকেতু বললেন, আজ্ঞে না, আপনি আমাকে সেই জ্ঞান উপদেশ করুন।

আরুণি বললেন, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা দেখছো, এর সৃষ্টিকর্তা একজন আছেন। তাঁর ইচ্ছাতেই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হচ্ছে। এক অদ্বিতীয় পুরুষ। তিনি সূক্ষ্মতম — অণোরণীয়ান্, আবার মহতো মহীয়ান্ — বড়র বড়, আবার ছোটর ছোট। অতি সূক্ষ্ম। এই এক বস্তুকে জানতে পারলে সব জানা হলো। ইহা না জানলে কিছুই হলো না। শাশ্বত সুখশান্তি লাভ হয় না, অমৃতত্ত্বও লাভ হয় না। বাবা, নানা বিদ্যা লাভ করে লোক অহঙ্কৃত হয়। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করলে, আত্মার সন্ধান করতে পারলে লোক শান্ত হয়।

সেই বস্তুটি কেমন জান? যেমন মৃত্তিকাকে জানলে তা দ্বারা নির্মিত সমস্ত বস্তু জানা যায়, যেমন একখণ্ড লৌহকে জানলে লৌহনির্মিত যাবতীয় বস্তুর জ্ঞান হয়, তেমনি সেই বস্তু। তিনি জগতের কারণ, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ। তাঁকে জানলে সর্বজ্ঞান লাভ হয়, সর্বজ্ঞ হয়। নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে জগৎকারণকে বোঝাবার চেষ্টা করেন। যেমন অতি সামান্য অতি সূক্ষ্ম একটি বটফলের বীজের ভিতর অত বড় বটবৃক্ষ থাকে, তেমনি সেই সূক্ষ্মতম বস্তু থেকেই এই বিশাল জগতের সৃষ্টি হয়েছে। তা থেকে মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কারের সৃষ্টি হয়েছে। সর্বজীবের উৎপত্তিস্থল যেমন তিনি, তেমনি সর্ববস্তুরও। সর্ববস্তুতে তিনি বিরাজমান। তাঁর সত্তাতে সকলের সত্তা। ওতপ্রোত-ভাবে তিনি আছেন। সেই সূক্ষ্মবস্তুই জগতের আত্মা, তাকেই সৎ বলা হয় — অর্থাৎ যাহা চিরবিদ্যমান। আবার 'তত্ত্বমসি' — তুমিই সেই আত্মা। 'স য এষঃ অণিমা ঐতদাত্মমিদং সর্বং তৎ সত্যং, স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।'

এই আত্মাই ব্রহ্ম, তাঁকেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বলে। তাঁকেই

ঠাকুর ‘কালী’ বলতেন, ‘মা’ বলতেন। এই ব্রহ্মই আবার মানুষশরীর ধারণ করে আসেন। তাঁকেই অবতার বলে, ঠাকুর সেই অবতার।

একদিন বলেছিলেন, ‘দেখলুম সচ্চিদানন্দ ভিতর থেকে বের হয়ে এসে বললেন, আমিই যুগে যুগে অবতার হই। এবার সত্ত্বগুণের পূর্ণ আবির্ভাব।’

আবার বলেছিলেন, ‘যে রাম সে-ই কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং রামকৃষ্ণ।’ ক্রাইস্ট, গৌরাঙ্গ, আর আমি এক’ — এ কথাও বলেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন, ‘আমাকে চিন্তা করলেই হবে।’ অন্তরঙ্গদের বলেছিলেন, ‘তোদের বেশী কিছু করতে হবে না, আমি কে আর তোরা কে, এ জানলেই হবে।’

একজনকে বললেন, ‘আমার চিন্তা যে করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে।’

এখন যারা জন্মেছে তাদের বড্ড chance (সুযোগ)। মাখন প্রস্তুত, কেবল নিয়ে আহার করা। ফল সুপরিপক্ক, কেবল আহার করলেই হলো।

(ব্রহ্মচারীর প্রতি) তোমরা তার উত্তরাধিকারী। Blessed are they that have not seen (me), and yet, have believed (St. John 20 : 29) (আমাকে না দেখেও যাঁরা আমাতে বিশ্বাসী হন তাঁরাই ধন্য)।

শ্রীম আহার করিতে বসিয়াছেন, সঙ্গে মুকুন্দ, ছোট জিতেন, অমূল্য আর জগবন্ধু বসিয়াছেন। বিনয় পরিবেশন করিতেছেন। কথাবার্তা চলিতেছে।

শ্রীম — (ভক্তদের প্রতি) যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণরা চিনতে পারলে না প্রথম শ্রীকৃষ্ণকে, শেষে বুঝতে পেরেছিলেন। বলেছিলেন চৈতন্য হলে, যাঁর সেবা স্বয়ং লক্ষ্মী করছেন তাঁর আবার অন্নের অভাব! তিনি আমাদের উপর কৃপা করবার জন্যই অন্ন ভিক্ষা করতে পাঠিয়েছিলেন। আমরা তাঁর মায়ায় আচ্ছন্ন ছিলাম, বুঝতে পারি নাই!

তিনি কিন্তু ধর্মের মর্যাদা রক্ষা করলেন। স্ত্রীদের পাঠিয়ে দিলেন।

বললেন, তোমাদের ছাড়া যজ্ঞ সম্পন্ন হবে না। স্বামী-স্ত্রী মিলে পূর্ণাহুতি দিতে হয়।

আবার রাজসূয় যজ্ঞে তিনি ব্রাহ্মণদের পা ধুইয়ে দিছলেন। কেন করলেন? তাদের মান বাড়াবার জন্য। তারা কি আর সকলে তাঁকে চিনতো? কয়েকজন মাত্র জেনেছিলেন — অসিত, দেবল, ব্যাস, গর্গ প্রভৃতি। তিনি জানেন, এদের মান দিলে এদের আত্মসম্মান বাড়বে তবেই ঈশ্বরচিন্তা করবে। তখন বুঝতে পারবে আমি কে! 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।' আর তিনি মানলে অপরেও মানবে। সাধু, ভক্ত, ব্রাহ্মণ সব নারায়ণতুল্য । এদের মানলে নিজের কল্যাণ। ঠাকুর গোস্বামীদের কত মান দিতেন। বলতেন, এরা গুরুবংশ, অদ্বৈত নিত্যানন্দের রক্ত এদের শরীরে রয়েছে।

আহারান্তে শ্রীম বারান্দায় তক্তপোষে বসিয়া আছেন। কেহ কেহ কাছে আছেন, কেহ বা গৃহকর্ম শেষ করিতেছেন। ভক্তগণ সর্ববিষয়ে পটু হইবে, এই বিষয়ে বলিতেছেন।

শ্রীম — (সকলের প্রতি) ঠাকুরের কি দৃষ্টি! সব দিকে তিনি লক্ষ্য রাখতেন। একজন দশটার জায়গায় ছয়টা পান এক পয়সা দিয়ে এনেছিলেন। অমনি তিরস্কার — 'ঠক্‌বি কেন? আনবি ঠিক, বেশী হয় — অন্যকে বিলিয়ে দে। তবুও ঠক্‌বি না।' এর মানে আছে, ও একটা mentality (স্বভাব) হয়ে যায়। কামিনীকাঞ্চনের বিষয়েও ঠকে যাবে শেষে। ঠকে যাওয়া mentality (স্বভাব) হয়ে যায়, অর্থাৎ careless (অমনোযোগী) হয়ে যায়। বলতেন কিনা প্রায়ই 'ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন?' সব দিকে হুঁশ থাকবে, সর্বদা সজাগ — যেন soldier (সৈনিক), কখন কোন্ দিক দিয়ে আক্রমণ আসে। তাই এত minutely (পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে) সব দেখতেন। লোকে মনে করে, এ আর কি, কয়টা পানের জন্য তিরস্কার কেন? কিন্তু তা নয়, value (মূল্য) অনেক। এর প্রভাব চরিত্রে পড়ে যায়, তাই সর্বদা সজাগ।

ধর্মের আর একটা প্রচলিত অর্থই হয়েছে বাইরের বিষয়ে এলোমেলো থাকা। কিন্তু ঠাকুর এসব দেখতে পারতেন না। বলতেন,

মহা তমোগুণে এরূপ হয়। গীতায় বলেছেন, ভক্ত হবে ‘ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত’।

ঠাকুর পরনের কাপড়খানাও রাখতে পারতেন না, সর্বদা সমাধিস্থ। কিন্তু তেলের কেঁড়েতে তেল আছে কিনা তার খবর নিচ্ছেন। এ কয়টার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন ঃ প্রথম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। প্রায়ই আলস্যের জন্যই লোক অপরিষ্কার থাকে। ঈশ্বরচিন্তা করে দেহভুল ক’জনের হচ্ছে? পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না থাকলে ভগবানের আবির্ভাব হয় না। অন্তর্বহিঃ শৌচের দরকার। দ্বিতীয়, waste (অপব্যয়) না হয়। অনেকে জিনিস নষ্ট করে, তা দেখতে পারতেন না। একবার এক টুকরা লেবুর জায়গায় ছয় টুকরা কেটেছিল বলে তিরস্কার করেছিলেন কাশীপুরে। বলেছিলেন, ভক্তরা কত কষ্ট করে অর্থোপার্জন করে, সেই অর্থে সেবা হচ্ছে, তার অপব্যবহার! বলতেন, লক্ষ্মীছাড়া থেকে কৃপণ হওয়া ভাল। দু’টোই খারাপ, তবু তো যা তা নষ্ট না করে কৃপণ হওয়া ভাল। আহারের সময় অনেকে ভাতটাত কত নষ্ট করে। এসব পছন্দ করতেন না। কুকুরের জন্য দু’টি রাখতে হয়। তা ছাড়া যেমন আবশ্যক তেমনি নাও — নষ্ট না হয়। তৃতীয়, ছেঁড়া কাপড় কিংবা ময়লা কাপড় পরা দেখতে পারতেন না। বলতেন, সেলাইকরা কাপড় পরলে লক্ষ্মীছাড়া হয়। চতুর্থ, এলোমেলো ভাব — যেমন এখানকার জিনিস ওখানে রাখা। যার যে স্থান সেখানে রাখা আর সাজিয়ে রাখা। পঞ্চম, নিজের রান্না নিজে করা। বলতেন, ভক্তরা যারা তাঁর ভজন করবে, তারা নিজের দু’টি চাল নিজে ফুটিয়ে নেবে। ভগবানে অর্পণ করে প্রসাদ পাবে। এতে পরের উপর নির্ভর করতে হয় না, আর সত্ত্বহানিও হয় না।

বলতেন, সর্বাবস্থায় তাঁর পূজা। কোনটাই অবহেলা করা চলে না। আহার বিহার, শয়ন, চলন, বলন, সর্বদা সর্ববস্তুতে তাঁর অনুধ্যান। তবে তো ধর্ম!

ধর্ম ধর্ম করে লোক — ধর্ম কি অত সোজা?

বাসস্থান, বাড়িঘর সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সাজানো-গুছানো রাখতে হয়। সর্বত্র তাঁর পূজা। বিলাসিতা নয়, বিলাসিতা আর পরিষ্কার-

পরিচ্ছন্নতা, গুছানগাছান থাকা ভিন্ন। সর্ববিষয়ে সুদক্ষ হওয়া, তারপর সর্বস্ব অর্পণ ঈশ্বরার্থে। Idiot-এর (ডাঁহা মূর্খের) ধর্ম হয় না তেমনি Careless-এরও (অমনোযোগীর) হয় না।

তিনি যদি দেহবুদ্ধি নিয়ে যান — আলাদা। নচেৎ ঐ রকম চলতে হয়, গীতায় যেমন বলেছেন,

'অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।'
সর্বারম্ভপরিত্যাগীযো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ।।'(গীতা ১২-১৬)

এই আদর্শ দেখ, বলেছেন দক্ষ — able, expert হবে। আবার অনপেক্ষ — কারো অপেক্ষা নাই। যা সামনে পড়ে, তা বুদ্ধিপূর্বক করা। অমুক করবে, কিংবা অমুকে বললে করবো, এ ভাব নাই। আবার উদাসীন — নিজে benefit (সুযোগসুবিধা) নিচ্ছে না, তাই indifference to benefit or loss (লাভলোকসানে উদাসীন) অর্থাৎ personal gain or lossএ (নিজের লাভালাভে) খেয়াল নাই, কিন্তু careless (অমনোযোগী) নয়। সর্বারম্ভপরিত্যাগী — মানে, নূতন কাজে আর জড়ায় না নিজেকে। যা সামনে এসে পড়ে তা অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করবে। সেখানে negligence (অবহেলা) নেই, up and doing (উঠে পড়ে লাগে)। কিন্তু নূতন করে আর কার্যারম্ভ করবে না।

আবার,

'মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যো নির্বিকারঃ........।' (গীতা ১৮-২৬)

নিজের জন্য করছে না, তাই আসক্তি নাই, অহঙ্কারও নাই — সব ঈশ্বরের জন্য। সেই জন্যই ধৃতি আর উৎসাহের সহিত – with patience and enthusiasm করছে। মড়ার মত নয়, বীরের মত তারা সব করছে।

যেমন হনুমান — রামের কাছে, সাধু ভক্ত ঋষিদের কাছে, হাত জোড় করে থাকেন। কিন্তু লঙ্কায় কি কাণ্ডটা করলেন!

ধর্মের এখন প্রচলিত অর্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে — incompetence, carelessness inertness আর uncleanliness (অযোগ্যতা,

অমনোযোগ, জড়ত্ব, অপরিচ্ছন্নতা) যার যত অধিক সে তত বড় ধার্মিক। কিন্তু ঠাকুর এদিকে সর্বদা সমাধিস্থ, গায়ের কাপড়ের হুঁশ নেই, অথচ সর্ববিষয়ে একটা fineness, decency-র (সূক্ষ্ম সুরুচির) জ্ঞান তাঁর পূর্ণমাত্রায় ছিল। আবার sence of proportion (পরিমিতিজ্ঞান) এও অদ্ভুত ছিল। বলেছিলেন, 'আচ্ছা, এই জলচৌকিটা যদি বার আনা হয়, তবে এ গোল টুলটা কেন দু'টাকা হবে? এমনি proportion (মাত্রা) জ্ঞান! সমাধিস্থ — আবার সর্ববিষয়ে সুদক্ষ, এইটি ideal (আদর্শ) — তিনি এই আদর্শ পুরুষ।

সর্ববিষয়ে expert (সুদক্ষ) হয়ে benefit (সুবিধা) না নেওয়া — এই ধর্ম। হনুমান 'বুদ্ধিমতাং বরিষ্ঠ' ছিলেন, আবার সর্বত্যাগী।

২

জম্বুতল-বেদিকা। ভাগবত পাঠ হইতেছে। এখন অপরাহ্ণ প্রায় তিনটা। আজ রামনবমী, পাঠ একটু শীঘ্র আরম্ভ হইয়াছে। ভক্তগণ রামনবমী উৎসবে নিকটবর্তী গ্রামে যাইবেন, তাই। শ্রীম ও ভক্তগণ উপস্থিত। রাসলীলা পাঠ হইতেছে।

শ্রীম — আহা, কি অদ্ভুত প্রেম! দেহজ্ঞান ভুল হয়ে গেল। যেই বাঁশীর ডাক শুনেছে তখনই জগৎ ভুল। এক ঈশ্বর মনোমধ্যে বিরাজমান। তখন বাড়িঘরের চিন্তা, পতি পুত্র সব চিন্তা বিদূরিত হয়। ইচ্ছা করে ছাড়ে না, আপনা থেকে ছেড়ে যায়। যেমন নারকেলের বালদো, আপনা থেকে ছেড়ে যায়। গোপীরা কি বিচার করে ঘর ছেড়েছেন, তা নয়। ঝড়ের মত ব্যাকুলতা এসে যেন উড়িয়ে নিয়ে গেল। নিজের পতিগৃহ, সর্বোপরি নিজের দেহ, সব জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে গেল তখন। 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' এক কথা, এক চিন্তা। বাঁশীর তান আর কি — এই ব্যাকুলতা, এই আকর্ষণ। প্রাণ যায় যায় অবস্থা — তাঁকে না দেখলে তাঁর সঙ্গে মিলন না হলে।

যারা আসতে পারলো না, আত্মীয়েরা আটকে রেখে দিল, তারা তাঁর চিন্তায় মগ্ন হয়ে সমাধিস্থ হলো। আর শরীর ত্যাগ করে সূক্ষ্ম

শরীরে মিলিত হলো।

রাসলীলা ঈশ্বরীয় প্রেমের শ্রেষ্ঠ বিকাশ। এমনটি জগতে আর নাই। প্রেমাভক্তির উজ্জ্বলমণি রাসলীলা।

ঠাকুর বলতেন, গোপীপ্রেমের এক বিন্দু পেলে অন্য লোকের হেউ ঢেউ হয়ে যায়।

তিনি বলতেন, তাঁ'তে ভালবাসা এলে, কামক্রোধাদি ঐ ভালবাসায় খেয়ে ফেলে — যেমন বাঘ ছাগল খেয়ে ফেলে কপ্ কপ্ করে। সব খসে পড়ে যায় — যেমন চুম্বকের পাহাড়ের কাছে গেলে জাহাজের লোহা সব খসে যায়।

গঙ্গা সাগরসঙ্গমে চলেছে — কেউ রোধ করতে পারে না। কতগুলি প্রাণ একসঙ্গে ব্যাকুল হয়ে ছুটলো একদিনে, একই ক্ষণে, সর্বস্ব ত্যাগ করে। অমনটি আর জগতের ইতিহাসে নাই। কে বুঝবে এ লীলা! তিনি না বুঝালে কেউ ধরতে পারে না। বাবুরা বুঝি এর কদর্থ করে! তা তাদের দোষ নাই, তিনি যেমন বুদ্ধি দিয়েছেন।

দ্বৈত ভাব থেকে অদ্বৈত। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ভাবতে ভাবতে ওরাও কৃষ্ণময় হয়ে গেল। মনে করতে লাগলো নিজেদেরই কৃষ্ণ। ভাবে নাই আমরা কৃষ্ণ, কিন্তু কৃষ্ণে পরিণত হয়ে গেল। অন্য বুদ্ধি ছিল না — কেবল কৃষ্ণাকারা বৃত্তি। এ উচ্চ ভাব কি দেহবুদ্ধি নিয়ে বোঝা যায়?

সমাধিস্থ হয়ে রাসলীলা করেছিলেন।

রাসলীলা মানে, যেখানে নিরতিশয় আনন্দ। 'রস' মানে আনন্দ। ব্রহ্মানন্দের পরাকাষ্ঠা, তাই রাস।

লৌকিকতা রক্ষা ততক্ষণ, যতক্ষণ দেহবুদ্ধি থাকে। তারপর সব ভার তাঁর উপর। তিনি সব ভার নেন।

ভক্ত — আজ্ঞে, গোপীদের ফিরে যেতে বললেন কেন?

শ্রীম — পরীক্ষার জন্য ষোলআনা মন তাঁ'তে না এলে হবে না কিনা — একটু বাকি থাকলেও হবে না। যতক্ষণ দেহবুদ্ধি ততক্ষণ শাস্ত্রবাক্য মেনে চলতে হবে। তাই তো বললেন, 'সতীগণ, তোমরা গৃহে ফিরে যাও। এ রজনীতে ঘর ছেড়ে আসা উচিত হয় নাই।

গৃহে গিয়ে পতির সেবা কর, সন্তানদের দুগ্ধপান করাও। পতি ও পতিবন্ধুগণের অকপটভাবে সেবা স্ত্রীলোকের পরমধর্ম। দুশ্চরিত্র, দুর্ভাগ্য, বৃদ্ধ, জড়, রোগী বা নির্ধন যাহাই হউক পতিকে পরিত্যাগ করিবে না।'

তিনি যখন দেহবুদ্ধি লোপ করিয়ে দেন তখন অন্য কথা। তা না হলে ঐ কর্তব্য — শাস্ত্র যা বলেন।

ঈশ্বর পতিরও পতি, পিতার পিতা, মাতার মাতা — সকলের প্রভু। একমাত্র তাঁর জন্য সবকে ছাড়া যায়। এই সেদিনও মীরাবাঈ তাঁর জন্য সব ছাড়লেন — রাজ্য, পতি, আত্মীয়, বন্ধু সব।

এ তত্ত্ব বোঝা বড় কঠিন। তাই তো ঠাকুর বলতেন, জীববুদ্ধি নিয়ে এসব পড়তে নেই, উল্টো ফল হয়।

তাঁর কৃপায় ভক্তিলাভ হলে তখন বোঝা যায়। কামগন্ধহীন না হলে সম্পূর্ণ বোধ হয় না। এত কঠিন! রিপুর বশবর্তী হয়ে হয় না। এর ধারণা করতে হলে তাঁর কৃপা চাই।

অযোগ্য লোক পড়লে অধঃপাত ঘটে এতে। ঠাকুর বলতেন, সাধারণতঃ মানুষের মন নিম্নদৃষ্টি। স্বভাবতঃই তা সাংসারিক বিষয়ে থাকে। সর্বদা ভোগ খোঁজে। এই মন নিয়ে এসব পড়লে ভোগের বাসনাই বর্ধিত হয়। কাঁচা মন, তাই!

শাস্ত্র কি খালি পড়লেই হলো! তাই গুরুমুখে শুনতে হয়। নয়ত একগুণ পড়ে পঞ্চাশ গুণ পিছিয়ে যেতে হবে। ন্যাড়ানেড়ীগুলি* এইভাবে অধঃপাতে যায়। ভোগবাসনা নিয়ে গোপীলীলার অভিনয় করে। মনমত কথা খুঁজে বের করে, আর নিজেদের অভিপ্রায় মত অর্থ করে। এরই ফলে মুকুটমণি ধূলিবিলুণ্ঠিত।

আর এক কথা। এসব শাস্ত্রের রিপোর্ট সব ঠিক দিতে পারে নাই। অনেক বাড়িয়ে লিখেছে। কত অবস্থার ভিতর দিয়ে এসেছে কখনও বিলুপ্ত হয়ে গেল, আবার কেউ উদ্ধার করলেন। তাই রিপোর্ট সব ঠিক নয় — exaggeration, (অতিরঞ্জিত) হয়ে গেছে। এক

*বৈষ্ণবদের একটি সম্প্রদায়।

একটা শব্দকে যে কতবার লেখা হয়েছে, proportion (মাত্রা) ঠিক রাখতে পারে নাই।

শুধু শাস্ত্র পড়ে কি হবে? তপস্যা চাই। An ounce of Tapasya is far greater than tons of book-learning — (সাগরসম পুঁথিগত বিদ্যা থেকেও তিলপরিমাণ তপস্যা শ্রেষ্ঠ)।

তাই তপস্যার দরকার। শাস্ত্রের অর্থ ধারণা করতে হলে তপস্যা চাই। মানুষ মনগড়া অর্থ করে শাস্ত্রের।

এইরূপে শাস্ত্র যখনই কদর্থযুক্ত হয়, তখনই ভগবানকে আসতে হয় অবতার হয়ে। তিনি এসে শাস্ত্রের অর্থ করেন, new light (নূতন ভাব) দেন। অবতার এসে গূঢ় অর্থ বলে দেন। তাঁর আগমনের পূর্বে লোক শুধু বাহ্য আড়ম্বরকে ধর্ম বলে পালন ও প্রচার করে। যাগযজ্ঞ, পূজাঅর্চা, গঙ্গাস্নান, ব্রতউপবাস, এই সব বাহ্য আচার নিয়ে রত থাকে। তিনি এসে বলে দেন, এর উপরও আছে, ব্যাকুলতা। ভগবানদর্শনের জন্য ব্যাকুল। ঈশ্বরদর্শন মনুষ্যজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ — সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। এ না হলে কিছুই হলো না। তখন এগুলি চাপা পড়ে যায়। ব্যাকুলতায় দেশ ছেয়ে যায় — The whole atmosphere becomes surcharged with spiritual yearning. God-realisation becomes the warcry (ঈশ্বরদর্শন জীবনের উদ্দেশ্য — এই রবে দেশ পূর্ণ হয়)

ডাক্তার পি.ডি. বোসের পিতা, পঁচানব্বুই বছর বয়েস, আমাদের পাড়ার লোক — গোঁড়া ক্রিশ্চিয়ান পাদ্রী। তিনি পি.ডি. বোসকে বলেছিলেন, 'মহেন্দ্রবাবু যত বাইবেল জানেন, বড় বড় পাদ্রীরাও তত জানেন না।' পাদ্রীরা জানবে কি করে? বই পড়ে কি আর উহার অর্থ ধারণা হয় যে জানবে? তপস্যার দরকার — এ বুঝতে হলে তপস্যা ছাড়া হবার যো নাই। আর অবতারের সঙ্গে বাস করলে তাঁর কথার অর্থ বোঝা যায়। আমরা ক্রাইস্টের সঙ্গে ছিলাম কিনা, তাই একটু একটু বুঝতে পারা যাচ্ছে। ঠাকুর বলেছিলেন, ক্রাইস্ট গৌরাঙ্গ আর আমি এক।

অবতার যখন explain (ব্যাখ্যা) করেন তখন তাতে অসার ভাগ

নেই। যেমন চিনি আর বালি, শুধু চিনিটুকু নেন তিনি।

তিনি বলেছিলেন, একজন ভক্তকে these very words, (ঠিক এই কথা), 'আমার চিন্তা যে করবে, সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে।'

শ্রীম — (ছোট জিতেনকে) বুঝলেন জিতেনবাবু, মঠে গঙ্গার তীরে বসে এই কথাগুলো ভাবলে বেশ হয়। পাঁচ বৎসর শুধু ঐ একটি কথা। হাঁ, আপনি তো রাত্রিতে রোজই মঠে (বেলুড় মঠে) থাকতে পারেন আফিসের পর। যেমন থাকছেন। এতে দু'বার ধ্যান দেখতে পাচ্ছেন। আর খাওয়াটা হোটেল থেকে নিয়ে যাবেন যেমন নিচ্ছেন। আশ্রমপীড়া না হয়। উৎসব, কি যখন বহুলোক খায়, তখন প্রসাদ চেয়ে খেতে হয়।

আমি একবার (১৮৯১ খ্রীঃ) বরানগর মঠে ছ' মাস ছিলাম। রাত্রে ওখানেই খেতাম, সকালে বাসায়। চারটার পর ফিরতাম আর সকালে বেরুতাম। তিনটা স্কুলের হেডমাস্টার। একঘন্টা করে পড়াতাম — পাল্কীতে যাওয়া আসা হতো। মা-ঠাকরুন দেশ থেকে চিঠি দিলেন, তখন বাড়ি এলাম।

হোটেলে খেলে অনাচার হয়, কিন্তু ঈশ্বরচিন্তায় এ হলেও দোষ নাই। কাশীপুরে ঠাকুরের অসুখের সময় আলাদা বাসা করে একা থাকতাম আর মেসে খেতাম। ঠাকুর জিজ্ঞেস করায় এই কথা বললুম। তিনি শুনে বললেন, 'বেশ করেছো, বেশ করেছো, বেশ করেছো' — তিনবার বললেন।

মঠে যাবার কত সুবিধা করে দিয়েছেন ঠাকুর আজকাল। ইষ্টিমার হয়েছে। কলকাতায় যারা থাকে সুবিধা হলে তাদের যাওয়া উচিত। সাধুসঙ্গ করতে বলতেন তিনি। সাধুসঙ্গ ছাড়া ধর্মজীবন গঠিত হয় না। এই একটিতে বাকি সব করে দেয়।

শুধু কি বলেছেন? আবার সাধু তৈরি করে দিয়েছেন। মঠে যাঁরা থাকেন, ওঁরা কত বড় সাধু, ideal (আদর্শ) কত বড়। A tree is known by the fruits it bears, and a man is known by the ideal he worships (বৃক্ষের পরিচয় ফলে আর মানুষের

পরিচয় দলে)। কত বড় ideal (আদর্শ)! ঠাকুর কিনা ওদের ideal (আদর্শ)!

ঠাকুর মানে অবতার।
ঈশ্বর মানুষশরীর ধারণ করে এসেছেন।
কামিনীকাঞ্চনত্যাগ-ঘনমূর্তি!

মঠের সাধুরা অন্যদের মত নয়। অন্য কিছু চায় না, কেবল জ্ঞান, ভক্তি — শুধু ঈশ্বর। নাম, যশ, লোকমান্য, দেহসুখ — কিছু চায় না ওরা। কি রকম লোক সব! সব ছেড়ে বলছে, শুধু তোমাকে চাই! এদের সঙ্গ যারা করবে তারাই লাভবান হবে, তারাই উঠবে।

অপরাহ্ন পাঁচটার সময় ছোট জিতেন, মুকুন্দ, বিনয়, ছোট অমূল্য ও জগবন্ধু শ্রীম-র আদেশে পাঁচ মাইল দূরবর্তী কেওরজালি নামক গ্রামে ৺রামনবমী উৎসব দেখিতে গমন করিলেন। চন্দ্রালোকে বন ও প্রান্তরের মধ্য দিয়া আনন্দ করিতে করিতে তাঁহারা রাত্রি সাড়ে দশটার সময় ফিরিয়া আসিয়াছেন। শ্রীম এতক্ষণ চন্দ্রালোকে বসিয়া তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। নির্জন পল্লীতে, ভক্তগৃহে শ্রীভগবানের আনন্দউৎসবের কথা সমস্ত শুনিয়া এবং তাহাদের ব্যাকুলতা দেখিয়া আনন্দে পূর্ণ হইলেন। এই উৎসবানন্দ নিজে গিয়া সম্ভোগ করিবার বাসনা শ্রীম-র মনেও কি সঞ্চারিত হইল!

একটি ভক্তকে শ্রীম অন্তরালে ডাকিয়া বলিলেন, ঠাকুর অধ্যাত্ম-রামায়ণ পড়তে বলতেন — ওটা দেখবেন। জ্ঞানভক্তির কথা আছে। রামই ব্রহ্ম, তিনিই জগৎরূপে প্রকাশিত।

১২ই চৈত্র, ১৩২৯ সাল।
২৬শে মার্চ, ১৯২৩ খ্রীঃ।
সোমবার, ৺রামনবমী।

পঞ্চদশ অধ্যায়

যতক্ষণ ইন্ধন ততক্ষণ অগ্নি

মহুয়া বৃক্ষতল। চতুর্দিকে হরিতকী বন।

মিহিজামের অতি নির্জন প্রান্তর, জনমানব দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। বসন্তপ্রভাত — দিনকর এই উদিত হইতেছেন। শ্রীম বৃক্ষতলে বসিয়া সুরসংযোগে মুণ্ডক-উপনিষদ্ পাঠ করিতেছেন — সম্মুখে অন্তেবাসী উপবিষ্ট। তিনি এই অমৃতক্ষণে এই গুরুগম্ভীর বেদবাণী শুনিতে শুনিতে আনন্দে আপ্লুত হইতেছেন। ভাবিতেছেন, এতদিনে আমার আবাল্যসঞ্চিত বাসনা কথঞ্চিৎ পূর্ণ হইতে চলিল। তিনি বাল্যাবধি তপোবনে গুরুগৃহে ঋষিসঙ্গে বাস করিবার আশা পোষণ করিয়া আসিতেছেন। শ্রীম পাঠ করিতেছেন।

'যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাণি পাদং।
নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং তদ্ভুতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।।
(১/১/৬)
.... দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্ন্যাত্মা প্রতির্ষ্ঠিতঃ।। (২/২/৭)
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিনদৃষ্টে পরাবরে॥ (২/২/৮)
সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্।
(৩/১/৫)
নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।(৩/২/৩)
যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ পরাৎপরম্ পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ (৩/২/৮)

পাঠ শেষ হইল। সংক্ষেপ অর্থ বলিতেছেন।

শ্রীম — শৌনক খুব পণ্ডিত ছিলেন। জ্ঞানের শেষ নাই দেখে তাঁর বৈরাগ্য হলো। তাই প্রশ্ন করলেন, 'কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে

সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি'। এমন কি কিছু আছে, যা জানলে সব জানা যায়, নানা জ্ঞানের বাসনা বিলুপ্ত হয়?

ঋষি অঙ্গিরা উত্তর করলেন, হাঁ আছে, অক্ষরকে জানলে আর কিছু জানবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না, অর্থাৎ ঈশ্বরকে। তাঁর লক্ষণ বলছেন, কতকগুলি negative (নেতি) আর কতকগুলি positive ideas (ইতিবাচক ভাব) দিয়ে। মুখে বলা যায় না কিনা তাই মূকের আনন্দ প্রকাশের চেষ্টার মত বোঝাবার চেষ্টামাত্র। বলছেন, তিনি ইন্দ্রিয়াতীত, অথচ নিত্য বিভু সর্বগত অতিসূক্ষ্ম, অব্যয় আবার জগতের কারণ। চন্দ্র সূর্য নক্ষত্র অগ্নি বিদ্যুৎ প্রভৃতি তেজবান পদার্থ তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাঁর দীপ্তিতে এঁরা সব দীপ্তিমান। এই যে সূর্য উঠছেন, আর এই যে বিস্তীর্ণ আকাশ, সব তিনি করেছেন। প্রাণ মন ইন্দ্রিয় প্রভৃতি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব তাঁর সৃষ্টি। তাঁকে যদি জানতে পার তা হলে আর অন্য কিছু জানবার ইচ্ছা থাকে না।

শৌনক বললেন — ভগবন্, কি উপায়ে জানা যাবে?

অঙ্গিরা জবাব দিলেন — বৎস, সত্য পালন কর কায়মনোবাক্যে, তপস্যা কর — অর্থাৎ প্রকৃতিজয়ের চেষ্টা কর, আর ব্রহ্মচর্য পালন কর। সত্য, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্য দ্বারা মেধাশক্তি উৎপন্ন হয়। তার দ্বারা ভগবানের ভাব ধারণ করবার শক্তি আসে। তা না হলে কথাই বোঝা যায় না — ধারণা করবে কি? বুঝলে তো ধারণা! একটা জিনিস পেলে তো সেটা রক্ষা করবে। ব্রহ্মচর্য ছাড়া ঈশ্বরীয় ভাবই পাওয়া যায় না, তা ধারণা মানে ধরে রাখা, তা তো দূরের কথা! তাই ব্রহ্মচর্যের একান্ত দরকার। এইগুলির একটা পালন করলেই বাকিগুলি আপনা থেকে এসে পড়ে।

শৌনক যখন জানলেন তখন খালি আনন্দ, আনন্দে ভরপুর। তখন সংশয় নাই, নানানখানা জানবার বাসনা নাই, কেবল আনন্দ আর শান্তি, শান্তি, প্রশান্তি, চিরশান্তি। নিজের চেষ্টা আর গুরুকৃপায় জেনেছিলেন তিনি।

অন্তেবাসী — আজ্ঞে, বড় কঠিন।

শ্রীম — কঠিন বটে, কিন্তু অসম্ভব নয়। তাঁর কৃপায় সব সহজ

হয়ে যায়। যাকে দিয়ে করাবেন তার পক্ষে সহজ হয়ে যায়। অন্যের পক্ষে কঠিন। বাজীকরের কথা ঠাকুর বলেছিলেন। বাজীকর হাত নাড়িয়ে সবগুলি গ্রন্থি খুলে ফেলতে পারেন। With men this is impossible, but with God all are possible (Mathew 19 : 26) — মানুষের পক্ষে অসম্ভব হতে পারে, কিন্তু ভগবানের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। ঠাকুরের ছেলেরা তাঁর কৃপায় জেনেছেন। জেলে মালোরা সামান্য লোক — তাঁর (যীশুর) কৃপায় জেনেছিলেন। চৈতন্যদেবের শিষ্যরা জানতেন। গোপীদের হয়েছিল। অক্রুর ভগবানের কৃপায় এ জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

শ্রীম — সত্যপালন, ব্রহ্মচর্য আর তপস্যা — এই করতে করতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ চিত্তে তিনি স্বয়ং প্রকাশিত হন। অশুদ্ধ ভাব — জীবভাব দূর হয়ে যায়। তখন তিনি বিরাজ করেন। যেমন যতক্ষণ ইন্ধন, ততক্ষণ অগ্নি। ইন্ধন মানে বাসনা, তাতেই মলিন হয়। বাসনা গেলেই শুদ্ধ মন। ঠাকুর বলতেন, শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ আত্মা এক।

তাঁকে জানলে সব সংশয় দূর হয়, নচেৎ সংশয় যায় না। একটা যায় তো আর একটা আসে। নিজে চেষ্টা করতে হয় সাধ্যমত, আর প্রার্থনা করতে হয় — 'তোমাকে জানবার শক্তি দাও প্রভো।' চেষ্টার ত্রুটি থাকলে হবে না। 'অপ্রমত্ত' হতে হবে আর 'শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ।'

অপ্রমত্ত মানে, leisurely – parenthetically (সব কাজ শেষ করে অবসর সময়ে) ডেকে হয় না। 'ভুলে গেছি,' বললে চলবে না। ঐ এক চিন্তা এক ভাব। তাই 'শরবৎ তন্ময়'। শর, লক্ষ্য আর মন — তিনটি এক সঙ্গে চলবে।

'কি দেখছ?'
'আজ্ঞে, গাছ, পক্ষীর শরীর।'
'হলো না। এখন কি দেখছ?'
'আজ্ঞে, পক্ষীর দক্ষিণ চক্ষু।'
'হাঁ, মার।'

অমনি বিদ্ধ করলেন। দ্রোণাচার্য অর্জুনকে বলেছিলেন এই কথা।

যখনই তিনটি একসঙ্গে চলে তখন হয়। শুধু এক straight line (সরল রেখা) নয়, শেষে এক point (বিন্দু) হয় — ধ্যান, ধাতা, ধ্যেয়, জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়। যতক্ষণ পৃথক বোধ, ততক্ষণ হচ্ছে না। ষোলআনা মন চাই। 'আষ্টে পিষ্টে ধর, তবে ঘোড়ায় চড়।' চেষ্টা করছে দেখলে কৃপা হয়, তাই চেষ্টা করতে হয়।

অন্তেবাসী — আজ্ঞে, নামরূপ বিলুপ্ত হয়ে যায়, এটা কি বুঝতে পারলাম না।

শ্রীম — নামরূপ অর্থাৎ জগৎ — জগতের জ্ঞান থাকে না। তখন দু'টি নাই, সব এক। নদী সাগরের সহিত মিলিত হলে সব সাগর হয়ে যায়। যতক্ষণ এক জ্ঞান না হয়, ততক্ষণই জগৎ। জগতের সকল বস্তুরই নাম আর রূপ আছে। অর্থাৎ পঞ্চভূতের এলাকা ছেড়ে যাওয়া। শরীর যাওয়ার পূর্বে ঠাকুর বলেছিলেন, 'এখন দু'টি দেখতে পাচ্ছি না — মা আর ছেলে, সব দেখছি তুমি, মা।' তিনি কখনও সাকারে রাখেন কখনও নিরাকারে, দুই-ই তিনি। এখানে নিরাকারের কথা বলছেন।

অন্তেবাসী — আজ্ঞে একটি বৃক্ষে দুটি পক্ষী বাস করছে — এই 'রূপক'টির অর্থ কি?

শ্রীম — জীবাত্মা আর পরমাত্মা। এ শরীরে দু'টিই আছে। হৃদয় পরমাত্মার অধিষ্ঠান, তাই 'ব্রহ্মপুর' বলেছেন, আর জীব।

জীবত্বের conception-এ (ধারণাতে) তিনটি জিনিস আছে। প্রথম — অজ্ঞান, অর্থাৎ অন্তঃকরণ, দ্বিতীয় — চেতনের আভাস অর্থাৎ reflection, আর তৃতীয় — কূটস্থ চেতন।

আর ঈশ্বর, এতেও তিনটি ভাগ আছে। প্রথম — মায়া, দ্বিতীয় — মায়াতে চেতনের আভাস, আর তৃতীয় — মায়ার অধিষ্ঠান চৈতন্য বা সাক্ষী চেতন।

চেতন অংশে জীব আর ঈশ্বর এক। এই ঐক্যজ্ঞান করা, তা জ্ঞানপথ দিয়েও হয়, ভক্তিপথেও হয়।

ঈশ্বর থেকে যতদিন পৃথক ভাবা ততদিনই দুঃখ, ততদিনই জন্মমরণ। তাই 'স্বাদু-পিপ্পল'— তিক্তকষায়, অর্থাৎ সুখ-দুঃখ ভোগ

করে জীব। যখন তাঁর সঙ্গে এক হয়ে যায় তখন এই জীবই শিব হয়ে যায়। তখন আনন্দ, কেবল আনন্দ। আর সুখ — সে সুখের পর দুঃখ নাই সেই একটানা সুখ লাভ হয়। এইটে হচ্ছে summum bonum of life — the greatest ideal of human life (মনুষ্যজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ)। তাকেই ঈশ্বরদর্শন, ব্রহ্মদর্শন, ভগবানলাভ, আত্মদর্শন নানা ভাবে বলা হয়। কিন্তু আসল কথা এক।

অন্তেবাসী — আজ্ঞে, অত্যন্ত দুরূহ বিষয়।

শ্রীম — তাই তো তিনি বলেছেন তাঁর সঙ্গে একটা সম্বন্ধ পাতাতে, তখন সোজা হয়ে যায় — যেমন শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। ক্রাইস্ট বলতেন — পিতাপুত্র, ঠাকুর বলছেন — মা আর ছেলে। আবার সোঽহং, অহং ব্রহ্মাস্মি — অদ্বৈতসাধন।

সনক, সনাতন ঋষিরা শান্তভাব আশ্রয় করেছিলেন। হনুমান দাস্যভাবে ছিলেন — 'আমি রামের দাস'। গুহক আর রাখালরা সখ্যভাবে দেখতেন। যশোদা, কৌশল্যা, নন্দ — এঁরা বাৎসল্যভাবে ছিলেন — ভগবান আমার ছেলে এইভাব। আর গোপীরা মধুরভাবে সাধন করেছিলেন — শ্রীকৃষ্ণ ভগবান আমাদের পতি, এই বুদ্ধি। ক্রাইস্ট বলতেন — The father is in me, and I in him. (St. John 10 : 38) (পিতা আমাতে আর আমি পিতায়)। শেষে বলেছিলেন, I and my father are one — পিতাপুত্র অভেদ (St. John 13:30). ঠাকুর বলতেন, মা — তুমি মা, আর আমি ছেলে। আবার জ্ঞানপথে সাধন — আমি ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বর, তত্ত্বমসি — তুমি তাহাই, তুমি মানে সেই ঈশ্বরই এই সবকিছু। এ কঠিন বটে!

এই সব রাস্তা দিয়েই লোক তাঁকে জেনেছে। একটা বেছে নিতে হয় নিজের রুচিমত। তারপর ঐটা নিয়ে পড়ে থাকা! সন্তানভাব তো বেশ, কি বল? — পিতা আর পুত্র।

অন্তেবাসী — আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার এটি ভাল লাগে।

শ্রীম — বেশ তো তা নিয়ে থাকলেও হয়। কেমন জান — যেমন জঙ্গলী গোলাপ — Gigantia। সেইটে ভাল গোলাপের সঙ্গে graft (কলম) করা। গাছটি হয়ত জঙ্গলী, কিন্তু তখন তার

যে ফুল ফুটবে তা ভাল গোলাপ।

তাঁর সঙ্গে এক, এই জ্ঞান করা, এইটে অদ্বৈত জ্ঞান। এই জ্ঞান না হলেই যত দুঃখ। কারণ, তখন 'অনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ'— জীববুদ্ধিতে মোহিত হয়ে শোক করে। আর এই জ্ঞান হয়ে গেলেই আনন্দ, তাই 'বীতশোক'।

যেমন রাজার ছেলে চোরে নিয়ে গেল। ভিক্ষুকের হাতে পড়েছে, ভিক্ষুকের ঘরে মানুষ হচ্ছে — ভিক্ষা করে খায়, কত দুঃখ! একজন এসে বললে তোর বাপ রাজা, তোর বাপ-মা আছে যাবি? দেখিয়ে দেব চল। তার কথায় বিশ্বাস করে তার সঙ্গে গেল। সত্যিকার বাপ-মাকে পেয়ে কত আনন্দ, তখন আর দুঃখ নাই। ভিক্ষা করে খেতে হয় না। আমি রাজার ব্যাটা — এই অভিমান।

অন্তেবাসী — (সানন্দে) আজ্ঞে, এ খুব ভরসার কথা। এতে আশা হয়।

শ্রীম — তাঁর সব কথা ভরসার কথা গো, সব message of hope (আশার বাণী)! তিনি বলেছিলেন, 'তোদের বেশী কিছু করতে হবে না, আমি কে আর তোরা কে শুধু এ জানলেই হবে।' কতবার বলেছেন অন্তরঙ্গদের, 'আমার চিন্তা যে করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে — যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে!'

এর চাইতে আশার বাণী আর কি আছে? এখন বড্ড chance (সুযোগ) — ড্যাঙ্গায়ও এক বাঁশ জল।

২

আজ বাসন্তী দশমী। ঠাকুরদের একটু বিশেষ ভোগ হইবে ফলমিষ্টির। ভোগের সব আয়োজন করিয়া একটি ভক্ত শ্রীমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ্ঞে, ভোগ কি মন্ত্রে নিবেদন করবো? শ্রীম তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, কি আর মন্ত্র, বাপকে যেমন খাওয়ায় লোকে তেমনি! নিজের বাপকে যখন খাওয়ায় তখন মন্ত্র বলে ডাকে কি? না বলে, বাবা আসুন, সব প্রস্তুত আহার করুন। আপনার বাপ, মন্ত্রের দরকার হয় না। বল, বাবা আসুন, খাবেন। আর বসে বসে

অনেকক্ষণ ধ্যান কর, তাহলেই হলো।

ভক্তটির যেন একটি নূতন দিক খুলিয়া গেল। একটি closed chapter (অজ্ঞাত অধ্যায়) যেন open (উন্মুক্ত) হইয়া গেল। 'আপনার বাপ' কথা মাত্র দু'টি কিন্তু কি শক্তি, কি আপন করা ভাব!

এখন বেলা দশটা। স্বামী নির্গুণানন্দ জামতাড়া আশ্রম হইতে আসিয়াছেন। শ্রীম রন্ধনশালার পার্শ্বে আসিয়া বলিতেছেন —

একজন সাধু এসেছেন, আহার করবেন। ব্রাহ্মণ ও সাধুসন্ন্যাসী নারায়ণতুল্য, শুদ্ধভাবে রাঁধতে হবে। ভাগবতে শুনলে না, ভগবান নিজে পা ধুইয়ে দিলেন! যতক্ষণ রান্না হচ্ছে ততক্ষণ জপ করা উচিত। পরিবেশন হচ্ছে তখনও জপ। সর্বদা জপ — যেন ঘড়ির কাঁটার মত টক্ টক্, ঠোঁট নড়বে না — মনে মনে জপ। মুড়িমিছরী এক দর করতে নেই।

আর তা ছাড়া নিত্য যা রান্না হয় সব শুচির সঙ্গে না করলে নারায়ণে অর্পণ করা যায় না। সাধু ভক্তরা নিজে খান না, ভগবানে নিবেদন করেন, তারপর তাঁর প্রসাদ পান। এতে সত্ত্বগুণ বাড়ে, চিত্ত শুদ্ধ হয়, ভক্তি হয়। গীতায় তিনি বলেছেন,

'যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্।। (গীতা ৯-২৭)

যা কিছু কর — আহারাদি, হোম, দান, তপস্যা সব আমাতে অর্পণ কর। তাই সর্বকার্য তাঁর, এ ভেবে করতে হয়। সব কাজের ভিতর একটু ফাঁক পেলেই জপ করতে হয়।

হিন্দুর জীবনটা একটা continual worship (একটানা উপাসনা)। দিনরাত যখনই অবসর হবে তখনই জপ। ঘড়ির কাঁটার ন্যায় টক্‌টক্ করা চাই। কাজ শেষ করে করবো — যদি এ মনে করা যায় তবে আর হলো না। কাজের শেষ নাই — একটার পর একটা, এ চলবেই। সমুদ্র স্থির হলে স্নান করবো, এ যেমন হয়ে উঠে না, তেমনি সব শেষ করে ভজন করবো — এও হয় না। তাই এর ভিতরই সব করে নিতে হবে। ভাত বসিয়েছ, জপ কর। একটু বেশী অবসর হলো, অমনি ঠাকুরঘরে গিয়ে বসে বসে জপ কর। কোথাও

যাচ্ছ, অমনি জপ করতে করতে যাও। এমনি করে সর্বকার্যের ভিতর জপ করার অভ্যাস করা। এ করতে করতে হয়ে যায়। এসব ঠাকুর কেন বলে গেছেন? তিনি জগদ্‌গুরু কিনা — লোকের কল্যাণের জন্য এসব বলেছেন। সময় তো হয় না, তাই যে অবস্থায় আছ সেই অবস্থাতেই তাঁর নাম কর। কর্মত্যাগ ও কর্মসংক্ষেপ কি করে হয় তার কৌশল সব দেখিয়ে গেছেন। এসব মানুষের কথা নয়। যিনি অবতার, ঈশ্বর — যিনি গুরু, যিনি বন্ধু তিনি এসব বলে গেছেন আমাদের মঙ্গলের জন্য।

কর্মকাণ্ড সোজা কথা! সব সময় নিয়ে যায় কর্মে। তাই বলেছেন, যে কর্মই কর না কেন, আমাকে ফল দিয়ে দিলে আমার জন্য করছ এ কথা স্মরণ থাকলে, এতেই হয়ে যায়। বন্ধনের পরিবর্তে এই কর্মই মুক্তি প্রদান করে।

আবার ঠাকুর কার্যসংক্ষেপের কথা কেমন বলেছেন! যেমন, যারা বিয়ে করে নাই তারা আর বিয়ে করবে না, বিয়ে করলে সময় কোথায়? অর্থ উপার্জন আরও কত চিন্তা! আবার যারা বিয়ে করে ফেলেছে, তাদের বলেছেন দুই-একটি সন্তান হয়ে গেলে ভাইবোনের মত থাকবে। মানে, একগুচ্ছের ছানাপোনা হয়ে গেলে অবসর কোথায়? তাদের মানুষ করা, লেখাপড়া শিখান, আবার মেয়ের বিয়ে, কত ঝঞ্ঝাট! তাই কি করে কর্মসংক্ষেপ হয় তার কথা আগে থাকতেই বলে দিয়ে গেছেন। যারা শুনবে, পালন করবে, তারা ফল পাবে। না শুন — যেমন ক্রাইস্ট বলেছিলেন — 'Verily, I say unto you they have their rewards. (St. Math. 6:2) — নিশ্চয় প্রতিফল পাবে।

এসব সঙ্কেত কেন দেখিয়ে দিলেন ঠাকুর? তিনি জানেন, কলিতে অন্নগত প্রাণ, আয়ু কম। অর্থোপার্জনেই সব সময় চলে যায়। তাঁকে ডাকবে কখন, তাই এসব কথা বলেছেন। এর অর্থ আছে। দেখ, ভক্তদের কল্যাণ হবে কিসে তাই অবতার, জগদ্‌গুরু সর্বদা ভাবেন। তার জন্যই বলেছেন — অর্থশূন্য বাক্য নয়, অর্থপূর্ণ সব।

যাদের প্রকৃতিতে কর্ম রয়েছে, তারা কর্ম না করে পারে না। তাদের

জন্য গীতায় তার কৌশল বলে দিয়েছেন—অনাসক্ত হয়ে কর, আমাতে ফল সব অর্পণ করে কর। তাহলে তোমার কর্মই উপাসনা হয়ে যাবে। নিষ্কামভাবে করলে এতে চিত্ত শুদ্ধ হবে আর প্রকৃতিও ক্ষয় হবে।

স্ত্রীপুত্র, বন্ধুবান্ধব যাদের বল তারা যাতে তোমায় কর্মে বেশী করে ফেলতে পারে, তারই চেষ্টা দেখে। কিন্তু যিনি গুরু তিনি দেখেন কি করে তোমার কর্ম কমে, কি করে অবসর পেয়ে ভগবানচিন্তা করতে পার। যারা প্রকৃত বন্ধু তারা বন্ধুর কর্ম যাতে কমে, যাতে তার মঙ্গল, তাই দেখে।

(একজন ভক্তের প্রতি) আপনি একে একটু অবসর দিন যতদিন থাকেন। ওদিকে ও অনেক করেছে। বহির্মুখী প্রবৃত্তি হয়ে গেছে, একটু ধ্যানট্যান করুক।

শ্রীম-র বৈশিষ্ট্য এই, যে কোনও উপলক্ষ্যকে অবলম্বন করিয়া মানুষের মনকে highest ideal-এ (সর্বোচ্চ লক্ষ্যে) উঠাইয়া দেন। সর্বদা এবং সারা জীবন ইহাই তাঁহার যুদ্ধনীতি।

মধ্যাহ্ন আহার হইয়া গেল। এখন উচ্ছিষ্ট শালপাতাগুলি তোলা হইতেছে। শ্রীম জনৈক ভক্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন — সাত্ত্বিক কর্মের লক্ষণ আছে — perseverance and promptitude-এর (ধৈর্য্য ও উৎসাহের) সহিত সব কাজ করা হয়, আর তামসিক কর্মীর যেন আঠার মাসে বছর, হচ্ছে হবে — এতে হয় না, পিছে পড়ে যায়। ঠাকুর বলতেন লেদাড়ুর কর্ম নয় — লেদাড়ু মানে অলস তামসিক কর্মী।

তাঁর কথা পালন করতে হয়, অন্ততঃ চেষ্টা করতে হয়। শুধু কথা শুনলুম আর পালন করলুম না — এ কেমন? যীশু তাই বলেছিলেন, And why call ye me Lord Lord and do not the things I say (St. Luke 6:46) (আমার কথা পালন না করে আমার দোহাই দিলে কি হবে)? তাই ঠাকুর regret (দুঃখ) করতেন এক একবার — 'কাকেই বা বলি, আর কেই বা শোনে।' 'শোনা' মানে শুনে কাজে লেগে যাওয়া। শুনতেও পারে, কিন্তু কাজের কথা বললেই পালায়। এসব লোকের ধর্ম হয় না।

শ্রীম-র স্নানজল একটা টিনে ঘরের বাহিরে জমা হয়। মুকুন্দ টিনটা উঠাইয়া জল দূরে ফেলিয়া দিয়া আসিলেন। শ্রীম উহা দেখিয়া বলিলেন, এটা নিলে কেন এখন? হাত-পা ধুয়ে ফেল, কাপড় ছাড়। মুকুন্দ সহাস্যে উত্তর করিলেন, এ তো মহাপবিত্র, শ্রীম পুনরায় বলিলেন, না, শৌচ দরকার, ঠাকুর রয়েছেন। যাও, হাতমুখ ধুয়ে ফেল আর কাপড় ছেড়ে দাও।

মুকুন্দ অগত্যা তাহাই করিল।

৩

এখন অপরাহ্ন চারটা, কুটীরপ্রাঙ্গণে ভাগবত পাঠ হইতেছে — রাজর্ষি ভরতের উপাখ্যান।

শ্রীম — (সহাস্যে) রাজর্ষি ভরতের হরিণ নিয়ে 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' হয়েছিল। কোথায় রাজ্যটাজ্য সব ছেড়ে তপস্যা করতে গেলেন, আর হরিণশিশুর স্নেহে পড়ে গেলেন! স্নেহ অমনি জিনিস! এ ভগবানের একটি কৌশল। তা দিয়ে জগৎকে রক্ষা করছেন। এই স্নেহকাটার নামই সন্ন্যাস।

গোমতীতীরে পুলস্ত্য ঋষির আশ্রমে ভরত বানপ্রস্থ অবলম্বন করেছিলেন। বেশ করছিলেন — ত্রিসন্ধ্যা স্নান, মৃগচর্ম পরিধান, প্রণব জপ। আবার পূজার জন্য কুশ, কুসুম ও যজ্ঞকাষ্ঠ আর পত্র, ফলমূল ও জল সব নিজে আহরণ করতেন। সুসংযত জীবনযাপন আর ঈশ্বরচিন্তা। তাঁরই নামে এ দেশের নাম ভারতবর্ষ, পূর্বে নাম ছিল অজানাভবর্ষ। ভরত ভগবান ঋষভদেবের পুত্র। ঋষভদেবকে একমতে অবতার বলে।

ভারতবর্ষের রাজাদের আদর্শ ঐ ছিল, রাজর্ষিত্ব লাভ করা। অন্য দেশে এ আদর্শ প্রায় নাই!

এখানে রাজা, যেমন রামচন্দ্র, নিজেকে মনে করতেন প্রজাদের পিতা। তাদের সর্বপ্রকার কল্যাণসাধন তাঁর কাজ। ভরতও রাজ্য-সেবা করে শেষে সন্ন্যাসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। কিন্তু স্নেহ তখন মুস্কিলে ফেলে দিলে — যোগভ্রষ্ট হলেন। একটা হরিণের বাচ্চা

জলে ভেসে যাচ্ছে দেখে তাকে তুলে আনলেন, আর পুত্রস্নেহে লালনপালন করতে লাগলেন। তাকে চক্ষের আড়ালে দেখলে জগৎ শূন্য দেখতেন। উঃ, কি মহামায়া! তাই ঠাকুর বলতেন, সর্বদা প্রার্থনা — 'মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না'।

নিজের স্ত্রীপুত্রকন্যা রাজ্য সব ছেড়ে গিয়ে হরিণের জন্য সংসারে আবদ্ধ হলেন। বিচিত্র মায়া! অত বড় শক্তিশালী পুরুষ তাঁরই এ অবস্থা। ছেলেখেলা নয় — অতবড় সম্রাট হয়ে সব ত্যাগ করে এক রকম যৌবন বয়সে এই কঠোর জীবন গ্রহণ করেছিলেন। কত বড় লোক আর কত বড় লোকের পুত্র — ঋষভদেব অবতার ছিলেন কিনা! তাঁরই এ অবস্থা অন্যের 'কা কথা'। তাই প্রার্থনা সর্বদা — শরণাগত প্রভো, শরণাগত।

এতে লোকশিক্ষা হবে — অত শক্তিমান পুরুষেরই এই অবস্থা, তা আমাদের কথা কি! সাবধান হবে লোক — সাধু, ভক্ত, তপস্বীগণ। তাঁর মহামায়ার সঙ্গে চালাকী চলে না। পঙ্কে বদ্ধ কর করী (হাতী), পঙ্গুকে লঙ্ঘাও গিরি।

শরীরত্যাগের সময়ও হরিণের চিন্তা করতে করতে হরিণজন্ম হলো। এক জন্ম পিছনে পড়ে গেল। তৃতীয় জন্মে জ্ঞানলাভ করলেন। ভরত মহাভক্ত ছিলেন, আর খুব তেজস্বী সম্রাট। তৃতীয় জন্ম-ব্রাহ্মণের ঘরে হলো, কিন্তু সব জন্মের কথা মনে ছিল।

শ্রীম (পাঠকের প্রতি) — হাঁ, এটা আবার পড়, কি কি গুণ এঁর পিতার ছিল।

পাঠক — শম, দম, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, দান, সন্তোষ, সহিষ্ণুতা, বিনয়, কর্ম, বিদ্যা, অনসূয়া, আত্মজ্ঞান ও ধর্মাচরণজনিত আনন্দ।

শ্রীম — এগুলি ব্রাহ্মণের গুণ। অত গুণ বলেই তো স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ রাজসূয় যজ্ঞে এঁদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন। এঁদের সংস্কার কত! এখন হয়ত চাপা পড়ে আছে। এইজন্য তাঁদের সম্মান করা উচিত! তবেই তাঁদের পূর্ব সংস্কার জেগে উঠবে। তাতে আমাদের লাভ, আর তাঁরাও মানুষ হবেন।

একবার মা-ঠাকরুন আমাদের বাড়িতে ছিলেন একমাস। যাবার

দিন রাঁধুনী ব্রাহ্মণকে একজোড়া কাপড় আর টাকা দিয়ে একেবারে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন। আর আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন জোড়হাতে।

মা ঠাকরুন cook-কে (রাঁধুনীকে) সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করছেন দেখে সকলে একেবারে অবাক্। তাই বলে, 'আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।'

শ্রীম — পড়।

পাঠক পড়িতেছেন — ভগবানের অনুগ্রহে তাঁহার পূর্বস্মৃতি জাগ্রত ছিল। স্বজনসঙ্গ হইতে পাছে পুনর্বার যোগভ্রষ্ট হন, এই আশঙ্কাহেতু তিনি লোকের নিকট আপনাকে উন্মত্ত, জড়, অন্ধ ও বধিরের ন্যায় দেখাইতেন।

আর যাঁহার শ্রবণ, স্মরণ ও গুণকথন দ্বারা কর্মবন্ধনের বিনাশ হয়, সেই ভগবানের চরণারবিন্দযুগল* হৃদয়ে বিশেষরূপে ধারণ করিতেন।

শ্রীম — ইহাই পরমহংস অবস্থা।

পাঠ চলিতেছে — জড়ভরতকে নরপশুরূপে ভদ্রকালীর সম্মুখে লইয়া গেল কিন্তু জড়ভরতের কোন চিত্তবিকার নাই। ভাইরা জমিতে শ্রমিকের কাজ করায়, তাহাতেও আপত্তি নাই। খাইতে দিক বা না দিক লক্ষ্য নাই।

শ্রীম — পরমহংস অবস্থায় ঠাকুর বলতেন, ঝড়ের এঁটো পাতার মত হয় — যেখানে নিয়ে যাচ্ছে, সেখানেই যাচ্ছে। বই পড়ে এক রকম হয় আর চোখে দেখলে আর এক রকম।

ভাগ্যিস্ আমরা চোখে দেখেছিলাম, তাঁকে তাই কিছু বোঝা যাচ্ছে। কোন গুণের বশ নন, গুণাতীত অবস্থা।

(ঠাকুর) সঞ্চয় করতে পারতেন না। একজন তিনটি জামা নিয়ে গিছলো, একটি রেখে দু'টি ফেরৎ দিলেন। আবার এদিকে সব বিষয়ে নজর! রামলালকে বললেন, 'পুজোর সময় মেয়েদের কাপড় পাঠিয়ে দিস্ — নয়ত ওরা বলবে মামার বাড়ির কেউ নেই।'

ভক্তদের কাছ থেকে জোর করে সেবা নিতেন।

---

*চরণ-অরবিন্দ-যুগল - পদ্মের ন্যায় চরণ দুটি।

তিনি জানতেন, এতে ওদের কল্যাণ হবে, ওঁর তো নিজের কোনও দরকার ছিল না কোন বিষয়েই, তবুও একই জিনিস দু'জনকে বলেছেন আনতে। মানে, আমার জন্য নিজে হেঁটে হেঁটে কিনে আনলে ওদের কল্যাণ হবে। কাউকে হয়ত বলছেন, পাটা কন্‌কন করছে, একটু হাত বুলিয়ে দাও তো — কি জামাটা রৌদ্রে রাখ, অথবা, গামছাটা ধুয়ে আন তো, এই রকম।

তিনিই জানতেন, বুঝতে পারতেন, ভক্তদের কিসে মঙ্গল হবে। ভক্তরা জানতো না, কিন্তু তিনি জানতেন। হয়ত ভাবতেন জোর করে এখন করিয়ে নি, পরে যখন ওরা মনে করবে আমরা তাঁর সেবা করেছি, তখন ওদের চিন্তার আহার মিলবে।

জনৈক ভক্ত (স্বগত) — আপনারাও এরূপভাবে সব জোর করে আমাদের দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন কৃপা করে, আমাদের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য।

শ্রীম কি ভাবিতেছেন।

শ্রীম (সহাস্যে) — একদিন ঠাকুরদের বাড়ির একটি scene-এর (ঘটনার) কথা বললেন — ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর ভগ্নীর কথা হচ্ছে। ভগ্নী বললেন, 'দেখ দেখি, মায়ের কি রকম আক্কেল — অমন বলতে হয়? দু'দিনমাত্র বাড়ি এসেছে, এর ভিতরই অমন কথা বলতে আছে?' ভগ্নীপতি প্রায়ই বাড়ি থাকতো না। একবার অসুখ হয়ে দু'দিন ছিল ঘরে, তাতে ঠাকুরের মা বললেন, 'কি বাবা, এখন বুঝি পাখা ভেঙ্গে গেছে উড়তে পারছ না?' (হাস্য)। ঠাকুরের মা অতি সরল ছিলেন কিনা! ঠাকুর বেশ হাসতে হাসতে বলতেন — মা বলেছিলেন, 'কি বাবা, এখন বুঝি পাখা ভেঙ্গে গেছে — উড়তে পারছ না?'

শ্রীম — তিনি নানা প্রকৃতির লোক করেছেন। যে যেমন সে তেমনি ভাবের লোক খোঁজে। কেউ কেউ পরমহংসদেবের কাছে যেতো তাঁর কথা শুনতে। কেউ বা তাঁর কথা শুনেও গ্রাহ্য করতো না — অন্যখানে যেতো। কেউ বিদ্যাসাগর মশায়ের কাছে, কেউ সুরেন ব্যানার্জীর, কেউ কোনও ধনী লোকের কাছে যেতো।

যেমনি ভাব তেমনি সব সঙ্গ নেয়।

শ্রীম (জনৈক ব্রহ্মচারীকে) — হাঁ, ভাগবতে পড়া হচ্ছিল

ব্রহ্মচারীর কর্তব্য কি কি — বল তো?

ব্রহ্মচারী — গুরুসেবা, নিয়ম, পাঠ।

শ্রীম — হাঁ, আর অন্তর্বহি শৌচ। গুরুসেবা বড় কঠিন কাজ, তাঁর কৃপা হলে এ করা চলে। নিষ্কামভাবে না করলে উল্টো ফল হয়। নিষ্কাম সেবাতে ঈশ্বরে ভক্তি হয়। গুরু আর ইষ্টে ক্রমে অভেদ জ্ঞান হয়।

বরাহনগর মঠে একজন সেবা করেছিল ছ'মাস — ঠাকুরসেবা, সাধুসেবা। আশ্রমের থালাবাসনও কখনও মাজতো। সেবা করতো বটে, কিন্তু এদিকে অফিসের কাজে লাগে অমন সব বই পড়তো। শেষে চাকরী নিলো, বিয়ে করলো। মাসে বিশ টাকা মাইনে হলো। এখন বুঝি একশ' টাকা বেতন।

তাই সর্বদা প্রার্থনা, প্রভো, ভুলিও না। নির্জনে, গোপনে প্রার্থনা করতে হয়। দক্ষিণ দিকের ঐসব মাঠে একলা নির্জনে, গোপনে থাকলে তবে ভাল ধারণা হয়।

শ্রীম — 'নিয়ম' — পতঞ্জলি ঋষির মতে — সন্তোষ, তপস্যা, ঈশ্বর-প্রণিধান। আবার এ দু'টিও — পাঠ এবং শৌচ। পাঠ বলতে যা তা পড়া নয়। অধ্যাত্মশাস্ত্র — যাতে মন ঈশ্বরের দিকে যায়, সিদ্ধান্তশাস্ত্র — যেমন গীতা, উপনিষদ্, ভাগবত কথামৃত এই সব। শৌচ, স্নানাদি দ্বারা বহিঃশৌচ হয়। অন্তঃশৌচ ঈশ্বরচিন্তা দ্বারা, ধ্যানজপ দ্বারা হয়। অন্তঃশৌচের প্রয়োজন অধিক। আবার, নোংরা লোকের ধর্ম হয় না। ব্রহ্মচারীদের এসব আচরণ করতে হয়।

ব্রহ্মচর্য নিয়ে বার বৎসর থাকতে হয়, তারপর সন্ন্যাস। আজকাল দু'এক বছরের মধ্যেই সন্ন্যাস নিয়ে একেবারে পাকা হয়ে যায়। এ তো ফ্যাসন নয়! গেরুয়া — এ তো সাইনবোর্ড। কিছু না জমতেই সব বের করে দেওয়া সাইনবোর্ড দিয়ে। শুধু গেরুয়াতে কিছু নেই। মনটিও সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গিন হয়, তবে ঠিক। মন যখন সর্বদা ঈশ্বরে মগ্ন থাকে, তখনই গেরুয়া নেওয়ার যথার্থ অধিকার। নয়ত অনেকদিন গুরুসেবা করে তারপর নেওয়া।

১৩ই চৈত্র, ১৩২৯ সাল, ২৭শে মার্চ, ১৯২৩ খ্রীঃ।
মঙ্গলবার, বাসন্তী দশমী।

ষোড়শ অধ্যায়

রামনবমীর আনন্দোৎসবে শ্রীম

আজ একাদশী। রাত্রিশেষে কতকগুলি ভক্ত অশ্বত্থমূলে ধ্যানমগ্ন। ঊষার নবীন আলোক সম্পাতের সঙ্গে সঙ্গে বিহগকুল কলধ্বনি করিতেছে। ক্রমে পূর্বাকাশে বালসূর্য উদিত হইতেছে। ভক্তগণ এইবার আশ্রম-সেবার্থে নিজ নিজ কার্যে মনোনিবেশ করিলেন।

শ্রীম দক্ষিণ প্রান্তরবর্তী হরতকী-বনে উপবিষ্ট। অল্পক্ষণ হয় সূর্যোদয় হইয়াছে। দুই চারিটি গাভী বিচরণ করিতেছে। আর দুই একটি পক্ষী আপন মনে গান করিতেছে। গাভীপদপৃষ্ট শুষ্ক পত্রোত্থিত মড়্মড়্ শব্দ ক্কচিৎ শ্রুত হইতেছে। তাহা ছাড়া সকলই নীরব।

শ্রীম তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবল্লী সুর করিয়া পাঠ করিতেছেন। সম্মুখে একজন ব্রহ্মচারী বসিয়াছেন। পাঠান্তে ভৃগু-বরুণ-সংবাদ বলিতেছেন — ভৃগু ঋষি পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন, 'অধীহি ভগবো ব্রহ্মেতি' — ভগবন্ আমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিন। পুত্রকে ব্যাকুল দেখিয়া পিতা বলিলেন, 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্মেতি।' জগতের সমস্ত প্রাণীগণ যা থেকে উৎপন্ন, যা দ্বারা বেঁচে থাকে আর অন্তে যাঁকে আশ্রয় করে, তাই ব্রহ্ম বলে জানবে। পিতার আদেশে ভৃগু তপস্যা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে আসিয়া বলিলেন, 'আজ্ঞে' মনে হচ্ছে অন্নই ব্রহ্ম। কারণ অন্ন থেকে শরীর উৎপন্ন হয়, অন্নদ্বারা রক্ষা হয়, আবার অন্নে পরিণত হয় শেষে।'

বরুণ বলিলেন, 'হয় নাই। তপস্যা কর, জানতে পারবে। আর দেখ তপস্যাই ব্রহ্ম।'

এইরূপে আরও তিনবার পিতার কাছে আসেন। কখনও

বলিতেছেন, প্রাণ ব্রহ্ম, কখনও মন, কখনও বুদ্ধি। পিতার ঐ এক কথা, তপস্যা কর , জানিতে পারিবে। অবশেষে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইল। তখন কি আনন্দ! সর্বভূতে সর্ববস্তুতে ব্রহ্মদর্শন করিয়া আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে ব্রহ্মগুণগান করিতে লাগিলেন।

শ্রীম — তাঁকে দর্শন করলে মনের সংশয় যায় — 'ছিদ্যন্তে সর্ব সংশয়াঃ'। নচেৎ বড় শক্ত, যায় না। তাই এক একটা এক একবার ব্রহ্ম বলে ধরেন, আর ছাড়েন। মন প্রসন্ন হয় না কিনা। ঠাকুর বলেছিলেন, বাক্সটা মুখে মুখে পড়ছে না।

প্রথমে বললেন — অন্ন, তারপর প্রাণ, মন, বুদ্ধি — এক একবার এক একটিকে ব্রহ্ম বলেন। পিতা বললেন, হলো না এগিয়ে যাও — তপস্যা কর। শেষে যখন হল, তখন নিজেই বুঝতে পারলেন।

যেমন ঠাকুর বলতেন, সাত দেউড়ীর পর রাজাকে যখন দেখলে তখন কে রাজা, এ প্রশ্ন আর নাই। যখন বুঝলেন, তখন আর বাপের নিকট আসেন নাই জিজ্ঞাসা করতে। নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছলো, এসে আর খবর দিলে না। সব সংশয় দূর হয় তাঁকে দেখলে! 'সব দুঃখ দূর করিলে দরশন দিয়ে।'

তপস্যা না করলে এসব তত্ত্ব বোঝা যায় না! তপস্যা করলে মনের সংশয় অনেকগুলি আপনিই নাশ হয়, একাগ্রতা হয়। সম, দম, তিতিক্ষা এসব গুণগুলি আসে। ইন্দ্রিয়সংযম আর মনের একাগ্রতা হলেই হলো। চিত্ত শুদ্ধ না হলে হবার যো নাই।

ঘোলা জলে ছায়া পড়ে না। তাই তপস্যা করতে হয়। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, সকলকেই তপস্যা করতে হয়। তপস্যা চাই।

অন্তেবাসী — আজ্ঞে, সেদিন সত্যকামের কথা বলেছিলেন ছান্দোগ্য উপনিষদ্ থেকে।

শ্রীম — কি কথা বল তো?

অন্তেবাসী — গুরু আরুণি ঋষি উপদেশ দিয়ে বললেন, এই চারশ' গরু নিয়ে যাও — চরাও। যখন এক হাজার হবে তখন এসো আবার। কোথায় থাকবে, কি খাবে, কি করবে, অন্য কোনও কথা বললেন না।

শ্রীম — হাঁ, পূর্বে এইরূপই হতো। এখনও তাই। বেশি বললে বুঝতে পারবে না কিনা, তাই বলেন না। ক্ষুদ্র আধার, তাতে আবার পরিষ্কার নয়, তাই ঐরূপ করা হয়।

এটা constructive path (স্বাভাবিক গঠনমূলক পন্থা), নিজের ভিতর থেকে আপনিই development (বিকাশ) হবে।

তপস্যা না করলে নিজে কি চায় তাই বুঝতে পারে না, প্রশ্নও ঠিক হয় না। তপস্যা করতে করতে এক চিন্তা, এক ভাবনা হয়। নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মত। ঠাকুর বলতেন, 'একটু কিছু কর, তাহলে তিনি কারুর মুখ দিয়ে বলে দেবেন, এই এই। তিনি বলতেন, 'প্রার্থনা কর, আন্তরিক ব্যাকুলভাবে — এতে হবে।' দেখ না শেষে সত্যকামকে ষাঁড়ের মুখ দিয়ে তিনি বলালেন। অগ্নি, হংস, মদ্‌গু এরাও উপদেশ দিলেন।

ঠাকুর বলেছিলেন, 'মা কুকুরের মুখ দিয়ে হয়ত কিছু বলাবেন।'

যখন সময় হয় আপনি হয় তখন। তা বলে চেষ্টা ছাড়তে নাই। খানদানি চাষার মত লেগে থাকতে হয়। তিনি তো অন্তর্যামী, সব জানেন। স্থান কাল পাত্রের অপেক্ষা নাই তাঁ'তে। তিনি দেখেন ব্যাকুল কিনা। প্রথমে একটু কষ্ট করলে শেষে কত আনন্দ। দেখ না ভৃগু আনন্দে 'হাউ, হাউ' করতে লাগলেন যখন ব্রহ্মদর্শন হলো।

অন্তেবাসী — আজ্ঞে, 'তপো ব্রহ্ম' এ কথার অর্থ কি? প্রথম বললেন, যা থেকে সব জন্মে, যার দ্বারা জীবিত থাকে, আবার মৃত্যুর পর যাতে যায়, তাহাই ব্রহ্ম। পরে বললেন, 'তপো ব্রহ্ম'। এর অভিপ্রায় কি?

শ্রীম — 'যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি'। সাধকের অবস্থায় উপায় আর উদ্দেশ্য এক হয়ে যাবে। যোলআনা মন দিয়ে উপায়কে না ধরলে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয় না।

লক্ষ্যভেদের সময় অর্জুনের শর আর পক্ষীর চক্ষু এক point (পয়েন্ট) হয়ে গিছলো। তখনই বিদ্ধ হল। মন দিয়ে যোগ করতে হয় কিনা, মনের দূরত্ব তখন চলে যায়। ব্রহ্মাকারা বৃত্তি হয়। গোপীদের, 'কৃষ্ণ' ভাবতে ভাবতে নিজেরা যে স্ত্রীলোক, এই জ্ঞান

লোপ হয়েছিল। নিজেদের কৃষ্ণ বলে মনে করতে লাগলো।

তপস্যা না করলে বুঝতে পারে না, তাই first step (প্রথম সোপান) বললেন, 'তপস্যাই ব্রহ্ম'। তপস্যাতে মন concentrated (একাগ্র) হয়ে গেলে সেই মন বস্তুলাভ করিয়ে দেবে, তাই 'তপো ব্রহ্ম' বলেছেন।

শাখাচন্দ্রবৎ — যেমন একজনকে দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখাবে, প্রথম — বৃক্ষের শাখাতে দৃষ্টি স্থাপন করার পরে সেখান থেকে চন্দ্রে। তেমনি প্রথমে তপস্যায় মনোনিবেশ করতে বললেন। পরে তপস্যাদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হলে 'স্বয়ংপ্রকাশ' তিনি আপনি দেখা দিবেন। তাই উপায়কে উদ্দেশ্যরূপে বলেছেন — 'তপো ব্রহ্ম'।

আর একটি মহাবাক্য আছে এখানে —'আনন্দাৎ হি এব ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।'

জীবগণ আনন্দ থেকে জন্মগ্রহণ করে — অর্থাৎ, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম হতে উৎপন্ন হয়, তাঁর ইচ্ছাতেই জীবনধারণ করে, আবার অন্তে আনন্দস্বরূপ তাঁ'তেই গমন করে। ঈশ্বরই জগতের সৃষ্টি স্থিতি-বিনাশ করেন! এই মন্ত্রটিকে জার্মান ফিলজফার শ্যপেনহায়র জীবনের আদর্শ করেছিলেন। মৃত্যুভয়ে ভীত না হয়ে বলেছিলেন, উপনিষদের এই মহাবাক্য ছিল বলে আনন্দে যেতে পারছি। 'It has been the solace in my life and it will be the solace in my death'— জীবনে-মরণে ইহাই আমার একমাত্র সান্ত্বনা।

অপরাহ্ন চারটা। জম্বুতল। বিনয়, মুকুন্দ, ছোট অমূল্য, জগবন্ধু ও গদাধর বসিয়া আছেন। শ্রীম আসিলে ভাগবতপাঠ আরম্ভ হইল। জড়ভরত সৌবীররাজ রহুগণকে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দিতেছেন।

শ্রীম — দেখ, আজ আবার শিবিকা বহন করতে লেগে গেলেন। নিজের কোন ইচ্ছা নাই, দেহে অভিমানও নাই। রাজা উপহাস করছেন, তাতেও ভ্রূক্ষেপ নাই। সাধুর হৃদয়, রাজার কল্যাণ কিসে হয়, উল্টে তাই ভাবছেন।

ক্রাইস্ট প্রার্থনা করেছিলেন — 'Father, forgive them; for they know not what they do' (St. Luke 23:34)

(পিতঃ, এদের ক্ষমা কর, কি মহা অন্যায় এরা করছে, বুঝতে পারছে না)। যারা তাঁর মৃত্যুর জন্য দায়ী, তাদের জন্য এই প্রার্থনা করছেন।

ঠাকুরও কিন্তু অপরাধীর কল্যাণকামনা করেছিলেন। মথুরবাবুর কুলপুরোহিত কালীঘাটের লোক। একবার জানবাজারের বাড়িতে ঠাকুর ভাবাবস্থায় মাটিতে পড়ে ছিলেন। ঐ লোকটি তখন ঠাকুরকে পদাঘাত করে বলেছিল, 'বল্ তুই কি গুণ করেছিস্ ওকে (মথুরকে)'? ঠাকুর কখনও একথা মথুরবাবুর নিকট প্রকাশ করেন নাই, তাহলে আর ঐ ব্যক্তির রক্ষা ছিল না!

ঠাকুর নন্দনবাগানে গেছেন ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক উৎসবে। কর্তা মারা গেছেন, ছেলেরা করছে। এরা ঠাকুরকে তেমন আদরযত্ন করে নাই, তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। সকলে খেতে যাচ্ছে, ঠাকুরকে ডাকে নাই। ভক্তরা কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে চলে আসতে চাইছেন। ঠাকুর ছল করে বললেন, 'না, এত রেতে খাব কোথায়? আবার ভাড়া দিবে কে?' শেষে একস্থানে নিজে গিয়ে বসলেন — জায়গাটা অপরিষ্কার ছিল — জুতো রাখার স্থান। নুন ট্যাকনা দিয়ে দুই একখানা লুচি খেয়ে এলেন। কেন করলেন — না, ছেলেমানুষ ওরা, জানে না তাঁকে! তিনি তো তাদের জানেন তাই কৃপা করে খেয়ে এলেন।

জড়ভরতের উপদেশে রাজার চৈতন্য হল। তখন বললেন, আমি রাজা, রাজ্যপালন আমার ধর্ম, এসব অজ্ঞান থেকে হচ্ছে। দেহেতে আত্মবুদ্ধি করে হচ্ছে। মন অশুদ্ধ হয়ে গেছে নানা বাসনাতে। কেমন বলছেন, যেমন ঘৃত ফুরিয়ে গেলে প্রদীপ নিভে যায়, তেমনি মনও বাসনাশূণ্য হলে শান্ত হয়। আর তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় তখন।

জড়ভরত বললেন, মহারাজ, শ্রীহরির চরণ ধ্যান করুন, তাহলেই আপনার মন শুদ্ধ হবে। আর সাধুসঙ্গ করুন। সাধুসঙ্গ আর সাধুসেবা ব্যতিরেকে জ্ঞানলাভ হয় না। আর তাঁর লীলা কীর্তন আর শ্রবণ করতে হয়।

'আমি ঈশ্বরের' — এই জ্ঞান হয়ে গেলেই হলো। আমি অমুকের পিতা, অমুকের ভ্রাতা, আমি রাজা — এসব অজ্ঞান থেকে হয়।

আমি ঈশ্বরের দাস, কি তাঁর সন্তান — এ ভাব আসে সৎসঙ্গ করতে করতে। দেহটাতে আত্মবুদ্ধি করেই যত মুস্কিল।

রাজা বলছেন, এই মুহূর্তকাল সৎসঙ্গ দ্বারা আমার অজ্ঞান নষ্ট হল সৎসঙ্গ এমনি! তাই শঙ্করাচার্য বলেছেন — 'ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা' — ক্ষণকালের সৎসঙ্গ করলেও তাহা সংসারবাসনা নাশ করতে পারে।

পাঠ চলিতে লাগিল। এইবার সংসার অরণ্যের বর্ণনা আসিল।

শ্রীম — কি কি উপসর্গ বললেন সংসারের, আবার পড় তো!

পাঠক — সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, ভয়, অভিমান, প্রমাদ, উন্মাদ, শোক, মোহ, লোভ, মাৎসর্য, ঈর্ষা, অপমান, ক্ষুধা, পিপাসা, মানসিক পীড়া, শারীরিক ব্যাধি, জন্ম, জরা, মরণ প্রভৃতি।

শ্রীম — ত্রিতাপজ্বালা, এসব দূর হয় তাঁর শরণ নিলে।

২

কেওরজালি একটি ক্ষুদ্র পল্লী, মিহিজাম হইতে পাঁচ মাইল। গ্রামে ত্রিশ ঘর লোক। কলিকাতার রাস্তার মত একটি প্রশস্ত রাস্তার দুই পার্শ্বে সব গৃহ। প্রায় সবই খড়ের ঘর। শ্রীযুক্ত নিতাই রায় এই গ্রামে বাস করেন। খুব সদাশয় ব্যক্তি আর আয়ুর্বেদ চিকিৎসায়ও তাঁর সুনাম। নিকটবর্তী ঘাটোয়াল রাজাদের কাহারো কাহারো সহিত তিনি সুপরিচিত। অবস্থা ভাল। শ্রীরামনবমী উপলক্ষ্যে তিনি ভগবল্লীলা মহোৎসব আরম্ভ করিয়াছেন। আজ একাদশী, কীর্তন শেষ হইবে। শ্রীমকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছিলেন যাহাতে তিনি আজ অবশ্য যান এবং উৎসবে যোগদান করিয়া আনন্দবর্ধন করেন!

ইতিপূর্বে একদিন রায়মহাশয় শ্রীম-র নাড়ি পরীক্ষা করিয়া সবিস্ময়ে বলিয়াছিলেন, 'কি আশ্চর্য আপনার নাড়ি! আমাদের শাস্ত্রে বলে এরূপ নাড়ি মৃত্যুর পূর্বে হয় আর যোগীদের হয়।'

শ্রীম এই কথা শুনিয়া স্মিতহাস্য করিয়াছিলেন। সেই অবধি রায়মহাশয় তাঁহাকে অতি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন।

আজ বিকালে পাঁচটায় শ্রীম একটি রিক্সাতে আরোহণ করিয়া ঐ

গ্রামে চলিলেন। সঙ্গে ছোট অমূল্য, জগবন্ধু আর গদাধর। গদাধর উৎকলবাসী একটি বালক ভক্ত, সবে আসিয়াছেন! আশ্রমপ্রহরী রহিলেন বিনয়। ইতিপূর্বে ভক্তগণ আর একদিন ঐ উৎসব দর্শন করিয়া আসিয়াছেন।

উৎসবমণ্ডপে শ্রীশ্রীরামসীতার মূর্তি। লক্ষ্মণ ছত্রধারণ করিয়াছেন, ভরত ব্যজন করিতেছেন আর শত্রুঘ্ন চামর দোলাইতেছেন। বিভীষণ যুক্তকরে দণ্ডায়মান, পাদমূলে হনুমান বসিয়া শ্রীরামপদকমলে কমলের অঞ্জলি প্রদান করিতেছেন। জাম্বুবান করজোড়ে দণ্ডায়মান। এই প্রধান মণ্ডপ। অন্যত্র হরগৌরী, মহর্ষি বশিষ্ঠ প্রভৃতির মূর্তি রহিয়াছে, সব মৃন্ময়ী। স্বতন্ত্র গৃহে বড় বেদীতে বালগোপাল নিত্য পূজিত হন। অপর একটি বেদীতে গৌরনিতাই, রাধাকৃষ্ণবিগ্রহ এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবেরও একটি প্রতিমূর্তি রহিয়াছে।

এই বেদিকার সম্মুখে বৃহৎ পটমণ্ডপে সংকীর্তন হইতেছে, ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর — 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে॥' আজই চব্বিশ প্রহর কীর্তন শেষ, তৎপর উৎসব পূর্ণিমা পর্যন্ত চলিবে।

কীর্তনআসরে সতরঞ্জির উপর একখানা শুভ্র বস্ত্র পাতিয়া শ্রীমকে বসাইলেন। তিনি পূর্বাস্য। তাঁহাকে পাইয়া কীর্তনীয়াগণ ও খোলীরা নবীন উৎসাহে পূর্ণ হইল।

নানা ভঙ্গীতে খোল বাজিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে করতাল, কাঁসর ও ঘন্টা বাজিতে লাগিল। এই নাদ রাম, কৃষ্ণ, হরিনামের ধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া এক অপূর্ব আনন্দহাটের সৃষ্টি করিয়া তুলিল। মাঝে মাঝে ভক্তগণ 'হরি বোল, হরি বোল' এই উচ্চ ধ্বনি তুলিয়া পরিশ্রান্ত কীর্তনীয়াদিগের শ্রম অপনোদন ও উৎসাহ বর্ধন করিতে লাগিল। যুবক বালক বৃদ্ধ সকলেই গাহিতেছে।

আটটি কীর্তনের দল আসিয়াছে। বহু দূর হইতে লোক সমাগম হইয়াছে — কেহ পদব্রজে, কেহ গোযানে আসিয়াছে। কতক আবার রেলে। জামতাড়ার রাজার ভাই কয়দিন উৎসবক্ষেত্রে বাস করিতেছেন। নগ্নদেহ সরলপ্রাণ কৃষকই অধিক। প্রকৃতির সব সরল

সন্তান। সভ্যতার ‘মুখে মধু অন্তরে গরল’ ভাব এদের ভিতর এখনও প্রবেশ করে নাই। উৎসবক্ষেত্রের পবিত্র রজ লইয়া ভক্তিভরে কেহ গায়ে মাখিতেছে, কেহ মস্তকে ধারণ করিতেছে, কেহ বা ভূমিতে গড়াগড়ি দিতেছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, প্রতিমা সুন্দর হবে, কর্তা ভক্তিমান হবে, আর পূজারী শ্রদ্ধালু হবে, তবে আবির্ভাব হয়। এখানে সবই অনুকূল। পূজারী একজন উৎকলবাসী সাধু, তাই সব সুন্দর। শ্রীম একটি টাকা দিয়া প্রণাম করিলেন।

কীর্তনের আসরে অর্ধঘন্টা বসিলেন, তাহার পর গাত্রোত্থান করিয়া নিতাইবাবুর ভাণ্ডার, ভদ্রাসন, খামার, বৈঠকখানা সব দর্শন করিলেন। উৎসবক্ষেত্রে মেলা বসিয়াছে, তাই বহু দোকান। শ্রীম আনন্দে মিষ্টির দোকানে উঁকি দিয়া দেখিতেছেন — ছেলেরা জিলিপি কিনিতেছে। নিতাইবাবুর অনুরোধে ভক্তগণ রাস্তায় বসিয়াই কিঞ্চিৎ প্রসাদ হাতে হাতে গ্রহণ করিলেন। আজ তাঁহারা একাদশী ব্রত পালন করিতেছেন।

শ্রীম রিক্সাতে আরোহণ করিলেন, এইবারে ফিরিতেছেন। কিয়দ্দুরে গ্রামের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি উচ্চ তীরবিশিষ্ট পুষ্করিণী দেখিয়া তিনি রিক্সা হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং অমূল্যর হাত ধরিয়া তীরে উঠিলেন। চতুর্দিকে বহু তালবৃক্ষ। শ্রীম বলিলেন, এটি দেখে আমার ঁজয়রামবাটির উদ্দীপন হচ্ছে! আর পুকুরের মাটির সিঁড়ি আর গ্রামের খড়ের দুচালা ঘর দেখে ঁকামারপুকুরের কথা মনে হচ্ছে। জয়রামবাটী শ্রীশ্রীমার এবং কামারপুকুর শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মস্থান।

রিক্সা গাড়ী মাঠের মধ্য দিয়া চলিতেছে — দুইটি বাহক টানিতেছে। অমূল্য অগ্রে হ্যারিকেন লইয়া পথ দেখাইতেছেন এবং জগবন্ধু পশ্চাৎ হইতে গাড়ি ঠেলিতেছেন, গদাধরের হাতে জলপাত্র। উচ্চ নিচ ভূমির উপর দিয়া রিক্সা চলিতেছে — আবার কোথাও রাস্তা বালুকাময়। শ্রীম-র গায়ে আঘাত না লাগে তাই সকলে সতর্ক।

আকাশে শুক্লপক্ষের চন্দ্রিমা কিরণজাল বিস্তার করিয়াছে। নির্জন প্রান্তর, আবার মহুল হরীতকী প্রভৃতি বৃক্ষসমাকীর্ণ বন এবং অদূরে কৃষ্ণবর্ণ পাহাড় দৃষ্টিগোচর হইতেছে। মন্দ মন্দ সান্ধ্য সমীরণ প্রবাহিত,

সকলই মনোমুগ্ধকর।

শ্রীম (জনৈক ভক্তের প্রতি) — আহা মধুযামিনী কি সুন্দর! এই তপোবন, এমন সব স্থানেই মুনি ঋষিরা বাস করতেন। কণ্বমুনির আশ্রমের চমৎকার চিত্রটি কালিদাস দিয়েছেন —

'শান্ত মিদমাশ্রমপদং —।'

আবার —

নীবারাঃ শুকগর্ভকোটরমুখভ্রষ্টাস্তরুণামধঃ
প্রস্নিগ্ধাঃ ক্বচিদিঙ্গুদীফলভিদঃ সূচ্যন্ত এবোপলাঃ।।
বিশ্বাসোপগমাদভিন্নগতয়ঃ শব্দং সহন্তে মৃগাঃ।
তোয়াধারপথাশ্চ বল্কল শিখানিষ্যন্দরেখাঙ্কিতাঃ।।

কোটরস্থিত শুকপক্ষীর মুখনিঃসৃত নীবারকণা বৃক্ষের পাদদেশে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কোথাও ইঙ্গুদী ফলভঙ্গের চিহ্ন প্রস্তরোপরি অঙ্কিত রহিয়াছে। বিশ্বস্তহৃদয় হরিণহরিণীগণ রথশব্দে ভীত নহে, তাই বিচরণ করিতেছে। কোথাও মুনিগণের সিক্ত বল্কল-জলধারা জলাশয়ের পথ সূচিত করিতেছে।

গাড়ী এক সাঁওতাল পল্লীর ভিতর দিয়া চলিতেছে। ছেলেরা বলিতেছে, 'সেলাম বাবাজী,' আবার বয়স্করা 'দণ্ডবৎ বাবুজী' বলিয়া শ্রীমকে অভ্যর্থনা করিতেছে। ইহারা প্রায়ই মিহিজামে গেলে শ্রীমকে দর্শন করে। তিনি সকলের কুশলপ্রশ্ন সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ছেলেদের তাহাদের ভাষায় বলিতেছেন, কি রে, কেমন আছিস, ভাল তো?

একটি বাড়ির সম্মুখে শ্রীম অবতরণ করিয়াছেন। বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুই একদিন হয় এখানে একটি বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আর একটি বাড়িতে বিবাহের উদ্যোগ হইতেছে। গাড়ী আবার চলিল। শ্রীম বলিলেন, বড় সাধ ছিল মাঠের মধ্যে ঐ গৃহস্থ ভক্তটির আনন্দোৎসব দেখি। সাঁওতালের পল্লী, মাঠে চাঁদ, বন, পাহাড় সবই হলো। ভাগবতপাঠ আর সাঁওতালদের বিয়ে দেখলে বাকি সাধ পূর্ণ হতো।

কি বিস্তীর্ণ মাঠ! ঠাকুর বলতেন, বড় মাঠে ঈশ্বরের উদ্দীপন

হয়। Vastness (বিশালতা) দেখে নিজের littleness-টা (ক্ষুদ্রত্ব) ধরা পড়ে।

আজ মধুযামিনীতে শ্রীম আনন্দে পরিপূর্ণ। দক্ষিণ হস্তদ্বারা চশমা চক্ষুসংলগ্ন করিয়া চন্দ্র দর্শন করিতেছেন, কখনও বা বন, কখনও পাহাড়। প্রাণ ভরিয়া যেন এই নৈসর্গিক সৌন্দর্যরাশি উপভোগ করিতেছেন অন্তর্বর্তী অন্তর্যামী চেতনপুরুষ।

আবার বলিতেছেন, কাছে এমন সৌন্দর্য আর ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার, কিন্তু কলকাতার লোক খবর জানে না।

(জনৈক ব্রহ্মচারীর প্রতি) এই দেখ 'নক্ষত্রাণাম্ অহং শশী' আর এই বিস্তীর্ণ নভোমণ্ডল, মৃদুমন্দ সমীরণ, বনস্পতি, পর্বত, বন, প্রান্তর আর নির্জনতা সবই ঈশ্বরের উদ্দীপন করে।

বনে গিয়ে তপস্যা — এইখানে করলেও হয়, এইখানেও বন। কি বল? পাহাড়ে হিংস্র জন্তু না থাকলে ঋষির আশ্রম হতে পারে বেশ।

ব্রহ্মচারী — আজ্ঞে হাঁ, এখানে তপস্যা বেশ হয়।

শ্রীম — বুদ্ধদেব তপস্যা করেছিলেন, এই অঞ্চলেই অশ্বত্থতলে বসে ধ্যানমগ্ন। কি কঠোর তপস্যা করেছিলেন, একটি তিল খেতেন রোজ।

তোমার বুদ্ধচরিতের কতক অংশ মুখস্থ আছে কি? এই বলিয়া শ্রীম দুই একটি শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্, ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চযাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥'

এই আসনে আমার শরীর শুষ্ক হইয়া যাউক, অস্থি চর্ম মাংস বিনষ্ট হউক। তথাপি বহুকল্পদুর্লভ বুদ্ধত্ব লাভ না করিয়া আমি এই আসন কখনও পরিত্যাগ করিব না।

শ্রীম — কুমারসম্ভব, কি আছে মুখস্থ?

ব্রহ্মচারী — প্রথম দিক্কার কিছু কিছু আছে —

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বপরৌ তোয়নিধীবগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ॥

পূর্ব পশ্চিম সাগরপ্রসারী দেবতাত্মা নগাধিরাজ হিমালয় পৃথিবীর মানদণ্ডস্বরূপ উত্তরদিকে বিরাজমান।

শ্রীম—হিমালয় দেবতাত্মা, 'স্থাবরাণাম্ হিমালয়ঃ'(গীতা ১০-২৫)। তাই ঠাকুর জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'হিমালয় দেখে উদ্দীপন হয়েছিল তো?' মহাদেব ধ্যান করছেন হিমালয়ে — বড় সুন্দর দৃশ্য!

এই সময়ে সম্মুখে একটি দুইটি বিষধর সর্প দৃষ্ট হইল, রাস্তায় লম্ববান। দিনে সূর্যতাপে তাপিত হইয়া এক্ষণে নৈশ শীতল বায়ুতে বিশ্রাম করিতেছে। পায়ের শব্দ পাইয়া তাহারা চলিয়া গেল।

শ্রীম -- স কৃত্তিবাসাস্তপসে জিতাত্মা গঙ্গাপ্রবাহোত্থিত দেবদারু।
প্রস্থং হিমাদ্রের্মৃগনাভিগন্ধি কিঞ্চিৎক্কণত্ কিন্নরমধ্যুবাস।।
গণা নমেরুপ্রসবাবাতংসা ভূর্জত্বচঃ স্পর্শবতীর্দধানাঃ।
মনঃশিলাবিচ্ছুরিতা নিষেদুঃ শৈলেয়নদ্ধেষু শিলাতলেষু॥

ব্যাঘ্রচর্ম পরিয়া গঙ্গাতীরে দেবদারু বনে শিব ধ্যানমগ্ন। ঐ স্থান মৃগনাভীর গন্ধে সুবাসিত। আর কিন্নরগণের সুকণ্ঠ সঙ্গীতে ঝঙ্কৃত। শিবের গণ মাথায় ফুলের মালা বাঁধিয়া, সুকোমল ভূর্জবল্ক পরিধান করিয়া গায়ে বিভূতি মাখিয়া শিলার উপর বসিয়া আছেন।

নন্দী বাম হাতে সুবর্ণ বেত্র লইয়া সমস্ত প্রকৃতিকে শাসন করিতেছেন, যাহাতে শিবের ধ্যানে কোনরূপ বিঘ্ন না হয়। আর ওষ্ঠদ্বয়ে দক্ষিণ তর্জনী স্থাপন করিয়া ইসারায় শিবের গণকে চুপ থাকিতে বলিতেছেন।

লতাগৃহদ্বারগতোঽথ নন্দী বামপ্রকোষ্ঠার্পিতহেমবেত্রঃ।
মুখার্পিতৈকাঙ্গুলি সংজ্ঞয়ৈব মা চাপলায়েতি গণান্ব্যনৈষীৎ।।

নন্দীর শাসনে সমস্ত প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। পাতাটিও নড়িতেছে না।

নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃতদ্বিরেফং মুকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারম্।
তচ্ছাসনাৎ কাননমেব সর্বং চিত্রার্পিতারম্ভমিবাবতস্থে।।

শিব অর্ধনিমীলিতনেত্রে সমাধিমগ্ন হইয়া অন্তরে আত্মদর্শন করিতেছেন।

মনোনবদ্বার নিরুদ্ধবৃত্তি হৃদি ব্যবস্থাপ্য সমাধিবশ্যম্।
যমক্ষরং ক্ষেত্রবিদো বিদুস্তমাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তম্॥

বেশ উদ্দীপন হয় এই চিত্রটিতে।

ব্রহ্মচারী — আজ্ঞে হাঁ, কিন্তু শিব স্বয়ং ঈশ্বর। ঐ ভাবে তপস্যার কি প্রয়োজন তাঁর?

শ্রীম — লোকশিক্ষার জন্য। অবতারও তপস্যা করেন, যেমন ঠাকুর করলেন সব। বুদ্ধদেব করেছেন, ক্রাইস্ট, চৈতন্যদেব সবাইকে করতে হয়েছে।

ঠাকুর বলতেন, ধ্যানের দৃষ্টান্ত এই তিনটি —

যখন আকাশে মেঘ হয় আর বায়ু বন্ধ থাকে,

যখন খুব বড় সরোবরের জল নিশ্চল থাকে,

আর নিবাত নিষ্কম্প অগ্নিশিখা।

বাহিরে চন্দ্রকিরণমণ্ডিত বনস্থলীর অপূর্ব শোভা, আর অন্তরের ঈশভাবোদ্দীপ্ত আনন্দপ্রবাহ এই উভয়ে মিলিয়া যেন শ্রীমকে বিমোহিত করিয়াছে। বন্ধুর বনবর্ত্মে ভ্রমণজনিত শ্রম এতক্ষণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

রাত্রি প্রায় দশটা। এইবার সকলে আশ্রমপ্রাঙ্গণে উপস্থিত। শ্রীম অবতরণ করিয়া জম্বুতল বেদিকার উপর উপবেশন করিয়াছেন। এতক্ষণে তাঁহার শ্রমের বাঁধ ভাঙ্গিল। অতি ক্লান্তভাবে বলিতেছেন, এখন প্রকৃতি চাচ্ছে বিশ্রাম, — বলছে, এতদিন যা দেখেছ, শুনেছ, একস্থানে বসে এখন সে-সব রোমন্থন কর। আহা, ঠাকুর যা দেখিয়েছেন, শুনিয়েছেন, তা আর কোথায় পাব! বাসনা ছিল এসব দেখতে, তা হয়ে গেল। আর বাসনার তো নিবৃত্তি নাই!

পূর্ব স্মৃতি সব স্মরণ মনন কর — প্রকৃতি এই চায়!

১৪ই চৈত্র, ১৩২৯ সাল, ২৮শে মার্চ, ১৯২৩ খ্রীঃ।
বুধবার, শুক্লা একাদশী।

সপ্তদশ অধ্যায়

ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য — 'ধর্মসমন্বয়'

১

হরীতকীবনে শ্রীম ভ্রমণ করিতেছেন। প্রভাতকাল, বালসূর্য উদিত হইতেছে। সঙ্গে অন্তেবাসী। উভয়ে একস্থানে বসিলেন। কথোপকথন হইতেছে।

অন্তেবাসী — আজ্ঞে, ঠাকুরের আসার বৈশিষ্ট্য কি?

শ্রীম — ঈশ্বর আছেন এইটি প্রমাণ করতে এসেছিলেন। তিনি তাঁকে দর্শন করেছেন নানাভাবে — সাকার নিরাকার। আবার অন্তরঙ্গদের ঈশ্বরদর্শন করিয়েছেন। আবার যারা তাঁকে দর্শন করে নাই, কি পরে জন্মাবে, তারা যদি তাঁকে আন্তরিক চিন্তা করে, তারাও ঈশ্বরদর্শন করবে তাঁর কৃপায়। দু'টি কথা বলেছিলেন, প্রথম — 'আন্তরিক যারা ভগবানকে ডাকবে তাদের এখানে আসতে হবে।' 'এখানে' — মানে তাঁর কাছে। যতদিন শরীর ছিল ততদিন তাঁর কাছে আসবে অথবা তাঁর ভাবরাশি গ্রহণ করবে, আর স্থূল শরীর চলে গেলে তাঁর ভাব যারা নেবে। দ্বিতীয় — প্রার্থনা করেছিলেন, 'মা যারা আন্তরিক এখানে আসবে তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করো।' নিজেই বললেন কিন্তু মার নাম করে।

অন্তরঙ্গদের বলতেন, 'আমার চিন্তা যে করবে, সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে।'

এখন সায়েন্সের যুগ — Western materialism, ইহাই জগৎকে শাসন করছে। এ সময়ে ঈশ্বর আছেন, এটি বোঝাবার জন্য তাঁকে এরূপভাবে আসতে হয়েছে। কণ্ঠে সর্বদা 'মা, মা' — God-intoxicated child of the Mother (জগন্মাতার প্রেমোন্মত্ত শিশু) — আর নিরক্ষর হয়ে এলেন।

ওঁর যা কিছু সব নিজ অনুভব। পুঁথিগত বিদ্যা নয়। সাধন করে সিদ্ধ হয়েছেন সব পথ দিয়ে গিয়ে। সাকার নিরাকার উভয় সাধন করেছেন, উভয়ে সিদ্ধ। তখন ব্রাহ্মসমাজের ওঁরা বলতেন, নিরাকার সগুণ ঈশ্বর। মুসলমান ধর্ম, খ্রীস্টান ধর্ম, এদের মতও অনুরূপ, সাকার মানে না। এসব মিলে একটা সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছিল। অনেকে নিজেদের ধর্ম ছেড়ে, অন্য ধর্ম গ্রহণ করতে লাগলো। যে যেটি ধরে রয়েছে কেবল সেইটিকে সত্য বলছে, অপরগুলি সব অসত্য বলতে লাগলো। আবার Western Materialism — ঐ সঙ্গে পাশ্চাত্য জড়বাদ, এই সঙ্কট সময়ে তিনি এলেন। এসে সাধন করে নিজ জীবনে উপলব্ধি করে বললেন, 'ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার — কত কি! যেমন অন্ধের হাতীজ্ঞান — পা ধরেছে আর বলছে হাতী একটা থামের মত। যে কান ধরেছে সে বলছে হাতী কুলোর মত। তেমনি মাথা, ল্যাজ, শুঁড় যে যতটুকু বুঝছে ততটুকুই বলছে। কিন্তু, যে চক্ষুষ্মান, যে সমগ্র হাতীটা দেখতে পাচ্ছে সে বলছে, কেন ভাই তোমরা মিছে ঝগড়া করছো, হাতী এই সবই আবার তারও উপর।'

তেমনি ঈশ্বর। যার যতটুকু বোধ হয়েছে সে ততটুকুই বলছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, ইহুদি প্রভৃতি, আবার তাদের শাখাপ্রশাখা, সকলেই আপন আপন মতকে বড় করতে লাগল। ঠাকুর এসে বললেন, হাঁ আপনার মতকে বড় বল তাতে দোষ নাই, বরং ইহা নিষ্ঠারই পরিচয়, কিন্তু অন্য সব মত মিথ্যা, কেবল আমারটি সত্য, — এ কথা বলো না।

বরং বল, তাঁর জগতে সব সত্য হতে পারে।

আমার এটি ভাল লাগে আমি এটি নেবো। তোমার যাতে রুচি তুমি সেটা নেও।

কলহ বৃথা।

খিলাত ঘোষের বাড়িতে সেই রাত্রের কথা আজও মনে পড়ছে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। ঠাকুর তখন একটি বৈষ্ণবকে বলেছিলেন — 'একটা পুকুর, তাতে অনেক ঘাট। সকলেই যাচ্ছে জল আনতে। এক

একজন এক এক ঘাটে যাচ্ছে! হিন্দুরা বলছে জল, মুসলমান বলছে পানী, খ্রীস্টান বলছে ওয়াটার, কিন্তু বস্তু এক — জল।'

'নানা নাম।'

তেমনি ঈশ্বর। বস্তু এক, নানা নামে পরিচিত।

কেউ বলছে আল্লা, কেউ বলছে গড্, কেউ বলছে জেহোবা। অপর কেউ বলছে অহুর মাজদা, আবার কেউ ঈশ্বর, ব্রহ্ম। নানা নামে এক বস্তুকেই নির্দেশ করছে।

বেদে বলেছে, 'একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।' সচ্চিদানন্দ এক, নানা নামে কথিত। হিন্দুদেরই কত মত! বেদের সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, পুরাণের সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ, আবার তন্ত্রের সচ্চিদানন্দ শিব — বস্তু এক।

যদি বল নানা মত কেন? তার উত্তরও তিনি দিয়েছেন — রুচিভেদে! বলেছিলেন, বাড়িতে পাঁচ ছেলে — মাছ এসেছে। মা নানা রকম রাঁধছেন, কারুর জন্য পোলাও, কারুর জন্য ঝোল — যার যেমন পেটে সয়।

মা কিন্তু এক, উদ্দেশ্যও এক, স্নেহও সমান।

রুচিনাম্ বৈচিত্র্যাৎ ঋজু-কুটিল নানা পথজুসাং নৃণাম্।
একোগম্যস্তমসি পয়সামর্ণব ইব॥

নানা নদী সাগরে পড়ে সাগর হয়ে যায়। নদী নানা, কিন্তু সাগর এক। মত নানা, উদ্দেশ্য এক — ঈশ্বরলাভ।

নানা মত, নানা পথ। মত পথ।

মত কিছু ঈশ্বর নয়, পথমাত্র, তাঁ'তে পৌঁছাবার। ঈশ্বর এক। বেদেও তাই বলেছে, 'সদেব সৌম্য ইদমগ্রে আসীৎ, একমদ্বিতীয়ম্'।

এই ধর্মসমন্বয়ের জন্য তিনি এসেছিলেন। এসে বলেছেন, ঈশ্বর আছেন, তাঁকে আমি দেখেছি। তোমরাও দেখতে পারবে — একটা পথ ধর। মত নিয়ে বৃথা ঝগড়া করো না।

মত পথ, ঈশ্বর এক। এই সংবাদটি দিতে তিনি এসেছেন।

অন্তেবাসী — আজ্ঞে, সমন্বয়ের কথা শাস্ত্রে পূর্ব থেকেই রয়েছে, ঠাকুরের নূতনত্ব কোথায়?

শ্রীম — হাঁ, শাস্ত্রের কথারই demonstration (প্রতিপাদন) তাঁর জীবন। তিনি ধর্মের embodiment (বিগ্রহ)। শাস্ত্রের truth (সত্য) গুলি নূতন মূর্তি ধরে এসেছে। ঠাকুর ধর্মসমন্বয়ের মূর্তবিগ্রহ।

২

আজ দ্বাদশী। ভক্তগণ কাল একাদশী ব্রত করিয়াছেন, তাই আজ শীঘ্র শীঘ্র পারণ করিতেছেন। কলিকাতা হইতে শু-বাবু পার্সেল পাঠাইয়াছেন। জনৈক ব্রহ্মচারী স্টেশন হইতে উহা লইয়া আসিয়াছেন। উহাতে ফল মিষ্টি আসিয়াছে, তাহা ঠাকুরকে নিবেদন করা হইয়াছে। সকলে শ্রীম-র সঙ্গে প্রসাদ পাইতে বসিয়াছেন। কথা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — সাধু, ভক্ত, ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা করা উচিত। একদর করলে চলবে কেন? আমার footing (অবস্থান) কোথায় তা ঠিক করে নিতে হবে। আগেই যদি বললুম all men are euqal (সকলেই সমান) ওদের (পাশ্চাত্যদের) মত, তাহলে আমার আর কি হবে, কি বাকি রইলো — হয়েই তো আছি!

এদের সম্মান করলে এদেরও চৈতন্য হবে আর আমাদেরও কল্যাণ হবে।

জনৈক ভক্ত — আজ্ঞে, আজকালের শিক্ষা শ্রদ্ধামূলক নয়। তাই এতে চরিত্র সুগঠিত হতে পারে না। পূর্বে গুরুশিষ্য একসঙ্গে গুরুকুলে বাস করতো। তাতে গুরুসেবা, আশ্রমসেবা করতে হতো শিষ্যদের। এতে চরিত্র গঠিত হয়ে যেতো। আজকাল লেখা পড়া শিখে লোক প্রায়ই উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যায়।

শ্রীম — শিষ্টাচারের দরকার। চরিত্রগঠনে এর বড় প্রয়োজন। শিষ্ট — শাস্ ধাতু থেকে হয়েছে, এর মানে শাসন পেয়েছে যে। বৃদ্ধের সেবা করতে হয়, তবে কামক্রোধাদি দমন থাকে। রিপুগুলি দমন থাকলেই অনেকটা হয়ে গেল। সেবা করলুম কোথায় — শুধু নিলুমই, তাতে কি আর চরিত্র তৈরী হতে পারে? ভক্তরা এই যে সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা করছেন এইটি ঠিক হচ্ছে, ওতেই সব হয়ে যাবে।

(বেলুড়) মঠ হলো Post-Graduate Department of the University (বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষাসোপান), মঠের ট্রেনিং পেলে তবে ঠিক হলো। মঠে যে সেবাভাবটি রয়েছে এতে University-র (বিশ্ববিদ্যালয়ের) শিক্ষা supplemented (পূর্ণাঙ্গ) হচ্ছে। সেবা চাই, সেবা ছাড়া হয় না। পূর্বে রাজার ছেলে গরীবের ছেলে সব্বাইকে আশ্রমে থেকে সেবা করতে হতো। কাষ্ঠসংগ্রহ, জল আনা, ফলমূল আহরণ করা, গাভীরক্ষা — কত কাজ করতে হতো। এখন এসব দেখতে পাওয়া যায় না। মঠে হচ্ছে, সব কাজ ব্রহ্মচারীরা করেন, গো-রক্ষা, পুষ্পোদ্যান, গঙ্গা থেকে জল তোলা, ঘর ও উদ্যান পরিষ্কার, তরকারী-বাগান, মায় ড্রেইন পায়খানা পরিষ্কার করা পর্যন্ত আশ্রমের সব কাজ করতে হচ্ছে। এইটি কোথায় পাবে?

ব্রহ্মচর্য, সত্য, ধর্ম — সব শিক্ষা হতো গুরুগৃহে। যারা স্নাতক হয়ে যেত গার্হস্থ্যজীবন যাপন করতে, তাদের যাবার সময় গুরুগণ বলে দিতেন — 'ভগবৎ-উপাসনা করিবে। যে সত্য এখানে আচরণ করিয়াছ তাহা গৃহে গিয়াও পালন করিবে। আমাদের সুচরিত অনুকরণ করিবে। পিতা, মাতা, আচার্য, অতিথিকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিবে। সৎগ্রন্থ, বেদ পাঠ করিবে। জ্ঞানবৃদ্ধের সেবা করিবে। সংশয় উপস্থিত হইলে তাঁহাদের উপদেশ ও আচরণ অনুসরণ করিবে।' এইগুলি Forest University-র (প্রাচীন তপোবন মহাবিদ্যালয়ের) বিশেষত্ব ছিল। এই উপদেশগুলিই তখনকার convocation address — সমাবর্তনবাণী। আজকাল সমাবর্তনে পূর্বের সেই spirit (ভাব) নাই।

প্রথম সুজন, ভদ্র হতে হবে, তারপর ঈশ্বরলাভের চেষ্টা। কোনও শিক্ষা নাই, ট্রেনিং নাই, বৃদ্ধের সেবা নাই আর অমনিই হয়ে যাবে? যার চরিত্র সুগঠিত নয় তার না সংসারে, না ঈশ্বরের পথে, কোথাও স্থান নাই।

শিষ্টাচার প্রথম, তারপর ধর্মাচরণ, তবে ঈশ্বরলাভ।

অপরাহ্ণ আড়াইটা বাজিয়াছে। শ্রীম তাঁহার কুটির-বারান্দায় বসিয়া

আছেন। কর্ম কি প্রকারে করিতে হয় সেই প্রসঙ্গে কথা হইতেছে। বলিলেন, গীতায় সব তিনি বলে গেছেন — সব কথা আছে। ঠাকুর নিজ জীবনে এসব পালন করে দেখিয়ে গেছেন। তাই তিনি গীতার প্রতিমূর্তি। এই বলিয়া গীতা হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্মীর লক্ষণ বলিতেছেন।

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥
রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ॥
অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠোঽনৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে॥

(গীতা ১৮-২৬/২৭/২৮)

শ্রীম — সাত্ত্বিক কর্মী, মানে নিষ্কাম কর্মী, নিজের লাভালাভ চায় না। রাজসিক লাভ চায়, তাই লোকসানও হয় — তাই হর্ষশোকান্বিতা। আর তামসিক কর্তা বিষাদী, দীর্ঘসূত্রী। ঠাকুর বলতেন, যেন আঠারো মাসে বছর তাদের — হবে হচ্ছে করে। সাত্ত্বিক কর্ম করতে হয় 'ধৃত্যুৎসাহ সমন্বিত', perseverance and promptitude-এর সঙ্গে। সাত্ত্বিক কর্মী পনর মিনিটে অপরের এক ঘন্টার কাজ করে ফেলে। তারা অলস নয় আবার আসক্তিও নাই, তাই লাভ লোকসানের হিসাব নাই। এ একটি মহামন্ত্র।

(একজন ভক্তের প্রতি) এই এম. এ., ল — এসবও নিষ্কামভাবে পড়তে হয়, তাঁর লীলা আস্বাদনের জন্য। এসব পড়া ভাল, তবে practice (ওকালতি) করতে নেই।

নিষ্কাম কর্ম করলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, শুদ্ধ চিত্তে তাঁকে ডাকলে তিনি দেখা দেন। অশুদ্ধ মনে তিনি দেখা দেন না। একজন ছিলেন নবদ্বীপ গোস্বামী — ঠাকুরকে বলেছিলেন, আচ্ছা মশায় নামমাহাত্ম্য তো আছে।

ঠাকুর বললেন, হাঁ আছে, তবে শুদ্ধ মন হওয়া চাই। মন শুদ্ধ না হলে হাজার কর, কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। শুদ্ধ মনে একবার

ডাকলেই হয়ে যায়।

তাই সদাচারের বড্ড দরকার। শুচি অশুচি মানতে হয়। যতক্ষণ না ভগবান লাভ হয় ততক্ষণ অন্তর্বহিঃ শুচির দরকার। 'শুচি অশুচিরে লয়ে দিব্য ঘরে কবে শুবি' — সে অনেক দূরের কথা। এ ঈশ্বর দর্শনের পরের অবস্থা, ত্রিগুণাতীত অবস্থা। যতক্ষণ না তাঁর দর্শন হয়েছে ততক্ষণ মানতে হয়।

ঠাকুর বেশ বলতেন, এক বোতল মদ খেলাম আর মাতাল হলুম কেন — এ জিজ্ঞাসা কেন? কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যে পড়ে রয়েছে, ষোলআনা ডুবে আছি ভোগের মধ্যে, অথচ হচ্ছে না কেন — এ প্রশ্ন বাতুলতা।

শুদ্ধচিত্ত লোক একবার নাম শুনে, বা নাম করে একেবারে বেহুঁশ সমাধিস্থ। ঠাকুর একটা ঈশ্বরীয় কথা বলতে বলতে সমাধিস্থ, কিম্বা শুনতে শুনতে বেঁহুশ, অথবা দেখে সমাধিস্থ। পাঁচটা ইন্দ্রিয়ই একেবারে সজাগ।

চিত্তশুদ্ধির বড়ই আবশ্যক, গোস্বামীকে এই কথাই বললেন। আরও বললেন, মনে কর ১০৫ ডিগ্রি জ্বর, তখন কুইনাইন দিলে কি কাজ করবে? আগে ফিভার মিকশ্চার দিয়ে জ্বর কমিয়ে নেও, তারপর কুইনাইন।

ঠাকুর বলতেন, 'একটা বজরা পঞ্চাশটা দাঁড়ে টানছে অথচ এগুচ্ছো না কেন? না, নঙ্গর করা রয়েছে যে!'

মন মলিন, বসে বসে মালা জপছে, তাতে কি হবে? ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, কাঁদ, তখন শীঘ্র হয়ে যাবে।

তিনি যেমন বলতেন, সকলেরই হৃদয়ে নারায়ণ বাস করছেন বটে, কিন্তু কারো আধ সের মাটিতে চাপা, কারো আধ মণ, কারো বিশ মণ। কে যায় কোদলাতে বিশ মণ। সৎগুরু যিনি তিনি আধ সের মাটি সরিয়ে দেন আর তখন তিনি হৃদয়ে ভেসে উঠেন। বিশ মণ চাপাও যাবে, সংসারের ঠ্যালা ধাক্কা খেয়ে খেয়ে যদি চৈতন্য হয় কখন।

মনের মলিনতা যেমন আর্শির উপর ময়লা, মুখ দেখা যায় না,

পরিষ্কার করে ফেল তখন মুখ দেখা যাবে। মন বিষয়বাসনাতে অশুদ্ধ হয়ে রয়েছে, তাঁর কাছে শুদ্ধ হয় চোখের জলে। তখন তিনি দেখা দেন। ঘোলা জলে প্রতিবিম্ব পড়ে না। শুদ্ধ আসন না হলে হৃদয়ে তিনি বসেন না। আবার বাইরে খুব হাসিখুশী — প্রফুল্ল ভাব থাকলেই শুদ্ধচিত্ত হয় না — A man may smile and smile and smile and yet may be vicious at heart (Shakespeare).

শ্রীম কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া আছেন। অদূরে রক্ষিত চোরাই কয়লা দৃষ্টে আবার কথা বলিতেছেন।

শ্রীম — সত্য রক্ষা চাই। সত্য ছাড়া ঈশ্বরলাভ হয় না। বেদে বলেছেন, 'সত্যমেব জয়তে, নানৃতম্'। সত্য, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য চাই — এও বেদের কথা। ঠাকুর তাই বলেছিলেন সত্য কথা কলির তপস্যা।

ছেলেগুলিকে অত ঘন ঘন আসাযাওয়া করতে দেখে ভাবতুম, তাইতো এরা এত পয়সা পায় কোথায়? এখন সব জানতে পেরেছি। (সহাস্যে) The cat is out of the bag (সত্য প্রকাশ হয়ে পড়েছে)। (ছোট অমূল্যের প্রতি) ছয়আনা দিয়ে কয়লা কেনা হয়েছে, এটা না বলা একটা মিথ্যা কথা, আর ছয়আনার কয়লা বার আনা বলা — এটা আর একটা মিথ্যা কথা। Suppressio Veri আর Suggestio Falsi — সত্যগোপন আর অসত্য কথন দুই-ই মিথ্যা। — বাবুকে দিয়ে পত্র দেওয়া হয়েছে জানতে, ক'বার অমন হয়েছে টিকিটছাড়া রেলভ্রমণ।

অনেক বাবুরা ট্রামে বা ট্রেনে এরূপ ভাবে পয়সা না দিয়ে যায় — বলে, মশায়, এই তো এইখানে যাব। অর্থাৎ দু' পয়সা হয়তো কণ্ডাক্টারকে দিলে। (রহস্য করে) কে যায় বাপু ছ' পয়সার জন্য নরক কিনতে।

জনৈক বালক ভক্তকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এরূপ করেছ কখনও, কিংবা শুনেছ কি?

বালক ভক্ত — আজ্ঞে, আমি কখনও করি নাই; শুনেছি।

শ্রীম — অশ্বত্থতলে একটি উকীলবাবু আমাকে একদিন একটি

গল্প বলেছিলেন। হাওড়া স্টেশনে একটি সাধু বসেছিলেন খুব তেজপুঞ্জশালী। টিকিট করতে যাচ্ছেন, অন্য লোকেরা সব বললে, বাবাজী টিকিট করবেন না। আপনি সাধু, অমনি যেতে পারবেন।

সাধুটি উত্তর করলেন, না বাপু, টিকিট করতে হবে। তিনদিনের রাস্তা যেতে হবে, কে যায় ভয়ে ভয়ে। কখন টিকিট-চেকার আসে, সর্বদা এই ভয় থাকলে ঈশ্বরচিন্তা করবো কখন?

তাই ক্রাইস্ট বলেছিলেন, Render therefore unto Caesar the things which be Caesar's and unto God the things which be God's. (St. Luke 20 : 25), যার যা প্রাপ্য তা' তাকে দাও।

(জনৈক ভক্তের প্রতি) ঠাকুর একটি আলাদা থাকের সৃষ্টি করে গেছেন। এরা কামিনীকাঞ্চন কিছুই চায় না। কত ভাল ভাল লোক এসেছে। কামিনী যত গণ্ডগোলের কারণ, কাঞ্চন তারই উপকরণ।

(স্বগত) পৃথ্বীরাজ সংযুক্তার প্রেমে পড়লেন, তাই আজ ভারতের এই দুরবস্থা। সব লোক ওতে ভুলে আছে। Alexander, the Great (আলেকজাণ্ডার) ত্রিশ বৎসরের সময় দিগ্বিজয় করলেন, কিন্তু love-এ (প্রেমে) পড়ে গেলেন। সিজার ক্লিওপেট্রার প্রেমে পড়লেন, আর জগৎসিংহ তিলোত্তমার। কাইজার বুড়ো বয়সে আবার বিয়ে করলেন। স্ত্রীলোক নিয়েই জগৎ চলছে।

স্ত্রীলোকসৃষ্টি ভগবানের জগৎরক্ষার একটি অপূর্ব কৌশল।

এক ক্লাস লোক আছে — এরা ও নেবে না — কামিনীকাঞ্চনে তারা মুগ্ধ নয়!

ইমা রামাঃ — এই রমণীগণ?

'না চাই না।'

'শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্?

'আজ্ঞে না।'

পশুন্ হস্তিহিরণ্যশ্বান্?

'আজ্ঞে না'। চিরজীবিকাং — 'না'।

ভূমের্মহদায়তনম্, মানে সাম্রাজ্য?

'আজ্ঞে এসব কিছুই চাই না।'

তবে কি চাও?

বরস্তু মে বরণীয় স এব — শুধু ঈশ্বরকে চাই, আর কিছু না।

ঠাকুর এই একটা ক্লাসের সৃষ্টি করেছেন — যেমন স্বামীজী। কিছুরই বশ নয়। সারাটা জগৎ পায়ে পড়লো কিন্তু কিছু চাই না নিজের জন্য। আমেরিকা থেকে দিগ্বিজয় করে এলেন — শুধু কৌপীন পরে আছেন — কি ত্যাগ! ভক্তদের কাছে কাপড় চেয়ে পাঠাতেন, আর নৌকোভাড়া, কলকাতা এলে। হাতে একটি কপর্দকও নাই। এই একটি থাক আলাদা।

আমেরিকার একটি heiress, multimillionaire (কোটীপতির কন্যা) স্বামীজীকে বললেন, আমার রূপযৌবন আর অতুল ঐশ্বর্য সব গ্রহণ করুন। স্বামীজী উত্তর করলেন, ভদ্রে, তা হয় না — স্ত্রীজাতি আমার মা — আমি সন্ন্যাসী।

দু' থাকের মানুষ তিনি করেছেন। এক থাক সমাধি চায় — সর্ববস্তু থেকে মন উঠিয়ে এনে তাঁতে সংলগ্ন করতে চায়। যেমন সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার ইত্যাদি ঋষিগণ, যেমন শুকদেব। আর এক থাক সমাধি চায় না — এই থাকের লোকই অধিক। এদের ঈশ্বরীয় কথা ভাল লাগে না। কথা হচ্ছে শুনলে উঠে যাবে, সহ্য করতে পারে না। একবার ঠাকুরের নিকট দু'জন গেল দক্ষিণেশ্বরে। একজন বসে শুনছে আর একজন উঠে চলে গেল, বললে, 'তুমি এখানে বসো, আমি নৌকায় গিয়ে বরং বসি।' সাধুদের এদের ভাল লাগে না, সহ্য করতে পারে না। বিষয়ের কথা বল, ভোগের কথা বল, প্রাণ খুলে যোগদান করবে এসে এতে। কিন্তু বেদ বলেন, 'অন্যাঃ বাচঃ বিমুঞ্চথঃ' — প্রবর্তকদের ঈশ্বরকথা ছাড়া অন্য সব কথা ভাল লাগে না।

অন্য কথা মানে গ্রাম্য কথা, বিষয়ের কথা — অর্থাৎ ভগবৎকথা নয়। এ ত্যাগ না করলে হবে না। ঈশ্বরের কথা ছাড়া অন্য কথা ঠাকুর শুনতে পারতেন না। তাই অন্য সব কথা না বলে অবসর সময়ে বসে বসে জপ করতে হয়।

(একটু চুপ করিয়া) দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার পূর্বে ভাবতুম কেশব সেন — এঁরাই আদর্শ, আর ইংরাজীতে লেকচার দেওয়া, এই সব। ওমা ওখানে গিয়ে দেখি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা ক'ন। আর 'মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।' মান অপমান সমান, শত্রু মিত্র ভেদ থাকবে না, লাভালাভে সমান হতে হবে — এ সব কথা।

মোহন — আজ্ঞে, West (প্রতীচী) এ আদর্শ ধরতে পারছে না।

শ্রীম — কেমন করে ধরবে ওরা, ভোগের দিকে মন থাকলে কেমন করে নেবে? Hegel (হেগেল) এ দেশের একটা ভাব নিয়েছেন — ঈশ্বরই সব হয়ে রয়েছেন। কিন্তু এটি বুঝতে যে ঋষিদের কত কাণ্ড করতে হয়েছে তার খবর নাই। সম্পূর্ণরূপে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করে তবে এঁরা এটা ধরতে পেরেছিলেন। ভোগ না ছাড়লে এটা বোঝা যায় না।

তাই Buddhist Philosophy-কে (বৌদ্ধদর্শনকে) pessimistic philosophy (দুঃখবাদ) বলে ওরা। সংসার দুঃখময় বললে ওরা দাঁড়ায় কোথায়? তাই একথা! Optimistic (সুখবাদী) হয়ে কি করছো তোমরা — টাকাকড়ি, রাজ্য, ইন্দ্রিয়সুখ এসব নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু এ যে ultimate goal (চরম লক্ষ্য) নয়।

এ যে পরমানন্দ, পরম শান্তি দিতে পারে না — একথা তারা জানবে কেমন করে? Optimism (যথার্থ সুখবাদ) কাকে বলে জানে? 'আমি রামদাস, কারো কাছে মাথা নোয়াব না'। The Father is in me and I am in Him (St. John 10:38). I and my Father are one (St. John 10:30). (আমি পুত্র, ঈশ্বর আমার পিতা, পিতাপুত্র অভেদ)। এই অভিমান, এ হলো optimism, চিরকাল থাকবে এ ভাব।

তাই ক্রাইস্টকে বুঝতে পারে নাই West (প্রতীচী)! কেন তিনি সব ত্যাগ করেছিলেন, কেন cross-এ (ক্রুশে) প্রাণত্যাগ করলেন এর অর্থ বুঝতে পারে নাই!

কেমন করে বুঝবে? উনি যা কাকবিষ্ঠার মত ত্যাগ করলেন,

ওরা তা ধরে আছে, কি করে বুঝবে তাঁকে? Foxes have holes and birds of the air have nests; but the Son of man hath not where to lay His head. (St. Luke 9:58, St. Matthew 8:20). (পশুপক্ষী সকলেরই মাথা গুঁজবার একটু স্থান আছে, কিন্তু আমার কিছুই নাই)। 'সর্বত্যাগ' এই তাঁর আদর্শ। 'সর্বভোগ' এখন এদের আদর্শ।

ত্যাগ না করলে অমৃতত্ত্ব লাভ হয় না — 'the eternal life'. 'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ত্বম আনসু' — বেদের বচন, সর্বস্ব ত্যাগ করে ঋষিরা অমৃতত্ত্ব অর্থাৎ ঈশ্বরকে লাভ করেছিলেন। অসীম বলের দরকার। বুকের ছাতি বড় চাই। ভোগ চাই না, একটা জীবন না হয় গেল — no compromise. মিনমিনে পিনপিনে নয় — pleasurable sensation-এ yield (ইন্দ্রিয়সুখের বশ্যতাস্বীকার) করবো না পাঁচ টাকার গরুর মত। রোখ চাই পঁচাত্তর টাকার গরুর মত — ছিনমিন করে ওঠা। দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, ঈশ্বরদর্শন করবো — ভোগ চাই না। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ — দুর্বলের আত্মদর্শন অসম্ভব। Baptism of fire — অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে।

৩

জম্বুতল, এখন অপরাহ্ণ চারটা।

সকলে একত্র হইয়াছেন, ভাগবত পাঠ হইবে — একাদশ স্কন্ধ, দ্বাদশ অধ্যায়। সাধুসঙ্গমাহাত্ম্য পাঠ চলিতেছে।

পাঠক পড়িতেছেন — 'শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আমি সাধুসঙ্গ দ্বারা যেরূপ বশীভূত হই যোগানুষ্ঠান, জ্ঞানার্জন, ধর্মনিষ্ঠা, বেদপাঠ, তপশ্চরণ, দান, ইষ্টাপূর্ত (যজ্ঞ), দক্ষিণা, ব্রতাচরণ, দেবার্চন, গোপ্য-মন্ত্রজপ, তীর্থসেবা বা যমনিয়মাদি দ্বারা সেরূপ বশীভূত হই না।'

শ্রীম — দেখ, ভগবান বলছেন, সাধুসঙ্গে আমি যেমন বশীভূত হই আর কিছুতেই তেমন হই না। তপস্যা, ব্রত, নিয়ম সবই সাধুসঙ্গের নিচে।

ঠাকুর বলেছিলেন, যাঁর কাছে বসলে, যাঁর সঙ্গ করলে ঈশ্বরের

উদ্দীপন হয়, তিনিই সাধু। অর্থাৎ, যিনি ভগবান দর্শন করেছেন, কিংবা সর্বস্ব ত্যাগ করে তাঁর দর্শনের জন্য ব্যাকুল।

অবতার, যেমন ঠাকুর — সাধুশ্রেষ্ঠ! অবতার সাধু তৈরী করেন। আর সাধু ভক্তের পরিত্রাণের জন্য আসেন। একবার একটি নারী ভক্তকে মা বলছেন, হাঁ মা, অত সাধু দেখলাম কিন্তু তাঁর (শ্রীরামকৃষ্ণ) মত আর দেখা যায় না! ভক্তটি উত্তর করলেন, মা, যে কি বল। অপর সাধুরা এসেছেন উদ্ধার হতে আর তিনি এসেছেন উদ্ধার করতে। তাঁর সঙ্গে মিলবে কিরূপে?

ঠাকুর এসে একটি আলাদা থাকের সাধু সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর ছাড়া এঁরা অন্য কিছু চান না। যেমন চাতক, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু বৃষ্টির জল ছাড়া অন্য জল খাবে না, যেমন মৌমাছি ফুল বই অন্য বস্তুতে বসবে না।

কলকাতার লোকদের এখন বড্ড chance (সুযোগ)। মঠে গেলে এমন সব সাধুসঙ্গ করতে পারে। ইষ্টিক হাতে বেড়াতে যাওয়া, তা নয় — কিন্তু শ্রদ্ধার সহিত যেতে হয়। সকাল সন্ধ্যায় যেতে হয়। Best time-এ catch (সুসময়ে দর্শন) করতে হয় — যখন তাঁরা সব ছেড়ে ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হন, সেই সময়ে ধরতে হয়। ছোট জিতেনবাবু বেশ ধ্যানদর্শন করতে পারছেন মঠে থাকেন বলে।

পাঠ চলিতেছে। গোপীদের কথা হইতেছে। শ্রীকৃষ্ণকে শুধু ভালবাসিয়া তাঁহারা যোগীশ্বরদেরও অগম্য স্থান লাভ করিয়াছেন।

পাঠক পড়িতেছেন — (শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) 'সমাধিকালে মুনিগণ যেরূপ নাম ও রূপ অপরিজ্ঞাত থাকেন, সেইরূপ অত্যাসক্তিবসতঃ আমাতেই মন বন্ধন করিয়াছিল বলিয়া গোপীগণ নিকটস্থ বা দূরস্থ কোনও পদার্থ, এমন কি নিজ দেহকেও জানিতে পারে নাই। সমুদ্রে নদীনিচয়ের ন্যায় আমাতেই তাহারা মিশিয়াছিল। ... তাহারা আমার স্বরূপ জানিত না বটে, কিন্তু আমার সৎসঙ্গবশে পরমব্রহ্ম স্বরূপই লাভ করিয়াছিল।'

শ্রীম — তাইতো অর্জুনকেও বললেন, 'মামেকং শরণং ব্রজ'। আমার শরণ লও। তাহলে আর কোন কর্তব্য থাকবে না। উদ্ধবকেও

তাই বলেছেন। (পাঠককে) কি, পড়তো আবার।

পাঠক — (শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন), ‘হে উদ্ধব, শ্রুতিস্মৃতি প্রবৃত্তি নিবৃত্তি এবং শ্রোতব্য বা শ্রুত বিষয় সকল পরিত্যাগ কর।’

শ্রীম — অর্থাৎ ‘সর্বধর্মান্’ — সকল কর্তব্য।

পাঠক — (শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) ‘হে উদ্ধব, আমি সকল দেহীর আত্মস্বরূপ। তুমি একনিষ্ঠ ভক্তিবলে আমারই শরণ লও, আর আমার প্রসাদেই অকুতোভয় হও।’

শ্রীম — ঈশ্বরের শরণ নিলে যমভয় থাকে না। ত্রিতাপ নাশ হয়, তখন অভয় হয় — জীবন্মুক্ত অবস্থা। ভগবান বলছেন, আমার প্রসাদেই এ অবস্থা লাভ হয় অর্থাৎ তাঁর কৃপায়।

বেদে আছে, ‘অভয়ং বৈ প্রাপ্তোঽসি জনক।’ — হে জনক, তুমি ভগবান লাভ করেছ, তাই অভয়। একমাত্র ঈশ্বরই অভয় আর সব ভয়াবহ। ঠাকুর রামপ্রসাদের কথায় গান গাইতেন, ‘আমি অভয়পদে প্রাণ সঁপেছি, আর কি যমের ভয় রেখেছি।’ তাই উদ্ধবকে তাঁর শরণ নিতে বললেন।

শ্রীম — ঠাকুরের এক একটি কথা মহামন্ত্র। এর একটি জপ করলে সিদ্ধ হয়ে যায়। যেমন, ‘ভক্ত ভাগবত ভগবান’, ‘ব্রহ্মশক্তি, শক্তিব্রহ্ম’ ‘গুরু গঙ্গা গায়ত্রী’, ‘বেদ পুরাণ তন্ত্র’, ‘সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ শিব’।

তাঁর প্রার্থনাও মন্ত্র। মন্ত্র কি শুধু সংস্কৃত হলেই হলো, বাংলায়ও হয়। ঠাকুর প্রার্থনা করেছিলেন,

‘মা, এই নাও তোমার পাপ,
এই নাও তোমার পুণ্য।
তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও।
এই নাও তোমার সুখ,
এই নাও তোমার দুঃখ,
তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও।
এই নাও তোমার ধর্ম,
এই নাও তোমার অধর্ম, তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও।

মা, এই নাও তোমার ভাল,
এই নাও তোমার মন্দ,
তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি দাও।’

ঠাকুরের প্রত্যেকটি কথা বেদপুরাণাদি শাস্ত্রের সঙ্গে মিলে যায়, তাই মন্ত্র। যদি কেউ বিশ্বাস ক’রে, সারাজীবন ঠাকুরের একটি কথা নিয়ে প’ড়ে থাকে — ঐটি জপ, ঐটি ধ্যান করে, তার সব হয়ে যাবে — ঈশ্বরদর্শন হবে। এই যে লোক দীক্ষা নেয়, এর অর্থ কি? না, গুরু একটি মন্ত্র বলে দিয়েছেন, সারাজীবন ঐটি নিয়ে পড়ে থাক, জপধ্যান কর। তবে ভাল গুরুর কাছে নিলে তেজীয়ান্ মন্ত্র পাওয়া যায় — সিদ্ধমন্ত্র।

গায়ত্রী বলছেন, হে ঈশ্বর, তুমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে বিরাজিত। তুমি তেজশালী সূর্যেরও পূজনীয়। তুমি আমাদের মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের চালক। আমরা তোমার ধ্যান করছি, তুমি দর্শন দাও।

ঠাকুরও বলছেন, মা, তুমিই তো সব হয়ে রয়েছ, আবার তোমার ইচ্ছাতেই সব চলছে। মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার, চতুর্বিংশতিতত্ত্ব সবই তুমি। তুমিই চালক। তাই প্রার্থনা করতেন, ‘মা, আমি ঘর তুমি ঘরণী, আমি রথ তুমি রথী, আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী। যেমন চালাও তেমনি চলি, যেমন বলাও তেমনি বলি, যেমন করাও তেমনি করি।’

সন্ধ্যা সমাগতা।

ঠাকুরঘরে আলো দেওয়া হইয়াছে। ধূপের সুমিষ্ট গন্ধে চতুর্দিক সুগন্ধিত। শ্রীম ভক্তসঙ্গে ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন ঠাকুরের সম্মুখে বসিয়া। কতকক্ষণ পরে ছোট অমূল্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ করিতেছেন। হৃদয়, ঠাকুরের যেরূপ সেবা করিয়াছেন, তেমনি যাতনাও দিয়াছেন — এইস্থানে পাঠ চলিতেছে।

একটি ব্রহ্মচারী রন্ধনকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীম তাঁহাকে ডাকিয়া আনাইলেন। তিনি আসিয়া শুনিলেন শ্রীম বলিতেছেন —

খালি সেবা করলেই হয় না। সর্বদা প্রার্থনা করতে হয় যাতে শ্রদ্ধা থাকে। এতকাল হৃদয় সেবা করলেন, কিন্তু ওঁর শেষটা অমন হলো কেন? ভিতরে স্বার্থ ছিল, তাই মা ওঁকে সরিয়ে দিলেন। তর্ক

করা, হাঁকডাক করা — সে অবস্থা ঠাকুরের ছিল না।

ঠাকুরের কথায় কথায় তিনি জবাব দিতেন, তর্ক করতেন, যা তা বলতেন। কখনও বলতেন, 'বোকা, তোমার সাধুগিরী উঠে যেতো আমি না থাকলে।' হৃদয়ের উচিত ছিল গুরুর মত সেবা করা, তা না করে গালাগাল। তাই মা সরিয়ে দিলেন।

ঈশ্বরবুদ্ধিতে গুরুসেবা করতে হয়। বেদে আছে, গুরু আর ইষ্টে সমান জ্ঞান হলে তখন হবে — 'যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।' দেবতা, অর্থাৎ ঈশ্বর আর গুরুতে সমান ভক্তি চাই। ঈশ্বরই শিষ্যের কল্যাণের জন্য গুরুরূপে অবতীর্ণ হন।

(সহাস্যে) শবসাধনায় ভূতের ভয় আছে। যারা শবসাধন করে তাদের অনেক ভূতপ্রেত ভয় দেখায়। এতে জয়ী হলে হয়ে গেল। তা না হলে পতন। তেমনি জপ, ধ্যান, তপস্যায়ও ভূত আছে। (জনৈক ভক্তের প্রতি) কি বল তো?

সকলে চুপ করিয়া আছেন। ক্ষণকাল পরে নিজেই তাহার উত্তর করিতেছেন।

শ্রীম — লোকমান্য!

এতে উত্থান পতন দুই-ই হয়। হাজরামশায় জপটপ করতেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে লোকমান্য হবার চেষ্টা ছিল, আর অর্থসংগ্রহের চেষ্টাও ছিল। ঠাকুর বলতেন, এসব বিজাতীয় লোক কেন জান? লীলা পোষ্টাইয়ের জন্য। জটিলে কুটিলে না হলে লীলা পোষ্টাই* হয় না (সকলের হাস্য)।

হাজরা নরেন্দ্রকে বলেছিলেন, পূজোটুজোতে কিছু হয় না। ঠাকুর বলতেন, নরেন্দ্র এই কথা শুনে দশ হাত নেমে গেল। আমি তখন হাজরাকে বলি, তুমি তো বড় পাজী। এদের এসব কথা বললে এরা দাঁড়ায় কোথায়?

কিন্তু কি করে চিনবে তাঁকে বল? — হৃদয়ই বল, আর হাজরাই বল! তাঁর মহামায়াতে সব ঢেকে রেখে দেন। অবতারকে বোঝবার

* পোষ্টাই - পুষ্টি

যো নাই। চৌদ্দপোয়া মানুষ হয়ে কি করে আসতে পারেন, এ সংশয় থেকে যায়। তবে তাঁর কৃপায় সংশয় যায়।

অবতার যখন আসেন তখন বড্ড chance (সুযোগ)। এ সময় না হলে দেরী হয়ে যায়।

অবতার এসে বলেন — ঈশ্বর আছেন, তাঁকে দেখা যায়, আমি দেখেছি।

‘বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্’ — সেই মহৎ পুরুষকে আমি দেখেছি।

আর তিনি এলে ব্যাকুলতা আসে সঙ্গে সঙ্গে। তখন লোক উঠে পড়ে লাগে।

এইবার শ্রীম সুর করিয়া উপনিষদ্ আবৃত্তি করিতেছেন। ‘আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ — (শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো)।’

(বৃহদারণ্যক ২/৪/৫)

‘স য এষঃ অণিমৈতদাত্ম্যং ইদং সর্বং তৎ সত্যং স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।’

‘দিব্যো হ্যমূর্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।।
এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী।’

মুন্ডকোপনিষদ (২/১/২-৩)

(ভক্তগণের প্রতি) এই পরমাত্মা সত্যবস্তু জ্যোতির্ময় পুরুষ যাঁর থেকে জগৎ উৎপন্ন হয়েছে, এবং যিনি জগৎ জুড়ে রয়েছেন, তিনি সাড়ে তিন হাত মানুষ হয়ে দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন — এই প্রহেলিকা কি করে বোঝে লোক!

১৫ই চৈত্র, ১৩২৯ সাল।
২৯শে মার্চ, ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ।
বৃহস্পতিবার, শুক্লা দ্বাদশী।

অষ্টাদশ অধ্যায়

সমাধি লাভ সকলেরই হইবে

১

আজ ভগবান যীশুর মহাপ্রয়াণের দিন — গুড্ ফ্রাইডে। শেষরাত্রিতে ভক্তগণ অশ্বত্থমূলে ধ্যান করিয়াছেন। এক্ষণে স্নানাদি সমাপন করিয়া শ্রীম-র আদেশে সকলে ঠাকুরঘরে সমবেত হইয়াছেন। শ্রীশ্রী ঠাকুরকে ফুল, ফল, মিষ্টি ও সুগন্ধি ধূপ নিবেদন করা হইয়াছে। শ্রীম ভক্তসঙ্গে এইবার ধ্যান করিতেছেন। ধ্যানান্তে সুমধুর সুরে কৈবল্য উপনিষদ্ পাঠ করিতেছেন। সকাল প্রায় নয়টা।

শ্রীম পড়িতেছেন —

অধীহি ভগবন্ ব্রহ্মবিদ্যাং বরিষ্ঠাং সদা সদ্ভিঃ সেব্যমানাং নিগূঢ়াম্।
যয়াঽচিরাৎ সর্বপাপং ব্যপোহ্য পরাৎপরং পুরুষং য়াতি বিদ্বান্॥
...... ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।
পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং বিভ্রাজতে যদ্যতয়ো বিশন্তি॥
বেদান্তবিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বে॥

কৈবল্য উপনিষদ্ (১/১-৪)

শ্রীম — আশ্বলায়ন ঋষি ব্রহ্মার নিকট ব্রহ্মবিদ্যা প্রার্থনা করলেন। ব্রহ্মা বললেন, শ্রদ্ধা ভক্তি, ধ্যানযোগাদির একান্ত প্রয়োজন ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে হলে। যাগযজ্ঞ, পুত্র, বিত্ত এসব দ্বারা তাঁকে লাভ করা যায় না। পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা ত্যাগ সম্পূর্ণ না হলে তাঁর দর্শন হয় না। শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে তপস্যা করতে হয়। তবে চিত্ত শুদ্ধ হয় ক্রমে, তখন তিনি হৃদয়ে দর্শন দেন। তাঁর কৃপায় মন থেকে যখন সব ত্যাগ হয়ে যায় তখনই তাঁর দর্শন হয়, তৎপূর্বে নয়।

শ্রীম — (জনৈকের প্রতি) ওকে ডাক তো।

একজন ব্রহ্মচারী অপর একজনকে সঙ্গে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

শ্রীম — (নবাগতের প্রতি) এদিকে ওদিকে ঘুরাঘুরি না করে ধ্যানঘরে এসে বসা ভাল। এখানে তো শুধু ভগবানচিন্তার জন্য আসা হয়েছে। একলা যখন থাকা যায় তখন যা হোক হবে। এখন যখন লোকজন রয়েছে, ধ্যানজপ যত করতে পারা যায় ততই ভাল।

ঠাকুর বলতেন, ঋষিরা কত পরিশ্রম করতেন। ভোর সকালে বেরুতেন, আর সন্ধ্যায় কুটীরে ফিরে এসে কিঞ্চিৎ ফলমূল খেতেন। আশ্রমে থাকতেন না, পাছে লোকজন এসে ভজনে ব্যাঘাত জন্মায়, গভীর বনে চলে যেতেন। নির্জনে বৃক্ষতলে বসে ধ্যান করতেন। কত কষ্ট! এত করে তবে ভগবানদর্শন হতো।

দিনরাত আর অবসর সময়ে জপধ্যান করা ভাল। এরূপভাবে জপধ্যান করতে করতে মোম যেমন অগ্নির উত্তাপে গলে যায়, তেমনি মানুষের কামক্রোধাদির — লোভ, অহঙ্কার, অভিমান প্রভৃতির — ক্রমে লোপ হয়।

কত দোষ রয়েছে। যে রক্ত ও বীজে জন্ম তা শরীরে রয়েছে। আবার কর্ম — অতীত কর্মের বন্ধন — এ-ও দোষ। শিক্ষার দোষ, সঙ্গদোষ, কত দোষ রয়েছে। এসব না গেলে কেমন করে হবে? তপস্যা করলে, তাঁকে ডাকলে সব দোষ যায়।

তাই দুপুরবেলা আহারের পর একঘন্টা বিশ্রাম করে, মাঠে কোনও গাছতলায় চলে যাওয়া উচিত। রাত্রিতে ও মহানিশায়, কিংবা তিনটায়, অগত্যা চারটায়, উঠে ধ্যান করা উচিত। আর এর মধ্যে যেই অবসর হবে অমনি জপ করা উচিত ঠাকুরঘরে বসে।

আবার ঐ উপনিষদ্ পাঠ করিতেছেন। শ্রীম —

......বিবিক্তদেশে চ সুখাসনস্থঃ শুচিঃ সমগ্রীবশিরঃ শরীরঃ॥
অত্যাশ্রমস্থঃ সকলেন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য ভক্ত্যা স্বগুরুং প্রণম্য।
হৃৎপুণ্ডরীকং বিরজং বিশুদ্ধং বিচিন্ত্য মধ্যে বিশদং বিশোকম্॥
অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপং শিবং প্রশান্তমমৃতং ব্রহ্মযোনিম্।

কৈবল্য উপনিষদ (১/৪-৬)

অর্থাৎ, সোজা হয়ে নির্জন স্থানে বসে ধ্যান করতে হয়। 'অত্যাশ্রমস্থঃ' অর্থাৎ সব ত্যাগ করে। অন্য কোন বাসনা থাকলে কার্যসিদ্ধি হবে না। এক ঈশ্বরদর্শন — এইমাত্র বাসনা। সুখাসনে বসতে হয়, অর্থাৎ যে রকম আসনে বসলে নিজের ভাল লাগে। স্থির হয়ে বসে হৃদয়পদ্মে ভগবানকে স্থাপন করে ধ্যান করতে হয়।

এইবার পাঠ শেষ করিতেছেন।

শ্রীম — ....বেদৈরনেকৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্।
ন পুণ্যপাপে মম নাস্তি নাশো ন জন্ম দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিরস্তি।।
কৈবল্য উপনিষদ (১/২১-২২)

সকল বেদের প্রতিপাদ্য ঈশ্বর। তিনিই বেদান্ত করেছেন, তিনিই বেদবেদান্তের অর্থ জানেন। তিনি জন্মমরণরহিত পাপপুণ্যাতীত সনাতন পুরুষ। সাধক ক্রমে অভেদ ভাব প্রাপ্ত হয় ধ্যান করতে করতে।

দেখ, বলছেন শাস্ত্রের অর্থ, বেদের মর্ম কেবল আমি জানি। তাই বড়ই কঠিন কাজ এটি — শাস্ত্র ব্যাখ্যা করা। তিনি ছাড়া কে করবে, কে বেদের মর্ম উদ্‌ঘাটন করতে পারেন? শুধু পাণ্ডিত্যের কর্ম নয়। অবতার এসে — অর্থাৎ ঈশ্বর মানুষশরীর ধারণ করে এসে বেদাদি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেন। আবার যোগ্য পাত্রে উপদেশ দেন। অযোগ্য পাত্রে দিলে কাজ হবে না, উল্টো উৎপত্তি হবে।

'যস্যদেবে পরাভক্তি যথা দেবে তথা গুরৌ' — গুরু ও ইষ্টে যার সমবুদ্ধি, এইরূপ শ্রদ্ধাবান প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তিকে উপদেশ দিতেন। যথার্থ ব্রাহ্মণরাই এর অধিকারী ছিল পূর্বে, তাই এদের পড়তে দেওয়া হতো। (জনৈক ভক্তের প্রতি) আপনারা ঈশ্বরচিন্তা করেন বলেই তো ভগবান শুনাচ্ছেন এই সব।

এখন বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছে। একজন ভক্ত শ্রীম-র বিছানাদি রৌদ্রে দিয়াছেন, ঘরদোর, পুস্তক, টেবিল সব পরিষ্কার করিয়াছেন। আর ময়লা কাপড় সাবান দিয়া কাচিতেছেন। ইহা দেখিয়া শ্রীম মুচকি হাসিয়া বলিতেছেন, বাঃ, ইনি যেন আজ গিন্নী সেজেছেন।

মধ্যাহ্ন আহারের পর বিশ্রামান্তে একটার সময় ভক্তগণ কেহ কেহ দক্ষিণদিকবর্তী নির্জন প্রান্তরে গমন করিলেন। অপরাহ্ন চার ঘটিকার সময় তাঁহারা প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। শ্রীম জম্বুতলে উপবিষ্ট

ভক্তগণকে বলিতেছেন —

তিনজনে একস্থানে যাওয়া ভাল নয়। একাকী নির্জনে থাকতে হয় — পৃথক পৃথক। (রহস্যচ্ছলে) শবসাধনে ভূত আসে, সেসব ভয় আছে নাকি? (সকলের হাস্য)।

শ্রীম — (গম্ভীর ভাবে) ধ্যান করতে করতে সব অবস্থা আপনি বোঝা যায়। ঠাকুর অন্তরঙ্গদের কাউকে কাউকে নিভৃতে ডেকে অতিশয় গূঢ় সব কথা বলতেন। কখনও বলতেন, ধ্যান করতে করতে দেখতে পেতাম — চারদিকে সব নৃমুণ্ড, আমি তার মধ্যে বসে ধ্যান করছি। অর্থাৎ, যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সবই মৃত — বিনাশশীল। কেবল তিনি জীবন্ত — সত্যস্বরূপ, সনাতন পুরুষ। তাই বলে, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। শেষে এক তিনিই আছেন আর কিছুই নাই। যাদের কিছু কিছু ধ্যানধারণা আছে তারাই এসব বুঝতে পারে কতক। অতি উচ্চাবস্থা সব।

সমাধিলাভ সকলেরই হবে — আগে আর পরে। কারও কয়েক জন্ম তপস্যাদি করে হলো, কারও বা একজন্মেই হয়ে গেল — হয়ত পূর্বের করা আছে। ঠাকুর যেমন বলতেন, একস্থানে নেমন্তন্ন আছে — সকলেই খাবে, আগে আর পরে।

ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া আবার বলিতেছেন — গুরুই শিষ্যকে সর্বদা দেখেন। গুরুবাক্যে বিশ্বাস চাই। গুরুবাক্যে বিশ্বাস থাকলে তিনিই তার সব খবর লন।

একটি বেশ উপাখ্যান আছে! আরুণিকে গুরু বললেন গরু চরাতে। কিছুকাল পর হৃষ্টপুষ্ট হয়ে সে ফিরে এল। গুরুর সব দিকে লক্ষ্য। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'খেতে কি?' আরুণি বললে, 'আজ্ঞে, দুধ।' গুরু তিরস্কার করে বললেন, 'এ যে হোমের দুধ, আগে খেতে নাই!'

আরুণি করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আবার কিছুদিন পর জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, আরুণি দুধই খায়, কিন্তু দ্বিতীয়বার দোহন করে খায়। পুনরায় তিরস্কার করে গুরু বললেন, 'এ বৎসদের দুধ, এতে তাদের অধিকার।'

আবার করজোড়ে প্রার্থনা ক্ষমার জন্য। দুধ খাওয়ার সময় বৎসদের

মুখ থেকে যে ফেনা পড়তো তৃতীয় বার তাই খেয়ে আরুণি জীবন ধারণ করতে লাগলো। এ কথা জানতে পেরেও গুরু তিরস্কার করলেন আর বললেন ‘ইহা কীটাদির প্রাপ্য, তোমার খাওয়া অনুচিত। যার যা প্রাপ্য থাকে তাকে তা দেওয়া উচিত।’

এত শাসন তবুও গুরুর উপর অগাধ বিশ্বাস একটুও হ্রাস হয় নাই। শেষে তৃণাদি খেতে লাগলেন। একদিন আকন্দপাতার আঠা চক্ষে লেগে যায় খাওয়ার সময়। তাতে অন্ধ হয়ে আরুণি কূপে পতিত হলো। সন্ধ্যার সময় আশ্রমে ফিরে আসে নাই দেখে গুরু ভাবিত হয়ে পড়লেন। তার সন্ধানে বের হয়ে, অনেক অন্বেষণের পর, অনেক ডাকাডাকির পর গুরু শুনতে পারলেন কূপ থেকে আরুণির শব্দ আসছে। তখন সেখান থেকে তাকে উঠিয়ে আশ্রমে নিয়ে গেলেন। আগেকার গুরুদের শক্তি ছিল সিদ্ধাই, তাই গুরুকৃপায় আরুণি পুনরায় চক্ষুষ্মান্ হলো।

এই প্রকার গুরুর উপর যারা বিশ্বাস করে, তাদের তিনি সর্বদা রক্ষা করেন। এদিকে অনেকে হয়ত ভাববে, গুরু কি নিষ্ঠুর — গরু চরাতে বলেছেন, অথচ খাবে কি তার কথা একবারও তো বলেন নাই! কিন্তু গুরু যখন দেখলেন যে সে গৃহে ফিরে নাই তখনই তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে বের হয়ে পড়লেন। কারণ ভগবানের জন্য আরুণি যে সব ছেড়েছে, গুরুবাক্য বিশ্বাস করে! তাই গুরু স্থির থাকতে পারলেন না।

এখানে আজকাল সূর্যের উত্তাপ অতিশয় প্রখর হইয়াছে। শ্রীম-র আদেশ ভক্তগণ সূর্যকিরণে উত্তপ্ত প্রান্তরে অপরাহ্ন অতিবাহিত করিয়াছেন! তাই কি তিনি এই উপাখ্যান বলিলেন?

শ্রীম — ঠাকুর যা বলতেন, আগে কিছুই বুঝতে পারতুম না। এখন একটু একটু বুঝতে পারা যাচ্ছে। গুরু সর্বদা ভালর জন্যই সব করেন। হয়ত লোকের চক্ষুতে অনুরূপ দেখায়। সার্জেন operation-এর (অস্ত্রোপচারের) সময় রোগীকে কষ্ট দেয় বটে, কিন্তু তার ভালর জন্যই।

২

জম্বুতলে ভাগবত পাঠ হইতেছে — প্রহ্লাদচরিত। এখন অপরাহ্ন সাড়ে চারটা। শ্রীম চেয়ারে বসিয়া আছেন। মুকুন্দ, জগবন্ধু, বিনয়, ছোট অমূল্য ও গদাধর বেদিকার উপর কম্বলাসনে উপবিষ্ট। প্রহ্লাদ দৈত্য বালকগণকে উপদেশ দিতেছেন।

দৈত্য বালকগণের প্রতি প্রহ্লাদ বলিতেছেন, বন্ধুগণ, বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া ধর্মাচরণ করিয়া থাকে। তোমরাও তাহাই করিবে।.......মনুষ্যজীবনের যখন স্থিরতা নাই তখন তোমাদের এই কৌমার কালেই ধর্মাচরণ করা বিধেয়।

শ্রীম — মনুষ্যজন্মে ভগবানদর্শন হয়, তাই ইহা দুর্লভ। আবার স্থির নাই কখন জীবন চলে যায়, তাই ধর্মাচরণের কালাকাল বিচার করা চলে না। যখনই ইচ্ছা হবে তখনই করে নিতে হয়।

পাঠক পড়িতেছেন, মনুষ্যের শরীর যতদিন সুস্থ আছে, বিপন্ন বা বিনষ্ট হয় নাই, ততদিন সংশয়প্রাপ্ত বুদ্ধিমান মনুষ্য স্বীয় কল্যাণের জন্য যত্ন করিবে। ...মনুষ্যের অর্ধ পরমায়ু অর্থাৎ পঞ্চাশ বৎসর নিদ্রায় নিষ্ফলভাবে অতিবাহিত হয়।

শ্রীম — নিদ্রায়, আর জরা, রোগ, এই সবে।

পাঠক — কোশকীট গৃহ নির্মাণ করিতে গিয়া আপনার নির্গমনের দ্বারও অবশিষ্ট রাখে না। সেইরূপ মনুষ্য লোভহেতু কর্ম করিতে গিয়া আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধন করিয়া ফেলে। .... অতএব হে দৈত্যবালকগণ, তোমরা দৈত্যগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নারায়ণের শরণাপন্ন হও।

শ্রীম — দেখ, সৎসঙ্গের প্রভাব! দৈত্যবালকগণ সমবয়সী প্রহ্লাদের সৎসঙ্গহেতু মনুষ্যজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ যে ভগবানদর্শন তার উপদেশ লাভ করলো।

পাঠক — কেবল যে উত্তম মনুষ্যদিগের ভগবানলাভে অধিকার এরূপ নহে। যাহাদিগের দেহ ভগবানের একান্ত অকিঞ্চন ভক্তগণের পদারবিন্দরজ দ্বারা আপ্লুত তাহারাও এই জ্ঞানলাভে অধিকারী।

শ্রীম — মহাপুরুষসংশ্রয়। গুহক শ্রীরামের কৃপায়, ভগবানদর্শন

করলেন। ব্যাধকন্যা শবরী ঋষিগণের কৃপায়, আর ব্যাধ কৃমিকণ্ঠ শ্রীরামানুজাচার্যের কৃপায় সিদ্ধমনোরথ হলেন! ক্রাইস্টের শিষ্যগণের প্রায়ই উত্তম গৃহে জন্ম হয় নাই, কিন্তু তাঁর কৃপায় তাঁরা জগৎপূজ্য। তাই ঠাকুর বলতেন, ভক্ত একটি আলাদা জাত। ভক্তের বিনাশ নাই — 'ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।' ভক্ত বাঁচলেও লাখ টাকা, মরলেও লাখ টাকা — যেমন হাতী।

পাঠক — স্বর্ণাকর ক্ষেত্রে যে সকল পাষাণ থাকে, তাহাতে স্বর্ণের কণিকাসকল দীপ্তি পাইয়া থাকে। অভিজ্ঞ স্বর্ণকার যেমন অগ্নিসংযোগাদি উপায়দ্বারা পাষাণ হইতে স্বর্ণলাভ করেন, সেইরূপ যিনি অবগত আছেন যে, স্থূল সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত এই দেহকে অধিকার করিয়া আত্মা অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি আত্মযোগের দ্বারা দেহরূপ ক্ষেত্রে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

শ্রীম — যিনি জানেন আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা, যেমন সোনা আলাদা আর পাষাণ আলাদা, তাঁর কাছে এই পাঁকের ভিতরই পদ্মফুল ফুটবে।

পাঠ চলিতেছে।

শ্রীম — হাঁ, অন্তরঙ্গ ধর্ম কি আবার পড় তো।

পাঠক — গুরু-শুশ্রূষা, ভক্তি, সকল লব্ধবস্তুর অর্পণ, সাধু ভক্তগণের সঙ্গ, ঈশ্বরের আরাধনা, তদীয় কথায় শ্রদ্ধা, তাঁহার গুণ ও ধর্মসকলের কীর্তন, তাঁহার পাদপদ্মের ধ্যান, তদীয় মূর্তির দর্শন, পূজা ও বন্দনাদি এবং ঈশ্বর ভগবান শ্রীহরি সর্বভূতে বিরাজমান চিন্তা করিয়া অভিলষিত বস্তু প্রদানদ্বারা সর্বভূতের সম্মান — এই সকল অন্তরঙ্গ ধর্ম।

শ্রীম — (জনৈকের প্রতি) গণনা করুন তো কয়টি হলো।

ভক্ত — দ্বাদশটি।

শ্রীম — হাঁ, মুখস্থ করে ফেলবেন।

পাঠ শেষ হইল।

শ্রীম — কি সুন্দর কথা! সর্বজীবে গোবিন্দের অধিষ্ঠান জেনে সর্বত্র সম্মানদানই গোবিন্দে একান্ত ভক্তি। কি চমৎকার কথা! ক্রাইস্টও

বলেছেন, Thou shalt love thy neighbour as thyself, (St. Matthew 19:19) — মানে, সর্বজীবে প্রেম প্রদর্শন করবে।

স্ত্রীলোকদের বুঝি মনে থাকে না। প্রহ্লাদ বলছেন, নারদের উপদেশ ওঁর মার মনে ছিল না। আবার কেমন বললেন দৈত্যবালকদের, শ্রদ্ধা থাকলে আমার ন্যায় বালক এবং স্ত্রীগণও ঈশ্বরলাভ করতে পারেন।

সন্ধ্যা প্রায় আগত। কুটীরপ্রাঙ্গণে কম্বল পাতা হইয়াছে। পুলিন ও রণদা আসিয়াছেন। শ্রীম কম্বলে উপবিষ্ট। পার্শ্বেই জগবন্ধু, মুকুন্দ ও ছোট অমূল্য। বিনয় ও গদাধর গৃহমধ্যে আছেন। পুলিন হারমোনিয়ামসংযোগে সঙ্গীত ধরিলেন —

গান। গগনময় থালে রবি চন্দ্র দীপক বনে,
তারকামণ্ডল চমকে মোতিরে॥
ধূপ মলয়ানিল পবন চৌঁরি করে
সকল বনরাই ফুলন্ত জ্যোতিরে॥
ক্যায়সে আরতি হোবে, ভব খন্ডন তেরি আরতি
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে॥
হরিচরণ-কমল-মকরন্দ লোভিত মন
অনুদিন মোহেয়া পিয়াসা,
কৃপা জল দেও নানক-সারঙ্গ কো
হো যায়ে তেরে নাম বাসা॥

আবার গাহিলেন —

অচলঘন গহনগুণ গাওরে তাঁহারি,
গাওরে আনন্দে সবে রবি চন্দ্র তারা॥
সকল তরুরাজি সাজি ফুলে ফলে গাওরে,
বিহগকুল গাও আজি মধুরতর তানে॥
গাও জীবজন্তু আজি যে আছ যেখানে,
জগত-পুরবাসী সবে গাও অনুরাগে॥
মম হৃদয় গাও আজি মিলিয়ে সবে সাথে,
ডাক নাথ নাথ বলি প্রাণ আমারি॥

শুক্লপক্ষের চন্দ্রকরসাগরে বনস্থলী এইক্ষণে নিমজ্জিত। চন্দ্রের সুশীতল কিরণ, মৃদুমন্দ সান্ধ্য সমীরণ, সঙ্গীতের সুমধুর তান, আর মহাপুরুষসন্নিধান — এই দিব্যসংযোগে নির্জন প্রান্তরমধ্যবর্তী কুটীরপ্রাঙ্গণে এক স্বর্গীয় আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে।

পুলিন মত্ত হইয়া এইবার স্বামীজীর রচিত নির্বিকল্প সমাধির গান ধরিলেন।

নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্বচরাচর।।
অস্ফুট মন আকাশে, জগত-সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডুবে পুনঃ অহংস্রোতে নিরন্তর।।
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি আমি' এই ধারা অনুক্ষণ।।
সে ধারাও বদ্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
অবাঙমনসোগোচরম্ বোঝে প্রাণ বোঝে যার।।

ভজন শেষ হইলে শ্রীম বলিলেন, বেশ আনন্দ দিলেন। কিয়ৎকাল সকলে চুপ করিয়া নীরব আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। এইবার নাগমহাশয়ের পবিত্র জীবনকথা হইতে লাগিল।

পুলিন — গিরিশবাবু নাগমহাশয়কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি জুতো পরেন না — অথচ ঐ ব্যক্তিকে জুতো দিয়ে প্রহার করলেন কি করে? নাগমহাশয় বললেন, কেন কেন, তার জুতা দিয়েই তাকে মারলাম (সকলের হাস্য)।

একজন গুরুনিন্দুককে নাগমহাশয় পাদুকাঘাত করিয়াছিলেন।

শ্রীম — এদিকে কি দীন ভাব, কিন্তু ঐ সময় কি তেজ! বাজারে যেতেন, দোকানদার যা দাম চায় তাই দিতেন। ওরা পয়সা ফিরিয়ে দিতে চাইলে বলতেন, না, না, আপনি নিন, আপনার লোকসান হবে। প্রথম প্রথম তাঁকে চিনতে পারতো না দোকানদার, তাই বেশী দাম চাইতো। অন্য লোক যখন বলতো, ওরে ইনি সাধু, এঁর কাছ থেকে এত দাম নিলি, তখন ফিরিয়ে দিতে আসতো। কিন্তু তিনি ফেরৎ নিতেন না, বলতেন, আপনি রেখে দিন — আপনার লোকসান

হবে।

পুলিন — প্রসাদী পাতা খেয়ে ফেলতেন।

শ্রীম — শেষের দিকে প্রসাদ পাতায় দেওয়া হতো না। কুলী এসেছে, তাকে পাখার বাতাস করতে লেগে গেলেন — ঘেমে গেছে কিনা! মজুর ঘর ছাইছে, রৌদ্রে ঘেমে গেছে দেখে বলছেন, আপনি নেমে আসুন, নেমে আসুন, বড় কষ্ট হচ্ছে আপনার। তারপর তাকে তামাক সেজে খাওয়ান।

পুলিন — শুনেছি, সাপ চলে যাচ্ছে, জোড়হাতে সেটাকে নাগমশায় বলছেন, এই দিকে যান, আপনার আহার এইদিকে আছে। হরি মহারাজরা গেলে তাঁদের ঘরের ভিতর ঢুকতেন না, বারান্দায় থাকতেন। বলতেন, আমি কি এদের পাশে যেতে পারি?

শ্রীম — একেই বলে উত্তম ভক্ত। উত্তম ভক্ত সর্বজীবে ভগবানের অধিষ্ঠান জেনে সকলকেই সম্মান করেন, পূজো করেন। অদ্ভুত জীবন। সেই পরশমণিকে ছুঁয়ে সব সোনা হয়ে গেছেন। এই চন্দ্রসূর্য যাঁর গুণগান করছে, তিনি মানুষ হয়ে এসেছিলেন। তাঁর পাদস্পর্শে নাগমশায়ের এই অবস্থা! ধন্য নাগমশায়, ধন্য এ দেশ!

১৬ই চৈত্র, ১৩২৯ সাল।
৩০শে মার্চ, ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ।
শুক্রবার, শুক্লা ত্রয়োদশী।
Good Friday.

ঊনবিংশ অধ্যায়

অক্ষম ছেলের মত শরণাগত ভক্তেরই ভার ঈশ্বর লন

১

অতি প্রত্যুষকাল। সূর্য এখনও উঠে নাই। ধ্যানান্তে অশ্বত্থমূলে অন্তেবাসী বসিয়া আছেন — কি ভাবিতেছেন। ইতিমধ্যে শ্রীম আসিয়া বসিলেন। অন্তেবাসী বিনীতভাবে শ্রীমকে একটি সংশয়ের কথা নিবেদন করিতেছেন।

অন্তেবাসী — আজ্ঞে, কাল উপনিষদপাঠের সময় বলেছিলেন, সুষুপ্তি সময়ে জীব সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মের সহিত এক হয়ে যায়। তাহলে তো সকলেই ব্রহ্মজ্ঞানী, কিন্তু তা তো নয়।

শ্রীম — সুষুপ্তিতে জীবের অজ্ঞান আবরণ থাকে, তাই 'তমোঽভিভূতঃ' বলেছেন — অর্থাৎ অজ্ঞানে আবৃত থাকে। 'সুষুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোঽভিভূতঃ সুখরূপমেতি'। সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু অজ্ঞান থাকে। তাই সুষুপ্তি থেকে জাগ্রত হয়ে — 'আমি মানুষ', 'আমি ব্যাঘ্র' ইত্যাদি বোধ ফিরে আসে।

Unconciously (অজ্ঞানে) যায়, unconsciously (অজ্ঞানে) ফিরে আসে। 'আমি আত্মা' — যাবার সময় এ বোধ নাই, তাই যখন সুষুপ্তি থেকে ফিরে আসে তখনও এ জ্ঞান থাকে না। যে শরীরে আছে তারই জ্ঞান হয়। শ্বেতকেতুকে বলেছিলেন পিতা আরুণি ঋষি এই কথা, মধু আর নদীর দৃষ্টান্ত দিয়ে। নানা ফুলের রস একত্র মিলিত হয়ে মধু হয়। তখন ভেদ থাকে না — ইহা মিষ্ট ফুলের রস কি তিক্ত ফুলের। সাগর থেকে জল বাষ্প হয়, তা থেকে মেঘ হয়। ক্রমে বৃষ্টি, বরফ, গঙ্গা, সিন্ধু প্রভৃতি নদীরূপে সেই জল পুনরায় সাগরে প্রবেশ করে, তখন সাগর হয়ে যায়। 'আমি গঙ্গা', 'আমি সিন্ধু' — এই জ্ঞান থাকে না — সব সাগর।

জীবগণ সুষুপ্তিতে এইরূপ সৎস্বরূপের সঙ্গে মিলিত হয়েও তাঁকে জানে না। সেইজন্য সুষুপ্তি ভঙ্গ হলে জাগ্রত অবস্থায় যখন ফিরে আসে তখন স্বরূপ জ্ঞান থাকে না — 'আমি সৎস্বরূপ', আমি 'সৎ থেকে ফিরে এসেছি' — এই জ্ঞান। তাই ফিরে এসে 'আমি সিংহ', 'আমি ব্যাঘ্র,' 'আমি মনুষ্য — অমুকের পুত্র' — এসব জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। যে শরীর তারই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু যারা consciously (সজ্ঞানে) যায়, তারা ফিরেও আসে consciously (সজ্ঞানে)। 'আমি ঈশ্বর' কিংবা 'আমি ঈশ্বরের সন্তান' এইরূপ একটি ভাবকে আশ্রয় করে যারা তাঁর কৃপায় তাঁকে দর্শন করে, ব্যুত্থিত হয়েও তাদের সেই ভাবটি থাকে — এই জ্ঞান আরো দৃঢ়তর হয়। ঠাকুর বলতেন, 'তখনই পাকা বিশ্বাস হয়'। এই বিশ্বাসেই জনক বলেছিলেন, মিথিলা ভস্মীভূত হয়ে যাক, তাতে আমার কি — অর্থাৎ আমি অবিনাশী আত্মা, — 'মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন'। এই বিশ্বাসেই ক্রাইস্ট বলেছিলেন, 'Not what I will, but what thou wilt' (St. Mark 14:36) — 'পিতঃ, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক' বলে ক্রুশবিদ্ধ হলেন।

এই জ্ঞান কিরূপ জান? যেমন একজনের business (বাণিজ্য) নষ্ট হয়ে গেল। ব্যাঙ্কে তার বহু টাকা গচ্ছিত আছে। বাইরে মন খারাপ হলেও অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস আছে। — আমার বিশ লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে। আর একজনের ব্যাঙ্কে টাকা নাই। তার কাজ নষ্ট হয়ে গেলে সে বড় চিন্তিত হয়ে পড়ে — একেবারে নিরুপায়। এও ঠিক এইরূপ।

অন্তেবাসী — আজ্ঞে ক্রাইস্টকে ধরবার আগে তিনি চঞ্চল হয়ে গিছলেন। বলেছিলেন, 'Oh my Father,...let this cup pass from me' (St. Mathew 26:39). (পিতঃ, এ বিপদ দূর কর)। এরূপ কেন হলো, যদি 'আমি ঈশ্বরের সন্তান' এই পাকা জ্ঞান থাকে?

শ্রীম — এসব লোকশিক্ষার জন্য। যিনি ঈশ্বর, তিনিই মানুষ হয়ে এসেছেন। তাঁর এসব ভাব নজীরের জন্য দেখান। মানে, শরীর

ধারণ করা — মহামায়ার এলাকা কিনা — কত কঠিন, তাই দেখাচ্ছেন। দেহবুদ্ধি যেতে চায় না। ক্ষণকাল ঐ ভাব ছিল — তারপরই বললেন, 'Not as I will, but as thou wilt' (St. Mathew 26:39) — তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক। মানুষ সর্বদা দেহবুদ্ধিতে ডুবে আছে। কিন্তু দেখ, পিটার যখন বললেন, ঈশ্বর না করুন আপনার কখনও প্রাণ হত্যা হয়ে যায়, তখন ক্রাইস্ট তীব্রস্বরে উত্তর করলেন, 'Get thee behind me Satan' (St. Mark 8 : 33) — 'শয়তান, তুমি আমার সম্মুখ থেকে দূর হও। তুমি ঈশ্বরেচ্ছার অন্তরায়।'

অন্তেবাসী — আজ্ঞে, সেদিন বলেছিলেন, ঠাকুরের কৃপায় তাঁর ভক্তরা এসব অবস্থা লাভ করেছেন। কিন্তু সাংসারিক ব্যাপারে তাঁদের এত অভিভূত দেখায় কেন? মনে হয়, যেন তাঁরা সাধারণ লোকেরই মত।

শ্রীম — ঠাকুর বলেছিলেন, কেরাণী জেলে গেল। এখন জেল থেকে ফিরে এসে কি ধেই ধেই করে নাচবে, না কেরাণীগিরিই করবে? তেমনি যে যা করছিল তাই করবে — কেউ কেরাণীগিরি, কেউ মাস্টারী, কেউ ডেপুটি — যার যা কাজ, তাই করবে। আবার সন্ন্যাসী সেজে লোকশিক্ষা দেবে কেউ কেউ।

একজন ছেলেবেলায় কাশীদর্শন করেছিল। বৃদ্ধবয়সে নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখা গেলেও তার ঐ জ্ঞান নষ্ট হয় নাই। নানা কাজে জড়িত দেখে মনে হয়, যেন কাশীর জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কিন্তু তা নয়।

ব্রহ্মা তাই বলেছিলেন সনকাদিকে, 'তোমরা এই সময় এলে। আমি নানা কাজে ব্যস্ত। আচ্ছা, একটু বসো।' তারপর মনস্থির করে তিনি জ্ঞানোপদেশ দিলেন।

ধর্মব্যাধ মাংসই কাটছেন ঠকঠক করে। কিন্তু এদিকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিচ্ছেন।

আবরণ থাকে না, আচরণ থাকে। তাই বিক্ষেপ, তাই ঐরূপ দেখায়, যেন সাধারণ মানুষ। মুচুকুন্দ রাজা ঈশ্বরদর্শন করেছিলেন

আগে, সাধনভজন করলেন পরে বিক্ষেপ নাশ করতে।

ঠাকুরের ছেলেরাও কেউ কেউ পরে সাধনভজন করেছিলেন। ঠাকুর পূর্বেই তাঁদের পূর্ণ করে দিয়েছিলেন, তবুও তাঁরা পরে সাধনভজন করলেন। এতে আবার লোকশিক্ষাও হয়ে যাচ্ছে।

কি করে সর্বাবস্থায় আত্মজ্ঞ পুরুষের জ্ঞান থাকে তার একটা description (বর্ণনা) গীতায় আছে। ইন্দ্রিয়ের কাজ ইন্দ্রিয় করছে — 'ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্'। (গীতা ৫-৯) কিন্তু, আমি নির্লেপ।

তবে কাশী দর্শন করে বাল্যাবধি যে কাশীতেই বাস করেছে বেশীর ভাগ, তার অন্তরেও কাশীর জ্ঞান থাকে, বাহ্য ব্যাপারেও কাশীরই চালচলন আচরণ দেখা যায়। যেমন শুকদেব।

As a man one enters, as a saint — a seer one returns — এই মানুষই আত্মদর্শনের পর ঋষিত্ব, দেবত্ব লাভ করে। এই হলো সমাধি আর সুষুপ্তির পার্থক্য।

অন্তেবাসী — আজ্ঞে, এখন বুঝতে পেরেছি।

শ্রীম — এ বিষয়ে শঙ্করাচার্য বেশ করে বিচার করেছেন, দেখে নিও। শঙ্করকে অবলম্বন করে পঞ্চদশী লেখা হয়েছে। এতেও আছে। বেদান্ত-দর্শনে ব্যাসদেব বিচার করেছেন। কিন্তু মূল উপনিষদ্ এখানে সংক্ষিপ্ত।

তাঁকে প্রার্থনা করতে হয় — বুঝিয়ে দাও বলে। তাঁর কৃপায় তিনি দেখিয়ে দিলে অন্যরূপ বোধ হয়। বিচারের দ্বারা একরূপ, দেখিয়ে দিলে অন্যরূপ।

Intellectual conviction (পরোক্ষ জ্ঞান,) দৃঢ় হইলে তাঁর কৃপায় direct realisation (প্রত্যক্ষ দর্শন) হয়, পরোক্ষ অপরোক্ষ হয়। আমেরিকার কথা শুনে বা পড়ে ধারণা আর দেখার প্রভেদ আছে। ঠাকুরের কৃপায় কেউ কেউ এসব অবস্থা লাভ করেছেন।

আর এক পথ আছে — ভক্তির পথ। কান্নাকাটা, প্রার্থনা, এই সব। তাঁকে ভালবেসে গোপীদের এসব অবস্থা লাভ হয়েছিল — সমাধি, ব্রহ্মজ্ঞান, ভাব, মহাভাব এই সব।

তাই ঠাকুরকে প্রার্থনা করতে হয়। তাঁর উপর ভালবাসা এলে এসব অবস্থা আপনি আসে। তিনি অবতার। নিজেই বলেছিলেন কি না — সচ্চিদানন্দ মানুষশরীর ধারণ করে এসেছেন!

কতবার বলেছেন, 'আমার চিন্তা যে করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, পিতার ঐশ্বর্য যেমন পুত্র লাভ করে।'

২

নিত্যপূজা সমাপ্ত হইয়াছে। ঠাকুরঘরে শ্রীম কম্বলাসনে বসিয়া আছেন। এখন বেলা প্রায় নয়টা। ডাক আসিয়াছে। ভুবনেশ্বর মঠে সম্প্রতি ৺বাসন্তী পূজা হইয়া গিয়াছে, তাহার বিবরণ একজন সাধু লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। আর পত্রমধ্যে ঐ সঙ্গে দেবীর প্রসাদ এবং নির্মাল্যও প্রেরণ করিয়াছেন। সকলে প্রথম প্রসাদকণিকা ধারণ করিয়া মস্তকে নির্মাল্য স্পর্শ করিলেন। তৎপর মুকুন্দ শ্রীম-র আদেশে ক্রমান্বয়ে তিনবার পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

শ্রীম — (পত্র পাঠান্তে) এসব পত্র পুরাণ — যেমন রামায়ণ, মহাভারত! এতে ভগবানের উদ্দীপন হয়। তা'তে আবার সাধুর হাতে লেখা। কোথায় পাওয়া যায় এসব পত্র!

(জগবন্ধুর প্রতি) দু'খানা পত্র আছে, পড়ুন তো শুনি।

জগবন্ধু (পড়িতেছেন) — (একজন ভক্ত লিখিতেছেন) 'আজ যে পত্র পাইলাম তাহাতে তিনটি উপদেশ খুব চমৎকার। ইহা পালন করিতে পারিলেই কাজ হয়। শ্রীশ্রীমসঙ্গে মান অভিমান সব চূর্ণ হয়ে যাবে — অহঙ্কার পালাবে। এটা অতি অদ্ভুত দেখছি। ইহা জগতে আর কোথাও আছে কিনা জানি না। আমি তো আমার জীবনে এমন কোথাও দেখি নাই — সম্পূর্ণ অহঙ্কারশূন্য অবস্থা। বিদ্যা, জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য সবগুলি লাভ করে একেবারে অহঙ্কারশূন্য। প্রশংসার ছিটেও প্রবেশ করে নাই। এ মূর্তি কেবল ওখানেই আছে।

'যাঁরা ওখানে আছেন তারা বড় সহজ লোক নন। আমরা হতাশার মধ্যে consolation (সান্ত্বনা) আনি — যদি আমাদের ফ্রেণ্ডস্‌রা

অমৃতসাগরের উপকূলে থেকে তার taste (আস্বাদ) নিয়ে spirituality-র development (ধর্মজীবনের বিকাশ) করেন, তবে আমরাও খুব সুখী হব।...

শ্রীম — এইখানাও পড়ুন।

জগবন্ধু (আবার পড়িলেন) — '...ওখানে সকল ভক্ত মিলে আনন্দের হাট বসাইয়াছে। ক্রমে ক্রমে প্রায় সকলেই fountain of peace-এর (শান্তি নির্ঝরের) কাছে যাচ্ছেন।...(আমাদের) বয়স বেশী হলেই হয় না। তার সঙ্গে ভক্তিভাব ঠিক হলেই শোভা পাবে। আমরা তো এক ক্লাসের ছাত্র। আমাদের মধ্যে সম্মানসূচক সম্বোধন উঠিয়ে দিয়ে ভাই ভাই বলে ডাকা, আর পরস্পরের প্রতি ভালবাসাই আমার মতে ভাল।'

'এর আগের পত্রে শ্রীশ্রীম-র যে সকল উপদেশ লিখেছ তাহা অমূল্য ধন। ভাবলে মনে হয় কি করছি! এখনও হুঁশ হলো না — দিন যে ফুরিয়ে আসছে! যাঁরা সাক্ষাৎ থেকে কথামৃত পান ও শ্রবণ করছেন তাঁরা কত উঁচু থাকের। ঐ শ্রীশ্রীচরণে জানাবে — ঝঞ্ঝাট কমিয়ে দিন, সাধুসঙ্গ ও নির্জনবাস ঘটিয়ে দিন। নতুবা উপায় নাই। এ দু'টি না পেলে আর মানুষ হয়ে কি করলাম! কোনও জিনিসপত্রের জন্যে তো কোনও সংবাদ দিতেছ না।...'

'যদি একবার সকলকে নিয়ে শ্রীশ্রীমাস্টারমহাশয়কে সঙ্গে করিয়া বৈদ্যনাথ হয়ে শিমুলতলা যেতে পার, তার বিশেষ চেষ্টা করো। আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল তাঁর পদধূলি ওখানে পড়বে, কিন্তু তা তো ঘটল না। সকলের নিকটেই আমার অনুরোধ একবার শ্রীশ্রীমকে নিয়ে একরাত্রি ওখানে থেকে আসুন।...'

পত্রপাঠ শেষ হইল। শ্রীম কতক্ষণ নীরব রহিলেন, তারপর কথা কহিতেছেন।

শ্রীম — (জনৈক ভক্তের প্রতি) হাঁ, সেদিন আপনি তাঁর কাছে কি লিখেছিলেন — যার কথা তিনি আজ লিখেছেন?

ভক্ত — এখানকার কিছু কথা লিখেছিলাম।

শ্রীম — কি কথা? — এখানকার জীবনপ্রণালী, কি ঈশ্বরীয়

কথা?

ভক্ত — উভয়ই লিখেছিলাম, আপনি বলেন 'পাণ্ডিত্যে তাঁকে পাওয়া যায় না। তাই ক্রাইস্ট বলেছিলেন, 'For of such is the Kingdom of Heaven' (St. Matthew 19 : 14) — শিশুর মত সরল না হলে ঈশ্বরলাভ হয় না। মা বলেছেন, ও ঘরে জুজু আছে তা শিশুর পাঁচসিকে পাঁচআনা বিশ্বাস মায়ের কথায়। জুজু কি সে কখনও চোখে দেখে নাই। কিন্তু মায়ের কথায় এমনি বিশ্বাস। তেমনি গুরুবাক্যে বিশ্বাস চাই। আপনি বলেন, উঁচু ঢিপিতে জল দাঁড়ায় না — এই সব কথা। আর, it is personality that matters (জীবন্ত আদর্শের প্রয়োজন)। Towering personality-র (গগনচুম্বী ব্যক্তিত্বের) কাছে থাকলে rustic (নিরক্ষর কৃষকও) God (দেবতা) হয়ে যায়। যীশুর অন্তরঙ্গগণ প্রায়ই ঐ শ্রেণীর ছিলেন।

কর্মফল ভুগতে হবে। তবে ভক্ত হলে মা হালকা করে দেন — নয়ত সবটা ভুগতে হবে। অক্ষম ছেলেকে যেমন বাপ-মা বেশী আদর করেন — দেখেন, তেমনি ভগবানের শরণাগত হলে, তিনিই ভক্তের ভার নেন। ঠাকুর তেজচন্দ্রকে বলতেন, তোর জন্যেই তো বেশী ভাবনা, তুই বিয়ে করে ফেলেছিস।

বিপদে পড়লে অমনি পূজো করতে হয়। ফুলচন্দন দিয়েও পূজো হয়, আবার শুধু নমস্কার করলেও হয়। নমস্কারের মানে — প্রভো, আমি তোমার শরণাগত।

সাধুসঙ্গ সর্বদা দরকার। ভগবানদর্শন হলে স্ত্রীজাতির উপর মাতৃবুদ্ধি ঠিক ঠিক হয়। কিন্তু, যতদিন দর্শন না হয় ততদিন গুরুবাক্যে বিশ্বাস alternative (উপায়ান্তর)। এসব কথাও ছিল।

আর লিখেছিলাম, এখানে জীবনপ্রণালী অতি সরল, তাই অভাব নাই। তজ্জন্য আপনার বারবার অনুরোধসত্ত্বেও জিনিসপত্র পাঠাতে লিখি নাই। এখানে দিবানিশি ঈশ্বরীয় ভাব — ধ্যান, ভজন, ঈশ্বরীয় কথা। অল্প সময়মাত্র আহারাদিতে ব্যয়িত হয়। রাত্রিতে উঠে সকলকেই ধ্যান করতে হয় সকাল পর্যন্ত। অপরাহ্ণে একাকী নির্জন

প্রান্তরে, বনে গিয়ে তিনচার ঘন্টা ধ্যানভজনাদিতে অতিবাহিত করতে হয়। গীতা, উপনিষদাদি হতে ধ্যানের সামগ্রী পূর্ব থেকেই শ্রীম দেখিয়ে দেন। এককথায় বলতে হয়, plain living and high thinking (সরল জীবন, উন্নত মনন) যেন মূর্তি পরিগ্রহ করে আছে।

শ্রীম — বেশ হয়েছে! কিন্তু, কেওরজালির কথা লিখেন নাই?

ভক্ত — লিখেছি সামান্যভাবে, পরে বিস্তৃত লিখবো জানিয়েছি।

শ্রীম — 'পরে লিখবো' কেন, এক্ষুনি লিখতে হয়। যারা ব্যাকুল, তাদের সময়মত আহার দিতে হয়, তবে তো উদ্দীপন হবে।

Description (বর্ণনা) খুব graphic (জীবন্ত) করতে হয়। এতে স্থান, কাল, পাত্র — আর বার, তিথি, নক্ষত্র এসব দিতে হয়। তবে তো উদ্দীপন হবে।

তা না হলে academic discourse (দার্শনিক আলোচনা) হয়ে দাঁড়ায়। কে কে উপস্থিত — personality (ব্যক্তিত্বের) উল্লেখ করতে হয়, আমরা যেমন দিয়েছি (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ) কথামৃতে।

ভক্ত — তাহলে এখনই বিস্তৃত লিখি?

শ্রীম — হ্যাঁ, আজই পাঠিয়ে দিন। আমাদের শুনিয়ে দেবেন। সময়মত আহার দিতে হয়, তখন ব্যাকুলতা থাকে। পরে শুধু discourse (কথার কথা) হয়ে দাঁড়ায়!

কি রকম সব লিখেছেন, কি ব্যাকুল দেখুন? উনি কি কম লোক? — সাধুলোক! নিজে স্থূলকায় আর বেরুতে পারেন না। অনেক কাজ, তাই ফ্রেণ্ডসদের দিয়ে তীর্থাদি করান আর সব শোনেন। বেশ রাস্তাটি ধরেছেন। এতেই সব হয়ে যাবে। একজনকে ঁকাশী ও পুরী পাঠালেন, আর একজনকে নবদ্বীপ পুরী আর কতস্থানে পাঠিয়েছেন। আবার এখানকার সবাইকে শিমুলতলার বাড়িতে নেবার জন্য কি ব্যাকুলতা! টাকার মায়া এমনি করে কাটিয়েছেন। তাঁর বড়ই ইচ্ছা যাঁরা ঈশ্বরের নাম করেন তাঁদের একবার শিমুলতলা নেন। কিন্তু, কি করে হয় যাওয়া? — বুড়োমানুষের প্রাণ যে যায়!

উনি কলকাতা রয়েছেন, কিন্তু মনটা পড়ে আছে এখানে — কি

ব্যাকুল! রোজ চিঠি দিচ্ছেন, এখানে কি হচ্ছে জানবার জন্য — এত ব্যাকুল! ঠাকুর দুই বন্ধুর গল্প বলতেন, ‘মনই সব।’ মহাত্মালোক! দেখ, কেমন grateful (কৃতজ্ঞ)! কে একজন সাধু প্রথম ঈশ্বরের কথা শুনিয়েছিলেন, তাঁকে অনেক দিন থেকে প্রতি মাসে পঁচিশ টাকা করে দেন। এ কি কম আশ্চর্যের কথা — ক’টা লোক করে?

ইনি হলেন রঙ্গমঞ্চের ম্যানেজার। নটনটীরা সব অভিনয় করে, কিন্তু যোগান দেন ম্যানেজার। ইনি থাকেন আড়ালে আর বাহাদুরী নেয় অভিনেতারা।

শ্রীম — ইনি প্রাতঃস্মরণীয় লোক। ছেলেমেয়ে, আত্মীয়দের জন্য কত খরচ করেন। ভালমানুষ, শান্তিতে থাকতেন চান। ওরা আবার কথা শোনে না। এক আধবার বলেন, না শুনলে ভগবানের উপর ভার দেন। টাকা আছে তাই রক্ষে — ওদের টাকা দিয়ে ভুলিয়ে রেখে দেন। যে যা চায় তাই দেন। একগুণ খরচে হয়, চারগুণ খরচ করেন। কেন? না, শান্তিতে থাকতে চান। তাইতো ঠাকুর বলতেন, টাকা থাকলে অর্ধ জীবন্মুক্ত—যদি মন ঈশ্বরে থাকে।

আবার মান অভিমান নাই। পোশাক পরিচ্ছদ সাদাসিধে। লিখেছেন, ‘দিন ফুরিয়ে আসছে হুঁশ হলো কই?’ — কি ব্যাকুল! মন থাকলেই হলো। ওখানে এত কাজের ভিড়ে রয়েছেন, তবুও মনটা এখানে পড়ে আছে — এই তো ব্যাকুলতা! আমরা আর কি করবো।

(ভক্তের প্রতি) আচ্ছা ঁবাসন্তীপূজার প্রসাদ ও নির্মাল্য, আর এখানকার ঠাকুরের প্রসাদ খামে করে পাঠিয়ে দিন।

ভক্ত — আজ্ঞে আচ্ছা, আজই দিব।

শ্রীম — আর কেওরজালির উৎসবের description grahpic (হুবহু বর্ণনা) করে দিবেন। পাহাড়, বন ও প্রান্তর, ওষধি ও বনস্পতি, সাঁওতালদের বিয়ের উদ্যাগ, ছেলেদের সেলাম, ওদের কুশল প্রশ্ন — এসব উল্লেখ করবেন। আবার আকাশে চাঁদ, মন্দ মন্দ সমীরণ, তালপুকুর দেখে জয়রামবাটী আর দোচালা খড়ের ঘর দেখে কামারপুকুরের উদ্দীপন, রামনবমী থেকে একাদশী পর্যন্ত চব্বিশ

প্রহরে কীর্তন, তৎপর পূর্ণিমা পর্যন্ত উৎসব এসবও থাকবে। আর কণ্বমুনির আশ্রম ও হিমালয়ের নির্জন গঙ্গাতীরে দেবদারু বনে শিব সমাধিমগ্ন, শকুন্তলা আর কুমারসম্ভবের এসব কথাও থাকবে।

এমন বর্ণনা দিতে হয় যাতে উদ্দীপন হয়। Scene-টি concretised (চিত্রটি সজীব) করতে হয়। ভাগবতের কি কি পাঠ হচ্ছে, কোথায় বসে হচ্ছে, কে কে শুনছেন, কে পাঠ করছেন, তা লিখে দিতে হয়। রাজা রহুগণকে জড়ভরত উপদেশ দিচ্ছেন — 'মহাপুরুষের চরণরেণুতে যা হয় অর্থাৎ ঈশ্বরদর্শন, দান ব্রত জপতপে তা হয় না' — ইহাও লিখবেন। আবার উপনিষদের কি কথা হলো (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ) কথামৃতের কোথায় পাঠ হচ্ছে, বেশীর ভাগ কি কি কথা হচ্ছে, এসব থাকবে। যেমন নচিকেতা বললেন যমকে, স্ত্রীপুত্র রাজ্যসুখ, এসব কিছুই চাই না, চাই একমাত্র ঈশ্বর। ঠাকুর বলছেন, বাবা, ঈশ্বরই সত্য, সংসার অনিত্য — দু'দিনের। তাঁর ভজন, দর্শন না হলে জীবন বৃথা — এমন সব কথা থাকলে তবে উদ্দীপন হয়। রোজ চিঠি লিখছেন — আহা কি ব্যাকুল!

টাকাকড়ি ঐশ্বর্য হলেই আজকাল লোক সদ্বংশ বলে। কিন্তু তা নয়। সদ্বংশ মানে যে বংশে ভগবানকে পূর্বে অনেকে ডেকেছেন, যে বংশে দোল-দুর্গোৎসব, খাওয়ান-দাওয়ান—সাধু, ভক্ত, ব্রাহ্মণ, দরিদ্রের সেবা — এই সব হয়েছে তাকেই বলে সদ্বংশ।

৩

মধ্যাহ্নে আহার হইয়া গিয়াছে। শ্রীম কুটীরের বারান্দায় তক্তপোষে বসিয়া আছেন। নিকটে মুকুন্দ ও বিনয়, ছোট অমূল্য ও গদাধর আর জগবন্ধু শচীনন্দন রহিয়াছেন। শচী কলেজে পড়েন। আজ কলিকাতা হইতে আসিয়াছেন। এখন বেলা এগারটা। সাধকের জীবন কিরূপ হইবে শ্রীম তাহা বলিতেছেন।

শ্রীম — (মুকুন্দের প্রতি) থাকবার স্থান থাকলেও আর একটি আড্ডা করতে হয় যেখানে সারাদিন একা একা থাকা যায়। খেয়ে আসা শুধু বাড়ি থেকে।

কাশীপুরের বাগানে ঠাকুরের অসুখের সময় বাড়ির কাছে একটা বাসা ভাড়া করে আমি ছিলাম, আর মেসে খেতাম। সকলেই ডাইনিং হলে যেতো, — আমার খাবার তিনতলায় দিয়ে আসতো। একটি ঝি রান্না করতো। ঠাকুর শুনে বললেন, 'বেশ করেছ, বেশ করেছ, বেশ করেছ' — তিনবার বললেন। তখন তাঁর শরীর skeleton (কঙ্কালসার)। বিছানা থেকে উঠে, কাছে এসে বসে আস্তে আস্তে বলছেন এই কথা। এত কষ্ট তবুও ভক্তদের যাতে মঙ্গল হয় তাই করছেন।

ভগবানলাভের জন্য ঘটনাচক্রে কখনও একটু অসদাচার হলেও দোষ নাই। অনেক লোকের ঘরে থাকতে নেই — একা থাকতে হয়। আলাদা ঘরে থাকলে সব সময়েই মনটা আপনাতে থাকে। কতদিন আমাকে শুধু ঘি আর ভাতে ভাত খেয়ে থাকতে বললেন ঠাকুর। বলেছিলেন, 'নিজে রেঁধে ভাতে ভাত আর গব্য ঘৃত খাবে — ঋষিদের মত'। তাঁর কথামত তাই অনেকদিন ধরে করলুম।

খাওয়া তো জীবনের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হল কিসে তাঁকে পাওয়া যায়। খাওয়ার কষ্ট, কাপড়ের কষ্ট, কষ্টই নয়। বিদ্যেসাগর মশায় বলেছিলেন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যালের কর্ম ছেড়ে দিয়ে, 'আমি শুধু নুনভাত খাব।' কি দরকার পাঁচটার? যারা বড় হবে, মহৎ হবে, তারা এসব বিষয়ে দৃষ্টি দেয় না।

হরিমহারাজ একবার বৃন্দাবনে একজন সাধুকে তিরস্কার করেছিলেন, 'ছি, লজ্জা হয় না বাড়িঘর ছেড়ে এসেছ ভগবান চিন্তা করতে, তা না করে খালি এটা রাঁধা ওটা রাঁধা, এ-বাজার ও-বাজার করা।' কি দরকার অতর? প্রকৃতিতে রয়েছে কি না! আর বাড়িতে যা দেখা যায় সেইগুলিই করতে ইচ্ছা হয়। মনে হয় পাঁচটা না হলে বুঝি হলো না।

ঋষিকেশে দেখতুম অনেক সাধু আছে কেবল এটা দাও ওটা দাও করে ডাল, হালুয়া সব চেয়ে নিচ্ছে। কিন্তু, কেউ কেউ যাদের self-respect (আত্মসম্মান) বোধ আছে তারা ভাতটা বা রুটি, যা না হলে নয়, তাই দু'টি নিয়ে চলে গেল। কে যায় দরজায় দরজায়

এটা ওটা নিতে?

সেখানে সত্র আছে, সব পাওয়া যায়। পেটুক সাধুরা খেয়ে খেয়ে গল্প করে, 'ফলানা বাবুনে খুব খিলায়া — হালুয়া, পুরি কচৌরী'। ঠাকুরের নিকটও দক্ষিণেশ্বরে কোন কোন সাধু এরূপ সব গল্প করতো।

Self-respect (আত্মসম্মানবোধ) যাদের আছে, তারা ওসব চায় না। কোনও রকমে একটু মুখে দেওয়া। এ তরকারি রান্না হলো না, তবে খাওয়া হবে না। ওটা ওর পাতে পড়ে নাই তো সর্বনাশ হলো। কেন, নুন ভাত খাওয়া যায় না? আমরা কি করলুম তাঁর জন্য! হয়তো রান্না হতে দেরি হল, কি রান্না ভাল হল না, অমনি হাঁড়ি ভাঙ্গ কিংবা গিন্নীকে বকো। আহারের সংযম চাই, নইলে ধর্মজীবন হয় না।

৪

জম্বুতল। অপরাহ্ন চারটা। নির্জন প্রান্তরে ভক্তগণ ঈশ্বরচিন্তা করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়াছেন। শ্রীম উত্তরাস্য চেয়ারে বসা। বেদিকার উপরে জগবন্ধু, বিনয়, মুকুন্দ, ছোট অমূল্য, গদাধর ও শচী উপবিষ্ট।

হিমালয়ে শিবের ধ্যানসম্বন্ধে মহাকবি কালিদাস কুমারসম্ভব কাব্যে যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহারই কথা হইতেছে।

শ্রীম — (স্বগত) হিমালয়ে গঙ্গাতটে দেবদারু বনে অজিনাসনে শিব অর্ধনিমীলিত নেত্রে ধ্যানমগ্ন। নন্দী বেত্রহস্তে সকল জীবজন্তু, পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা প্রভৃতিকে শাসন করছেন। সমস্ত প্রকৃতি চিত্রার্পিতবৎ।

(জনৈক ভক্তের প্রতি) কিরূপ হয়েছিল নন্দীর শাসনে?

ভক্ত — নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃতদ্বিরেফং...

শ্রীম — নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃতদ্বিরেফং মুকাণ্ডজং শান্তমৃগপ্রচারম্।
তচ্ছাসনাৎ কাননমেব সর্বং চিত্রার্পিতারম্ভমিবাবতস্থে।।

(ভক্তের প্রতি) দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মাকে দেবগণ স্তব করছেন

মনে আছে? — 'সরসাং সুপ্তপদ্মানাম্ প্রাতর্দীধিতিমানিব' — সূর্যোদয়ে সুপ্ত পদ্ম যেমন সরোবরে প্রস্ফুটিত হয়, তেমনি দেবগণের ম্লান মুখমণ্ডল ব্রহ্মার আগমনে উল্লসিত হইল।

দেবতাগণ স্তব করছেন —

নমস্ত্রিমূর্তয়ে তুভ্যং প্রাক্‌সৃষ্টিকেবলাত্মনে।
গুণত্রয়বিভাগায় পশ্চাৎ ভেদমুপেযুষে॥
জগদ্‌যোনিরযোনিস্ত্বং জগদন্তো নিরন্তকঃ।
জগদাদিরনাদিস্ত্বং জগদীশো নিরীশ্বরঃ॥

এক সৎ বস্তু সৃষ্টির পর তিন ভাগ হলেন — ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব।

(ভক্তের প্রতি) এগুলি মুখস্থ করে ফেলবেন। আপনার তো আই.এ., বি.এ.-তে সবই সংস্কৃত ছিল। শকুন্তলার কণ্বমুনি ও মহর্ষি মারীচের তপোবনের বর্ণনা খুব সুন্দর। মুখস্থ রাখতে হয় এসব।

'নষ্টাশঙ্কা হরিণশিশবো মন্দমন্দং চরন্তি'। কণ্বমুনির আশ্রমে নির্ভয়ে হরিণশিশুগণ আনন্দে বিচরণ করছে। মহর্ষি মারীচের তপোবনে একজন সমাধিমগ্ন — তাঁর বক্ষ পর্যন্ত বল্মীকস্তূপ উঠিয়াছে — 'বল্মীকাগ্রনিমগ্নমূর্তিরুরসা' 'স্থাণুরিবাচলঃ' — অচল যেন স্থাণু*।

শ্রীম (সকলের প্রতি) — দেখুন, নন্দী পাহারা দিচ্ছেন, তাঁর এক হাতে হেমবেত্র, অপর হাতের তর্জনী ওষ্ঠাধরে স্থাপিত। আপনারা যখন ধ্যান করেন তখন কাহারো পাহারা দেওয়া উচিত। থালা-বাসন সব আস্তে আস্তে নাড়াচাড়া করতে হয়। কোনও শব্দ হবে না — পায়ের শব্দও না। দরকার হলে ঐ গাছতলায় গিয়ে কথা কয়ে আসা উচিত। সব নীরব নিস্তব্ধ থাকবে — যেন কোন মানুষ নাই।

ধ্যানের সময় লম্বা হয়ে বসতে হয় — সোজা হয়ে। 'সমশিরকায়গ্রীবঃ' — শির, মেরুদণ্ড আর গলা এক লাইনে থাকবে। ধ্যান যদি জমে যায় আর কেউ disturb (গোলমাল) করে, তখন বজ্রাঘাতের মত মনে হয়। মা-ঠাকরুন একবার চিৎকার করে কেঁদে

*স্থাণু - নিশ্চল, স্তম্ভ

উঠেছিলেন — ধ্যানে disturbed (বাধাপ্রাপ্ত) হওয়ায়। তারপর ঠাকুর গিয়ে তখন ঠাণ্ডা করেন, এমন অবস্থা হয়। ধ্যান কি কম জিনিস — infinite-এর (ঈশ্বরের) সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া। যেমন খাল সব গঙ্গার সঙ্গে মিলে যায়, এক হয়ে যায় জোয়ারের সময়।

কেউ কেউ প্রাণায়াম — control of breath করে থাকে! Artificial way-তে (অস্বাভাবিকভাবে), কৃত্রিম উপায়ে নাক টেপাটিপি করে তারা মনকে স্থির করতে চেষ্টা করে। কিন্তু ঠাকুর বলতেন, মাকে প্রার্থনা করলে, তাঁর উপর ভক্তি এলে, মন আপনিই স্থির হয়ে যায়। তখন কুম্ভক আপনা থেকেই হয় — টেপাটিপির দরকার হয় না। আরও বলতেন, — এসব জোর করে করতে গেলে consumption (ক্ষয়রোগ) হয়, নয়তো insanity (উন্মাদ) হয়। স্বভাবতঃ মন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে। ঈশ্বরে ভক্তি হলে চতুর্দিক থেকে আপনিই গুটিয়ে তাঁ'তে মগ্ন হয়ে যায়। উপযুক্ত গুরুর সহায়তা না পেলে ঐ পথে প্রায়ই কুফল ফলে থাকে। তাই ঠাকুর এই ভক্তির পথ — সোজা পথ, স্বাভাবিক পথ দেখিয়ে দিলেন।

এইবার ভাগবতপাঠ আরম্ভ হইল — চতুর্থ স্কন্ধ, অষ্টম অধ্যায় — ধ্রুবচরিত্র। মুকুন্দ পড়িতেছেন —

'ধ্রুবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তম পিতা উত্থানপাদের কোলে আরূঢ়, ধ্রুবও পিতৃঅঙ্কে আরোহণ করিতে চাহিলেন। বিমাতা সুরুচি বলিলেন, 'বৎস, তোমার এ চেষ্টা দুরাশা। যদি তুমি রাজাসন লাভ করিতে ইচ্ছা কর, ঈশ্বরারাধনা করে আমার গর্ভে জন্মলাভ কর।'

জননী সুনীতি দণ্ডাহত সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ পুত্র ধ্রুবকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া, দাবাগ্নিপীড়িতা বনলতার ন্যায় বাষ্পাকুল নেত্রে কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, 'পুত্র, তোমার বিমাতার বাক্য সত্য। তুমি যদি উত্তমের ন্যায় রাজাসন লাভ করিতে অভিলাষ কর, তাহা হইলে পরশ্রীকাতরতা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্ম আরাধনা কর। শ্রীহরি ব্যতীত অপর কেহ তোমার দুঃখ হরণ করিতে পারে এরূপ দেখিতেছি না।'

ধ্রুব তপস্যার্থে বনে গমন করিলেন। নারদের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ

হইল।

শ্রীম — দেখ, কিরূপ ক্ষত্রিয় প্রকৃতি! অবমাননা একটু সহ্য হলো না। বিমাতার কথায় দুঃখিত হয়ে সব ছেড়ে ঈশ্বরের আরাধনা করতে বনে চলে গেলেন। নারদ বললেন, ‘যোগীশ্বরগণ তীব্র সাধনা দ্বারাও তাঁহাকে পায় না — তুমি তো শিশু! এখন গৃহে যাও, বৃদ্ধ হইলে তখন যত্ন করিও।’ শুনলে না। অগত্যা নারদ পুনরায় বললেন, ‘সমভাব রক্ষা করিয়া তপস্যা কর। অপরকে দোষী না করিয়া, সুখ হইলে স্বীয় পুণ্য ক্ষয়, আর দুঃখ হইলে পাপ ক্ষয় হইতেছে মনে করিবে।’ ধ্রুব জোড়হাতে উত্তর করিলেন, ভগবন্, আমি ইহা পারিব না। আমার ক্ষত্রিয়স্বভাব — অসহনশীল ও অবিনীত। বিমাতার কথায় মনে দারুণ কষ্ট হইয়াছে। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমার পূর্বপুরুষগণও যাহা লাভ করে নাই, ত্রিভুবনের এমনি উৎকৃষ্ট পদ লাভ করিব। কৃপা করিয়া তাহার উপদেশ দিন।’ নারদ এখন সেই উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীম — ক্ষত্রিয় প্রকৃতি, ভোগবাসনা রয়েছে, তাই ধর্ম, অর্থ ও কাম — এই তিনটে প্রার্থনা করতে বললেন। আবার মোক্ষের কথাও শুনিয়ে রাখলেন। ঠাকুরও তাই বলতেন, ‘শুনে রাখা ভাল, সময় হলে বুঝবে এই এই।’

নারদ বলিলেন, ‘ভগবানের পরম মঙ্গলরূপ ধ্যান করিবে। আর তিনি অচিন্ত্য মায়াবলে অবতার হইয়া যে লীলা করেন তাহাও ধ্যান করিবে।’

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — এই আপনারা যেমন ঠাকুরের লীলা চিন্তা করেন। তিনি অবতার কিনা — নিজে বলেছিলেন এ কথা। কখনও রূপচিন্তা, কখনও লীলাচিন্তা কখনও তাঁর মহাবাক্যচিন্তা, কখনও অরূপের চিন্তা। সবই ধ্যান।

তাই ঠাকুর বলেছিলেন, ‘আমাকে ধ্যান করলেই হবে।’ তিনি অরূপের ধ্যান ভক্তদের শিখিয়েছিলেন। মতি শীলের ঝিলে নিয়ে গিছলেন, বড় বড় রুইমাছ জলে ভেসে বেড়াচ্ছে দেখাতে। সচ্চিদানন্দসাগরে মীন আনন্দে বিহার করে, কিংবা অনন্ত আকাশে

পক্ষী স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছে, অরূপের ধ্যানের এই সব ভাব কি করে আরোপ করতে হয় তাই দেখাতে নিয়ে গিছলেন। ঠাকুরকে ধ্যান করলেও অখণ্ড সচ্চিদানন্দ যিনি বাক্যমনের অতীত, তাঁকেই ধ্যান করা হয়।

ধ্রুব কঠোর ধ্যানে নিমগ্ন — যমুনাতীরে মধুবনে।

শ্রীম — তপস্যার কথাটা আবার পড় তো।

পাঠক (পড়িতেছেন) — ধ্রুব প্রথম মাসে ত্রিরাত্র অন্তর দেহধারণের উপযোগী কপিত্থ ও বদরীফল ভক্ষণ করিলেন। দ্বিতীয় মাসে ষষ্ঠ দিবসে শীর্ণ তৃণপত্রাদি, তৃতীয় মাসে নবম দিবসে শুধু বারি। চতুর্থমাসে দ্বাদশ দিবসে শুধু বায়ু ভক্ষণ করিতেন। পঞ্চম মাসে কুম্ভক করিয়া একপদে স্থাণুর ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। ...এইরূপে বিশ্বাত্মা হরির সহিত অভেদ জ্ঞানে ধ্যাননিরত হইলে লোকপালগণ ও সকল লোক শ্বাসরোধক্লেশ অনুভব করিয়া শ্রীহরির শরণাপন্ন হইলেন।

শ্রীম — উঃ কি কঠোর তপস্যা! আজকাল বুঝি অতটা হয় না। কলিতে অন্নগত প্রাণ, আয়ু কম, তাই ঠাকুর প্রার্থনা করতে বলেছিলেন কেঁদে কেঁদে নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে। বলেছিলেন, একদিন একরাত কেউ কাঁদলে তিনি দেখা দেন।

ঠাকুরেরও এই অবস্থা। গঙ্গার উপর নৌকোতে মাঝিকে একজন প্রহার করেছে, তার আঘাত নিজ পিঠে অনুভব করলেন। ঘাসের উপর দিয়ে লোক চলে যাচ্ছে, তিনি গায়ে যন্ত্রণা বোধ করছেন। বেলপাতা ছিঁড়তে পারলেন না। ফুলও তুলতে পারলেন না। সব জীবন্ত এক সত্ত্বা। বেলপাতা তুলতে গিয়ে গাছের আঁশ একটু উঠে এলো আর 'উঃ উঃ' করতে লাগলেন। বিশ্বের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছিলেন।

সন্ধ্যা সমাগতা। সকলে এইবারে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রদীপ ও ধূপ দেওয়া হইয়াছে। শ্রীম ও ভক্তগণ বসিয়াছেন। ইতিমধ্যে পুলিন মিত্র আসিয়া পড়িলেন। সকলে ধ্যান করিতেছেন। কেবল একজন মাত্র পাকশালায় আহার প্রস্তুত করিতেছেন। এখন

রাত্রি সাড়ে আটটা। ধ্যানান্তে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ হইতে লাগিল — দ্বিতীয় ভাগ, ত্রয়োবিংশ খণ্ড। দোলযাত্রা দিবসে দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্র আসিয়াছেন।

আজ রাত্রিতে একটু সুজির পায়েস ভোগ দেওয়া হইবে। মুকুন্দ সব আয়োজন করিয়াছেন। তাই অনেকক্ষণ ধরিয়া পাঠ চলিতেছে। জগবন্ধু পড়িতেছেন।

শ্রীম — (সহাস্যে) একদিকে বলছেন, গিরিশের কি বিশ্বাস! কিন্তু, নরেন্দ্রকে বারণ করছেন বেশী যেতে। রসুনের বাটি গন্ধ ছাড়তে চায় না। নরেন্দ্রকে দিয়ে একটি আলাদা থাকের সৃষ্টি করাবেন কি না! তাই অত সাবধান করছেন। এ থাকের শুধু যোগ, আর ঐ থাকের যোগ-ভোগ। নৈকষ্যকুলীন। যেমন মৌমাছি ফুল বই বসবে না। যেমন চাতক শুধু বৃষ্টির জল খাবে।

১৭ই চৈত্র, ১৩২৯ সাল।
৩১শে মার্চ, ১৯২৩ খ্রীঃ।
শনিবার, শুক্লা চতুর্দশী।

বিংশ অধ্যায়

উঠন্ত যৌবন ভগবদ্-আরাধনার শ্রেষ্ঠ সময়

১

বসন্তের ঊষা — সূর্য পূর্বাকাশ আলোকিত করিয়া উঠিতেছেন। শ্রীম একাকী আম্রকাননের দক্ষিণে ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহার ডাহিনে মহুলতলে বসিয়া অন্তেবাসী ধ্যান করিতেছিলেন। রজনীর শেষভাগে তিনি আসিয়াছেন। এক্ষণে তিনি আশ্রমে ফিরিয়া যাইতেছেন। সম্মুখে শ্রীমকে দর্শন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। উভয়ে গিয়া মহুলবৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। এই স্থানটি আশ্রম হইতে প্রায় অর্ধমাইল।

শ্রীম উপনিষদ্ পাঠ করিতেছেন। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিতেছেন, 'ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাম্ কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দৃষ্টব্যঃ, শ্রোতব্যো, মন্তব্যো, নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি, আত্মনি খলু অরে দৃষ্টে, শ্রুতে, মতে, বিজ্ঞাতে ঈদং সর্বং বিদিতং।' (বৃহদারণ্যক ৪/৫/৬)

শ্রীম — আত্মসত্ত্বাতে, ঈশ্বরের সত্ত্বাতে সব সত্ত্বাবান্। বিপ্রপত্নীদিগকেও এই কথা বলেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ। 'পতি, পুত্র, বিত্ত — এ সকল প্রিয়বস্তু, কেন? — না, আমি এদের ভিতর রয়েছি আত্মারূপে, তাই এরা সব প্রিয়! কিন্তু আমি সকলের প্রিয় — প্রিয়েরও প্রিয়। তোমরা আমাকে ভালবেসে খুব উত্তম কার্য করেছ।'

তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং — তাঁকে তুষ্ট করতে পারলে সব তুষ্ট হল। তাঁকে জানলে সব জানা হলো।

নিজের সুখের অন্বেষণ সকলে করছে। কিন্তু নিজেকে জানলেই যে পরম সুখ সে খবর জানে না। তাই নানা স্থানে ছুটোছুটি করে। পতি, স্ত্রী, পুত্র, বিত্ত — এই সকলই নিজের সুখ বিধান করে বলে প্রিয়। সেই নিজের, সেই আত্মার, সেই আপনার সন্ধান করতে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দিলেন।

ঠাকুর বলতেন, মোড় ফিরিয়ে দাও। যে মন দিয়ে পতিপুত্রকে ভালবাসছো সেইটে তাঁর দিকে, অর্থাৎ তোমার সত্যিকার আপনার দিকে, নিজের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া। জিনিস একটাই। শরীরকে না ভালবেসে স্বরূপকে ভালবাসা।

আত্মীয়কুটুম্ব বিত্ত থেকে মন উঠিয়ে তাঁ'তে দিলে সকল লেঠা চুকে যায়। নানানখানা আর ভাবতে হয় না। একটানা ভাব — যেমন গঙ্গাপ্রবাহ গোমুখী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত। নইলে অনেক লেঠা।

ঠাকুর বলতেন, জীবন যৌবন বিদ্যা সব তাঁকে দিয়ে দিতে হয়। তাহলে আর এত ভাবতে হয় না।

উঠন্ত যৌবন ভগবান আরাধনার প্রকৃষ্ট সময়। শরীরে বল থাকে, মনে তেজ থাকে।

'নচেৎ ইহ অবেদীৎ মহতি বিনষ্টিঃ।' বৈদিক গুরু শিষ্যকে বলেছিলেন, তাঁকে এই শরীরে জানতে না পারলে মহা বিপদ। অর্থাৎ জন্মমরণচক্রে পুনরায় পড়তে হবে।

অবতার যখন আসেন, বড্ড chance (সুযোগ)। এ সময় যারা জন্মেছে তারা বড়ই fortunate (সৌভাগ্যবান)। সব তৈরী, শুধু খাওয়া — প্রচুর আয়োজন। আবার পরিবেশন করে অপেক্ষা করছেন। শুধু একটু কষ্ট করে খাওয়া।

'Come unto me all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest... For my yoke is easy, and my burden is light' (St. Mathew 11 : 28 and 11 : 30). ক্রাইস্ট উচ্চৈঃস্বরে সকলকে আহ্বান করে বললেন,

“এস শ্রান্ত ভারক্লান্ত
দিব শান্তি তোমা সবায়।
সরল ব্যাকুল অন্তরে অবিরাম ডাক তাঁরে
লহ মম সহজ উপায়॥”

ঠাকুরও বলেছিলেন, ‘তোমরা কেবল আমার চিন্তা কর, আর সব আমি দেখবো।’ ভক্তদের বলেছিলেন, ‘আমার চিন্তা যে করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে — পিতার ঐশ্বর্য যেমন পুত্র লাভ করে।’

ঠাকুর সেই পরমাত্মা, যাঁকে জানলে সব জানা হয় — মৈত্রেয়ীকে যা জানতে উপদেশ দিলেন যাজ্ঞবল্ক্য। তাঁকে যদি কেউ ভালবাসে প্রাণ দিয়ে, তবে তো সব হয়ে গেল। অত শত করতে হয় না — সহজ হয়ে যায়। যেমন গোপীদের হয়েছিল, অক্রুরের হয়েছিল।

ঠাকুরের prescription (বিধান) খুব সহজ। বলতেন, ব্যাকুল হয়ে নির্জনে গোপনে কাঁদ, আর বল — দেখা দাও বাপ! দেখা যে দিতে হবে, তুমি যে আমার আপনার বাপ — পাতানো বাপ নয়!

অন্তেবাসী — ব্যাকুলতা স্থায়ী হয় কৈ?

শ্রীম — ঐ রকম হয়, আসে যায়। প্রার্থনা করতে হয়। তাঁর কৃপায় পরে স্থায়ী হয়। তখন একটানা ফল্গুর মত বইতে থাকে অন্তরে। বাইরে হয়তো প্রকাশ নাই। পাল তুলে দেওয়া, তাঁর কৃপাপবন বইছে।

সম্মুখে আম্রবৃক্ষ, মুকুলশোভিত। অলিকুল গুন্‌গুন্ রবে মধুপানে মত্ত। দুই একটি অলি উড়িয়া গিয়া আম্রমুকুলে বসিল।

শ্রীম — (অন্তেবাসীর প্রতি) এই দেখ, মৌমাছি ফুল বই বসবে না। এ একটি আলাদা থাক। যারা ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল, তারা অন্য কিছু চায় না — এই মধুকরের মত। বিষয়রস ভাল লাগে না। চায় কেবল মধু — ঈশ্বর।

‘নেতি নেতি’ — এই করে সব ছেড়ে যেতে হয়। যা ঈশ্বরের উদ্দীপক তা গ্রহণ, আর সব বর্জন। সব ত্যাগ — no compromise, যেমন নচিকেতা — ‘অন্য কিছু চাই না, শুধু আত্মতত্ত্ব, ঈশ্বর।’

অন্তেবাসী — মন থেকে সব ত্যাগ হয় কৈ? বাইরে ছাড়লেও মন থেকে যেতে চায় না বাসনা!

শ্রীম — তাঁকে বলতে হয়। তাঁর কৃপায় সব যায়। যাঁর ইঙ্গিতে জগৎ চলছে তিনি এটা পারেন না? বাজিকর হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে সব গ্রন্থি খুলে ফেলতে পারে। টেরও পাওয়া যায় না।

তাঁকে ডাকতে হয়।

একটি ছোট ছেলে খেলতে খেলতে গিয়ে কাঁটাবনে পড়েছে। জামাকাপড় সব আটকে গেছে, বের হতে পারছে না। কাঁদছে ওখানে দাঁড়িয়ে। খেলুড়েরা গিয়ে মাকে বললে। মা এসে, জামাকাপড় খুলে ফেললো, আর ছেলেটিকে উঠিয়ে কোলে তুলে নিয়ে গেল। তখন কেমন আনন্দ! মায়ের কোলে!

তাঁকে প্রার্থনা করতে হয়, তিনি এটা চান। অবতার আসেনই এই জন্য। ভক্তগণ যখন খুব জড়িয়ে পড়ে — তাদের অবস্থা যখন complicated (জটিল) হয় তখনই ভগবান আসেন তাদের তুলতে।

মিহিজাম আশ্রমের সংলগ্ন পশ্চিমের জমিতে একটি পরিত্যক্ত অর্ধসমাপ্ত গৃহভিত্তি রহিয়াছে। শ্রীম তদুপরি বসিয়া আছেন। নিকটে একটি ব্রহ্মচারী। এখন সকাল প্রায় সাড়ে সাতটা। কথোপকথন হইতেছে।

ব্রহ্মচারী — সেদিন (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ) কথামৃতপাঠের সময় ঠাকুরের নৃত্যের কথা পড়া হচ্ছিল। আপনি লিখেছেন, ঠাকুরের নৃত্য দেখলে চক্ষু ফিরানো যায় না — এমনি চিত্তাকর্ষক! নীলকণ্ঠ এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে, ঠাকুর তখন নৃত্য করতে লাগলেন।

শ্রীম — (ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া) ব্রহ্মভাবটি অঙ্গভঙ্গীতে প্রকাশ। ব্রহ্মবাক্য মনের অতীত। তবুও রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ — এই সব বিষয় আর ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়ে প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে, আভাস দেওয়া হয়েছে। জড় শরীরটার ভিতর দিয়ে ঐ ব্রহ্মভাব প্রকাশই নৃত্য। তাই এত মনোমুগ্ধকর।

চৈতন্যদেব যখন নৃত্য করতেন চিত্রার্পিতবৎ লোক সব দাঁড়িয়ে পড়তো। নিত্যানন্দের নৃত্যও ঐরূপ।

রাসে শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করেছিলেন, গোপীগণের সঙ্গে। রাসের নৃত্য ঈশ্বরীয় ভাব প্রকাশের চরম অবস্থা।

শিবের নটরাজ নৃত্য অপরূপ। ভারতীয় নৃত্যকলার আদর্শ।

ঠাকুর বলতেন, চৈতন্যদেব অন্তর্দশায় জড়বৎ থাকতেন। অর্ধবাহ্যদশায় নৃত্য করতেন। বাহ্যদশায় ঈশ্বরীয় কথা কইতেন।

শিবেরও ঐরূপ। অর্ধবাহ্যদশায় দেখতেন, ব্রহ্মই জীবজগৎরূপ হয়ে রয়েছেন। তখন বিস্ময় ও আনন্দে নৃত্য করতেন।

ঠাকুরের নৃত্যও এইরূপ। অন্তর্দশায় স্থির নিশ্চল। অর্ধবাহ্যদশায় নৃত্য করতেন — ব্রহ্মানন্দ জড়বস্তুতে বিকাশ।

জড় চেতনের সত্ত্বা লয়। ঠাকুরের শরীর শুদ্ধসত্ত্ব ছিল। অজ্ঞাত অবস্থায়ও অপবিত্র স্পর্শ উহা সহ্য করতে পারতো না। এমনি ভালবাসা ঈশ্বরের জন্য! এমনি পবিত্র যে হাড়, মাংস, নাড়ি, চর্মের ভিতর দিয়েও উহা manifested (প্রকটিত) হচ্ছে।

টাকার দিকে হাত গেল না, আড়ষ্ট হয়ে রইল। বিছানায় বসতে পারলেন না, তাঁর অজ্ঞাতে পয়সা রাখা হয়েছিল তাই। যেমন ঐখানে দাঁড়িয়ে রইলেন। অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন করে, সেই অর্থে মিষ্টি কিনে এনেছিল একজন, ঠাকুর তা ছুঁতে পারলেন না। না বলে একজন লেবু এনেছিল বাগান থেকে, সেই লেবুর রস মুখে গেল না।

জড় যেন চেতন হয়ে গিছলো। সমাধিতে সব অবস্থায় অন্তরঙ্গরা সকলে ছুঁতে পারতেন না। ছুঁলে সমাধি ভেঙ্গে যেতো। ঝি পা ছুঁয়েছিল, যেন শিঙ্গিমাছের কাঁটা বিঁধলো এমনি জ্বালা হয়েছিল। কাশীপুর বাগানে এক পাগলী এসেছিল, ঠাকুর বলেছিলেন, ও যদি তখন আমায় ছুঁতো তবে শরীর ত্যাগ হতো। ক্রাইস্টকে একটি মেয়ে ছুঁয়েছিল, তাতে এমনি যাতনা হয়েছিল।

শ্রীম — নৃত্য মানে, অঙ্গভঙ্গীর ভিতর দিয়ে চেতনের প্রকাশ। ঐ ভাব শব্দ দিয়েও প্রকাশ হয়। যেমন গানে, রাগরাগিণীতে হয়। রামপ্রসাদের গান তাই এত ভাল লাগে।

অন্তেবাসী — (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ) কথামৃতে লিখেছেন, আপনিও ঠাকুরের গান শুনে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, ‘আজ আর গান হবে?’

ঠাকুর বললেন, ‘বলরামের বাড়ি যেও, সেখানে হবে।’

শ্রীম — হাঁ ঠাকুরের গানও মনোমুগ্ধকর। যে শুনতো অন্য দিকে মন ফিরাতে পারতো না। যদু মল্লিক অত বিষয়ী, কিন্তু তাঁর গান শুনে স্থির হয়ে যেতো, আর প্রেমাশ্রু বিসর্জন করতো। তোতাপুরী অত বড় জ্ঞানী — ঠাকুরের গান শুনে কাঁদতেন, ভাষা বুঝতেন না, তবুও।

শিব ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনীতে ঐ ব্রহ্মভাব প্রকাশ করেছিলেন।

কথায়ও প্রকাশ হয় — যেমন (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ) কথামৃত। ঠাকুরের কথা পড়লে বা শুনলে অন্য সব ভুল হয়ে যায়। মহেন্দ্র সরকার অত বড় ডাক্তার, ঠাকুরের কথা শুনতে শুনতে তাঁর সব ভুল হয়ে যেতো। চার, পাঁচ ঘন্টা বসে ক্রমাগত কথাই শুনছেন। বলতেন, ওখানে গেলে আমি অন্য সব ভুলে যাই!

ভাস্কর মূর্তিতে প্রকাশ করে ঐ ভাব। বৌদ্ধযুগের কোন কোন মূর্তি তাই এত ভাল লাগে।

একজন সিদ্ধ পুরুষ যদি ভাস্কর হন তাঁর মূর্তিই ভিন্নরূপ হবে — যেন জীবন্ত! চিত্রকর তুলি দিয়ে প্রকাশ করে, তাই রাফেলের চিত্র অত lifelike (সজীব)।

কবি ভাষায় প্রকাশ করে — তাই ভাগবতাদি এত মধুর।

ভারতীয় সকল আর্টই তাঁকে প্রকাশ করার চেষ্টা করে। এ দেশের নৃত্যগীত, চিত্র ও কাব্য, গদ্য পদ্য, ভাস্কর্য সবই তাঁকে নিয়ে। ঈশ্বরীয় ভাব এগুলিতে যিনি যত অধিক ফুটিয়ে তুলতে পারবেন, তিনি তত successful (কৃতকার্য) হবেন। তাই এদেশের শিল্পকলাকে idealistic (তত্ত্বপ্রকাশক) বলা হয়। মানে, ইহা ঈশ্বরীয় ভাববিকাশে বিশেষ প্রযত্নশীল। পাশ্চাত্ত্যের শিল্পকলা সব realistic (পার্থিব ভাবপ্রকাশক) অর্থাৎ, মনুষ্যভাব এতে বেশী প্রকাশ।

শ্রীম — ঠাকুরের চলন বলন, গান ও নৃত্য সবই তাই মনোমুগ্ধকর। ভক্তেরা কেউ কেউ বলেছেন — মথুরাধিপতেঃ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের, অবতারের, অখিলং মধুরং। তাঁর সবই সুন্দর — অবতারপুরুষের।

২

ঠাকুরঘর। পূজা সমাপ্ত হইয়াছে। শ্রীম ধ্যান করিতেছেন। বিনয়, জগবন্ধু, মুকুন্দ, শচী, গদাধর ও ছোট অমূল্য প্রভৃতি ভক্তগণও ধ্যান করিতেছিলেন। এখন সকাল নয়টা। কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিনবাবু আসিয়া পড়িলেন। এইবার ঈশ্বরীয় কথা হইতেছে। পুলিন বিপদে পড়িয়াছেন।

পুলিন — মাস্টারমশায়, আপনি বলেছিলেন গুরুই সর্বদা ধরে রাখেন — তাই কি?

শ্রীম — (উত্তেজিতভাবে) ধরে রাখেন না তো কি? সর্বক্ষণ ধরে রাখেন। সর্বদা পিছু পিছু থাকেন। একি কাব্য — মহাসত্য। তবে দেখতে পাওয়া যায় না কেন? তার উত্তর — দূরে থাকলে দেখা যায় না। যেমন পুতুলনাচ, যারা কাছে থাকে তারা দেখতে পায় অন্য লোক নাচাচ্ছে। দূরের লোক মনে করে পুতুল আপনি নাচছে। এই রূপ গুরু সর্বদা পিছু পিছু ধরে আছেন।

উনুনের উপর আলু পটল কেমন নাচছে মা! — ছেলে বললে। যে-ই কাঠটি টেনে নিলেন মা, অমনি সব বন্ধ।

‘ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া’ (গীতা ১৮-৬১) — তিনি যন্ত্রী হয়ে জীবকুলকে যন্ত্রবৎ চালিত করছেন। তাইতো শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন,

‘তমেব শরণম্ গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত’ (গীতা ১৮-৬২)। তাই ভগবানের শরণ লও — তাঁর শরণাগত হলে শান্তি।

পুলিনবাবুর বয়স প্রায় পঞ্চাশ হইবে। তিনি একটি লাল রঙ্গের সৌখিন পাঞ্জাবী পরিয়া আসিয়াছেন। শ্রীম-র দৃষ্টি ইহার উপর পতিত হইয়াছে।

শ্রীম (সহাস্যে রহস্যচ্ছলে) — ঈশান মুখুয্যে এসেছেন, হাতে একটি সোনার আংটি। তাঁর বয়স পঞ্চাশ। ঠাকুরের দৃষ্টি এড়াবার যো নেই। দেখে হেসে বললেন — দেখ, বুড়ো বেশ্যা, সব গেছে তবুও কানে মাকড়িটি চাই (সকলের উচ্চহাস্য)।

বিলাসিতা ভাল নয়। যারা ঈশ্বরকে চায়, তাহাদের ওসব কেন?

ওসব করবার সময় কোথায়? আবার খাটুনি বেড়ে যায়।

শ্রীম এইবার ঠাকুরঘরে বসিয়াই উপনিষদ্ পাঠ করিতেছেন — তৈত্তিরীয়ের ব্রহ্মানন্দ বল্লী (অষ্টম অনুবাক)। ভক্তরা কেউ কেউ আছেন, কেহ গৃহকর্মে ব্যাপৃত।

শ্রীম পড়িতেছেন —

ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্যঃ।
ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি।

তাঁর ভয়ে পবন, সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র, যম, সকলে আপন কর্ম করছেন। সব তাঁর ইচ্ছায় চলছে।

আবার পড়িতেছেন — সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি। যুবা স্যাৎ সাধুযুবাধ্যায়কঃ। আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যেয়ং পৃথিবী সর্বা বিত্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষ আনন্দঃ।

তে যে শতং মানুষা আনন্দাঃ। স একো মনুষ্যগন্ধর্বাণামানন্দাঃ। ....শ্রোত্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং প্রজাপতেরানন্দাঃ। স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ।

শ্রীম — ব্রহ্মানন্দের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাবার জন্য এই আনন্দক্রমের কথা বলা হচ্ছে। one unit of bliss — আনন্দের একটি মাত্রা ধরা হয়েছে একজন সম্রাটের যে আনন্দ, যে সুখ — সেইটি। সম্রাট আবার যুবক হওয়া চাই, — আর সচ্চরিত্র, বিদ্বান্, শাসনক্ষম, সুদৃঢ় শরীর মন ও বলিষ্ঠ হবেন।

এরূপ একজন সম্রাটের যে আনন্দ তার শতগুণ বেশী একজন মনুষ্যগন্ধর্বের আনন্দ। এইরূপে দেবগন্ধর্ব, পিতৃ, আজানজ দেবতা, কর্মদেবতা, দেবতা, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, প্রজাপতি অর্থাৎ সমষ্টিশরীর হিরণ্যগর্ভ এই সকলের আনন্দ পর পর একশত গুণ বেশী।

শুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম, তত্ত্বজ্ঞ যে ব্যক্তি — যাঁর ঈশ্বরদর্শন হয়েছে, তিনি যে আনন্দ উপভোগ করেন তা এ সকলের চাইতেও অধিক।

মানুষ থেকে হিরণ্যগর্ভ পর্যন্ত সবই নশ্বর। অতএব, এদের আনন্দ বিষয়ানন্দ বলে নশ্বর। ব্রহ্মানন্দ অবিনশ্বর। বেদ বলছেন, হে জীব, বিষয়ানন্দ ছেড়ে ব্রহ্মানন্দ গ্রহণ কর।

ঠাকুর বলতেন, সেই আনন্দের এক বিন্দু পেলে রম্ভা, তিলোত্তমা চিতাভস্ম বলে বোধ হয়। তাঁর এক ছিটে আনন্দে জগৎ ভরপুর।

তাঁর মহামায়ায় সব ভুলিয়ে রেখে দেয়। সত্যিকার আনন্দের সন্ধান মানুষ পায় না। খনি সঙ্গেই রয়েছে, কিন্তু সন্ধান নাই তাই ঘোরে। সকলে পরমানন্দ অন্বেষণ করছে, কিন্তু জানে না কোথায় সে আনন্দ।

ভগবানের পাদপদ্ম ছাড়া এই আনন্দ, এই পরম সুখ, কোথাও নাই। বিষয়ানন্দ — তারপরই নিরানন্দ, দুঃখ। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ লাভ করলে আর দুঃখ থাকে না।

'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে'॥ (গীতা ৬-২২)

ঠাকুরের দেখেছি এ অবস্থা। মা ছাড়া আর কিছু চান নাই। শারীরিক এত কষ্ট, কিন্তু মুখটি যেন বিকশিত কমল! ঈশ্বরের নাম হতেই সমাধি। ভগবৎকৃপায় এ আনন্দ লাভ হয়।

আবার পড়িয়া তাঁহার পাঠ শেষ করিলেন — স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ। ইত্যাদি।

শ্রীম — যিনি সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশ করছেন, তিনি আবার সকল জীবের হৃদয়ে অন্তর্যামীরূপে নিবাস করছেন। অন্তরে বাহিরে তিনি বেদ বলছেন, হে জীব, তাঁর শরণ লও — 'শমন* ডরে যাঁর শাসনে'। তাহলে অকুতোভয় হতে পারবে, নয়তো সব ভয়াবহ।

একজন সসাগরা ধরিত্রীর সম্রাট, কত প্রচুর তাঁর ভোগের উপকরণ! কিন্তু এ সবই বিষয়ভোগ। নচিকেতা এসব কিছুই নিলে না। এই যে সম্রাট, তাঁর চাইতে কোটি গুণ বিষয়ানন্দ উপভোগ করেন ব্রহ্মা, যিনি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর। এঁর তুলনায় সম্রাটের ভোগ কিছুই না। আবার সম্রাটের তুলনায় সাধারণ মানুষের ভোগানন্দ অতি অকিঞ্চিৎকর — অত্যন্ত তুচ্ছ।

এই সাধারণ মানুষ যদি ভগবৎকৃপায় তাঁর দর্শন লাভ করতে

* শমন - যম

পারে — তাহলে তাঁর আনন্দের কাছে ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর ব্রহ্মার আনন্দও এক বিন্দু বলে বোধ হবে। কিছুই নয় — অতি অত্যন্ত তুচ্ছ।

ঈশ্বরের আনন্দ অনন্ত অপার। আর বিষয়ানন্দ সান্ত * — দু'দিনের। ব্রহ্মার আনন্দও বিষয়ানন্দ।

যাঁর ভগবানদর্শন হয়েছে তিনি জীবন্মুক্ত। পাঁকে থেকেও পাঁক লাগে না গায়ে। ঠাকুর যেমন বলতেন, পাঁকাল মাছ — পাঁকে থাকে কিন্তু, গা অতি মসৃণ, চক্‌চকে। পাঁক নাই গায়ে। যেমন পদ্মপত্র জলে থাকে, কিন্তু গায়ে জল নাই। 'কালীভক্ত সদামুক্ত নিত্যানন্দ রায়' — যেমন রামপ্রসাদ, যেমন রৈক্ক। In the world, but not of the world — সংসারে থাকে কিন্তু সংসারী নন।

'জন্মাদ্যস্য যতঃ', আর যিনি সকলের অন্তর্যামী তিনিই এই (আসনোপরি ঠাকুরের ছবির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া) মানুষ হয়ে এসেছেন, অবতার হয়ে।

আহারের পর কুটীরের বারান্দায় তক্তপোষে শ্রীম বসিয়া আছেন, নিকটে দুই একটি ভক্ত। তিন কি যেন ভাবিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মৌন ভঙ্গ করিয়া কথা কহিতেছেন।

শ্রীম — মান অপমান বোধ নাই। দারোয়ান বললে চলে যেতে, অমনি চললেন, গামছাখানা কাঁধে। ত্রৈলোক্যবাবু দেখে বললেন, 'আপনি কোথায় যাচ্ছেন, ফিরে আসুন' — অমনি হেসে ফিরে এলেন।

(ভক্তদের প্রতি) — হৃদয় মুখুয্যেকে কালীবাড়ি থেকে বের হয়ে যেতে বললেন কর্তারা। দারোয়ান এসে ভুল করে ঠাকুরকে চলে যেতে বললে। অমনি তিনি চললেন, মুখে কথাটিও নাই — রাগদ্বেষ কিছুই নাই কিনা!

নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গেছেন। ছেলেরা করছে — কর্তা গত হয়েছেন। এরা তেমন আদর করে নাই, আহারের সময়

---

* সান্ত - সসীম

ঠাকুরকে ডাকে নাই। তাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি নিজেই গিয়ে বসলেন, আর কয়েকখানা লুচি চেয়ে নিয়ে খেয়ে এলেন।

বিদ্যেসাগরমশায়ের দয়ার কথা শুনেছেন। তা নিমন্ত্রণের অপেক্ষা রাখলেন না। নিজে গিয়ে হাজির তাঁকে দেখতে।

গুণাতীত পুরুষ! কোন গুণের বশ নন — যেমন বালক। (ভক্তের প্রতি) গীতাখানা আন তো।

শ্রীম গীতা পাঠ করিতেছেন — গুণাতীতের লক্ষণ।

'সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥

(গীতা ১৪-২৪/২৫)

শ্রীম — গুণাতীত পুরুষ সর্বদা আত্মস্থ, তাই সমদর্শী। সুখদুঃখে সমান, অর্থাৎ বিষয়সুখকেও দুঃখ বলে মনে করেন। এই দু'টোই নেন না — বোধ নাই — সর্বদা ব্রহ্মানন্দে মগ্ন। মন দিয়ে সুখদুঃখ বোধ — মন যে পড়ে আছে অন্যত্র — সচ্চিদানন্দে। তাই লোকে যাকে মণিমাণিক্য বলে থাকে, ত্রিগুণাতীত পুরুষের নিকট তা মাটির ঢেলা বই কিছুই নয়। আবার প্রিয় অপ্রিয়, নিন্দা স্তুতি, মান অপমান — এ সব দ্বন্দ্ব নাই তাঁ'তে। শত্রুমিত্র ভেদও নাই। ভেদ থাকে কখন? — যতক্ষণ দ্বন্দ্ব আছে। যাঁর নিকট দ্বন্দ্ব নাই, 'দুই বোধ নাই — অর্থাৎ এক ঈশ্বরই অন্তরে বাহিরে — এ জ্ঞান যাঁর হয়েছে তাঁতে কি করে ভেদ থাকে? সবই দেখছেন ঈশ্বর!

ঠাকুর বলতেন, মোমের গাছপালা, মোমের বাগান, এ সবই মোমের দেখছি। মানে সমাধি থেকে অনেক দূর নেমে এলে তখন জগতের জ্ঞান হয় — নামরূপ বোধ হয়। এ কেমন — যেমন স্বপ্নাবিষ্ট, নিদ্রাবিষ্ট লোকের চক্ষুতে ঘরবাড়ি, জিনিসপত্র, মানুষ — এসব বোধ হয়।

নিদ্রায় মনকে টেনে রেখেছে তাই এসবে অভিনিবেশ নাই। তেমনি ঠাকুরের অবস্থা। সচ্চিদানন্দসাগরে বিলীন হয়ে গিছলো মন।

এখন নিচে নেমে আসছে। নিচের দিকে চেয়ে দেখছেন, তিনিই অর্থাৎ সচ্চিদানন্দই এই নামরূপ ধারণ করে আছেন, জগৎ হয়ে রয়েছেন। তাই বলতেন মোমের সব — অর্থাৎ সচ্চিদানন্দের নির্মিত। শিব এই অবস্থা দেখে বিস্ময়ানন্দে নৃত্য করতেন। ঈশ্বর আর জগৎ এ দু'টির সংযোগস্থলে থেকে ঠাকুর এসব কথা কইতেন।

অসুখের সময় এত কষ্ট, কিন্তু ঈশ্বরের কথা হতেই সমাধি। 'মাটি টাকা, টাকা মাটি' — এই বলে দুই-ই গঙ্গায় ফেলে দিলেন। হাজরা নিন্দে করে, সেদিকে লক্ষ্য নাই, কিসে তার ভাল হবে উল্টে তাই দেখছেন। সেবার কষ্ট হচ্ছে মথুরবাবুর শরীর ত্যাগের পর — তাতে কোন complain (অনুযোগ) নাই। ঠাকুরের জীবনে দেখা গিয়েছে এসব লক্ষণ। জড়ভরতের কথা পড়া হলো সেদিন — তাঁরও এই অবস্থা।

(ভক্তদের প্রতি) — এসব মুখস্থ করে রাখা উচিত। পাণ্ডিত্য দেখাবার জন্য নয়। প্রার্থনা করতে হয় তাঁর কাছে — ইহা বুঝিয়ে দাও বলে। এসব মন্ত্র। নির্জন মাঠে বসে বলতে হয়, 'প্রভো, এসব বোধ করিয়ে দাও।'

৩

ভক্তগণ কেহ কেহ নির্জন প্রান্তর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। এখন বেলা চারটা। জম্বুতল-বেদিকাতে ভক্তগণ বসিয়া আছেন, শ্রীম চেয়ারে উত্তরাস্য। ভাগবতের ধ্রুবচরিত্র পাঠ চলিতেছে। মুকুন্দ পড়িতেছেন।

শ্রীম — ধ্রুব যাঁকে অন্তরে ধ্যানযোগে দর্শন করেছিলেন, চোখ চেয়ে বাইরে তাঁকেই দর্শন করলেন। চোখ ফিরাতে পারছেন না, তাক্ লেগে গেছে। ভক্তদেরও কারো কারো এরূপ হতো। চক্ষু বুজে ধ্যান করছেন, চক্ষু মেলে দেখছেন ঠাকুর সম্মুখে দণ্ডায়মান। এসব তাঁর লীলা।

ধ্রুব বালক, স্তব করতে ইচ্ছা হয়েছে কিন্তু ভাষা নাই। ভগবান অন্তর্যামী, বুঝতে পেরে যেই বেদশঙ্খদ্বারা কপোলদেশ স্পর্শ করলেন, তখনই সব তত্ত্ব জাগ্রত হয়ে উঠলো, তত্ত্বজ্ঞান লাভ হলো। 'মূকং

করোতি বাচালং’ তখন স্তব করতে লাগলেন — হে ভগবন্, এই বিশ্ব তোমারই রচনা। তুমি সর্বজীবের অন্তরে বিরাজমান। তাই মন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদি সব কাজ করছে।

ঠাকুরও এসব কথা বলেছেন — মিলে যাচ্ছে সব। তিনি বলতেন, মা-ই সব হয়ে রয়েছেন, আবার তাঁর শক্তিতেই সব চলছে। যেমন দুধ টগবগ্ করছে কেন? না আগুন আছে নিচে। আগুন সরালেই সব বন্ধ হয়ে যায়। তেমনি ঈশ্বরের শক্তিতে সব চলছে।

পাঠ চলিতে লাগিল। সাধনার কথা হইতেছে।

শ্রীম — সাধনা দু’রকম আছে — সকাম আর নিষ্কাম। ধ্রুব সকাম সাধনা করেছিলেন, রাজ্য পাবেন বলে। ভাইকে শত্রু মনে করেছিলেন। ভগবান কল্পতরু, যে যা চায় তাই দেন। ধ্রুবের নিকট এসে দর্শন দিয়ে বললেন, ‘যাও, ছত্রিশ হাজার বৎসর গিয়ে রাজত্ব কর। তারপর ধ্রুবলোকে বাস করবে।’

ধ্রুবের অনুশোচনা হয়েছিল বাড়ি এসে। বললেন, সনকাদি মুনিগণের আর ব্রহ্মাদি দেব গণের আরাধ্য যে ভগবৎ-পাদপদ্ম, তা না চেয়ে কি দৈবী মায়ার বশবর্তী হয়ে আমি রাজ্য চাইলাম!

কিন্তু সৎসঙ্গও চাইলেন সঙ্গে সঙ্গে। ধ্রুব বললেন, ‘ভগবন্ তোমার একান্তশরণ শুদ্ধ ভক্তগণের যেন সঙ্গলাভ করতে পারি।’ কারণ, তাঁদের সঙ্গলাভে দেহবুদ্ধি ও বিষয়, আর আত্মীয়কুটুম্বে আসক্তির লোপ হয়। অর্থাৎ ঈশ্বর দর্শন হয়, তাহলেই জীবন্মুক্ত।

তারপর ধ্রুবের সুবর্ণপুরী হল। ঝাঁটা পর্যন্ত সোনার (সকলের হাস্য)। কিন্তু তা’তেও দুঃখ গেল না, কেননা, তিনি ভগবৎ-পাদপদ্ম চান নাই।

এইবার পাঠ শেষ হইল।

মোহন — আচ্ছা, নারদ তো মোক্ষের উপদেশ দিয়েছিলেন, তবে কেন ধ্রুব উহা প্রার্থনা করলেন না?

শ্রীম — দৈবী মায়া, প্রবল বাসনা ছিল কিনা — বংশে কেউ যা করতে পারেন নাই, অমন রাজ্য ও যশ অর্জন করবো বলে। তাই তো বিদুরের সংশয় হয়েছিল — তাই প্রশ্ন করলেন, ‘ধ্রুব পুরুষার্থবিৎ

কেননা তিনি শ্রীহরির সুদুর্লভ পাদপদ্ম লাভ করেছিলেন। তবুও কেন তিনি নিজেকে অপূর্ণ মনোরথ মনে করতেন।' মৈত্রেয় ঋষি উত্তর করলেন, 'বিমাতার বাক্যবাণে হৃদয় বিদ্ধ থাকায় মুক্তি প্রার্থনা করতে তিনি ভুলে গিছলেন।'

রাজ্য ভোগ করার বাসনা প্রবল থাকায় মুক্তি চান নাই, তজ্জন্যই মনোকষ্ট। বাসনা ত্যাগ হওয়া চাই, তবে শান্তি। নচেৎ ঈশ্বরদর্শন করেও অশান্তি — যেমন ধ্রুব, যেমন রাজা সুরথ।

শ্রীম — এই যে পূজোপার্বণ করে লোক, অধিকাংশই এই রকম সকাম। এই পৃথিবীর নাম, যশ, অর্থ, ইন্দ্রিয়সুখ — এসবের জন্য। কিন্তু দেহান্তে যে সব পড়ে থাকবে।

অবতার এসে দেখিয়ে দেন অন্য একটি জিনিস। তিনি বলেন, এর উপরেও আছে একটি — সেটি নিষ্কাম সাধনা। হে ঈশ্বর, শুধু তোমাকে চাই আর কিছু না। মৃত্যু যে সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে। সব পড়ে থাকবে। তখন কে ভোগ করবে? তাই কেবল তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি চাই। সাধক এই কথা বলেন।

ঠাকুর বলতেন, আমি ধ্যানে কত কিছু দেখতে পেতাম — যাকে লোকে সম্পদ, ঐশ্বর্য বলে। মনকে তখন জিজ্ঞেস করতুম, মন তুই এসব চাস্?

মন বলতো, না।

কি হবে এসবে? রাজপ্রাসাদ কুঁড়ে, সবই পড়ে থাকবে।

লোক ভুলে যায় ঐটি। অবতার এসে নূতন করে দেখিয়ে দেন। অবতারকে যারা চিন্তা করবে, ঠাকুরকে যারা ধ্যান করবে, তারাও ঐরূপ হবে। কেবল ঈশ্বরকে চাইবে, অন্য কিছু নয়। তাই যীশু বলতেন, 'In me ye might have peace' (St. John 16:33) — আমার কথা শুনলে শান্তি পাবে।

শ্রীম — অবতারের test-stone-এর (কষ্টিপাথরের) সঙ্গে এই সব শাস্ত্রের কথা মিলিয়ে পড়লে তবে অর্থ বোঝা যায়। ঠাকুর যা যা বলে গেছেন তার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হয়।

একটু ভোগবাসনা থাকলে সকাম হয়ে পড়ে। — সেনকে বলেছিলেন, এর একটু জপ ধ্যান আছে, তাতেই লোকমান্য হলো। মথুরবাবুর সম্বন্ধে বলতেন, 'শরীর ত্যাগের পর (পরজন্মে) ও একটা রাজাটাজা হবে'।

ধ্রুবও সকাম সাধনা করে রাজ্য পেলেন।

রাজা সুরথও তাই।

ভগবান প্রসন্ন হলে, তাঁর কৃপা হলে, সব ঠিক হয়ে যায়। শত্রুও তখন মিত্র হয়। বিমাতা সুরুচি এদিকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করলেন। তপস্যার পর গৃহে ফিরে গেলে তখন আবার তিনিই ধ্রুবকে মায়ের মত সর্বাগ্রে কোলে তুলে নিলেন।

শ্রীম — অবতারের touch-এ (সংস্পর্শে) যারা আসে, যারা তাঁকে চিন্তা করে, তারাই নিষ্কাম সাধনা কি তা ঠিক ঠিক বুঝতে পারে।

গীতায় ভগবান বলেছেন — আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী — এরা সকলেই উদার, অর্থাৎ মহৎ। —

সেন প্রভৃতিও মহৎ! তারপরই আবার বলছেন, 'কিন্তু জ্ঞানী আমার বড় প্রিয়। জ্ঞানী মানে, যিনি ভগবানকে দর্শন করেছেন, যিনি শুধু তাঁকেই চান, অন্য কিছু নয়। কেন প্রিয়? তাই শেষে বললেন — 'জ্ঞানী আমার স্বরূপ'।

পিটারকে জিজ্ঞেস করলেন ক্রাইস্ট — Wilt ye also go away?' (St. John 6 : 67). 'আমাকে ছেড়ে চলে যাবে তুমি?'

পিটার বললেন, Lord to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life (St. John 6 : 68) — আপনি অমৃতত্ত্বের খনি, আপনাকে ছেড়ে যাব কোথায়?

নিষ্কাম সাধনায় এটি হয় — বুঝতে পারে। সকাম হলে এ ভাবটি ধরতে পারে না। ঈশ্বর অমৃতত্ত্বস্বরূপ।

৪

সূর্য অস্তাচল গমনোন্মুখ।

পূর্বাকাশ কৃষ্ণমেঘে আবৃত। দুই এক বিন্দু বারিপাত হইতেছে। এই সময় শ্রীম ছত্রহস্তে আশ্রম অঙ্গনে উত্তর-দক্ষিণ লম্বমান পথে দ্রুত পাদচারণ করিতেছেন। কৃষ্ণমেঘ ক্রমশঃ পশ্চিমাকাশে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল। সূর্যকে আবৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শ্রীম উচ্চকণ্ঠে ভক্তদের আহ্বান করিলেন।

তাঁহারা আসিয়া এই সুদৃশ্য দর্শন করিতেছেন — হীনপ্রভ অস্তগামী দিনমণি ঘন মেঘে আবৃত।

এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অপর একটি অপূর্ব নৈসর্গিক শোভা দৃষ্টিগোচর হইল। পশ্চিমদিকবর্তী কালিয়াপাহাড় মেঘে আচ্ছাদিত হইয়া গাঢ় কৃষ্ণরূপ ধারণ করিয়াছে। মেঘান্তরাল ভেদ করিয়া মলিন দিনকরের ঈষৎ রক্তিমাভা নিবিড় কৃষ্ণ কালিয়ার অঙ্গে ঢলিয়া পড়িয়াছে — যেন অনিচ্ছায় ম্লানহাস্যে অচলরাজের নিকট বিদায় লইতেছে। আর যেন বলিতেছে, জ্যোতিষ্কশিরোমণি সূর্যেরও এই অবস্থা — অতএব হে জীব, যিনি জ্যোতির জ্যোতি তাঁহার শরণ লও। তাহা হইলে সংসারে আনন্দে থাকিবে এবং আনন্দে যাইবে।

শ্রীম-র একটি দিব্য আনন্দময় ভাবের সঞ্চার হইয়াছে। তিনি দীর্ঘ পদবিক্ষেপে পাদচারণ করিতেছেন। সঙ্গে মুকুন্দ ও বিনয়, গদাধর ও অমূল্য আর শচী ও জগবন্ধু রহিয়াছেন। কিন্তু ভক্তগণ শ্রীম-র সঙ্গে চলিতে পারিতেছেন না — যেন অর্ধ-দৌড়ে চলিয়াছেন। একবার চলিতেছেন, আবার ফিরিতেছেন, আবার চলিতেছেন — হুঁশ নাই, ভাবে বিভোর। চক্ষু ছলছল, উর্ধ্বদৃষ্টি। কোন সুদূর আনন্দময় জগতে মন নিবদ্ধ — অন্তর যেন আনন্দে নৃত্য করিতেছে। এক একটি কথা ভাবোচ্ছ্বাসে দশবার আবৃত্তি করিতেছেন। সঙ্গগুণে ভক্তদের মনও এক অজ্ঞাত আনন্দে পূর্ণ হইল। তপোবনে ঋষিসঙ্গের ইহাই বুঝি দৃষ্টফল!

শ্রীম ভাবাবেগে দীর্ঘপদবিক্ষেপ করিতে করিতে বলিতেছেন, ‘গভীর রাত্রিতে ঠাকুর বলতেন, — অনাহত শব্দ হয়।

যোগীরা টের পান — তাঁরা ঐ শব্দ শুনতে পান।’ যোগী — অর্থাৎ যিনি ভোগ ত্যাগ করেছেন — কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করেছেন।

এতক্ষণে সমগ্র আকাশ মেঘাবৃত হইয়াছে। শ্রীম মেঘদৃষ্টে বলিতেছেন, দেখ, দেখ, এই মেঘ কোথায় ছিল, কোথায় এলো, আবার কোথায় যাবে!

আমি ছেলেবেলায় ছাদে বসে বসে বৃষ্টিতে ভিজতুম। কেন ভিজতুম জানি না, কিন্তু খুব ভাল লাগতো!

মেঘও তিনি, বৃষ্টিও তিনি — সবই তিনি। যদি বল, এসব কেন? তার উত্তর — বিশ্ব রক্ষার জন্য এসব আয়োজন। আর আমরা তাঁকে স্মরণ করবো বলে। এই প্রতাপশালী সূর্য, তিনি মেঘে ঢাকা পড়ে গেলেন। সূর্য হয়ে আলো দিচ্ছেন, মেঘ হয়ে ঢাকছেন। সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি এই সকলের যে তেজ তা-ও তিনি — 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি'।

এই যে সৌন্দর্যের আগার বিশ্ব, তার সৃষ্টি যিনি করেছেন তিনি কত বড় কবি! আদি কবি বলেন ঋষিরা তাঁকে। আমরা যাকে সুন্দর বলি, তিনি তার চাইতেও সুন্দর। আমরা যাকে বলি কবি, তিনি তেমন কবি নন্। তিনি কবির কবিত্বশক্তি।

একবার মা-ঠাকরুন কতকগুলি ভক্ত স্ত্রীলোকের সঙ্গে আসছেন, তখন সূর্যাস্ত হচ্ছে। ভক্তরা সকলে সূর্যাস্ত দেখে আনন্দে কবিত্ব প্রকাশ করতে লাগলেন। মা শুনে বললেন, 'না তা নয়। এই সূর্য, এই সৌন্দর্য, সবই তিনি।'

স্কট প্রভৃতি কবিরা সূর্যাস্তের বর্ণনা করেছেন। এঁরা শুধু বাইরের সৌন্দর্যটাই দেখেছেন।

কিন্তু এতে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়।

পুলিনবাবু আসিয়াছেন। শ্রীম এখন ভক্তপরিবৃত হইয়া কুটীরের বারান্দায় বসিয়াছেন। সওয়া ছয়টা বাজিয়াছে।

পুনরায় অনাহত শব্দের কথা হইতেছে।

শ্রীম (পুলিনের প্রতি) — ঠাকুর মাঝে মাঝে পোস্তার উপর বেড়াতেন — রাত দু'টো তিনটের সময়। তখন অনাহত শব্দ শুনতে পাওয়া যায়, বলতেন। যোগীরা শুনতে পান।

একদিন খুব মেঘ আর জল ঝড় হয়েছে। ঠাকুর নিজের ঘরে পায়চারি করছেন, আর জপ করছেন। মা-র প্রলয়ঙ্করী ভয়ঙ্করী মূর্তি বুঝি দর্শন হচ্ছে। এই দু'টি চরণ গুন-গুন্ করে গাইছেন —

মা লম্ফে ঝম্পে কম্পে ধরা অসিধরা করালিনী।
তুমি ত্রিগুণা ত্রিপুরা তারা ভয়ঙ্করা কালকামিনী॥

রাত্রিতে বেড়াতেন পোস্তার উপর একাকী সিংহের ন্যায়।

হাঁ, পুলিনবাবু, আপনারা মেঘমল্লার রাগিণী আলাপ করেন না?

'আজ্ঞে হ্যাঁ', বলিয়া পুলিন তিনটি গান এই রাগিণীতে আলাপ করিয়া শুনাইলেন।

পাশের বাড়িতে একজন ব্যারিস্টার রহিয়াছেন। এইবার তাঁহাদের সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে।

পুলিন — এরা সব সাহেব। কোট-প্যান্ট-টাই — সাহেবিয়ানা ছাড়া এদের হয় না।

শ্রীম — না, না, বাইরে দেখতে এই রকম, কিন্তু ভিতরে সব আছে — poet, আবার philosopher — ভিতরে কবিত্ব, দার্শনিকতা, এসব আছে। ইংরেজদের সঙ্গে থেকে থেকে ঐ চাল হয়ে যায় কিনা। পায়জামা পরা, মুরগী খাওয়া, দাঁড়িয়ে মূত্র ত্যাগ করা, চাকরকে বুটশুদ্ধ লাথি মারা — এ সব vice (কদাচার) শিখে। (সহাস্যে) স্বামীজী চুরুট দেখিয়ে বলতেন, The only vice I have got of them is this (এদের এই চুরুটটাই কেবল নিয়েছি — অন্য কোন দোষ আমায় ধরতে পারে নাই)।

স্বামীজী বলতেন, ইংরেজরা খুব গুণবান জাত। খুব ভাল লোকও আছে ওদেশে।

এখানে প্রায় থার্ড ক্লাস লোক আসে টাকাকড়ি রোজগার করতে। এদের এক ক্লাস লোক অতি উচ্চ। তাঁদের সব কিছু খারাপ নয়।

সকাল-বিকেল গান গায় — এই পাশের বাড়ির এরা, কবি লোক হবে। আজ ভোরবেলায় একটি গান শুনালেন ঠাকুর, ওদের বাড়ি থেকে।

পুলিন — ঠাকুর শুনালেন?

শ্রীম — হাঁ, গো হাঁ। ঠাকুর বলেছেন, মা-ই সব হয়ে রয়েছেন — গাছপালা পর্যন্ত। কাটতে পারে এ কথা কেউ? ঠাকুর যেকালে বলেছেন কখনও মিথ্যা হতে পারে না।

একটি ভক্ত (আত্মগত) — ঠাকুরের দোহাই দিলেন বটে, কিন্তু ইনিও দেখছি সর্বভূতে নারায়ণ দর্শন করেন আর সকলকে সম্মান করেন। ভাগবতেও সেদিন একথা পড়া হচ্ছিল — যিনি সর্বভূতে নারায়ণ দর্শন করে সকলকে সম্মান করেন, তিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ।

শ্রীম — ঈশ্বর মানুষ হয়ে আসেন আমাদের শিক্ষার জন্য। তা না হলে কে জগৎকে শিখাবে? তাই গুরুরূপে তিনি আসেন।

গিরিশ ঘোষ আর নরেন্দ্র এ দু'জনের বিচার হতো। গিরিশবাবুর কি বিশ্বাস! নরেন্দ্রকে বলতেন, 'তিনি যদি এসে তোমাকে না বোঝান তবে তুমি বুঝবে কি করে বল?' ঈশ্বর মানুষ হয়ে আসেন, নরেন্দ্র একথা পূর্বে বিশ্বাস করতেন না। ঈশ্বর মানুষ হয়ে এসে এ তত্ত্ব বোঝালে তবে লোক বুঝতে পারে।

আকাশের মেঘ এতক্ষণে কাটিয়া গিয়াছে। শ্রীম রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইলেন। সঙ্গে পুলিন। ক্রমে ক্রমে পুলিনের বাসা পর্যন্ত বেড়াইয়া আসিলেন।

মেঘ ও বৃষ্টি হওয়ায় তাপিত প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। মন্দ মন্দ সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হইতেছে।

সন্ধ্যা হইয়াছে — ধূপ প্রদীপ দেওয়া হইল। ঠাকুরঘরে ভক্তগণ সব বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেছেন। শ্রীম বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনিও ভক্তসঙ্গে ধ্যান করিতেছেন। আকাশ নির্মল হওয়ায় বনভূমি আলোকিত করিয়া পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়াছে।

কিয়ৎকাল পরে শ্রীম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ করিতে বলিলেন এবং নিজে তৃতীয় ভাগ, সপ্তদশ খণ্ড বাহির করিয়া দিলেন।

জগবন্ধু পড়িতেছেন — দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে পণ্ডিতজী, কাপ্তেন, নরেন্দ্র প্রভৃতি আসিয়াছেন। যতক্ষণ পাঠ চলিতেছিল ততক্ষণ শ্রীম

ধ্যানস্থ হইয়া রহিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইল। এইবার কথা হইতেছে।

শ্রীম (মধুর দৃঢ়কণ্ঠে) — ঈশ্বর সত্য, সংসার অনিত্য — এটি একটি মহামন্ত্র। বিশ্বাস করলেই হয়ে গেল — গুরুবাক্য, অবতারের কথা। অবতার এসে না বললে কে বলবে, কে বলতে পারে এ কথা? বাড়ি-ঘর সোনার ঝাঁটা, এসব অনিত্য, একমাত্র ঈশ্বর সত্য। ঠাকুর এসে বলে গেছেন তবুও কি লোকের বিশ্বাস হয়?

একবার গড়ের মাঠে exhibition (প্রদর্শনী) হলো। বড় বড় রাজাদের সোনার খাট পালঙ্ক সব দামী জিনিষ একত্র জড় করা হলো। ভক্তরা যেতে বলায় ঠাকুর বললেন, 'না, কি জানি কেন যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।' শেষে তাদের অনুরোধে গেলেন। রাস্তায় গাড়িতে হৃদয় লাটভবন দেখিয়ে বললেন, 'মামা এই দেখ লাটের বাড়ি।' ঠাকুর উত্তর করলেন, 'হাঁ, মা আমায় দেখিয়ে দিয়েছেন — সব মাটির ঢিপি।'

তিনি ছাড়া, অবতার ছাড়া, আমাদিগকে কে শুনাতো এই কথা — কে বলতে পারে? ঈশ্বর সত্য সংসার অনিত্য — এটি গায়ত্রীর মত একটি মহামন্ত্র।

আকাশ, প্রান্তর, পর্বত ও পর্ণকুটীর, তরুরাজি, বনস্থলী, সব সুশীতল চন্দ্রকিরণসাগরে আনন্দে নিমগ্ন। মধুনক্তম্‌ — রজনী মধুর, সমীরণ মধুর, ভক্তহৃদয় মধুর, সকলই মধুর। এখন মধ্যনিশা — সকল প্রকৃতি নীরবে মধুপানে মগ্ন। শ্রীম কুটীরপ্রাঙ্গণের পূর্বদিকের পুষ্পোদ্যানে দণ্ডায়মান। একদৃষ্টে পূর্ণচন্দ্র দর্শন করিতেছেন। দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইল, কোন নড়নচড়ন নাই — যেন স্থাণু। তিনি কি দেখিতেছেন? 'নক্ষত্রাণামহং শশী'কে দর্শন করিয়া কি বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলেন! (গীতা ১০-২১)।

১৮ই চৈত্র, ১৩২৯ সাল।
১লা এপ্রিল, ১৯২৩ খ্রীঃ।
রবিবার, পূর্ণিমা।

একবিংশ অধ্যায়

জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে সেবা

নিশাকাল, আকাশে পূর্ণচন্দ্র। দক্ষিণ প্রান্তরে মহুল বৃক্ষতলে বসিয়া একটি ভক্ত দুইটি কথা চিন্তা করিতেছেন ঃ প্রথমটি, মানুষ ঈশ্বরকে চিন্তা করে, এরূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয় কিরূপে, কতখানি ভালবাসায় — এইমাত্র শ্রীমকে যেরূপ দেখে এলাম? আর দ্বিতীয় কথা, ঈশ্বর সত্য, সংসার অনিত্য — ঠাকুরের এই মহামন্ত্র বোধ হয় কিরূপে? শ্রীম ব্যথিত কণ্ঠে বলেছেন, তাঁর এ মহাবাক্য কে শোনে, কে বিশ্বাস করে? শুনেছি ঈশ্বরদর্শন করলে সংসার অনিত্য, এ বোধ হয়। তদভাবে উপায় — গুরুবাক্যে বিশ্বাস। এখন গুরুবাক্যে বিশ্বাস হয় কিরূপে?

প্রভাত হইয়াছে। শ্রীম একাকী ভ্রমণ করিতেছেন। অন্তেবাসী আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। উভয়ে একটি ক্ষুদ্র জলাশয়ের তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে বসিয়া একদিন ঠাকুরের অতি গূঢ় উপদেশসমূহ শ্রীম-র স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছিল। তদবধি তিনি এটিকে অতি পবিত্র স্থান মনে করেন। ভূম্যাসনে বসিয়া শ্রীম বৃহদারণ্যক উপনিষদের জনকসভার কিয়দংশ পাঠ করিতেছেন, সম্মুখে অন্তেবাসী।

শ্রীম — এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠত। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্টত। ... যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ অথ যং এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ। এতস্মিন্নূ খলু অক্ষরে গার্গি আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি। (৩/৮-১০)

শ্রীম — (অঙ্গুলিসঙ্কেতে বিশ্ব দেখাইয়া) চন্দ্র, সূর্য, নদনদী, পবন, কাল, সব তিনি চালাচ্ছেন। তাঁর শাসনে সকলে ভীত হয়ে

আপন আপন কাজ করছে। (অন্তর দেখাইয়া) আবার এ-ও চলছে তাঁর ইচ্ছায়। Second day-তে (দ্বিতীয় দিনে) ঠাকুর আমায় এ কথা বলেছিলেন — যেখানে যা দরকার তিনি সব সাজিয়ে রেখেছেন! তোমার কাজ কিসে তাঁকে লাভ হয়। তাঁকে ডাক।

বঙ্কিমবাবুকে বলেছিলেন, আম খেতে এসেছো, আম খাও। অর্থাৎ মনুষ্যজন্ম ঈশ্বরভজনের জন্য, তাঁকে ডাক। বঙ্কিমবাবু বললেন, গুরু ভাল আম নিজে খেয়ে খারাপ আম দেন শিষ্যকে।

তৎক্ষণাৎ উত্তর করলেন, সে কেন হবে গো! বাড়ীতে মাছ এলে মা সব ছেলেকে কালিয়া পোলাও করে দেন না। পেটরোগা যে ছেলে তার জন্য ঝোল করে দেন। তা বলে মায়ের স্নেহ কম বেশী নয়, সব সমান। যার যা পেটে সয় তাকে তেমনি দেন। যেমন বলতেন, যো সো করে যদু মল্লিকের সঙ্গে দেখা করা — তাঁকে জানা।

তাঁকে যে জানে না, বেদ বলছেন — সে কৃপণ, মানে হতভাগ্য, অল্পজ্ঞ। সব আছে কিন্তু নিজেও ভোগ করতে পারে না, আবার অপরকেও দিতে পারে না। তাঁকে জানতে পারলে ব্রাহ্মণ হয় — উদার, অভয় হয়। নচেৎ সর্বদা ভয়। ব্রহ্ম অর্থাৎ বৃহৎকে যে জানে সে ব্রাহ্মণ।

বুদ্ধদেব বলেছিলেন, 'অশোকং বিরজং শুদ্ধং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণং।' মানে, যিনি সর্বদা ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন তিনি ব্রাহ্মণ। তাঁকে বেদে 'অক্ষর' বলেছেন। মানে, যাঁর ক্ষয় নাই, নিত্য একরূপ। তিনি বাক্যমনাতীত, আবার বিশ্বাধার। তাঁকে কেউ দেখতে পায় না, কিন্তু তিনি সকলকে দেখছেন। এই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীর নিকট অক্ষর বলে যাঁকে নির্দেশ করলেন, তিনি মানুষ হয়ে আসেন। কিন্তু ধরা না দিলে ধরা যায় না — তাঁকে চেনা বড় কঠিন। রামকে ভরদ্বাজাদি কয়েকজনমাত্র চিনেছিলেন। ঠাকুরকেও জনকয়েক ধরতে পেরেছিলেন।

জ্ঞানযোগ বড় কঠিন পথ। অবতারকে ধরতে পারলে সোজা হয়ে যায়। অবতার যেমন দোভাষী। যেমন শালগাছ দেখতে অন্য

গাছের মত, কিন্তু সবটাই সার।

বু-রু্-র্ করতে আসেন (হাস্য)। দেখ নাই, রাখালরা মাঠে ছাগল চরাবার সময় বু-রু-র্, বু-রু-র্ করে। মানে, ওদের ভাষায় কথা বলে। তেমনি অবতার। দেখতেই মানুষ, ভিতরটা সব ঈশ্বর। তাই তাঁকে ধরলে, তাঁর কথায় বিশ্বাস হলে — সব হয়ে গেল।

অন্তেবাসী — ঈশ্বর সত্য, সংসার অনিত্য, এ বিশ্বাস হয় কি করে, ঈশ্বরদর্শন না করলে?

শ্রীম — কেন, গুরুবাক্যে বিশ্বাস করে। মা বলেছেন, ও ঘরে জুজু — শিশু তাই বিশ্বাস করেছে, পাঁচসিকে পাঁচ আনা। এমনি বিশ্বাস — বালকের ন্যায় বিশ্বাস করলে হয়ে গেল। ঠাকুর ভক্তদের বিচার করতে বারণ করেছিলেন। বলতেন, শুধু বিচার করে তাঁকে জানা যায় না, বিশ্বাস চাই। গুরুবাক্যে বিশ্বাস! তিনি বলতেন, আমি মাকে বলেছিলাম — মা, বেদবেদান্তে পুরাণে তন্ত্রে কি আছে আমায় জানিয়ে দাও। মা সব জানিয়ে দিয়েছেন। অনেক আবার দেখিয়েও দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, একদিন দেখলুম সব নৃমুণ্ড — সারা সংসার। আমি তার মাঝে বসে ধ্যান করছি।

একদিন দেখলুম, জগৎময় শিবশক্তির রমণ চলছে। একবার দেখালেন একটা সাগর। আমি নুনের পুতুল হয়ে মাপতে গেছি। গুরুকৃপায় পাথর হয়ে গেলুম। একটা জাহাজ যাচ্ছিল, তাতে উঠে পড়লুম।

তাঁর সব কথার অর্থ কে বুঝবে? এসব কেন বলতেন? তাঁর কি দরকার? সাধনভজনই বা কি, আর দর্শনই বা কি তাঁর কাছে? এসব বলতেন মানুষের শিক্ষার জন্য। যাতে ঈশ্বরে তাঁদের বিশ্বাস হয় তার জন্য।

ঠাকুর একজন ভক্তকে বলেছিলেন — বল, আর বিচার করবে না। বিচারের দৌড় কত, কি করবে বিচার করে? বিচার করে এক, তিনি দেখালে অন্য রূপ। (সহাস্যে) আবার plead (সুপারিশ) করে বলতেন, মা এরা এক একবার বিচার না করে কি করবে? মানে, সংশয় যেতে চায় না কিনা!

তাঁর কৃপা হলে জ্ঞানের কমতি পড়ে না — ভিতর থেকে সব আসে। রাশ ঠেলে দেন। বলতেন, দেখ নাই ধান মাপবার সময় একজন ধান ঠেলে দেয়? তেমনি মা রাশ ঠেলে দেন।

তাঁকে প্রার্থনা করতে হয়। বলতে হয়, বাপ, আমায় বালকের বিশ্বাস দাও। তা হলেই হয়ে গেল। বাকি (দর্শন), সে তাঁর ইচ্ছা। তার জন্যও ঠাকুর প্রার্থনা করেছিলেন, 'মা, যারা আন্তরিক এখানে আসবে তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো'।

ঠাকুরঘরে শ্রীম বসিয়া আছেন। পূজা ও ধ্যানাদি যথারীতি সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এইবার শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ হইতে যোগের বিষয়-পাঠ হইতেছে। ভক্তগণ প্রায় সকলে আছেন। পুলিনবাবুও আসিয়াছেন।

শ্রীম পড়িতেছেন —

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সংনিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি॥
শ্বেতাশ্বতর (২/৮)

শ্রীম — শির, গ্রীবা আর বক্ষ সমান রেখে সোজা হয়ে বসতে হয়। সংসারসমুদ্র ভয়াবহ, প্রায় পার হওয়া যায় না। তবে তাঁর কৃপায় হয়। তাঁকে আশ্রয় করলে হয়। তাই ব্রহ্ম-উড়ুপ বলেছেন— উড়ুপ মানে নৌকা, আশ্রয়। গীতায়ও তাই বলেছেন, এই 'দুরত্যয়া' (গীতা ৭-১৪) মায়া শুধু আমাকে আশ্রয় করলেই উত্তীর্ণ হতে পারে। অন্য পথ নাই। ব্রহ্মোড়ুপের অর্থ কেহ কেহ করেন ওঁকার। ওঁকারের ধ্যান করে মন স্থির করা। অন্য আলম্বনেও এ হতে পারে। ঠাকুর বলেছিলেন, 'আমার চিন্তা করলেই হবে'।

মনটিকে দুষ্ট অশ্ব বলা হয়েছে, চঞ্চল। অতি সাবধানে তাকে বশে আনতে হয়। সর্বদা সজাগ থাকতে হয়। গাড়ীর ঘোড়া দুষ্ট হলে চালককে অতি সাবধান থাকতে হয় — কখন বিপদ ঘটায়! তিনি যা বলে গেছেন সেই সব মহাবাক্য আশ্রয় করে থাকতে হয়। মনের সঙ্গে পেরে না উঠলে আকুল প্রাণে তাঁকে প্রার্থনা করতে হয়। তাঁর কৃপায় সব সহজ হয়ে যায়।

যোগীর আহার-বিহার সব পরিমাণমত হবে — সব বিষয়ে সংযম রেখে একভাবে চলা। আজ দশ ঘন্টা ধ্যান করে ফেললুম — আবার দু'দিন কিছুই নয়, কিংবা আজ খুব নেমন্তন্ন খেলুম, তারপর দু'দিন উপোস, এরূপ অসংযম হলে যোগ হবে না। সব ওজন মত হবে।

স্থানের কথায় বলা হয়েছে — সমভূমি হবে আর পবিত্র স্থান হবে। কাঁকর, বালি কিংবা অগ্নিভয় থাকবে না। কোলাহল হয় এমন স্থানে বসবে না — জলাশয়ের নিকটও নয় — যেখানে সব লোক আসে জল নিতে। লোকালয়ের বাইরে নির্জন স্থানে বসে ধ্যান করতে হয়। মনের অনুকূল অর্থাৎ মন প্রসন্ন হয় এমন স্থানে হবে, আবার নয়ন সুখকর অর্থাৎ সুদৃশ্য হবে। শ্রীম — আবার পড়িলেন,

যথৈব বিম্বং মৃদয়োপলিপ্তং তেজোময়ং ভ্রাজতে তৎ সুধান্তম্।
তদ্ধাত্মতত্ত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী একঃ কৃতার্থো ভবতে বীতশোকঃ।।
শ্বেতাশ্বতর (২/১৪)

শ্রীম — ধ্যান করতে করতে মন ক্রমশঃ শুদ্ধ হয়ে যায়। কাম ক্রোধাদি চলে যায়। সোনার পিণ্ডে মাটি মাখানো আছে, যেই জল দিয়ে ধুয়ে ফেলা হলো অমনি উজ্জ্বল হয়ে গেল। তেমনি হয় মন — শুদ্ধ, উজ্জ্বল। সেই শুদ্ধ মনে তাঁর দর্শন হয়। যোগী অবাক হয়ে দেখে — 'আমিই ব্রহ্ম', তখন মুক্তি।

এটি রাজযোগের পথ — এত কঠিন। কোথা দিয়ে এসে পড়ে লোকমান্য, নাক টেপাটেপি। অতর কি দরকার? তিনি যা বলে গেছেন তা করলে সহজ হয়ে যায়। বলেছেন, প্রার্থনা কর নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে। মা সব করে দিবেন, তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। এই কলিযুগের পক্ষে এটাই সহজ পথ।

শাস্ত্রাদি পড়ার কথাও তাই বলতেন, কি হবে অত পড়ে — বেদ, পুরাণ, তন্ত্র? শাস্ত্র সন্ধান বলে দেয় মাত্র। শাস্ত্র আর কিছু ঈশ্বর লাভ করিয়ে দিতে পারে না। গুরুমুখে সন্ধান জেনে নিয়ে কাজে লাগা। কাজ না করলে কিছু হবে না।

কত রকম বিপদ। একজন ধ্যান করবার জন্য একটি ঘর করেছিল।

ঠাকুর শুনে বললেন, সে কি গো, তিনি যে অতি গোপনের ধন। ঈশ্বরকে ডাকবো তা আবার অন্য লোক জানবে কেন? তাঁকে ডাকতে হয় অতি নির্জনে গোপনে।

ঈশ্বর অবতার হয়ে না এলে শাস্ত্রার্থ কে করবে? শুধু পাণ্ডিত্যের কর্ম নয়। শুধু কতকগুলি বই পড়লেই হলো না। মর্ম বুঝতে হয় নইলে উল্টো উৎপত্তি হয়। বদ্‌হজম হয়ে হয়ত পিছে পড়ে গেল।

তাই গুরুমুখ দরকার — যদি শুনতে হয়, জানতে হয়। নয়তো তাঁকে নির্জনে গোপনে ডাকা — প্রভো, আমায় বুঝিয়ে দাও, এই বলে। যার যেমন পেটে সয় তেমনি ব্যবস্থা করবেন তিনি।

২

মধ্যাহ্ন-আহারের পর শ্রীম কুটির-বারান্দায় বসিয়া আছেন। কথাবার্তা হইতেছে।

শ্রীম (জনৈক ভক্তের প্রতি) — গীতায় দৈবী সম্পদ আর আসুরী সম্পদের কথা আছে, মুখস্থ করে ফেলতে হয়। আর ধ্যান করতে হয় এই সব মহাবাক্য — ধ্যান আর প্রার্থনা। এ করতে করতে true light (ঠিক ঠিক অর্থ) বোধ হয়। ভিতর থেকে মর্মার্থ আপনিই flashed (প্রকাশিত) হয়। গীতাখানা আন তো।

শ্রীম গীতার দৈবী সম্পদ পাঠ করিতেছেন।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ। (১৬-১)
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥ ইত্যাদি।

পাঁচটি শ্লোক পড়িলেন। এক্ষণে দৈবী সম্পদের লক্ষণ এক এক করিয়া বলিতেছেন। অভয়, সত্ত্বশুদ্ধি মানে প্রসন্নভাব ; জ্ঞান মানে শাস্ত্রজ্ঞান; যোগ, দান, দম মানে বাইরের ইন্দ্রিয়সংযম; যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, অর্থাৎ শাস্ত্রপাঠ, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্যকথা, অক্রোধ অর্থাৎ প্রপীড়িত হয়েও মনের সমভাব রক্ষা করা; ত্যাগ মানে উদাসীনতা; শান্তি, অপৈশুনম্ মানে পরনিন্দাবর্জন, জীবে দয়া; অলোলুপ্ত মানে নির্লোভিতা; মৃদুভাব, দুষ্কর্মে লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, অন্তর্বহিঃশৌচ; অদ্রোহ মানে মৈত্রীভাব, নিরভিমান —

এইগুলি দৈবী সম্পদ।

শ্রীম — ঠাকুর বলতেন, যাদের মন ঈশ্বরে আছে তারা কারো ভয় করে না, কারো খোসামোদ করে না। ভগবান যা দেন তাতেই সন্তুষ্ট। লাভের প্রত্যাশা থাকলেই ভয়।

সর্বদাই তাঁদের মন ঈশ্বরের সহিত যোগে থাকে। কারণ তাঁদের এই জ্ঞান হয়েছে — ঈশ্বরই আমাদের আপনার, আমরা ঈশ্বরের। দানের কথায় ঠাকুর বলেছিলেন, জ্ঞানভক্তিদান, বিদ্যাদান, প্রাণদান আর অন্নদান — প্রধানতঃ এই চার প্রকার দান। একটা থেকে আর একটা হীন। শ্রেষ্ঠ দান হলো ঈশ্বরের সন্ধান বলে দেওয়া।

সত্যরক্ষার উপর খুব জোর দিতেন ঠাকুর। সত্যকে ধরে থাকলে বলতেন, ঈশ্বরলাভ হয়। জীবে দয়া — তিনি বলতেন, দয়া নয় — সেবা। দয়া তুমি করবার কে? জীবে দয়া নয় — শিবজ্ঞানে সেবা। দয়া সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য বটে, কিন্তু দয়া থেকে সেবা বড়।

শুধু তেজে কাজ হয় না, ক্ষমাও চাই সঙ্গে সঙ্গে। অন্যায় অসত্য ভোগ বাসনাদির সঙ্গে তেজ দেখাতে হয়। নচিকেতার কেমন তেজ, সংসারের কোন ভোগই নিল না। আবার কেমন ক্ষমাশীল — পিতার উপর ক্রোধ নাই, পিতার কল্যাণ কামনা করে যমের নিকট পিতার জন্য শান্তি প্রার্থনা করলেন। আর ধৃতি, মানে ধৈর্যের দরকার। ধর্মজীবনে বিশেষতঃ অসীম ধৈর্যের প্রয়োজন। ঠাকুর বলতেন, শ ষ স। যে সয় সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়।

তিনি একটি গল্প বলেছিলেন। দুইজন তপস্বীর সঙ্গে নারদের দেখা হলো। কবে মুক্তি হবে একথা জিজ্ঞাসা করায় নারদ উত্তর করলেন, এই গাছে যত পাতা তত বৎসর পর। একজন আনন্দে নৃত্য করতে লাগলো আর ধৈর্য ধরে ভজন করে যেতে লাগলো। অপরজন ধৈর্য হারিয়ে তপস্যা ছেড়ে দিল। ধৈর্যের বড় দরকার।

পরপীড়ন পাপ, উহাই হিংসা। অহিংসা মানে wilfully and unnecessarily (স্বেচ্ছায় ও অকারণে) কোনও জীবকে কষ্ট না দেওয়া কায়মনোবাক্যে। সত্ত্বগুণী লোকের আর একটি বড় প্রধান গুণ মধুকর বৃত্তি। সকলের গুণ দেখবে। অপরের দোষ বের করা,

নিন্দা করা, তাতে এসব নাই! অপরের দোষ দেখলে মনে করে 'দোষে গুণে মানুষ', এই উদার দৃষ্টি গ্রহণ করে।

দৈবী সম্পদ মানে, যে সদ্‌গুণ থাকলে মানুষ দেবতা হয় সেই গুণাবলী। এইসব বোঝা যায় ঠাকুরের চরিত্র ধ্যান করলে। তাঁর জীবনে এ সবই দেখা গিয়েছে। যা কিছু সৎ, যা কিছু ভাল, উপাদেয়, এ সকলের demonstration (প্রদর্শনী) অবতারজীবন।

দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, অভদ্র ব্যবহার — এগুলো আসুরী সম্পদ। এগুলোর উৎপত্তিস্থল অজ্ঞান — মানে ঈশ্বর কর্তা নয়, আমি কর্তা — এ বোধের নাম অজ্ঞান। এ থেকেই এই দোষগুলির জন্ম হয়।

দৈবী সম্পদ means the qualities that lead towards God, and আসুরী সম্পদ, that take away from God (দৈবী সম্পদ জীবকে ঈশ্বরমুখী করে, আর আসুরী সম্পদে জীব ঈশ্বর-বিমুখ হয়)।

শ্রীম স্বীয় কুটীরে বসিয়া আছেন, মেঝেতে কম্বলাসনে। একটি ভক্ত গৃহে প্রবেশ করিলেন। শ্রীম তাঁহার হাতে একটি পত্র দিয়া উহা পাঠ করিতে বলিলেন। পত্রখানা কলিকাতা হইতে আসিয়াছে, শুকলালবাবু লিখিয়াছেন। এখন বেলা প্রায় বারটা।

ভক্ত — (পড়িতেছেন) '... মিহিজামবাসী ধন্য, সেখানকার তরুলতা ধন্য! কি আনন্দেই আছেন সব। মহাসংকীর্তন দর্শনে গমন, জ্যোৎস্নাপূর্ণ রজনীতে খোলামাঠ, পার্বত্য স্থান, সরলপ্রাণ কৃষক ও সাঁওতালদের কুটীর, এই সকলের মধ্য দিয়া গমন। আবার শ্রীশ্রীম-র সঙ্গে থাকা এবং কথামৃত পান করা — এ কি যে-সে রকম সৌভাগ্যের কথা! এর কিছুটাও নির্জনে বসিয়া ভাবিলে জীবন ধন্য হইয়া যায়... এমন শুভ সময় আর হইবে না। যে যতদূর পারেন প্রাণ খুলিয়া আস্বাদ করুন। আমরা ঐ সকল শুনিয়া ধন্য হইব।

'এসব আহার কি জীবনে পাইতাম, না পাইয়াছি? তাঁর কৃপাতে এখন পাইতেছি। ব্যাকুলতা মনে স্থায়ী হয় না, বিদ্যুতের ন্যায় চমকাইয়া চলিয়া যায়। শ্রীম সর্বদা উপদেশ দিতেছেন, সাধুসঙ্গ ও নির্জনবাস

চাই। এই কথাই কেবল মনে উদয় হইতেছে আর ছটফট করিতেছি। সে দিন কি হবে?

‘সুধা বলিয়া যে বিষ পান করিতেছি, তার জ্বালা যে কি ভীষণ তাহা তো আগে বুঝিতে পারি নাই। মিষ্টি বলিয়া খাইয়াছি। এখন কিঞ্চিৎ আভাস পাইতেছি, ঐ খাদ্য কি ভয়ানক অখাদ্য। এর জন্য কত শত জন্ম ভোগ করিতে হইবে।

‘হৃদয়ে বল দিন্, ভুল ভাঙ্গিয়া দিন্। যে ছেলে পুনঃ পুনঃ কথা শোনে না, তাহাকে শিক্ষক কঠোর শাসন দিয়া সুপথে আনেন, অবশেষে বলপূর্বক আটক করেন। ...We got a good teacher, but there is want of a good student. আমাদের অতি উত্তম আচার্য লাভ হইয়াছে — অমন অভিমান-অহঙ্কারশূন্য কিন্তু ত্যাগ বৈরাগ্যযুক্ত উত্তম শিষ্যের অভাব। তাঁহার কৃপায় সব হইয়া যাইতে পারে — এই ভরসা।...’

শ্রীম — (ভক্তের প্রতি) দেখলেন, ঐ রকম graphic description (জীবন্ত বর্ণনা) দিয়ে উৎসবের সংবাদ দেওয়ায় কেমন কাজ করেছে। ঐ রকম করে time, place, personality (স্থান কাল পাত্র) দিয়ে scene concretised (চিত্র মূর্তিময়) করে তুলতে হয়। শুকলালবাবুর প্রাণে যেন গিয়ে বিঁধেছে। শুধু উপদেশ লিখে দিলে তেমন কাজ করে না। ঐখানে art (বর্ণনানৈপুণ্যের) দরকার। Imagination (অন্তর্দৃষ্টি) চাই — কি করে বললে acceptable (গ্রহণযোগ্য) হয়।

ঠাকরের অদ্ভুত way of presentation (বর্ণনাকৌশল) ছিল। এদিকে তত লেখাপড়া শিখেন নাই, অথচ কথা যখন বলতেন যেন হৃদয়ে বিঁধে যাচ্ছে, কিন্তু ক্ষত হচ্ছে না — হৃদয় মন শীতল করে দিতো! তাঁর ছিল divine art (দৈবী কৌশল)।

আহা খুব ব্যাকুল হয়েছেন শুকলালবাবু! ব্যাকুল হলেই হলো। নিজের position (অবস্থা) বুঝতে পারছেন তা হলেই অনেকটা হয়ে গেল। হাজার বছরের অন্ধকার ঘর তাঁর কৃপাতে এক মুহূর্তে আলোকিত হয়ে যায়। বেশ বুঝেছেন, বেশ বলেছেন — ‘সংসার

বিষ’। ঘোর কেটে গেছে, এখন ফরসা হয়ে আসছে। (সহাস্যে) ‘অখাদ্য’ — সুন্দর লিখেছেন, বিষয়ভোগ অখাদ্যই বটে। যাতে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস বাড়ে তাই খাদ্য, আর সব অখাদ্য।

লাল চশমা পরলে লাল দেখায়। তাই মিহিজামের সব ধন্য, লিখেছেন — তরু লতা, সব ধন্য! এত কাজের ভিতর ঈশ্বরকে স্মরণ রাখা — এই তো বীরের চিহ্ন!

মিহিজাম কুটীরপ্রাঙ্গণ। শ্রীম মুকুন্দের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। জগবন্ধু নিকট দিয়া যাইতেছেন। তিনি এইমাত্র বন হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শ্রীম তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, দাঁড়াও, শোন। এখন অপরাহ্ন প্রায় চারটা।

মুকুন্দ — (শ্রীম-র প্রতি) আজ চিঠি এসেছে। শিক্ষক দুইজন টিকিট করেছিলেন, ছেলেটিও মাঝে মাঝে করেছে লিখেছেন।

দিনকয়েক পূর্বে দুইজন শিক্ষক ও একটি ছাত্র মিহিজামে আসিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় তাঁহারা রেলে টিকিট করিয়াছিলেন কিনা — এই কথা জানিবার জন্য শ্রীম মুকুন্দকে পত্র লিখিতে বলিয়াছিলেন। আজ পত্রের উত্তর আসিয়াছে।

শ্রীম — (জনৈক ভক্তের প্রতি) জরাসন্ধ অনেকগুলি রাজাকে ধরে আটকে রেখে দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ দেখলেন, এ ভীষণ অত্যাচার। তিনি তাই অর্জুন আর ভীমকে সঙ্গে নিয়ে ছদ্মবেশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। পরে পরিচয় দিয়ে আগমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন। জরাসন্ধকে বললেন, আচ্ছা, তুমিই বল শক্তি থাকতে যদি অন্যায় কার্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয় তাকে ধর্মশাস্ত্রে পাপ বলে কিনা।

জরাসন্ধ শাস্ত্রজ্ঞ — নির্বাক হয়ে রইলেন। ধর্মশাস্ত্রে আছে, একজনের শক্তি আছে, সে অবস্থায় তার সামনে বা জ্ঞাতসারে পাপ কার্য হচ্ছে, তাতে যদি সে protest (প্রতিবাদ) না করে, বাধা না দেয়, তাহলে সমস্ত পাপ তাকে স্পর্শ করবে।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, দেখ, যুদ্ধ করে নিরর্থক লোক ক্ষয় করার প্রয়োজন নাই। তোমাদের মধ্যে থেকে একজন, আর আমাদের তিনজনের মধ্যে একজন — এই দুইজনের মধ্যে duel (দ্বন্দ্বযুদ্ধ)

হোক। এতে হারজিত যা হবে সেরূপ কাজ হবে। তাই হলো। ভীম গদাযুদ্ধে তাকে হারিয়ে দিলেন। সব মুক্ত হয়ে গেল। শক্তি থাকলে অন্যায়ের প্রতিরোধ করা উচিত।

শ্রীম — (জগবন্ধুর প্রতি) 'বিল্বমঙ্গল' শুন নাই?

জগবন্ধু — আজ্ঞে, শুনেছি।

শ্রীম — বিল্বমঙ্গলে 'থাক' বলে একটি চরিত্র আছে। সাধক 'থাক'কে বললে, 'চিন্তামণিকে বিষ খাইয়ে মারতে হবে, সে থাকতে আমার শান্তি নেই।' থাক বললে, 'আমি ও সবে নেই, তোমার যা ইচ্ছা কর।' সাধক বললে, 'দুধে বিষ দিতে হবে, দুধ দাও।' থাক উত্তর করলে, 'আমি দুধ দিতে পারবো না। দুধ ঐ ঘরে আছে, তোমার ইচ্ছে হয় নিয়ে যাও।' কিন্তু এই case-এ (ব্যাপারে) থাকই দোষী। কেননা সে abet (কুকর্মের সহায়তা) করেছে যে!

(অদূরে পরিত্যক্ত কয়লা দেখাইয়া) এতে abet (কুকর্মের সহায়তা করা) হবে আমাদের, আমরা যদি এগুলি use (ব্যবহার) করি। চুরি করে এনেছে ওরা, আমরা কিনলে ওদের abet (সহায়তা) করা হবে।

ঠাকুর এসব বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। বলতেন, ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম। ছুঁচের ভিতর সুতো ঢুকবে না — ফেঁসো থাকলে। এমন শক্ত পথ ধর্মপথ। Head-এর (কর্তার) খুব নজর রাখা দরকার এদিকে।

৩

জম্বুতল — অপরাহ্ন সাড়ে চারটা। একান্ত সেবন করিয়া ভক্তগণ বন হইতে ফিরিয়াছেন। এইবার ভাগবৎপাঠ হইবে। শ্রীম চেয়ারে, উত্তরাস্য। মুকুন্দ, বিনয়, জগবন্ধু, ছোট অমূল্য, শচী ও গদাধর বেদির উপর বসিয়াছেন, কম্বলাসনে। মুকুন্দ উদ্ধবসংবাদ পাঠ করিতেছেন। শ্রীম বাহির করিয়া দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ভবকে উপদেশ দিতেছেন।

পাঠক পড়িতেছেন — (শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) হে উদ্ধব, তুমি

আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ ও বিষয়সকল বর্জন করিয়া আমাতে সম্যক্‌রূপে মনোনিবেশ কর। আর সমদর্শী হইয়া পৃথিবী পর্যটন করিতে থাক।

শ্রীম — সন্ন্যাস গ্রহণ করতে বলছেন সংসার পরিত্যাগ করে। পুত্র কন্যা ও বিষয়ের মায়াই সংসার। এসব ছেড়ে দিতে বলছেন। লীলাসম্বরণের সময় উপস্থিত হয়েছে। তাই অন্তরঙ্গদের যাকে দিয়ে যা করাবেন সেই কার্যে নিযুক্ত করে যাচ্ছেন। উদ্ধব জ্ঞানী ভক্ত ছিলেন। এতকাল ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা করেছেন। এই ক্ষণে সন্ন্যাস নিতে আদেশ করলেন।

ভগবান ভক্তদের জন্য ভাবিত হয়ে পড়েন। ঠাকুর বলেছিলেন কাশীপুরে — তোমাদের জন্যই তো শরীরটা যাচ্ছে না — রাস্তায় রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়াবে। শেষের দিকে ভক্তদের একা একা ডেকে উপদেশ দিতেন। কি রকম করে থাকবে সংসারে, কি করবে — এসব কথা বলে গেছেন। একজন গালে হাত দিয়ে বিষণ্ণ হয়ে বসেছিলেন, অমনি ধমক দিয়ে বললেন, ও কি, অমন করতে নেই — কোমর বাঁধ। তাই উদ্ধবের জন্য ভাবিত হয়ে ভগবান শান্তির পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন।

পাঠক (পড়িতেছেন) — উদ্ধব বলিলেন, হে যোগাত্মন্, পুত্রাদিসহ নিজ দেহে 'আমার', 'আমি' এই বুদ্ধিতে আমি আসক্ত হইয়াছি। যাহাতে আমার এই দেহবুদ্ধি যায়, কৃপা করিয়া দাসকে তাহার পথ দেখাইয়া দাও! আমি তোমার শরণাপন্ন।

শ্রীম — দেহবুদ্ধি যেতে চায় না, বড় কঠিন। ঈশ্বরকোটির যায়, জীবকোটির যায় না। ঠাকুর বললেন, যেমন অশ্বত্থ গাছ শত কাট, অমনি ফেঁকড়ি বেরুবে। তাই 'ভক্তের আমি', 'দাস আমি' এই অভিমান রাখতে বলতেন।

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে তাই বলছেন, মনে জোর আন। মনই মানুষের বন্ধন ও মোক্ষের কারণ। এই মনকে আমার ধ্যানে মগ্ন কর। আমার ধ্যানে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণরূপে, শ্রীকৃষ্ণদেহে। বললেন, জ্ঞানীগণ এ দেহে আমার অন্বেষণ করে। আমি বাক্যমনের অতীত হলেও এ দেহ আমার প্রিয়, মানে অবতারের দেহ।

ঠাকুরও অন্তরঙ্গদের বলতেন, আমার চিন্তা করলেই হবে। তিনি বলেছিলেন, 'আমার চিন্তা যে করবে, সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, পিতার ঐশ্বর্য যেমন পুত্র লাভ করে'। জ্ঞানভক্তি, বিবেকবৈরাগ্য, প্রেমশান্তি, মহাভাব, সমাধি — এসব তাঁর ঐশ্বর্য।

দেহবুদ্ধির অপর নাম বিষয়বাসনা। বিষয়বাসনা মানে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ — এই সংসারভোগ করবার ইচ্ছা। মন থেকে এই বাসনা যেতে পারে কেবলমাত্র তাঁর কৃপায়। ব্রহ্মা অত বড় শক্তিশালী পুরুষ, তাঁরও মন থেকে সম্পূর্ণরূপে বিষয়বাসনা ত্যাগ হয় নাই! কর্মকাণ্ডে থাকলে এসব হয়।

পাঠ চলিতেছে। অবধূতের চব্বিশ গুরুর কথাপ্রসঙ্গে সাধুর খাদ্যের কথা হইতেছে।

শ্রীম — এই দেখ, খাদ্যের কথা বলছেন। সন্ন্যাসী মাধুকরী করে খাবেন। মধুকরের মত — নানা ফুল থেকে মধুকর যেমন অল্প অল্প মধু গ্রহণ করে, তেমনি বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করে খাবেন। তাও আবার যতটুকু নইলে শরীর ধারণ হচ্ছে না, ততটুকু গ্রহণ করবেন। অতি সহজে যা পাওয়া যায় — সরস, নীরস, এসব বিচার না করে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। যেদিন যা পাওয়া যাবে, ভাবতে হবে — ভগবান আজ আমায় এই প্রসাদ দিয়েছেন। ভিক্ষার জন্য গৃহস্থদের পীড়ন করতে নাই।

বুদ্ধদেব বলেছিলেন, মধুকর পুষ্প থেকে মধু আহরণ করে, কিন্তু পুষ্পের বর্ণ ও গন্ধের কোনও হানি করে না। তেমনি সাধু বিচরণ করবে। গৃহস্থদের কোন মতে পীড়ন করবে না —

যথাপি ভ্রমরো পুষ্পং বন্নগন্ধং অহেঠ্যং।
পলেতি রসমাদায় এবং গামে মুনি চরে।।*

পাঠ শেষ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীম — খাদ্যবিষয়ে এত সংযমের কথা কেন বলেছেন? রসনা জয় না হলে ইন্দ্রিয়সংযম হয় না তাই। রসনাকে বশে আনতে

*ধম্মপদ নং ৪৯

পারলে অন্য সব ইন্দ্রিয় আপনি বশে আসে। ‘জিতং সর্বং জিতে রসে।’

ঠাকুর বলতেন, সংসার করলে মনের বাজে খরচ হয়ে যায়। কিন্তু যদি কেউ বৈরাগ্য করে, সর্বস্ব তাঁকে অর্পণ করে, তবে সেই ক্ষতিপূরণ হতে পারে। বৈরাগ্য মানে, ঈশ্বরে অনুরাগ আর সংসারে বিরাগ। উদ্ধবকে সে জন্য বললেন, সংসার ত্যাগ করে আমার চিন্তা কর।

কুটীরপ্রাঙ্গণে শ্রীম পাদচারণ করিতেছেন, সঙ্গে দুই একজন ভক্ত। এখন অপরাহ্ন প্রায় ছয়টা।

উত্তর দিকের বাগনে দুইটি ছাগশিশু মায়ের সঙ্গে বিচরণ করিতেছে, আর মাঝে মাঝে তৃণ ভক্ষণ করিতেছে।

শ্রীম — (ভক্তদের প্রতি) এই দেখ, এরা মার পেট থেকে বের হয়ে দুধ খেয়েছে। এখন হয়তো মাসখানেক বয়স। মার সঙ্গে সঙ্গে চরতে শিখছে, ঘাস খাচ্ছে। খাওয়া, কেবল খাওয়া — এই পশুর কর্ম। মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন।

ভক্তগণ এইবার এস. পি. চ্যাটার্জীর বিখ্যাত পুষ্পোদ্যান দেখিতে যাইবেন। এই উদ্যান হইতে ফুলের তোড়া কখনো কখনো ভাইস্‌রয়ের জন্য পাঠান হয়। একজন ভক্তআশ্রমপ্রহরী হইয়া থাকিতে চাহিলেন। শ্রীম তাঁহাকেও প্রেরণ করিলেন, আর বলিয়া দিলেন ‘অশোক, কিংশুক, বকুল, মন্দার, শিরিষ, কদম্ব — এসব পুষ্পবৃক্ষ দেখবেন। মালীকে জিজ্ঞেস করে নেবেন। আর দ্বিরেফের (ভ্রমর) গুন্‌গুন্ শব্দ শুনবেন।’

শ্রীম আশ্রমের সম্মুখে বড় রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছেন। ভক্তগণ বাহিরে আসিলেন। একজন ভক্ত নগ্ন দেহে ও নগ্ন পদে চলিয়াছেন। উহা লক্ষ্য করিয়া শ্রীম তাঁহাকে আশ্রমে পাঠাইয়া দিলেন — ভাল পোশাক পরিয়া আসিতে। বলিলেন না, ওরূপ নয় — Well-dressed, ভাল করে পোশাক পরে যেতে হয়। নয়তো ঢুকতেই দেবে না বাগানে। যে যেমন লোক, তার কাছে তেমন ভাবে যেতে হয়, তবে কার্য শীঘ্র সিদ্ধ হয়। রাজসিক লোকের কাছে রাজসিকভাবে যেতে হয়।

এতক্ষণে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। ধ্যানান্তে শ্রীম ঠাকুরঘরে বসিয়াছেন। পুলিন মিত্র আসিয়াছেন। তিনি দুই-একটি মায়ের নাম গাহিয়া শুনাইতেছেন।

গান

মা, ত্বং হি তারা, তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা।
আমি জানি গো ও দীন দয়াময়ী, তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা॥
তুমি জলে তুমি স্থলে, তুমি আদ্যমূলে গো মা।
আছ সর্বঘটে অর্ঘ্যপুটে সাকার আকার নিরাকারা॥
তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা,
অকুলের ত্রাণকর্ত্রী, সদা শিবের মনোহরা॥

গান

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি।
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরি-গুহাবাসী॥
অনন্ত আঁধার কোলে, মহা-নির্বাণ-হিল্লোলে,
চিরশান্তি-পরিমল অবিরল যায় ভাসি॥
মহাকাল রূপধরি, আঁধার বসন পরি,
সমাধিমন্দিরে ওমা কে তুমি গো একা বসি।
অভয়-পদ-কমলে, প্রেমের বিজলী খেলে,
চিন্ময় মুখমণ্ডলে শোভে অট্ট অট্টহাসি॥

গানের পর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পাঠ হইতেছে — 'মণির গুরুগৃহে বাস'। জগবন্ধু পড়িতেছেন। ঠাকুর সমাধিস্থ হইতেছেন আর বলিতেছেন, 'আমি হয়েছি — আমি এসেছি।'

শ্রীম — অর্থাৎ যিনি বাক্যমনের অতীত অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। ঠাকুর ঝাউতলায় দাঁড়িয়ে আছেন, সম্মুখে গঙ্গা। মণিকে বলছেন, তিনি অবতার হয়ে জ্ঞান ভক্তি শিক্ষা দেন।

১৯শে চৈত্র, ১৩২৯ সাল, ২রা এপ্রিল ১৯২৩ খ্রীঃ।
সোমবার, কৃষ্ণা প্রতিপদ।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

কবি ও দার্শনিকের গন্তব্যস্থল এক

১

মিহিজাম আশ্রম, ঠাকুরঘর। নিত্যপূজা ও ধ্যানাদি শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন সকালে সাড়ে নয়টা। শ্রীম গীতাপাঠ করিতেছেন, দ্বিতীয় অধ্যায় স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ —

'প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।।'... (২-৫৫)

শ্রীম — যাঁর ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়েছে তাঁরই বুদ্ধি স্থির। অন্য সব অস্থির বুদ্ধি। স্থিতপ্রজ্ঞ মানে যাঁর মন অন্য বিষয়ে যায় না — একমাত্র ঈশ্বরে মগ্ন; আত্মারাম আপ্তকাম যিনি — যেমন নারদ, শুকদেব।

কচ্ছপ যেমন, হাত পা একবার ভিতরে প্রবেশ করালে আর বের করবে না — কেটে টুকরো টুকরো কর, তবুও বের করবে না। তেমনি ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁর মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয় সব ঈশ্বরে লীন — বিষয় কিছুতেই গ্রহণ করবে না। এ যে চেষ্টা করে করেন তা নয়। মন থেকে বিষয় — রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ আপনি খসে পড়ে যায়। যেমন জোঁক — উপরে একটু চুন ফেলে দাও আপনি খসে যায়, ঠিক তেমনি।

কচ্ছপের আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন ঠাকুর। নিজে থাকে জলে, কিন্তু ডিম পাড়ে আড়ায়, মনটা থাকে ডিমে। সংসারী লোকও কচ্ছপের মত থাকবে। সবটা মন ডিমে অর্থাৎ ঈশ্বরের দিকে রাখবে। সংসারে সকলের সঙ্গে থাকবে — দেখাবে তারা যেন কত আপনার, কিন্তু অন্তরে জানবে কেউ আমার আপনার নেই। এক ঈশ্বরই শুধু আপনার।

ঠাকুর বলতেন, ‘ক্ষোভ, দুঃখ গেলেই আনন্দ’। বাসনা থাকতে ক্ষোভ দুঃখ যায় না। তাই বাসনাত্যাগই যথার্থ ত্যাগ। তাঁর কৃপায় তাঁর দর্শন হলে এ যায়। না খেয়ে শরীর শুকিয়ে রাখ, এতে বাসনা শুকুবে না। এতে কোন লাভ হবে না। বাসনা গেলে তবে শান্তি।

কি করে মানুষের পতন হয় তার steps (সোপানগুলি) ভগবান গীতায় দেখিয়েছেন। ঠাকুর বলতেন, পতনের রাস্তা কলমবাড়া — sloping — জানতে দেয় না যে নিচে যাচ্ছে। ঠাকুর ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের ভিতর গিয়েছিলেন। বলতেন, প্রথমটা বুঝতে পারি নাই যে অত নিচে চলে এসেছি। ওমা, চেয়ে দেখি সেখানে তিন চারতলা বাড়ি। তেমনি মন, বিষয়চিন্তা করে করে অজ্ঞাতসারে বহু নিম্নে পড়ে যায়।

বিষয়চিন্তা করতে করতে বিষয়ের প্রতি প্রীতি হয়। তারপর কাম অর্থাৎ ঐ বিষয় লাভ করবার ইচ্ছা হয়। পেতে প্রতিবন্ধক হলেই ক্রোধ হয়। ক্রোধ হলে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হয়, তাকে সম্মোহ বলা হয়েছে। এ থেকে গুরুবাক্য, শাস্ত্রবাক্য ভুল হয়ে যায়, তাই স্মৃতিভ্রংশ। এর কুফল অসৎ বুদ্ধি, তা থেকে পতন হয়।

ছিদ্র কলসীর জল যেমন সব বের হয়ে যায়, তেমনি একটা ইন্দ্রিয়ও যদি ছাড়া পায় তাহলে আর রক্ষে নেই — ঐ পথে বিনাশ উপস্থিত হয়। যেমন কর্ণধারবিহীন নৌকো, ঝড়ে যে দিকে খুশি নিয়ে যায়। শেষে ধাক্কা খেতে খেতে বিনষ্ট হয়।

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষকে বাইরের লক্ষণ দেখে চেনা বড় কঠিন — প্রায় চেনা যায় না। তবে যদি নিজে ঐ রকম হওয়া যায় তখন অপরকে জানতে পারে। ঠাকুর একজন পূর্ণজ্ঞানী দেখেছিলেন।

বলেছিলেন, দেখতে ঠিক যেন পাগল — হাতে একটা আমের চারা, কুকুরদের সঙ্গে খাচ্ছেন এঁটো পাতা থেকে কুড়িয়ে। কিন্তু যখন স্তব করলেন তখন মন্দির যেন ফেটে যাচ্ছে — এমনি তেজ। তিনি বলেছিলেন, যখন নর্দমার জল আর গঙ্গার জল এক মনে হবে তখন জানবে হয়েছে — অর্থাৎ পূর্ণজ্ঞান হয়েছে।

(ভক্তের প্রতি) — স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ কণ্ঠস্থ রাখা উচিত, তবেই

ক্রমশঃ ধারণা করবার সুবিধে হবে। এ পড়া রইলো। ঠাকুরকে যারা চিন্তা করে তাদের এসব বুঝতে কষ্ট হবে না। তাঁর জীবনটাই গীতা। ‘যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে’ (গীতা ৬-২২) — এটিও স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ। ঠাকুরের এত দেহকষ্ট অসুখের সময় — কিন্তু সর্বদা আনন্দময়, সর্বদা সমাধিস্থ। মুখে সদা ‘মা’ ‘মা’ বুলি। মুখটি যেন প্রস্ফুটিত কমল!

এখন বেলা প্রায় দশটা। শ্রীম বারান্দায় বসিয়া আছেন। পুলিনবাবু আসিয়াছেন। তিনি হারমোনিয়াম সহযোগে গান গাহিতেছেন।

গান

একরূপ, অরূপ-নাম-বরণ অতীত-আগামী কালহীন,
দেশহীন, সর্বহীন, ‘নেতি নেতি’ বিরাম যথায়॥
সেথা হতে বহে কারণধারা ধরিয়ে বাসনা বেশ উজলা,
গরজি গরজি উঠে তার বারি ‘অহমহমিতি’ সর্বক্ষণ॥
সে অপার ইচ্ছা-সাগর মাঝে, অযুত অনন্ত তরঙ্গ রাজে,
কতই রূপ কতই শকতি কত গতিস্থিতি কে করে গণন॥
কোটি চন্দ্র কোটি তপন, লভিয়ে সেই সাগরে জনম্,
মহাঘোর রোলে ছাইল গগন, করি দশদিক জ্যোতিঃ মগন॥
তাহে বসে কত জড় জীব প্রাণী, সুখ দুঃখ জরা জনম মরণ,
সেই সূর্য তারি কিরণ, যেই সূর্য সেই কিরণ॥

গান

ঐ যে দেখা যায় আনন্দ ধাম।
অপূর্ব শোভন, ভব-জলধির পারে জ্যোতির্ময়॥
শোক-তাপিত জন সবে চল, সকল দুঃখ হবে মোচন;
শান্তি পাইবে হৃদয় মাঝে, প্রেম জাগিবে অন্তরে॥
কত যোগীন্দ্র-ঋষি-মুণিগণ, না জানি কি ধ্যানে মগন,
স্তিমিত লোচন কি অমৃতরস পানে ভুলিল চরাচর॥
কি সুধাময় গান গাহিছে সুরগণ, বিমল বিভূগুণ-বন্দন,
কোটি চন্দ্র তারা উলসিত, নৃত্য করিছে অবিরাম॥

এখন বেলা বারটা। আহারান্তে শ্রীম কুটিরের বারান্দায় বসিয়া আছেন। ভক্তগণও কেহ কেহ নিকটে আছেন।

আজকাল গ্রীষ্ম পড়িয়াছে, আশ্রমসেবায় প্রচুর জলের প্রয়োজন। একটি বলিষ্ঠ যুবক ব্রহ্মচারীর উপর জল তোলার ভার পড়িয়াছে। এই অঞ্চলের কূপ অতি গভীর। ব্রহ্মচারী লাটাখাম্বা সাহায্যে কূপ হইতে জল তোলেন, আর প্রচুর জলে সকলকে স্নান করান। শ্রীম ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন, এই সম্বন্ধে এখন ব্রহ্মচারীকে উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীম — (ব্রহ্মচারীর প্রতি) ভক্তির সহিত বিচার চাই। সাধু ও ভক্তসেবায়ও বিচারের প্রয়োজন। জলটা বড় বেশী খরচ হচ্ছে। কোন দ্রব্যই waste (অপব্যয়) করা উচিত নয়। জল পয়সা দিয়ে কিনতে হয় না বলে তা নষ্ট করা উচিত নয়। যতটা প্রয়োজন ততটা নিতে হয়। আর প্রয়োজনের তো শেষ নাই, তাই minimum — (যতটা না হলে নয়, ততটা নিতে হয়।

Waste (অপব্যয়) করা একটা স্বভাব দাঁড়িয়ে যায় ক্রমশঃ। Its reaction on one's character is very great (মানুষের চরিত্রের উপর এর প্রভাব অত্যন্ত অধিক)। সেইজন্য সর্ববিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত, তবে ধর্মজীবন সুগঠিত হয়।

ঠাকুর waste (অপব্যয়) করা দেখতে পারতেন না। তাঁকে এক টুকরার জায়গায় ছয় টুকরা লেবু দিয়েছিল বলে তিরস্কার করেছিলেন। কাশীপুরে অসুখের সময় বার্লির সঙ্গে লেবুর রস খেতেন।

ঠাকুর বলেছিলেন, ‘লক্ষ্মীছাড়া থেকে কৃপণ হওয়া ভাল। দু’টোর কোনটাই ভাল নয় তবুও নষ্ট করার চাইতে কৃপণ হওয়া ভাল।

ব্রহ্মচারী ভাবিতেছেন, উঃ কি দূরদৃষ্টি! স্কুল কলেজে এমন শিক্ষক তো কখনও পাই নাই। মায়ের মত যত্ন করে কিরূপ শিক্ষা দিচ্ছেন। তাই বুঝি বলে, গুরু অহেতুক কৃপাসিন্ধু।

আজ মুকুন্দ ও শচীনন্দন রামপুরহাটে চলিয়া যাইবেন। তাহার আয়োজন হইতেছে। গাড়ি আড়াইটায় ছাড়িবে। বিনয় ও জগবন্ধু তাঁহাদিগকে স্টেশনে উঠাইয়া দিয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। মুকুন্দ ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া বায়ু পরিবর্তন মানসে শ্রীম-র নিকট ছিলেন।

শ্রীম — (জগবন্ধুর প্রতি) মুকুন্দবাবু স্টেশনে কোন message (সংবাদ) দিয়েছেন কি?

জগবন্ধু — না। কিছুই তো বলেন নাই।

শ্রীম — কিছুই না?

জগবন্ধু — (কৌতুহলী হয়ে) আজ্ঞে না, কিছুই বলেন নাই।

শ্রীম — এক টিন মাখন শুকলালবাবু পাঠিয়েছিলেন। সে টিনটি মুকুন্দবাবুকে উৎসর্গ করা হয়েছে। আর তিনটি টাকা ও একখানা পত্র। এসব শচীনন্দনের কাছে দেওয়া হয়েছে। বলে দিয়েছি, রামপুরহাট না পৌঁছে তাঁকে কিছু বলো না, বা পত্র খুলো না। প্রথমটা সে নিতে চায় নাই। শেষে, তোমায় অত ভাবতে হবে না, যেমন বলছি কর — বলায় নিলে।

লিখে দিয়েছি, আপনি guest (অতিথি) ছিলেন। অনেক খরচ করেছেন। অন্ততঃ চালের দামটা অবশ্য অবশ্য নেবেন। (ভক্তদের প্রতি) আচ্ছা, এ ভাল হল কি?

ভক্তগণ নিরুত্তর হলেন।

শ্রীম — (সস্নেহে) ওঁর স্বাস্থ্য বড় খারাপ হয়ে গেছে, কারো লক্ষ্য রাখা উচিত! নয়তো ওখানে গিয়ে পূর্ব্ববৎ হবে। স্কুলে থাকা ভাল। বোডিং-এ এত ছেলে নিয়ে হট্টগোলে প্রাণ টেঁকে কি করে! আমরাও করতাম নড়াইলে। স্কুলে থাকতাম, আর বাসায় গিয়ে খেয়ে আসতাম।

শ্রীম প্রথমে কিছুকাল নড়াইলে হাইস্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন। এখন একটি ভক্তের সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

শ্রীম — এর একটা consciousness (কর্তব্যবুদ্ধি) জেগেছে। ওর জ্ঞাতসারে ঐ স্কুলের ছেলেরা ভাড়া না দিয়ে রেলগাড়িতে চড়ে — কখনও কখনও ফুটবল ম্যাচ খেলতে যায়। এটা এর দেখা উচিত, নইলে পাপ একে স্পর্শ করবে। সেই জন্য তাকে শ্রীকৃষ্ণ ও জরাসন্ধের গল্প বলেছিলাম।

ধর্মশাস্ত্রে আছে শক্তি থাকাসত্ত্বেও অন্যায়ের প্রতিকার না করলেও পাপ স্পর্শ করে। দূরে হোক বা নিকটে হোক, পাপ বা অন্যায়ের

প্রতিরোধ করা উচিত — শক্তি থাকলে। সে যখন ঐ স্কুলের হেড তখন তারই সব দেখা উচিত।

একশ’ টাকা দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত! আমি বলে দিয়েছি মাসে মাসে কিছু কিছু করে দিতে (রেলের টিকিট কিনে ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া প্রভৃতি উপায়ে)। একসঙ্গে নাই বা দিলে।

এইজন্য গুরু শিষ্য করেন না যাকে তাকে। কেননা, শিষ্যের সব পাপপুণ্যের ভার গুরুর উপর। গুরুকে সব ভার অর্পণ করেছে কি না! গুরু এমন শক্ত জিনিস।

একজন আমাদের কাছে এসে বলেন, suicide (আত্মহত্যা) করবো। আমরা বললুম, এতে যে গুরুর উপর সব দোষ যাবে। গুরুকে যে শ্রদ্ধা করে সে কি এ করতে পারে? না, তার করা উচিত যাতে গুরুর হানি হয় এমন কাজ? গুরুর obedient (অনুগত) যে, তাকে গুরু উঠতে বললে উঠবে, বসতে বললে বসবে।

কেন তিনি করলেন না? — এর জন্য। ঠাকুর কাউকেও শিষ্য করেন নাই মন্ত্র দিয়ে যেমন লোকে করে। বলতেন, ‘আমি বালক, আমার মা আছেন। আমি কি জানি — মা সব জানেন।’ অন্তরঙ্গদের কথা আলাদা — তাঁর লীলার সহায়।

যাঁর ইচ্ছায়, কথায় স্পর্শে ঈশ্বরদর্শন হয়ে যেতো তাঁর আবার মন্ত্র দিবার প্রয়োজন কোথায়?

২

শ্রীম অশ্বত্থতলে বসিয়া আছেন, সঙ্গে মোহন। মোহন প্রশ্ন করিতেছেন।

মোহন — মন্ত্রদীক্ষা নেবার দরকার কি?

শ্রীম-র মন অন্তরে ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন। তাই প্রশ্ন বুঝিতে পারেন নাই মোহন তাই পুনরায় বলিলেন। এবারও ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বুঝিলেন, মন্ত্রদীক্ষা দিবার দরকার কি? তারই উত্তর দিতেছেন।

শ্রীম — আদেশ পেলে ভগবানের কাছ থেকে, তবে গুরু দীক্ষা

দিতে পারেন — তা নইলে নয়। ভগবান সব দেখছেন — তিনি ঠিক বুঝলে দীক্ষা দেওয়াবেন। মা জানেন কখন ডিম ফোটাতে হবে, ডিমের অত ভাবনা কেন? কুলগুরুরা যে দীক্ষা দেন, ওঁদের হয়তো পূর্বপুরুষ কেউ আদেশ পেয়েছিলেন।

এখন কত গুরু মন্ত্র দিচ্ছে — হিজিপিজি গুরু সব। জিজ্ঞেস করলে বলে, অমুক অমুক বড়লোক আমার শিষ্য। কলকাতার কোন কোন ধনী লোকদের গুরুরা এরূপ বলে থাকে কখনও কখনও। ধনী শিষ্যদের পরিচয় দেয়। Trade (ব্যবসা) করলে ভিন্ন কথা।

মোহন — (তৃতীয়বার চেষ্টা) আচ্ছা, অনেকে যেমন বলেন আমি অমুকের নিকট দীক্ষা নিয়েছি — এইরূপ গুরুকরণ করার, দীক্ষা নেবার প্রয়োজন আছে কি?

শ্রীম — না না, সে তো অনেকে নেয়। নিলেই কি আর হলো? তা, ঠাকুর কাউকে কাউকে মন্ত্র নিতে বলেছেন। কাউকে আবার বলেছেন দরকার নাই। 'এখানে আনাগোনা করলেই হবে'। কারণ, মন্ত্র তো ঈশ্বরদর্শনের জন্য। ঈশ্বরকে নিজে সম্মুখে দেখছ — মন্ত্রের দরকার কি? যারা অপেক্ষাকৃত সংশয়াত্মক, অর্থাৎ যাদের বিশ্বাস প্রবল নয় তাদের বলতেন নিতে। আর ঐ কথা বলতেন, মা জানেন কখন ডিম ফোটাতে হবে, ডিমের অত ভাবনা কেন?

গুরু যেমনই হোন তাঁকে মানুষ জ্ঞান করলে চলবে না। ঠাকুর বলতেন, গুরুকে মানুষ জ্ঞান করলে ছাই হবে। সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ জ্ঞান করতে হবে।

মোহন — যদি কুলগুরুর আচারব্যবহারে তাঁর উপর শ্রদ্ধা না থাকে তবে কেমন করে তাঁকে ঈশ্বর জ্ঞান করা যায়?

শ্রীম — হাঁ, এ সম্বন্ধে একটি অতি সুন্দর গল্প বলেছিলেন ঠাকুর।

এক গুরুর বাড়িতে ব্যাপার — ছেলের পৈতে হবে। ধনী দরিদ্র সকল শিষ্যরা কিছু কিছু দেবে — কেউ পয়সাকড়ি, কেউ জিনিসপত্র। একটি স্ত্রীলোক গরীব, বিধবা। সে বললে, 'গুরুদেব, আমি দই দিব'।

উৎসবের দিন ছোট একটি খুরিতে করে এইটুকু দই নিয়ে এসে

সে উপস্থিত। অপর শিষ্যরা অন্যান্য দ্রব্য প্রচুর এনেছে। গুরু এইটুকু দই দেখে চটে গেলেন। পদাঘাতে খুরিটা ভেঙ্গে ফেললেন। ক্রোধে অধীর হয়ে তিরস্কার করতে লাগলেন। আর বললেন, 'এত লোক খাবে, এইটুকু দই নিয়ে এসেছিস — এতে হয় কি করে?' বেচারী শিষ্যা কি আর করে, হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইলো। ক্রোধ থামলে গুরু বললেন, 'হতভাগিনী, তুই নদীতে গিয়ে ডুবে মর'। ভক্তটি খুব বিশ্বাসী ছিল, গুরুবাক্য রক্ষা করবার জন্য নদীর জলে গিয়ে ঝাঁপ দিলে। কিন্তু সারা নদীময় হাঁটু জল। এ এক দৈবী মায়া। তখন আর কি করে — বসে বসে কাঁদছে গুরুবাক্য পালন করতে পারলে না বলে। ভক্তবৎসল ভগবান আর স্থির থাকতে পারলেন না — তাঁকে দর্শন দিলেন। তাকে সান্ত্বনা দিয়ে ঠিক পূর্বের ন্যায় আর এক খুরি দই হাতে দিয়ে বললেন, 'এটা নিয়ে যাও যত ঢালবে ফুরোবে না।'

গুরুকে তাই নিয়ে দিলে। তিনি আবার চটে গেলেন। তখন ভক্ত বললে, 'ঢেলে দেখুন — ফুরোবে না'। যত সব হাঁড়িকলসী ছিল, সব ভরে গেল। গুরু তো অবাক্! কোথায় পেল সব কথা শুনে গুরু বললেন, 'মা, আমায়ও একবার ঈশ্বরকে দর্শন করিয়ে দিতে হবে, নইলে জলে ডুবে প্রাণত্যাগ করবো'। ছেলের পৈতে কোথায় পড়ে রইলো তার নেই ঠিক।

উভয়ে নদীতীরে গেল। দর্শন দিয়ে ভক্তের সঙ্গে ভগবান কথা কইতে লাগলেন, কিন্তু গুরু দেখতে পাচ্ছেন না। গুরু প্রাণত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুত। ভক্ত ভগবানকে বললেন, 'ঠাকুর, একটিবার গুরুদেবকে দর্শন দিতে হবে, নইলে আমিও শরীর রাখবো না।' ভগবান বললেন, 'মা, কি করে তা হয় — তোর পূর্বজন্মে সব করা ছিল তাই দেখা পেলি, ওর অনেক বাকি।' 'না ঠাকুর, দেখা দিতেই হবে, নইলে আমিও আর প্রাণ রাখবো না।' কেঁদে কেঁদে ভক্ত এই আবদার করে বসলে। ভক্তবৎসল কি আর করেন! বললেন, 'আচ্ছা' — এই বলে একবারমাত্র দর্শন দিলেন।

এ গল্পটি কেন বললেন ঠাকুর? মানে, সরল বিশ্বাস চাই। গুরু যাই করে করুক, ভক্ত তার নিজের কর্তব্য নিজে করবে। গুরুবাক্য

বিশ্বাস করবে।

এই সব বলে গেছেন ঠাকুর। সব problems solve (সমস্যা সমাধান) করে দিয়ে গেছেন। কত foresee (দূরদর্শন) করেছেন। Life and soul-এর (মনুষ্যজীবনের) যতপ্রকার problems (সমস্যা) আছে সব solve (সমাধান) করে গেছেন পূর্ব থেকে। কখন কোথায় কেমন হবে — সব আগে থেকে বলে গেছেন।

ঠাকুর আর একটি বেশ গল্প বলতেন। দুইজন তপস্বী একস্থানে তপস্যা করছেন। একজনের বালকস্বভাব, আর একজনের অন্য রকম। নারদ যাচ্ছেন রাস্তা দিয়ে, তাঁকে পেয়ে ওঁরা জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কোথা থেকে এসেছেন। নারদ বৈকুণ্ঠ থেকে আসছেন শুনে এক তপস্বী বললেন, 'বৈকুণ্ঠে ভগবান কি করছেন দেখে এলেন?' নারদ উত্তর করলেন, 'ছুঁচের ছেঁদা দিয়ে উট আর হাতী ঢুকুচ্ছেন আর বের করছেন।'

একজন ভাবলে, তাও কি কখন হতে পারে! তিনি বৈকুণ্ঠ থেকে মোটেই আসেন নাই। অপর তপস্বী বললে — উট, হাতী বলছো কি, ব্রহ্মাণ্ড যেতে পারে ছুঁচের ভিতর দিয়ে তাঁর হাতে। একজন বললেন, অসম্ভব — আর একজন বললেন, সব সম্ভব। এঁর সরল বিশ্বাস — পূর্বের বহু জন্মের তপস্যার ফল। আর অপর ব্যক্তির এই সবে আরম্ভ — প্রথম জন্ম তপস্যার।

তাইতো ক্রাইস্ট বলেছিলেন, 'With man this is impossible; but with God all things are possible (St. Matthew 19:26) — মানুষের পক্ষে অসম্ভব হতে পারে, কিন্তু, ভগবানের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। ভগবান সব করতে পারেন।

এই ব্যক্তির আরো অনেক জন্ম ধৃতির সহিত তপস্যা করতে হবে। fate (অদৃষ্ট) মানতে হয়। তা না হলে একজনের এমন সরল বিশ্বাস, আর একজনের অবিশ্বাস কেন?

ধৈর্যের সহিত কাজ করে যেতে হয়। নাই বা হলো এক জন্মে, দু' জন্মে — দশ জন্মে হবে। তা বলে কি হতাশ হওয়া ভাল, না চেষ্টা ছেড়ে দেওয়া উচিত? করে যাও একদিন না একদিন হবেই।

'অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিং' (গীতা ৬-৪৫) তাঁর কাছে সকলকেই যেতে হবে।

যেমন ঠাকুর বলতেন, খানদানী চাষা। এক বছর বৃষ্টি হয় নাই, ফসলও হয় নাই। দ্বিতীয়, তৃতীয় বৎসরেও তাই ফসল হলো না। তা বলে কি সে চাষ ছেড়ে দিয়ে বসে থাকবে? তেমনি এক জন্মে হলো না বলে ছাড়বো কেন, দশ জন্মে হবে —এরূপ বিশ্বাস চাই। ধৃতির সহিত করে যেতে হয় — পথ ছাড়তে নেই।

এই যে সাধুসঙ্গটি আপনারা সব করছেন, এ কি শুধু দু'টিখানি কথা! পূর্বজন্মের বহু তপস্যা ছিল, তাই এটি হচ্ছে।

দক্ষিণেশ্বর আজকাল সর্ব তীর্থের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। তাঁর দর্শন, আর মঠের সাধুসঙ্গ, ভারতের greatest and best (সর্বোত্তম) সাধুসঙ্গ। এ সব কি কম ভাগ্যের ফলে হচ্ছে!

জপধ্যান করতে হয়। ঠাকুর একজনকে বলেছিলেন একদিন সন্ধ্যার সময় কাশীপুর বাগানে 'এই সন্ধ্যেবেলা কি হৈ হৈ করে কাটাচ্ছিস, এখন বসে ধ্যানজপ করতে হয়। এখন এসব করবি না, তো পরে কি লোকের ঘরের বউ-ঝি টেনে বের করবি?' এই কথা শুনে গলায় সাপ পরানো বানরের মত চুপ করে বসে রইলো এসে। কি insight (অন্তর্দৃষ্টি) শেষে ঠিক তাই হলো, যা বলেছিলেন!

মোহন — আজকের প্রথম গল্পটিতে বোঝা যায়, শিষ্যাই গুরু হলেন বিশ্বাসের বলে। অমন ঘটনা তো খুব rare (অল্প)। কিন্তু common, ordinary (সাধারণ) লোকের কি করা উচিত? সচরাচর লোক আশা করে, গুরু আমার মনের প্রতিকূল প্রবৃত্তিসকল দূর করে, আমায় মানুষ করে, ক্রমে ভগবান দর্শন করাবেন।

শ্রীম — ও যে মানুষবুদ্ধি! গুরুকে মানুষ মনে করলে অমন সংশয় হবে। এর মূলে এই assumption (ধারণা), মানুষ সব করছে। কিন্তু তা তো নয়। ঈশ্বর কর্তা, মানুষ অকর্তা। গুরুতে ঈশ্বরবুদ্ধি করে নিজের কর্তব্য পালন করা উচিত।

গুরুকরণ তো ছেলেখেলা নয়! দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, দিনে রেতে দেখে শ্রদ্ধা হলে, তখন করা উচিত। একবার হয়ে

গেলে ছাড়বার উপায় নেই। এ কি ধোপার কাপড় যে পাঁচ জায়গায় বদল হবে — আজ এ ধোপা, কাল সে? নিজের কর্তব্য নিজে পালন করা উচিত।

তবে ঈশ্বরলাভের পথে প্রতিবন্ধক হলে সব ত্যাগ করা যায়। বলিরাজা গুরু ত্যাগ করেছিলেন, শুক্রাচার্যকে। ভরত ত্যাগ করলেন মাকে, বিভীষণ ভাইকে। ঈশ্বরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করা যায়। এ সব অতি rare case (বিরল ঘটনা)। বলিরাজা ক'টা হয়? তাই ঠাকুর বলতেন এত জোর দিয়ে, গুরুতে মানুষবুদ্ধি করলে ছাই হবে!

তবে একটা কথা আছে। যারা ঠাকুরকে ভাবে, তাঁর চিন্তা করে, তাদের আবার মন্ত্রই বা কি! আর কি বা কি! তিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর — অবতার।

ভক্তদের কারো কারো ঠাকুরের নিকট আসতে দেরি হয়ে গেলে তার সব কারণ জিজ্ঞেস করতেন, কখনও বা বাড়িতে খবর পাঠাতেন কিংবা চিঠি লিখতেন। এমন ভালবাসতেন, এমন স্নেহময় ছিলেন।

তিনি তো জানতেন, ওরা অজ্ঞান, আমাকে জানে না। কিন্তু আমি তো এদের সব জানি। তাই এত ভালবাসতেন — এত ক্ষমা করতেন।

ভক্তদের দোষ নিতেন না। মার কাছে plead (ওকালতি) করতেন, 'মা, ওদের নানা কাজ সংসারের কি করে আসে!' পড়ে গিয়ে হাত ভেঙ্গে গেল — ভাবে যাচ্ছিলেন। তা বলছেন, মা ওর তো অতদূর যাওয়ার কথা ছিল না। ঠাকুর ঝাউতলায় বাহ্যে যেতেন। রাখাল গাড়ু হাতে নিয়ে পঞ্চবটি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতেন। একদিন বাহ্যে করে ফিরবার সময় — পড়ে গিয়ে হাত ভেঙ্গে যায়। বার (bar) বেঁধে অনেক কষ্ট পেয়ে ভাল হন।

ভক্তরা বিচার করে, জগন্মাতাকে তাই বলছেন, 'মা, কি করে ওরা এক একবার বিচার না করে?'

Father, forgive them; for they know not what they do' (St. Luke 23:24) — পিতঃ, এদের ক্ষমা কর; এরা অজ্ঞান, জানে না কি হীন কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছে। ক্রাইস্ট স্বীয় ঘাতকের জন্য এই প্রার্থনা করেছিলেন।

ঠাকুর অহেতুক কৃপাসিন্ধু। তাঁকে যারা চিন্তা করে তাদের ভাবনা কি? তিনি কতবার অন্তরঙ্গদের বলেছেন, 'আমার চিন্তা যে করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে — পিতার ঐশ্বর্য যেমন পুত্র লাভ করে।'

৩

শ্রীম জম্বুতলে পায়চারি করিতেছেন। একটি কুকুর পাকশালার নর্দমায় আহার অন্বেষণ করিতেছে। তিনি উহা দেখিতেছেন।

শ্রীম — (ভক্তদের প্রতি) দেখ দেখ, আহার খুঁজছে। এদের খাওয়া আর খাওয়া — এই সার। কিন্তু মানুষের তা নয়।

এই শরীরের ভিতর তিনটি শরীর আছে — স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ। পশুরা কেবল স্থূল শরীরে আহার দেয়।

শুধু তাতে আহার দিলে কি হবে? তিনটাতেই আহার দিতে হয়। মানুষের ইহা কর্তব্য।

স্থূল শরীরের আহার, এই আমরা যা সব খাই — অন্ন, পানাদি। সূক্ষ্ম শরীর satisfied তুষ্ট হয় intellectual pursuit-এ (বুদ্ধির অনুশীলনে)। Art, science, literature, architecture (শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, স্থপতিবিদ্যা) এসবের অনুশীলন সূক্ষ্ম-শরীরের আহার। আর কারণশরীর — এতে চাই পূজা পাঠ, জপ-ধ্যান বিবেক-বৈরাগ্য, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম এই সব। সবগুলি শরীরকে আহার দিতে হয়। শুধু স্থূলকে দিলে চলবে না।

স্বামীজী তিনদিনের উপোসে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। এক পশলা বৃষ্টি উপর দিয়ে হয়ে গেল। তখন revive (সংজ্ঞালাভ) করলেন। উঠে আবার পথ চলতে লাগলেন।

এই ঘটনায় কি মনে হয়? খাওয়াদাওয়াই সার — না, এর উপরও উচ্চ চিন্তা আছে, উচ্চ কর্তব্য আছে? তাই ক্রাইস্ট বলেছিলেন, 'Man shall not live by bread alone' (St. Matthew 4:4) — অন্ন, পান, ইত্যাদি বাহ্য উপকরণই জীবনধারণের একমাত্র উপায় নহে।

কারণ শরীরকে ঠাকুর বলতেন 'ভাগবতী তনু'। এই শরীর ঈশ্বরের

পথে নিয়ে যায়, এর দ্বারা ঈশ্বরদর্শন হয়।

শ্রীম — আমার দ্বিতীয় দর্শনের দিন বলেছিলাম, আচ্ছা লোকদের তো বুঝিয়ে দেওয়া উচিত—। যেই বলা অমনি ঠাকুর উত্তর করলেন, 'তোমাকে কে বোঝায় তার নেই ঠিক, আবার লোকদের বুঝাতে যাওয়া!' আগে ঈশ্বর দর্শন করা — তারপর তাঁর আদেশ পেলে তখন জগৎকে শিক্ষা দেওয়া যায়। মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ ঈশ্বরদর্শন — পরমানন্দ উপভোগ, বিষয়ভোগ নহে।

আজ দুপুরে মাছির উৎপাতে মশারির ভিতর রয়েছি, শুনতে পেলুম একটা শব্দ হচ্ছে। মুখ বাড়িয়ে দেখি (চক্ষু দিয়া ইঙ্গিত করিয়া) ঐ হাঁড়িটাতে যাতে কুকুরের ভাত থাকে, একটা ছাগল মুখ দিচ্ছে। একটা কাক এর মাথায় ঠোকর মারছে অনেক বার, চার পাঁচবারেরও বেশি। শেষে ছাগলটা চলে গেলে, কাক খেল। এর অর্থ এই — যার যা প্রকৃতি সে তাতে যাক। তুমি ছাগ — চরে খেতে পার, তুমি ওখানে মাঠে যাও, ঘাস খাও। আমরা কাক — এতে আমাদের অধিকার!

এই সংসারেও তাই। যার যা ভোগের জিনিস তাতে হাত দিতে নেই, বা তার নিন্দে করতে নেই। কারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করা ভীষণ অন্যায়।

এই যে পাশের বাড়ির এরা খায় দায়, খালি ভোগ নিয়ে আছে এদের কি ঈশ্বর দেখছেন না? তিনি রেখেছেন ঐ ভাবে। আমরা যে ঠাকুরের কথা শুনতে পাচ্ছি — যেমন কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ না করলে চলবে না — এতে আমাদের বাহাদুরী নেই। কেউ হয়ত একথা একদম শোনেই নাই, তাতে তাদেরও দোষ নেই। ঈশ্বর যাকে যেমন রেখেছেন। আমরা একটু জপতপ করি বলে, ঠাকুরের চিন্তা করি বলে, আমাদের কোনও credit (গুণ) নেই! তিনি রেখেছেন এভাবে, তাই করছি। কারো নিন্দা করবার যো নেই। ঈশ্বর যাকে যেমন রাখেন সে তেমন থাকে।

জনৈক ভক্ত — (স্বগত) ভক্তগণ এখানে তপস্যার ভাবে রয়েছেন। পাছে অহঙ্কার হয় তাদের, তাই বুঝি শ্রীম কৃপা করে সাবধান করছেন।

শ্রীম আশ্রমপ্রাঙ্গণে চেয়ারে বসিয়াছেন। এখন অপরাহ্ণ প্রায় পাঁচটা। ভক্তরা কেহ কেহ আশেপাশে আছেন। মিহিজাম শ্রীম-র খুব ভাল লাগিয়াছে। স্থানটি যেমন স্বভাবসুন্দর তেমনি উহা তপস্যার অনুকূল।

শ্রীম — (ভক্তদের প্রতি) ভগবান কি সুন্দর স্থানে আমাদের এনেছেন। এখানে আছে গরীব লোক, ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরা, কালো — আবার খেটে খেটে হয়রান, দেখলেও কেউ ফিরে চায় না, অমন সব লোক। এদেরই যদি পাউডার মাখিয়ে ভাল কাপড় পরান যায়, লোকে হাঁ করে থাকবে দেখে, পোশাকের এত মাহাত্ম্য।

বিলেতে পোশাক দিয়ে আদর। যে যত বেশী দামী জিনিস পরবে তার তত সৌন্দর্য।

(সহাস্যে) আমাদের আলাপী অনেক বাঙ্গালীবাবু আছেন, পূজোর ছুটিতে এঁরা সব 'হোমে' (দেশে) যান। (সকলের হাস্য)। হাঁ, সাহেবদের দেখাদেখি এঁরাও বিলেতকে 'হোম' বলেন। এঁরা কখনও কখনও বলেছেন, 'মশায় বিলেতে যাওয়া-আসার সময় যত ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য প্রবল হয়! বুঝতে পারি না কেন।'

এর মানে হলো, লোক কামিনীকাঞ্চন নিয়ে রয়েছে। একটা ছেড়ে এখন অপরতে মন চলে গেছে। তিনমাসের ফি, অর্থাৎ কাঞ্চন ছেড়ে এখন কামিনীর ভাবনা বেড়ে গেছে। মহামায়ার এমনি মায়া।

ঈশ্বর তাই কর্মকাণ্ড করেছেন। অকর্মা থাকলে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য বৃদ্ধি হয়, তাই কর্মের সৃষ্টি।

একজন ভক্ত — অনেকক্ষণ ভাগবতপাঠের সময় হয়েছে।

শ্রীম — এই তো ভাগবত পাঠ হচ্ছে। ভগবানের নাম, তাঁর গুণ-কীর্তন, এই তো ভাগবত — এই উপনিষদ্।

(সহাস্যে) 'উপনিষদ্ং ভো ব্রূহি' — শিষ্য বলেছিল গুরুকে। তিনি উত্তর করলেন, 'উক্তা তে উপনিষদৎ' — এই যে তোমায় উপনিষদ্ বললুম এতক্ষণ! শিষ্য মনে করেছিল উপনিষদ্ অদ্ভুত একটা কিছু হবে। গুরু বললেন, এতক্ষণ যা কথা হয়েছে এরই নাম উপনিষদ্। যাতে ঈশ্বরে মন যায় তারই নাম উপনিষদ্।

৪

আশ্রমপ্রাঙ্গণ, অপরাহ্ণ প্রায় ছয়টা। একজন ভক্ত কন্যা-জামাতা সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। ইঁহাদের বাড়ি কলিকাতায়, দিন কয়েকের জন্য বায়ুপরিবর্তন করিতে মিহিজামে আসিয়াছিলেন। আগামীকাল ইঁহারা সব কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতেছেন। প্রাঙ্গণে কম্বল পাতিয়া দেওয়া হইল। তাঁহারা বসিয়াছেন, শ্রীমও নিকটে চেয়ারে উপবিষ্ট। আশ্রমবাসিগণ আশ্রমসেবায় ব্যাপৃত। ভক্তগণ ঠাকুর প্রণাম করিয়া কিছুক্ষণ কথাবার্তা কহিয়া শ্রীম-র নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। শ্রীম এইবার উপদেশ দিতেছেন।

শ্রীম — (আশ্রমবাসিগণের প্রতি) ইনি খুব সরল লোক, কিন্তু একটি দোষ আছে দেখছি। মেয়েদের লজ্জা শিক্ষা দেন নাই। এই রকম করে মেয়েদের নিয়ে আসা উচিত হয় নাই। আর কন্যাকে সকলের সাক্ষাতে তার স্বামীকে প্রণাম করতে বলা নেহাৎ নির্লজ্জের কাজ। এ কি রকম ব্যবহার!

স্ত্রীলোকের লজ্জাই ভূষণ। এটি গেলে আর রইল কি? চণ্ডীতে আছে, 'যা দেবী সর্বভূতেষু লজ্জারূপেণ সংস্থিতা'। লজ্জা দেবীরই একটি রূপ। এইরূপে তিনি সর্বভূতে রয়েছেন।

মা-ঠাকরুন বুড়ো হয়ে গেলেন। তবুও, এই সেদিন মুখের ঘোমটা একটু উপরে তুলেছিলেন। আমরা পাঁচ বৎসর তাঁকে দেখতে পাই নাই। খালি শুনতুম ঠাকুর বলতেন 'রামলালের খুড়ী'। আমি একদিন জিজ্ঞেস করলুম, 'রামলালের খুড়ী' কে? ঠাকুর বললেন, 'ঐ যে ন'বতে থাকে'। যাঁকে জীবনের ধ্রুবতারা করেছিলাম, পঁয়ত্রিশ বৎসর যাঁর সঙ্গ পেয়েছি, যিনি জীবনের guide (পথপ্রদর্শক) ছিলেন, তাঁকেই দেখতে পাই নাই। ঠাকুর চলে যাবার পর তাঁর মুখদর্শন হয় — অনেকদিন পর। ঠাকুরকে মাত্র পাঁচ বৎসর পেয়েছিলাম — মাকে পঁয়ত্রিশ বৎসর।

দেখ, কেমন আচরণ করেন, তবে তো লোকশিক্ষা দিচ্ছেন। কোন কোন মেয়েরা অপরকে হাত-পা পর্যন্ত দেখায় না — মুখ দেখানো তো দূরের কথা।

ছোট অমূল্য — আজ্ঞে, আমাদেরই সরে যাওয়া উচিত ছিল, ওঁরা যখন আশ্রমে প্রবেশ করেন। তা'হলে ওদের শিক্ষা হতো।

শ্রীম — (জনৈকের প্রতি) আপনি কি বলেন, ইনি যা বললেন?

ভক্ত — আজ্ঞে, কথা ঠিক — আমাদেরই বের হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

শ্রীম — কি করা যায়? Mountain (পর্বত) না গেলে মহম্মদই যাবেন। Mountain (পর্বত) তো যাবে না, কাজেই আপনাদেরই বের হয়ে গেলে ভাল ছিল। ওদের শিক্ষা নাই তেমন।

একজন ভক্ত — (স্বগত) ঢেলা দিয়ে ভাঙ্গছেন ঢেলা!

শ্রীম — মেয়েদেরই বা দোষ কি? যেমন শিক্ষা দেওয়া যায় তারা তেমনি হয়। লজ্জার আবশ্যকতা না থাকলে, এটা ভাল না হলে, কেন এটা সৃষ্টি করলেন ভগবান। ভেতর বাড়ি, বার বাড়ি — এ বিভাগ কেন হলো? বাড়ির কর্তাদের এসব সম্বন্ধে খুব তীক্ষ্ণ নজর রাখা উচিত।

কামিনী হলো ভোগের বিষয়। পোশাক-পরিচ্ছদে আর বিলাসদ্রব্যে সজ্জিত দেখলে সহজেই চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। তা'তে ব্রহ্মচর্যের খুব হানি হয়। ব্রহ্মচারিগণ কোন স্ত্রীঅঙ্গ স্পর্শ করবে না — দেখবেও না।

একজন ভক্ত — কলকাতা থেকে পল্লীগ্রামে লজ্জা বেশী।

শ্রীম — হাঁ, দেশে তবুও এ-বাড়ি ওবাড়ি যাওয়া আসা আছে। কলকাতায় কোন কোন বাড়ির মেয়েরা রাস্তায় বের হয় না — অন্তঃপুরে থাকে।

ভক্ত — ইডেন গার্ডেন, গড়ের মাঠে —

শ্রীম — ও — না, না। এ যে আধুনিকরা। ইংরেজনবিশ বাবুদের প্রাচীন হিন্দুঘরের মেয়ে পছন্দ হবে না। পাউডার-মাখা, ইংরেজী জানা মেয়ে চাই। বাবু চিঠি ডিকটেট্ করছেন, বিবি চেয়ারে বসে টেবিলের উপর লিখছেন। এমন বউ না হলে এদের মন উঠবে না। হিন্দুঘরের ময়লা কাপড় পরা, মাটিতে ফস্ করে বসে গেল, অমন বউ ওদের মনে লাগবে না। এদিকে হয়ত ছেলে মাই খাচ্ছে আবার। সংসারের কত কাজ করছে — দিনরাত খাটুনী। বিলেতঘেঁষা বাবুরা

এই গৃহলক্ষ্মীদের পছন্দ করবে না।

এই যে দিনরাত কাজ, চিত্তসংযমের এর চাইতে আর ভাল উপায় নেই। এতে মন অন্যমনস্ক থাকে।

কোথাও আবার ভাইভগ্নীর মিলন হয়। মেয়েছেলে আর বেটাছেলে মিলে ঢলাঢলি — এ ছাড়া কি আর ভালবাসা প্রকাশের উপায় নেই? (উত্তেজিত ভাবে) আরে, মেয়েদের company (সাহচর্য) তো pleasing (সুখকর)। তা বলে চালাও আলাপ, চলুক মেশামেশি — এর ফল খারাপ বই ভাল হবে না।

কিছুক্ষণ শ্রীম চুপ করিয়া আছেন। আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম — (সহাস্যে) ঠাকুর একটি গল্প বলতেন বেশ। এক সেকরার নিকট একটি মিশ্রিত সোনার ঢেলা ছিল। শুদ্ধ সোনার একটা ঢেলা নিয়ে এলো একজন লোক বিক্রী করতে। দেখে সেকরার লোভ হ'ল! কি করে মিশ্রিত সোনার দর দিয়ে খাঁটি সোনার ঢেলাটি আত্মসাৎ করবে তারই ফন্দি আঁটছে! একটা মতলব ঠাওরিয়ে লোকটিকে দোকানে বসিয়ে রেখে সে বাড়ির ভিতর গেল। পাশেই ঘর। স্ত্রীকে বললে — দেখ, আমি যখন ইঙ্গিত করবো তখন তুমি খুব সেজেগুজে মাঝের দরজাটা ঝনাৎ ক'রে খুলে এসে সামনে দাঁড়াবে। হতভাগা বেটা ঐ রূপ দেখে একেবারে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। আর সেক্‌রা এই ফাঁকে তার কার্যসিদ্ধি ক'রে নিলে। স্ত্রীলোক দেখলেই হাঁ করে চেয়ে থাকে। এমনি চিজ মেয়েমানুষ!

ঘোমটা না দিলে স্ত্রীলোকের আর রইলো কি? মা স্বয়ং লজ্জারূপে এদের ভিতর অবস্থান করেন। এই লজ্জাই যদি না রইলো তবে আর রইলো কি?

ঠাকুর সব বলে গেছেন — কোনও দিক বাকি রাখেন নি। (ভক্তদের প্রতি) এই ভক্তটিকে এ বিষয় একদিন বলে দিতে হবে।

৫

নৈশ আহার শেষ হইয়াছে। এখন রাত্রি প্রায় দশটা। শ্রীম জম্বুতলে বসিয়া আছেন, নিকটে মোহন। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র দেখা যাইতেছে। চন্দ্রও উঠিয়াছে। বনভূমি চন্দ্রকিরণে উদ্ভাসিত হইয়াছে।

শ্রীম — (মোহনের প্রতি) এই দেখ কি কাণ্ডখানা! (এই বলিয়া তর্জনীদ্বারা আকাশ দেখাইলেন) এই যে বিরাট — এই সুন্দর প্রকৃতি, এ সবই তাঁর ইচ্ছায় হয়েছে। তিনি করেছেন। প্ল্যানও তাঁর, কাজও তাঁর! তাই তাঁকে আদি কবি বলে।

ঋষিরা কেহ কেহ এই সুন্দরের উপাসক ছিলেন। ঈশ্বর 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং', আবার 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'। ঠাকুর বলতেন, এই সত্যকে, এই সুন্দরকে দেখতে পেলে রম্ভা, তিলোত্তমা চিতাভস্ম বলে মনে হয়।

যিনি কবি তিনি খোঁজেন সুন্দরকে, আর philosopher (দার্শনিক) খোঁজেন সত্যকে। উভয়ের শেষ এক। যিনি সত্য তিনিই সুন্দর, যিনি সুন্দর তিনিই সত্য। A true poet and a true philosopher are one (একজন যথার্থ কবি আর যথার্থ দার্শনিকে কোন প্রভেদ নাই।)

ফিলজফার eternal existence (অনন্ত জীবন) চায়, temporary (ক্ষণস্থায়ী) জীবনে খুশী নয়। প্লেটোর (Plato) কথায় বলতে হয় — A philosopher seeks 'to find a ground unconditioned and absolute' — (এক অখণ্ড অদ্বিতীয় বস্তু লাভই দার্শনিকের লক্ষ্য)। অর্থাৎ relative existence — (নশ্বর জীবন) নয়, অবিনশ্বর অমৃতত্ব চায় — permanent, immortal existence চায়। ঈশ্বর ছাড়া কিছুই permanent (অবিনশ্বর বা শাশ্বত) নয়। Poet (কবি) চিরসুন্দরকে দেখতে চায় — চির নূতনকে। ঈশ্বর ছাড়া চিরসুন্দর নিত্য নূতন আর কেহ নাই। তাই উভয়ের, কবি ও দার্শনিকের গন্তব্যস্থল এক — ঈশ্বর।

মোহন — এমারসন্ (Emerson) এ ভাবটা নিয়েছেন।

শ্রীম — কি ভাব?

মোহন — A true poet and a true philosopher are one (একজন যথার্থ কবি আর যথার্থ দার্শনিকে কোন প্রভেদ নাই)।

শ্রীম — হাঁ, 'Nature'-এ ('প্রকৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধে) বলেছেন এ কথা। এমারসন্‌কে transcendental naturalist (অলৌকিক প্রকৃতিতত্ত্বজ্ঞ) বলা হয়।

Nature-কে (প্রকৃতিকে), এই জগৎকে, তিনি phenomenon (বিকার) বলেছে — not the substance (ইহা সত্য বস্তু নহে)। substance (সত্যবস্তু) হলো spirit — (আত্মা, পরমেশ্বর)। তাঁকে হৃদয়ে অনুভব করা যায়, কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করা সুকঠিন।

বেশ বলেছেন তিনি — 'যীশুর ন্যায় প্রার্থনামুদ্রায় যুক্তকরে নতমস্তকে nature (প্রকৃতি) যেন ঈশোপাসনায় নিমগ্ন। প্রকৃতির মুখ দিয়ে যেন ঈশ্বর জীবগণকে আহ্বান করে বলছেন, আমি আছি, আমি আছি। আমার কাছে এসো — চিরসুখ চিরশান্তি পাবে, অমৃতত্ব লাভ করবে।'

তিনি প্রকৃতিকে apparition of God (ঈশপ্রতিমা) বলেছেন। হিন্দুদের প্রতিমাপূজার spirit-ও (ভাবও) তাই। এমারসন্ এ দেশের চিন্তাধারার সহিত সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর জীবনে এর প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। এঁর 'ভাব' হতো — ঋষি-চরিত্র!

(মোহনকে) আপনি ড্যান্টে (Dante) পড়েছেন? ওখানা পড়বেন। এর ইংলিশ translation (অনুবাদ) কুরি (Curry) সাহেব করেছেন। খুব সুন্দর বিষয়টি। ড্যান্টে তিনটি picture paint (চিত্র অঙ্কিত) করেছেন — 'হেল', 'পারগেটারি' ও 'হেভেন' — Hell, Purgatory, Heaven.

মোহন — পারগেটারি কি?

শ্রীম — শুদ্ধ পবিত্র হবার চেষ্টা। মানুষের যখন অল্প চৈতন্য হয়েছে, ভোগের ঘোর কেটে গেছে, যখন ভিতরে অল্প ফরসা হচ্ছে, এই অবস্থা। চেষ্টা চলছে ভাল হতে।

অজ্ঞান অবস্থায় সংসার অরণ্যে ভ্রমণকে 'হেল' — নরক বলা হয়েছে। যখন চিত্ত শুদ্ধ হচ্ছে, এগুচ্ছে তাঁরে দিকে, তখন 'পারগেটারি' বা সাধক অবস্থা। তাঁর দর্শন হলে 'হেভেন' — সিদ্ধাবস্থা, তখন কেবল আনন্দ। হেল, পারগেটারি ও হেভেন্ — বদ্ধ, সাধক ও মুক্তাবস্থা।

২০শে চৈত্র, ১৩২৯ সাল। ৩রা এপ্রিল, ১৯২৩ খ্রীঃ।
মঙ্গলবার, কৃষ্ণা দ্বিতীয়া।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

ঈশ্বরকে না জানাই অতি বড় দুঃখ

১

দক্ষিণ প্রান্তর, মিহিজাম। মহুল বৃক্ষতলে শ্রীম বসিয়াছেন, পাশেই অন্তেবাসী। চৈত্র মাস হইলেও প্রভাতে মধুর শীত বোধ হইতেছে। সূর্য উঠিতেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ শ্রীম পাঠ করিতেছেন। জনক সভায় ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য উদ্দালককে বলিতেছেন।

শ্রীম পড়িতেছেন — 'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরোয়ং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ। ...যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো যং বিজ্ঞানং ন বেদ যস্য বিজ্ঞানং শরীরং যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়তি এষঃ তে আত্মা অন্তর্যামীঃ অমৃতঃ। ...অতোঽন্যদার্তম্। (৩/৭)

(অন্তেবাসীর প্রতি) কি উচ্চ ভাব, কি সুন্দর কবিত্বপূর্ণ। এসব কণ্ঠস্থ করে ফেলতে হয়। যিনি পৃথিবীতে আছেন, অর্থাৎ পৃথিবীর অধিষ্ঠাতা দেবতার হৃদয়াভ্যন্তরে আছেন। তথাপি পৃথিবী দেবতা যাঁকে জানেন না, পৃথিবী দেবতাই যাঁর শরীর, আবার যিনি অভ্যন্তরে থেকে পৃথিবী দেবতাকে পরিচালিত করছেন, তিনিই তোমার জিজ্ঞাসিত অমৃত অন্তর্যামী আত্মা। এ ছাড়া আর সব নশ্বর। তিনি সর্ব দেবে, সর্ব জীবে, সর্ব বস্তুতে রয়েছেন, কিন্তু কেউ তাঁকে জানে না। অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ মহাশক্তিশালী হয়েও তাঁর সন্ধান জানেন না। যদিও বা সন্ধান পেলেন, কিন্তু দেখতে পান না। তাঁর কৃপা ছাড়া কেউ তাঁকে দেখতে পায় না।

অন্তরে বাহিরে তিনি। মানুষের মন বুদ্ধি তাঁর শক্তিতে চলছে। মানুষ মনে করে, আমার নিজের শক্তিতে চলছি। তা নয়, সব তাঁর শক্তি। মানুষ অকর্তা, তিনিই কর্তা। আবার বাইরে দেখ — চন্দ্র,

সূর্য, জল, অগ্নি, পবন, এই সারাটি বিশ্ব — সব তাঁর শক্তিতে চলছে। তিনি সকলের সার। জীবজগতের অন্তরে থেকে চালাচ্ছেন তাই তাঁকে অন্তর্যামী বলা হয়।

তাঁকে সূত্রাত্মাও বলা হয়। যেমন ফুলের মালা, নানাজাতীয় নানা রং-এর ফুল — কিন্তু সব ফুলের ভিতর দিয়ে একটিই সূত্র গিয়েছে। তা দিয়েই সব ফুল একত্রে গ্রথিত। তেমনি এই বিশ্বের সকল বস্তু, সকল ব্যক্তির ভিতর তিনি রয়েছেন — সব চালাচ্ছেন। The great organisation and the greatest organiser — (এই বিরাট বিশ্বও তিনি, তার স্রষ্টাও তিনি, আবার পরিচালকও তিনি)।

'তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রবিশৎ' — এই জীবজগৎ সৃজন করেছেন তিনি, আবার এসবের অন্তরেও তিনি। আকাশাদি সূক্ষ্ম পঞ্চভূত সৃষ্টি হলো প্রথম। তারপর হলো মন বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদি। তারপর এই বিচিত্র জগৎ। এই সব সৃষ্টি করে আবার চালাচ্ছেনও তিনি ভিতরে থেকে। তিনি involved (অনুপ্রবিষ্ট) হয়ে আছেন। Involution — (ক্রমসঙ্কোচ, অনুপ্রবেশ) অর্থাৎ ঈশ্বর এই জীবজগতের ভিতর সূত্রাত্মা বা অন্তর্যামীরূপে বিরাজমান। একথা না মানলে — শুধু evolution theory— (ক্রমবিকাশবাদ) অর্থাৎ জগতের পরিচালনকার্যে ঈশ্বরের কোন হাত নাই — আপনি চলছে, জড়বাদীদের এই মত, জাগতিক প্রধান প্রধান সমস্যাগুলির সন্তোষজনক সমাধান করতে পারে না।

এই জীবজগতের উৎপত্তিস্থলও তিনি, গতিও তিনি। সকলকেই যেতে হবে তাঁর কাছে, আগে আর পরে। যেমন ঠাকুর বলতেন, নেমন্তন্ন-বাড়ি থেকে কেউ ফিরে যায় না, সকলেই খাবে — তবে আগে আর পরে।

কেন সকল জীবকেই ঈশ্বরের কাছে যেতে হবে? না, এটা যে জীবের birthright, real nature — (তার জন্মগত অধিকার, তার নিজ স্বরূপ)। জীবত্বটা artificial (কৃত্রিম) — স্বরূপ নয়, দেবত্ব তার স্বরূপ। ঐখানে বাড়ি — our 'Home' is God. ঈশ্বরই আমাদের আপনার জন, গন্তব্যস্থল। সাহেবঘেঁষা বাবুরা ছুটিতে

'হোমে' — বিলেত যান, কিন্তু আমাদের 'হোম' ঐ ঈশ্বর। সকলেই যাবে একদিন সেখানে।

তিনি সকলকে জানেন, তাঁকে সকলে জানে না। তাঁকে জানলে সব জানা হয়। মানুষ অমর হয়ে যায়, জন্ম-মরণ-চক্রের বাইরে চলে যায়। বিষয়টি অতি দুরূহ। তাই নানাভাবে বুঝাবার চেষ্টা হচ্ছে। দৃষ্টিটা যাতে অন্তরে আনা যায় সেই চেষ্টা। বহির্দৃষ্টি সব মানুষ।

দক্ষিণেশ্বর থেকে আসতে গাড়ীর বাইরে মুখ রেখে, ঠাকুর সব লোক দেখতেন। একদিন বললেন, সব দেখছি নিম্নদৃষ্টি। ফৌজদারি বালাখানার মোড়ে দেখলুম একটি লোক উর্দ্ধদৃষ্টি।

অন্তেবাসী — আজ্ঞে, দৃষ্টি অন্তরে আসে কি করে?

শ্রীম — সাধুসঙ্গে। এটি প্রথম। তারপর অভ্যাস আর প্রার্থনা। সাধুরা ঐ চিন্তা করেন কিনা দিনরাত। তাঁদের দেখে নিজেরও করতে ইচ্ছা হয়।

তিনিই transcendent, তিনিই immanent. তিনি দেশকালাতীত, মায়াতীত, আবার তিনিই মায়াময়। তিনিই নির্গুণ বাক্যমনের অতীত, আবার তিনিই সগুণ বাক্যমন, জীবজগৎ হয়ে রয়েছেন। তিনিই সাক্ষী, সূত্রাত্মা, অন্তর্যামী কূটস্থ চেতন। তিনিই সাকার, তিনিই নিরাকার, তিনিই আবার অবতার হয়েছেন। এই সাড়ে তিন হাত মানুষ হয়ে এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে।

অন্তেবাসী — এই মায়া — causation তাঁ'তে রয়েছে, কিন্তু তিনি এতে affected (বিকৃত বা প্রভাবান্বিত) হন না, এ কি করে হতে পারে?

শ্রীম — কেন, সাপের মত! সাপের মুখে বিষ রয়েছে, তাতে সাপের কোন অনিষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু অপরের শরীরে প্রবেশ করলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু, ঠিক তেমনি। মায়া যে তাঁরই সৃষ্টি — তাঁর শক্তিতে কাজ করছে। তাই তাঁর শরণাগত হলে এই মায়া থেকে নিষ্কৃতি লাভ হয়। আর অন্য পথ নাই।

২

এখন সকাল সাড়ে আটটা। শ্রীম বারান্দায় বসিয়া আছেন। ডাক আসিয়াছে। ছোট জিতেন মঠে রাত্রিবাস করিতেছেন — চিঠি আসিয়াছে। চিঠি পড়িয়া শ্রীম অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন।

শ্রীম — (ভক্তদের প্রতি) এ-করা ও-করা — দান, ব্রত, তীর্থ করা ভাল কাজ বটে। কিন্তু ধর্ম অর্থে বুঝি সাধুসঙ্গ করা — কে কত সাধুসঙ্গ করতে পার, করে দেখাও। তবে বুঝি ধর্ম! সাধুসঙ্গ না হলে কিছুই হলো না — হাজার ওসব কর।

মামলা করতে হলে উকীলের কাছে যেতে হয়। অসুখ সারাতে হলে ডাক্তারের কাছে যেতে হয়। তেমনি ঈশ্বরকে চাইলে সাধুসঙ্গ করতে হয়। জিতেনবাবু মঠের মেম্বর হয়ে গেলেন আর কি!

উড়িষ্যা হইতে একখানা পত্র আসিয়াছে। জনৈক ভক্তের পিতা গৃহে অসুস্থ। ভক্ত সম্প্রতি মিহিজাম আশ্রমে রহিয়াছেন। এই কথা হইতেছে।

শ্রীম — মহামায়ার এমনি মায়া, নিশ্চিন্ত হতে দিবেন না। কোথায় দেশ — সামান্য বেতন, কত খরচ করে এসেছে। মনের জোর কত, কি ব্যাকুলতা! কিন্তু আজ বাপের অসুখ সংবাদ এসেছে। তাই, তিনি যখন নিশ্চিন্ত করেন সে সময়টা উঠে পড়ে লাগতে হয়।

শ্রীম কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। আবার কথা কহিতেছেন।

শ্রীম — (একজন ভক্তের প্রতি) আপনারা তো আরও দিনকতক আছেন। এর ভিতর ঘরটরগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে গেলে বেশ ভাল হয়।

ঠাকুর বলতেন, 'ঈশ্বরের পূজা কি শুধু ঠাকুরঘরেই হয় — সর্বত্র, সব ঘরে সব স্থানে।' অর্থাৎ ভক্ত ভাবে — আমার তো কিছুই নাই সব তাঁর, ভগবানের। তা হলে কিছুই নোংরা বা অপরিষ্কার রাখবার যো নাই। সব ফিটফাট্ সুসজ্জিত থাকবে।

তাই শ্যামপুকুরের বাড়িতে ঢুকেই ঠাকুর ভাঁড়ারে প্রবেশ করলেন। দেখছেন, জিনিসপত্র যথাস্থানে রাখা হয়েছে কি না। হাঁড়ি কলসী

বিড়ের উপর বসানো নয়, আর মুখে ঢাকনা নেই — ওই দেখে তক্ষুনি পয়সা দিয়ে একজনকে বাজারে পাঠালেন সরা আর বিড়ে কিনে আনতে। যে জিনিসের যে স্থান সেখানে সেটি রাখতে হয়। ঠিক ঠিক মত না রাখলে লক্ষ্মীছাড়া হয়, বলতেন।

সর্বত্র তাঁর পূজা হচ্ছে — এ ভাবটি স্মরণ রেখে ঘরদোর সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয়। শরীরে, মনে, বাইরে — সর্বত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে, তবে ধর্মজীবন। অন্তর্বহির্শৌচের প্রয়োজন।

মোহন — আজ্ঞে, কত রকম লোকের হাতে আমাদের খেতে হয়, তাতে অনেক সময় মন খুঁৎ খুঁৎ করে, তখন কি করা উচিত?

শ্রীম — অশুচি নোংরা লোকের হাতে দৈবাৎ খেতে হলে, আগে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিতে হয়। শিশিতে করে, হাতে করে, কিংবা চাদরের কোন ভিজিয়ে একটু জল নিতে হয়। গঙ্গাজল না পাওয়া গেলে অন্যজল হাতে নিয়ে — বিষ্ণু স্মরণ করে ছিটিয়ে দিতে হয়।

মোহন — (সহাস্যে) লোকে বলে বড় ভক্ত হয়েছে, ঠাট্টা করে এরূপ করতে দেখলে।

শ্রীম — (উত্তেজিতভাবে) লোকের কথায় কি হবে? লোক পোক। আর লোককেই বা দেখানো কেন? যে খেলে, সে কানাকড়িতে খেলে।

গঙ্গা কি কম! ঠাকুর বলতেন, গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি। গঙ্গার কি কম মাহাত্ম্য! কত সাধু তার তীরে ঈশ্বরদর্শন করেছেন। কত সাধু ভক্ত দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে কাঁদছেন গঙ্গাতীরে বসে। কত ভগবৎপ্রসঙ্গ হয়েছে। গঙ্গাতীরে ভাগবত শুনিয়েছিলেন শুকদেব। এত সব কাণ্ড গঙ্গাতীরে হয়েছে, এখনও হচ্ছে, আরো কত হবে।

লছমনঝোলায় একটি সাধু বসে আছেন গঙ্গাতীরে। আমরা জিজ্ঞেস করলুম, 'কি করছেন মহারাজ?' সাধুটি উত্তর করলেন, 'এই গঙ্গা দর্শন করছি আর গঙ্গার বায়ু সেবন করছি। এ বায়ু পেটে গেলে পেট শুদ্ধ হয়, শরীর মন উভয়ই পবিত্র হয়।' এত মাহাত্ম্য গঙ্গার! তাই ঠাকুর বলতেন, গঙ্গাবারি ব্রহ্মবারি — কলিতে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম।

শুকলালবাবুরও পত্র আসিয়াছে। একজন ভক্ত পড়িয়া উহা শ্রীমকে শুনাইতেছেন।

শ্রীম — (পত্রপাঠান্তে) শুকলালবাবুর কি ব্যাকুলতা! এই চৈত্র মাস, এত কাজের ভিড়! তার মধ্যে পত্রাদি নিত্য দিচ্ছেন। সব ঠাকুরের কথা, ঠাকুরের চিন্তা। সর্বদা মনে এসব স্থানের চিন্তা — এ কি বড় কম কথা। আচ্ছা খেলোয়াড়।

কেমন ঠিক পথটি আবার ধরেছেন দেখুন! নিজে আসতে পারেন না তাই বন্ধুদের দিয়ে সব করিয়ে নিচ্ছেন। নিত্য সংবাদ নিচ্ছেন। এতে নিজেরও হয়ে যাচ্ছে।

পূজার সময় হইয়া আসিল। একটি ভক্ত আশ্রমপ্রাঙ্গণ সম্মার্জন করিতেছেন। শ্রীম হাতে একটি শিশি লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। হাত ধোয়া হইলে ভক্তটির হাতে শিশি হইতে তেল ঢালিয়া দিতেছেন — এই নিন্ তেল। কেশব সেন তেল মাখতেন। ঠাকুর, স্বামীজী এঁরাও মাখতেন। তেল মেখে স্নান করে আসুন।

ভক্তটি ব্রহ্মচারী। তিনি মনে করিতেন, তেল না মাখিলেই ব্রহ্মচর্য পালন হইল। শ্রীম আরো বলিতেছেন, ঠাকুর বলতেন, মাছ পান ছাড়লে কি হবে? — কামিনীকাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ।

৩

মিহিজাম আশ্রম। এখন পূজা হইতেছে। গোলাপাদি সুগন্ধি পুষ্পে শ্রীশ্রীঠাকুর ও বালগোপালকে সজ্জিত করা হইল। আর সুগন্ধি ধূপ ও ফলমিষ্টি নিবেদন করা হইল। বেলা প্রায় নয়টা। শ্রীম নিজের আসনে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। ছোট অমূল্য, বিনয়, জগবন্ধু প্রভৃতি ভক্তরাও ধ্যান করিতেছেন।

ধ্যানান্তে মৈত্রেয়ী উপনিষদ্‌খানা খুলিয়া পাঠ করিতেছেন।

শ্রীম পড়িতেছেন —

দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ।
ত্যজেদজ্ঞাননির্মাল্যং সোঽহং ভাবেন পূজয়েৎ।। (২/১)

চিত্তশুদ্ধিকরং শৌচং বাসনাত্রয়নাশনম্।
জ্ঞানবৈরাগ্যমৃত্তোয়ৈঃ ক্ষালনাচ্ছৌচমুচ্যতে॥ (২/৯)
বিদ্বান্ স্বদেশমুৎসৃজ্য সন্নাসানন্তরং স্বতঃ।
কারাগারবিনির্মুক্ত চোরবৎ দূরতো বসেৎ॥ (২/১১)
বমনাহারবৎ যস্য ভাতি সর্বেষণাদিষু।
তস্যাধিকারঃ সন্ন্যাসে ত্যক্তদেহাভিমানিনঃ॥ (২/১৮)
উত্তমা তত্ত্বচিন্তৈব মধ্যমং শাস্ত্রচিন্তনম্।
অধমা মন্ত্রচিন্তা চ তীর্থভ্রান্ত্যধমাধমা॥ (২/২১)
ধনবৃদ্ধা বয়োবৃদ্ধা বিদ্যাবৃদ্ধস্তথৈব চ।
তে সর্বে জ্ঞানবৃদ্ধস্য কিংকরাঃ শিষ্যকিংকরাঃ॥ (২/২৪)

শ্রীম — ঠাকুর বলতেন, ভক্তের হৃদয় — ভগবানের বৈঠকখানা, ভক্তের দেহ — মন্দির। এখানে তাঁর পূজা হয়। আবার বলতেন, পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব। বাসনাই পাশ। বাসনা থাকলেই বন্ধন, বাসনা ত্যাগ হয়ে গেলেই মুক্তি!

আমার পুত্রলাভ হউক, ধন, ঐশ্বর্য হউক, স্বর্গসুখ লাভ হউক, এ সব বাসনা। অর্থাৎ কামিনীকাঞ্চন — এ সবই ঐ। এতেই চিত্ত অশান্ত হয়, অশুদ্ধ হয়। আমি তাঁর সন্তান, দাস, কিংবা আমিই তিনি — এ ভাবনা জ্ঞান। এতে মনের মলিনতা নষ্ট হয়।

আমি অমুকের সন্তান, অমুক জাতি — এসব অজ্ঞান! আমি ঈশ্বরের সন্তান — এ জ্ঞান। তিনি বলতেন, জ্ঞান-কাঁটা দিয়ে অজ্ঞান-কাঁটা তুলে উভয়ই ফেলে দিতে হয় — তখন বিজ্ঞান। যেমন কাঠ, যতক্ষণ কাঠ ততক্ষণই আগুন। যতক্ষণ বাসনা ততক্ষণই জ্বালা। কাঠ জ্বলে গেলে, কাঠও নাই, অগ্নিও নাই।

জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক বৈরাগ্য, প্রেম — এসব কামনা কামনার মধ্যে নয়। আমি ঈশ্বরের ভক্ত, আমি দাস, কি আমি সন্তান, এ কামনা ভাল। অজ্ঞান নাশ করে দিয়েও এ থাকে, এতে দোষ নাই।

যেমন বলতেন, হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয় — মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়। যেমন হনুমান ঈশ্বরদর্শনের পরও, আমি রামদাস — এই অভিমান রেখেছিলেন।

কিন্তু বড় কঠিন! বাসনা যোগীরও যোগভ্রষ্ট করে ফেলে। তাই সর্বদা প্রার্থনা — 'মা তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না...'

শ্রীম — তীব্র বৈরাগ্য হলে, ঠাকুর বলতেন, সংসার পাতকুয়ো আর আত্মীয়স্বজন কালসর্পের মত মনে হয়। তখন কামিনীকাঞ্চন আপনি ত্যাগ হয়ে যায়। কামক্রোধাদি গলিত পত্রের মত ঝরে পড়ে যায়। সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনীকাঞ্চন যেমন থুথু ফেলে থুথু খাওয়া, তাই 'বমনাহার' বলছেন।

ঠাকুর ভক্তদের ভিতর সব রঙ্গিয়ে দিছলেন। কতকগুলিকে ভিতর বার সব ত্যাগ করিয়ে নিলেন, কতকগুলিকে সংসারে রেখে দিলেন। দেখতেই সংসারী — ভিতর সব লাল (ত্যাগী)।

সন্ন্যাস নিয়ে দূরে চলে যেতে হয় আত্মীয়কুটুম্ব থেকে — out of sight out of mind. আগে বার বৎসর নিখোঁজ হয়ে থাকতো।

ঠাকুর বলতেন, বিচার করে এক, আর তিনি দেখিয়ে দিলে অন্যরূপ।

ধর্মের মূল অনুভূতি, দর্শন। ঠাকুর 'আম খাওয়া' বলতেন। নইলে যেমন প্রতিবিম্বিত আম দেখা। একটা পুকুরের উপর আমের ডাল পড়েছে, তাতে আম হয়েছে, তার প্রতিবিম্ব জলে পড়েছে। সেই প্রতিবিম্ব আম দেখে যেমন আনন্দ। তেমনি শুধু বিচার। কৃপা করে তিনি দর্শন দিলে, তাঁর সঙ্গে আলাপ হলে, যেমন আম খাওয়ার আনন্দ।

সাধুদের প্রণাম করতে হয়, পূজা করতে হয়। কেন করা? তাতে চৈতন্য হয়ে যায়। ঠাকুর কেশব সেনকে বলেছিলেন এই কথা। জ্ঞানবৃদ্ধ কিনা। তাই বলে, 'গোপীভর্তুশ্চরণকমলয়োর্দাস দাসানুদাসঃ'।

(ভক্তদের প্রতি) এই তিনটে শ্লোক মুখস্থ পড়া রইলো সকলের। (১) বিদ্বান্ স্বদেশমুৎসৃজ্য, (২) বমনাহারবৎ আর (৩) উত্তমা তত্ত্বচিন্তৈব।

কুটীরপ্রাঙ্গণ। জম্বুতলে ভক্তগণ উত্তরাস্য বসিয়া আছেন। কেহ

কেহ বন হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। শ্রীম চেয়ারে। ভাগবতপাঠের আয়োজন হইতেছে। বেলা চারটা।

একজন বাবাজী সাধু করতাল বাজাইয়া ‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥’ — এই নাম গান করিতে করিতে পশ্চিম দিক হইতে আসিতেছেন। বাবাজীর শরীরে হরিনামের ছাপ। তিনি আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ‘দণ্ডবৎ’ আদি শেষ হইলে ভাগবতপাঠ আরম্ভ হইল — পিঙ্গলার উপাখ্যান।

শ্রীম — দেহগৃহের কথাটা আবার পড়ুন তো।

ছোট অমূল্য (পড়িতেছেন) — যাহার মেরুদণ্ড, পঞ্জর, জানু, জঙ্ঘা, হস্ত, পদ সমস্তই অস্থিময় এবং ত্বক, রোম ও নখাদি দ্বারা যাহা পরিবৃত — অপিচ যাহাতে নবদ্বার ক্ষরিত হইতেছে, সেই বিষ্ঠামূত্র পরিপূর্ণ এই দেহগৃহ।

শ্রীম — অর্থাৎ যা বিনাশশীল এমন যে দেহ তাতে আত্মবুদ্ধি করলেই বদ্ধ। দেহ আলাদা, আমি অর্থাৎ আত্মা আলাদা, এই বুদ্ধি হলে ধর্মজীবন আরম্ভ হলো।

পাঠ শেষ হইল।

শ্রীম — নৈরাশ্যং পরমং সুখং। নৈরাশ্য মানে despair নয়। নৈরাশ্য মানে, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ — surrender to God, ঈশ্বরে নির্ভরতা। তাঁর কৃপায় তাঁ’তে বিশ্বাস হলেই নির্ভরতা। পিঙ্গলা বলছেন, ‘আমি যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট থাকিব আর শ্রীহরির পাদপদ্ম চিন্তা করিব।’ তা হলেই হয়ে গেল।

ঠাকুর বলেছিলেন, আমার আদর্শ ছিল — একটি কুটীর থাকবে — শাকভাত খাব, আর তাঁর নাম করবো দিনরাত।

৪

ঠাকুরঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ ও ধূপ দেওয়া হইল। ধ্যানও শেষ হইয়াছে। এখন প্রায় সাড়ে আটটা।

আজ বড় গরম পড়িয়াছে। গৃহে বসিতে কষ্ট হইতেছে, তাই

বাহিরে জম্বুবেদীকাতে আসন পাতা হইল। শ্রীম চেয়ারে। বিনয়, ছোট অমূল্য ও গদাধর বসিয়া আছেন। জগবন্ধু শ্রীম-র নির্দেশমত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, তৃতীয় ভাগ, পঞ্চদশ খণ্ড পড়িতেছেন। আজ রাত্রিতে বাহিরে প্রথম পাঠ।

শ্রীম বলিতেছেন — এই আরণ্যক হচ্ছে। (পাঠকের প্রতি) বুঝলেন, এর নাম আরণ্যক। হয়তো মনে হচ্ছে, আরণ্যক না জানি কি? এই আরণ্যক। মানে নির্জনে ঈশ্বরচিন্তা — তাঁর আলোচনা।

কুটীর প্রাঙ্গণে চেয়ারে শ্রীম বসিয়া আছেন। নৈশ ভোজন শেষ হইয়াছে। এখন রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা। পূর্বাকাশ আলোকিত করিয়া চন্দ্রোদয় হইতেছে। বেদিকোপরি ভক্তগণ কেহ কেহ বসিয়া আছেন।

— বাবু ঠাকুরের ভক্ত, শ্রীম-র খুব অনুগত। কলিকাতায় বাড়ি, অনেক বিষয়সম্পত্তি আছে। ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল। বৈষয়িক ঝঞ্ঝাটের জন্য মনে অশান্তি। পত্রদ্বারা ইহা নিবেদন করিয়াছেন। ভক্তসঙ্গে ঈশ্বরীয় কথায় মনে শান্তি পাইবেন, এইজন্য শ্রীম জনৈক সেবককে কলিকাতা যাইয়া তাঁহার সাহায্য করিতে আদেশ করিলেন। সেবকের শিক্ষা চলিতেছে।

শ্রীম — (সেবকের প্রতি) — বাবুকে বলবেন শিমুলতলা যেতে পারা গেল না — শরীর বড় দুর্বল। জামতাড়া থেকে মোটরে এখানে আসতে হয়েছিল, কেওরজালি গিয়েও বসে পড়লুম। কাল একটু বেড়ান হয়েছিল, তাতে দুর্বলতা অনুভব করছি।

— বাবু শিমুলতলায় বেশ আড্ডাটি করেছেন। ওখানে গিয়ে তো থাকতে পারেন মাঝে মাঝে — প্রতি মাসে দু'তিন দিন, কখনও বা দু'দশ দিন। একলা, আর কেউ না — খালি রাঁধুনি একজন।

আর একজন থাকলে ভার নিতে পারতো, কিন্তু কেউ যে নেই তেমন। বৃহৎ সংসার আর অনেক বিষয়, সব নিজেকে দেখতে হচ্ছে। ছেলে, জামাই, আত্মীয়কুটুম্ব সকলের ভার এঁর উপর — কি আশ্চর্য!

আচ্ছা, উনি তো এদের টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারেন। তা করুন না? ওরা সব আলাদা বাড়ি করে থাকবে, উনি কেবল টাকা

দিয়ে সাহায্য করবেন। বিদ্যেসাগরমশায় এটি করতেন। সকলকে টাকা দিয়ে সন্তুষ্ট রেখে নিজে একলা এক বাড়িতে থাকতেন। যত্ন করতে হয়, দেখতে হয়, দেখুন না টাকা দিয়ে।

আর এতে ওদেরও ভাল হবে। Direct control-এ — (একেবারে সরাসরি অধীনে) সব রাখতে নাই। সব বিষয় নিজে দেখতে দেখতে ওদের individuality (ব্যক্তিত্ব) খাটো হয়ে যায় — চাপা পড়ে যায় — দুর্বল হয়ে পড়ে। দুর্বল হয়ে সংসারে তলিয়ে যায়। সংসার উত্তাল তরঙ্গসমাকীর্ণ মহাসাগর। দুর্বলরা পারে না এতে মাথা উঁচু করে থাকতে। যেই বিপদআপদে পড়লো অমনি নুইয়ে যায়, নেতিয়ে পড়ে। সুখ খোঁজে খালি।

স্বামীজী বলতেন, যাদের বিপদআপদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই তারা babies, little babies — (দুগ্ধপোষ্য শিশু সব)! বন্ধুদের বলতেন, বিপদ কি জিনিস তা তোরা কি বুঝবি? যাদের বিপদ হয় নাই তারা আবার মানুষ!

ঠাকুর বলতেন, যারা সুখ খোঁজে কেবল, তাদের দাম পাঁচ টাকা! যারা সিদ্ধাসিদ্ধে নির্বিকার, তাদের দাম পঁচাত্তর টাকা। যেমন তেজী গরু ছিনিমিনি করে উঠে লেজে হাত দিলে। pleasurable sensation-এ yield (আনন্দে আত্মহারা) করে না — তারা দেহসুখের বশ নয়।

স্পার্টাতে এক সময় দুর্বল লোকদের একটা উঁচু পাহাড় থেকে ফেলে দিয়ে মেরে ফেলতো। ঐ দেশের লোকেরা মনে করতো দুর্বলরা উন্নতির প্রতিবন্ধক। দুর্বল দিয়ে কোন কাজ হয় না। (উত্তেজিতভাবে) যারা বিপদের ভিতর দিয়ে যায় নাই তারা আবার মানুষ? — ছি!

মহাপুরুষের লক্ষণ — বিপদে ধীর স্থির, সম্পদে ক্ষমাশীল, বাক্যে পটু ও যুদ্ধে পারদর্শী — সিংহতুল্য। বিপদে লোক সদ্‌ভাবাপন্ন হয় — যারা শুভ সংস্কারবান। দেখ না পাণ্ডবদের। কত বিপদ — কিন্তু ন্যায় পথ, সত্যের পথ ছাড়েন নাই। তাই ভগবান রইলেন সঙ্গে সঙ্গে। দুঃখ ঘুচলো না — দুঃখে এঁদের জীবনের উৎকর্ষ আরো

ফুটে উঠেছে। বিপদের মত এমন উত্তম শিক্ষক আর কেউ নাই। বিপদে মানুষের সদ্‌গুণাবলী বিকশিত হয়, শক্তি বৃদ্ধি হয়।

নেপোলিয়ন সৈনিকের কর্ম করছেন — হঠাৎ কর্ম গেল। বাড়ি থেকে মা পত্র দিলেন, ‘বাবা বড় কষ্টে আছি, টাকা পাঠাও’। কিন্তু হাতে কিছুই নাই। মায়ের কষ্টের কথা শুনে আর সহ্য করতে পারলেন না। সংকল্প করলেন জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করবেন। নদীতীরে গিয়ে জলে ঝাঁপ দিবার যেই উদ্যোগ করছেন, অমনি পেছন থেকে এক বন্ধু এসে কাপড় টেনে ধরলে, আর বললে, ‘নেপোলিয়ন, তোমায় এমন দেখাচ্ছে কেন? — কখনও তো তোমার চেহারা এরূপ দেখিনি!’ তখন বন্ধুকে সব কথা বললেন, কিন্তু মৃত্যুর জন্য যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন সেটি বলেন নাই। বন্ধুর কোমরবন্ধে অনেক অর্থ ছিল — দু’ হাজার মুদ্রা বুঝি, সেগুলি তাঁকে বের করে দিল। ডাক চলে যাবে বলে টাকা নিয়ে অমনি দৌড় পোস্ট অফিসে। ফিরে এসে আর বন্ধুকে পেলেন না। অনেক দিন আর তার সঙ্গে দেখা নাই। তারপর ইটালি ইজিপ্টে গেলেন, জেনারেল হলেন। ক্রমে কনসাল, ডিক্টেটার, শেষে সম্রাট হলেন। একদিন শোভাযাত্রা ক’রে নেপোলিয়ান যাচ্ছেন। রাজপথে অসংখ্য লোক দু’ধারে সার ক’রে দাঁড়িয়ে আছে। রাজদর্শন করছে। এদের ভিতর অনেকটা দূরে পূর্বের বন্ধুটি দাঁড়িয়ে আছে, দেখতে পেলেন। তাকে ডাকিয়ে এনে সঙ্গে ক’রে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেলেন। বন্ধু তেমনি ভদ্র ও বিবেচক — অর্থসাহায্যের কথা একবারও মুখে আনে নাই। ভাবলো, বড় হয়েছেন তা বেশ ভালই হয়েছে। নেপোলিয়ান বহু অনুনয় বিনয় করে বন্ধুকে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত করলেন, আর বহু অর্থ উপহারস্বরূপ প্রদান করলেন।

সেবক — নেপোলিয়ানের কত মহত্ব, বন্ধুকে রাজসম্মান দিলেন প্রকাশ্যে! স্বামীজীও এরূপ করেছিলেন শুনেছি। আলমোড়ায় প্রকাশ্য সভায়, যে ফকির একটি শশা খাইয়ে স্বামীজীর প্রাণরক্ষা করেছিল তাকে বহু সম্মান দিয়েছিলেন, আর কিছু উপহারও দিয়েছিলেন।

শ্রীম — মহাপুরুষদের লক্ষণই এই, তাঁরা উপকার চিরকাল

মনে রাখেন — চিরকৃতজ্ঞ।

পুনরায় পূর্ব প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল।

৫

শ্রীম — (সেবকের প্রতি) বিদ্যাসাগরমশায় — চৌদ্দ বছর বয়স। বাপ ছ'টাকা বেতনে খাতা লেখেন। ছোট চারটি ভাই — সকলের রান্না নিজে হাতে করতেন। ওদের খাইয়ে নিজে খেতেন। নিজেই আমাদের কাছে গল্প করতেন। সকালে অম্বল হতো, তারই একটু থাকতো। রাত্রে ঐ অম্বল আর ভাত। এদিকে নিজের জলপানির টাকা দিয়ে গরীব ছাত্রদের বেতন দিতেন। পোশাক ছেলেবেলায় যা ছিল — থান কাপড় আর চাদর, তালতলার চটি আর উড়ে চুল — বরাবরই তা রেখেছিলেন। অনেকে ওঁকে চিনতে পারতো না।

একবার কারমাটারে গেছেন। ওখানে একটি বাড়ি করে ছিলেন — মাঝে মাঝে থাকতেন। একদিন একজন বাঙ্গালী বাবু একটি কুলি খুঁজছেন, তাঁর ব্যাগটা নেবে। বিদ্যেসাগরমশায় ব্যাগটা বয়ে নিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিলেন। কিন্তু পয়সা নিলেন না। অন্য লোকেরা বলাবলি করছে — 'আরে এযে বিদ্যেসাগরমশায়!' তিনি শুধু মৃদুবাক্যে তাকে বললেন, 'ব্যাগটা আপনার এইটুকু দূর বয়ে নেওয়া উচিত, কুলি ছাড়া।'

বিপদের ভিতর দিয়ে গিছলেন বলে বিদ্যেসাগরমশায়ের চরিত্র এত উজ্জ্বল। আর চিরকাল বিপদে অপরকে সহায়তা করতেন। বিপদে পড়লে পুরুষকার বৃদ্ধি হয়। ঈশ্বরে বিশ্বাস বাড়ে।

বিলেতে পুরুষকারের ফল চোখের সামনে দেখতে পাওয়া যায়। ছেলে বড় হয়েছে, বাপ তাকে হয়ত পঞ্চাশ পাউণ্ড দিয়ে বললেন, যাও, এ দিয়ে করে খাও। ছেলে অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা কি কানাডায় চলে গেল। কয়েক বছর পর কোটিপতি হয়ে ফিরে এলো। পুরুষকারের এই ফল ওদেশে দেখতে পাওয়া যায়।

শ্রীম — (সেবকের প্রতি) আপনি — বাবুকে বলবেন বিদ্যেসাগরমশায়ের কথা। তিনি আত্মীয়দের টাকা দিয়ে সাহায্য

করতেন আলাদা রেখে। নিজে একলা থাকতেন। একথা আমরা বলেছি বলে বলবেন।

ভাতকাপড়ের জন্য দুঃখকষ্ট — এ আর কি দুঃখকষ্ট! ভগবানকে না জানাই সব চাইতে বড় দুঃখ। যাঁরা তাঁকে জেনেছেন, কত দুঃখকষ্ট বরণ করে তবে জেনেছেন। বুদ্ধদেব রাজার ছেলে — কিন্তু কি দুঃখকষ্ট বরণ করলেন তপস্যায়!

একজন ভ্যাক করে কেঁদে ফেলেছিল, একদিন ভাল খাওয়া হয় নাই বলে। এসব লোকের দ্বারা মহৎ কাজ হয় না।

দিলীপরাজার ছেলে হয় না, তার জন্য কত কষ্ট করলেন। অত বড় রাজা — সস্ত্রীক গুরুর আশ্রমে গিয়ে সামান্য দাসদাসীর ন্যায় বাস করতে লাগলেন। গরুকে জাব দেওয়া, উঠোন ঝাড়ু দেওয়া, গরু চরান — এসব কাজ করতে লাগলেন। আগে এই রকম সেবা করে গুরুর কৃপা লাভ করতো।

দুর্বলচিত্তকে গুরু কাছে রাখেন না। পঁচাত্তর টাকার গরুর মত তেজী না হলে, no compromise (আপোষ নাই)। দেহ সুখ চাই না, এরূপ না বললে গুরু কাছে থাকতে দেন না। বেদে আছে, ‘নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ’।

এই জন্য গুরু শিষ্যকে পরীক্ষা করেন যখন শিষ্য আসে তখনই। আরুণিকে দিলেন গরু চরাতে, সত্যকামকেও তাই। যখন বুঝতে পারেন শক্ত লোক, এ আমার উপযুক্ত শিষ্য হবে, তখন গুরুর কৃপা হয়।

শ্রীম — ভগবান গীতায় বলেছেন, ‘পৌরুষং নৃষু’ — আমি মানুষের ভিতর পুরুষকাররূপে রয়েছি। পুরুষকারও তিনি। এটি দরকার। গুরু যা বলেন তা করতে হয়। অন্তত চেষ্টা করতে হয়। তাই ক্রাইস্ট বলেছিলেন, ভক্তেরা কথা সব শুনতো, কিন্তু পালন করতে চেষ্টা করতো না। এই অবস্থা দেখে বলেছিলেন, 'And why call ye me, Lord, Lord, and do not the things which I say?' (St. Luke 6:46) — আমার কথা পালন না করে শুধু আমার দোহাই দিলে কি হবে?

সদগুরু যিনি তিনি কর্ম কমিয়ে দেন। কি করে অবসর হবে তাঁকে ডাকবার সেই রাস্তা দেখিয়ে দেন! পালন করলে বেঁচে গেল, নয়তো দুঃখ।

(সেবকের প্রতি) আপনি বলবেন বিদ্যেসাগরমশায়ের কথা বলে — তিনি এমন করতেন। নিজে একা থাকতেন, আর টাকা দিয়ে দেখতেন সবাইকে। একি, সব বিষয়ে নিজে জড়িত হলে সময় কই? এটা দেখতে ওটা দেখতেই সব সময় চলে যায়। ঈশ্বরচিন্তার সময় হয় না।

শ্রীম — দিগম্বর মিত্র বলে কলকাতায় একজন জমিদার ছিলেন। পনের বিশ হাজার টাকা আয় মাসে মাসে। গরীব অবস্থা থেকে উঠেছেন দোকান করে। আস্তাবলভরা ঘোড়া আর গাড়ী। কিন্তু ছেলেদের অতি simple (সরলভাবে) জীবনযাপন করতে শিখিয়েছিলেন। হেঁটে হেঁটে হিন্দু স্কুলে যেতো — এক হাতে বই আর এক হাতে ছাতা। ছাতাটি হাতে করে নিতে হবে।

অত গাড়ীঘোড়া — কিন্তু তা চড়তে দেবেন না। বলতেন, 'কেন মানুষ কি পায়ে হেঁটে চলে না?' পোশাকপরিচ্ছদে, খাওয়াদাওয়ায় অতি সাধারণ ভাব। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতেন, 'ছেলেদের এভাবে শিক্ষা দেওয়া দরকার — নয়তো সম্পত্তি রাখতে পারবে না। তারপর যখন বড় হবে, বুঝবে সব, তখন যা ইচ্ছা তা করুক। ছেলেবেলায় কঠোর শাসনে — strict discipline-এ রাখতে হয়।' নিজে গরীব ছিলেন, তাই simplicity (জীবনযাত্রায় সরলতার) কত দরকার সব বিষয়ে, তা বুঝেছিলেন। (সেবকের প্রতি) আপনি দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের কথাটিও বলবেন।

সেবক — (আত্মগত) সদ্‌গুরু ছাড়া কেউ আত্মীয় নয় সংসারে। এই ভক্তের জন্য শ্রীম-র কি ভাবনা — কি সহানুভূতি! ভক্ত নির্জনবাস ও সৎসঙ্গের জন্য ব্যাকুল — কি উপায়ে উহা সম্ভব হতে পারে তার কথাই সর্বদা ভাবছেন। কি করে সংসারের octopus (কঠিন বন্ধন) থেকে বাইরে আসতে পারেন তার উপায় বলে দিচ্ছেন। হৃদয়ের অন্তঃস্তল ভেদ করে যেন কথাগুলি আসছে।

শ্রীম — সব বিষয় নিজে অমন করে দেখা ভাল নয়। এমন অনেক কর্তা আছে দেখেছি, তারা জানে ছেলেদের হাতে ছেড়ে দিলে দ্বিগুণ খরচ হবে, তবু ওদের হাতে ভার ছেড়ে দেয় সংসারের। কেন না, ওদের individuality (ব্যক্তিত্ব) যে বাড়াতে হবে, তাই।

ও রকম করলে, সবটা নিজে দেখতে গেলে ও নিয়েই জন্ম কেটে যায়। আসল কাজের কি হলো? 'বাবা, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু — তাঁকে না জানলে কিছুই হলো না' — ঠাকুরের এই মহাবাক্য কি বিফলে যাবে?

(সেবকের প্রতি) হাঁ, আপনি গিয়ে আমাদের কথামত ওঁকে suggestion (পরামর্শ) দিবেন। বিদ্যেসাগরমশায়ের মত টাকা দিয়ে সকলকে তুষ্ট রাখুন, আর মাঝে মাঝে নির্জনে শিমুলতলায় চলে আসুন।

ধন্য ভক্ত, ধন্য তুমি! তোমার জন্য এ মহাপুরুষ এত ভাবিত!

এখন রাত্রি প্রায় এগারটা। আশ্রম ও বনভূমি চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত। শ্রীম প্রাঙ্গণে পাদচারণ করিতেছেন। একটি ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, 'গরমে সাপ বেরুচ্ছে। এখন আর মাঠে গাছতলায় রাত্রে যাওয়া উচিত নয়।'

২১শে চৈত্র, ১৩২৯ সাল,
৪ঠা এপ্রিল, ১৯২৩ খ্রীঃ
বুধবার, কৃষ্ণা তৃতীয়া।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

ম্যাক্সমূলার ও শ্রীরামকৃষ্ণ — গীতার ছয়টি শ্লোক

১

বসন্তপ্রভাত। সূর্য উদিত হইতেছে। শ্রীম অশ্বত্থমূলে বসিয়া আছেন, নিকটে মোহন প্রশ্ন করিতেছেন।

মোহন — আজ্ঞে, সেদিন বলেছিলেন, ধর্মসমন্বয় ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু, ইহা তো পূর্বেও ছিল। 'একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।' এ তো বেদের কথা। আবার গীতায়ও ভগবান বলেছেন, সকল মানুষই আমার ভজনা করে — নানাভাবে।

শ্রীম — হাঁ, সমন্বয়ের কথা সব শাস্ত্রে আছে। কিন্তু কালক্রমে লোক এই সব কথা ভুলে যায়। ঠাকুর সেগুলি নিজ জীবনে দেখাতে এসেছেন। তিনি বলতেন, পাঁজিতে লিখেছে বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপলে এক ফোঁটাও পড়ে না। শাস্ত্রে থাকলেই তো হয় না, লোকে দেখতে চায় জীবন্ত। তাই ভগবান মানুষ হয়ে এসে এসব বুঝান।

এখন আবার সমস্ত জগৎটা একটা family-র (পরিবারের) মত হয়ে গেছে সায়েন্সের প্রভাবে। তাই ঠাকুর প্রধান প্রধান ধর্মমতগুলি নিজ জীবনে সাধন করলেন — মুসলমান, খ্রীস্টান ধর্ম পর্যন্ত। শেষে বললেন, যত মত তত পথ — মত পথ।

কারুকে বাদ দিবার যো নাই। সকলেই তাঁকে ডাকছে — একজনকেই। লোক যাদের অসভ্য বর্বর, savage বলে তারাও তাঁকেই ডাকছে। মানুষের এটা একটা necessity (প্রয়োজন), ঈশ্বরকে ডাকা। সংসারে সুখ নাই কিনা তাই! Fetishism (ভূতপূজা) থেকে ব্রহ্মজ্ঞান পর্যন্ত সব সত্য।

ভাষা ভিন্ন ভিন্ন। কোন ভাষায় বেশী প্রকাশ, কোনটাতে কম।

যেমন ঠাকুর বলতেন, বাপের পাঁচ ছেলে — কেউ বলছে বাবা, কেউ বাপু, কেউ বা, যে খুব ছোট, সে তা-ও বলতে পারছে না। কিন্তু ভিতরে স্নেহ আছে, ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না, বলতে পারে না। ভগবান দর্শন দিলে ধ্রুবের স্তব করতে ইচ্ছা হলো, কিন্তু ভাষা নাই। যেই বেদশঙ্খ ছুঁইয়ে দিলেন, অমনি স্তব বের হতে লাগলো।

যারা জঙ্গলে থাকে, হিংসাবৃত্তি করে যারা জীবনধারণ করে, এমন মানুষও তাঁকে ডাকে। তাদেরও বিশ্বাস আছে, একজন উপরে আছেন, যিনি তাদের খেতে পরতে দেন, বৃষ্টি দেন, শস্য দেন, শিকার দেন।

রেড ইণ্ডিয়ানদের ভিতর খুব উচ্চ ধর্মভাব ছিল। Supreme Being— ঈশ্বরকে তারা মেনিটো (Manitou) বলতো। তাদের মত, ঈশ্বরই সব হয়ে রয়েছেন। বেদান্তের এই উচ্চভাব তাদের ছিল। কি আশ্চর্য! কি করে গেল এই ভাব — Pantheism (সর্বঈশ্বরবাদ)। তারা হয়তো পূর্বে ভারতবর্ষের ছিল, তারপর migrate করে আমেরিকায় চলে যায়। বেদের 'তত্ত্বমসি' — এই উচ্চ চিন্তার সঙ্গে তারা পরিচিত ছিল। তারা বলতো — 'Cummanittou' – you are God — জীব শিব। এ বেদান্তের চূড়ান্ত কথা।

আজকাল পাশ্চাত্ত্যে comparative religions-এর study (বিভিন্ন ধর্মের তুলনাত্মক পঠনপাঠন) চলেছে। এতে এইসব অমূল্য সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। পড়বেন এসব — 'হিবার্ট লেক্চারস্', 'গিফোর্ড লেকচারস্', 'ধর্মবিজ্ঞান-বিষয়ক বক্তৃতা' — এই সব (Max Muller's 'Hibbert Lectures', 'Gifford Lectures', 'Lectures on Science of Religions').

মোহন — আজ্ঞে, ম্যাক্সমূলার একটু দেখেছিলাম। তিনিও বলেন সব ধর্ম সত্য। কিন্তু মিশনারীগণ তাঁর একথা নিতে চান না।

শ্রীম — (সহাস্যে) ওদের যে ব্যবসা থাকে না, তা হলে। ম্যাক্সমূলার এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন comparative religions (তুলনামূলক ধর্মমত) আলোচনা করে। ঠাকুর সাধনা করে, নানা ধর্মমতে সিদ্ধ হয়ে তবে বলেছেন — 'যত মত তত পথ'। একটি

হলো intellectual study (শুধু বিচারাত্মক আলোচনা), আর একটি direct realisation (প্রত্যক্ষ অনুভূতি) — অনেক তফাৎ।

মোহন — ম্যাক্সমূলার খুব fearless and uncompromising (নির্ভীক আর অচল অটল) নিজের সিদ্ধান্তসম্বন্ধে। মিশনারীগণ বলেন, কেবল খ্রীস্টান ধর্ম সত্য, আর সব মিথ্যা। তিনি তাদের কথা নেন না। তিনি বলেন, সব ধর্মেই grains of truth (সত্যের বীজ) নিহিত আছে।

শ্রীম — আবার ওটিও বল — he is sympathetic like a mother (মায়ের মত দরদী) আর গুণগ্রাহী। অসভ্য বর্বরদের ধর্মকেও তিনি সত্য বলেন। তিনি বেশ একটি কথা বলেছিলেন, শুধু কথার literal (শব্দগত) অর্থ করলে চলবে না, ভাব দেখতে হয়। নিজে এটি করতেন, আর (সিস্টার) নিবেদিতারও এটি দেখেছি।

কি শক্তিমান পুরুষ! তিনিই তো বেদ-উপনিষদ্‌কে রাখলেন। এ দেশেরই লোক ওখানে গিয়ে জন্ম নিয়েছেন। স্বামীজীও খুব সুখ্যাতি করতেন। কখনও বলতেন, যেন বশিষ্ঠদেবকে দেখে এলুম। কখনও বলতেন, বেদভাষ্যকার সায়ন এই শরীরে এসেছেন। কি ধৈর্য্য! সংস্কৃত অত কঠিন ভাষা, কিন্তু কেমন শিখেছিলেন। অর্ধশতাব্দী ধরে বেদ সঙ্কলন করলেন। কি অধ্যবসায়, কি পাণ্ডিত্য!

স্বামীজীকে পেয়ে কত আহ্লাদ, কত আদর করলেন তাঁকে। আর কি মহৎ — সাউদামপ্‌টন লণ্ডন স্টেশনে বুঝি স্বামীজীর উপর ছাতা খুলে ধরলেন। তিনি আপত্তি করলে বললেন, ‘it is not everyday that the son of Sri Ramakrishna can be seen’– শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানকে রোজ দেখতে পাওয়া যায় না। দেখ, কি উদার হৃদয়, কি গভীর অন্তর্দৃষ্টি! অতবড় মানী পণ্ডিত, আর ঐ রাজসিক দেশে জন্ম, কিন্তু কি নিরভিমান! এ সবই মহাপুরুষের লক্ষণ।

তিনি বলেছিলেন, ঠাকুর না এলে তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত অপরকে বোঝান কষ্ট হতো। ঠাকুরের জীবন দেখিয়ে বললেন, ইনি নিজ জীবনে সাধন করে দেখিয়েছেন — সব ধর্ম সত্য।

কেশব সেনকে ম্যাক্সমূলার watch (পর্যবেক্ষণ) করতেন। ঠাকুরের সঙ্গে মিলনের পর কেশববাবুর অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। ম্যাক্সমূলার এটা notice (লক্ষ্য) করেছিলেন। কিন্তু কি করে পরিবর্তন হলো তখনও তিনি ভাল করে বুঝতে পারেন নাই। তারপর যখন স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর মিলন হলো, আর ঠাকুরের সব কথা শুনলেন, তখন সব বুঝতে পেরেছিলেন। শেষে ঠাকুরের জীবনচরিত লিখলেন।

মোহন — ম্যাক্সমূলার বেশ সুন্দর একটি উপমা দিয়েছেন। মানুষ এক আকাশের নানাভাবে বর্ণনা করে। কেউ বলে আকাশ উজ্জ্বল, কেউ বলে কৃষ্ণবর্ণ, কেউ বলে মেঘাবৃত, ইত্যাদি। নানা ভাবে উপাধি সহযোগে এক নিরুপাধিক আকাশকে লোক বর্ণনা করে থাকে। তেমনি ঈশ্বর এক অদ্বিতীয় নিরুপাধিক বস্তু হলেও বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ভাষায় তাঁর বর্ণনা করে। ভাব এক, ভাষা অনেক। এ থেকেই Polyonomy (বহুনামবাদ) ও Polytheism এর (বহু ঈশ্বরবাদের) সৃষ্টি। কিন্তু supreme being – পরমেশ্বর, এক।

শ্রীম — ঠাকুরও তাই বললেন — জল বস্তু এক, কিন্তু কেউ বলে জল, কেউ পানি, কেউ ওয়াটার, কেউ বলে একুয়া। নানা নাম, বস্তু এক। ছেলেদের রুচি অনুসারে মা মাছের ঝোল, ঝাল, ভাজা, কালিয়া পোলাও — নানান্‌খানা রেঁধে দেন। বস্তু এক — মাছ।

হিন্দুরা বলে 'ব্রহ্ম', মুসলমান বলে 'আল্লা'। খ্রীস্টান বলে 'ফাদার', জু বলে 'জোহোবা'। পার্শিরা বলে 'আহুর মাজদা', চীনারা বলে 'তাই' (Ti)। গ্রীকরা বলতো 'জিউস', বেবিলোনিয়ানরা বলতো 'বেলাস্‌'। এসিরিয়ান বলতো 'মেরোডাক'। প্রাচীন ইজিপসিয়ান বলতো 'সামাস্‌'। 'মেনিটো' বলতো রেড ইণ্ডিয়ানরা — কত নাম! এক হিন্দুরাই আরো কত নামে বলে — রাম, কৃষ্ণ, হরি, ভগবান, পরমাত্মা, শিব, বিষ্ণু, শক্তি — কত কি, অন্ত নাই! এক রাম তাঁর শত নাম। ঠাকুর তাঁকেই মা বলতেন। চীনদেশের লাওজে (Lao Tse) ঈশ্বরকে কখন কখনও মা বলতেন।

আবার এই মা-ই ঠাকুর হয়ে এসেছেন। কি আশ্চর্য বল দেখি!

যাঁকে নিয়ে নানা দেশের নানা শাস্ত্র ব্যস্ত — তিনি সাড়ে তিন হাত মানুষ হয়ে এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। এই তত্ত্ব মানুষ বোঝে কি করে তিনি না বোঝালে!

এখন সকাল আটটা। শ্রীম জগবন্ধুর হাতে চারটি টাকা দিয়া বলিলেন, পরেশবাবুর কম্পাউণ্ডারকে এই ক'টা টাকা দিয়ে এই কথা বলবেন..., আর পরেশবাবুর কাছ থেকে শেক্সপীয়রখানা আবার চেয়ে আনবেন। জগবন্ধু রওনা হইয়াছেন, শ্রীম পিছন হইতে ডাকিয়া থামাইয়া বলিলেন, টাকা কোথায়?

জগবন্ধু — আজ্ঞে, এই হাতে।

শ্রীম — না, না। হাতে রাখতে নেই। পরনের কাপড়ের খোঁটে বাঁধুন — সাবধান হতে হয়।

জগবন্ধু তাহাই করিলেন। যাইতে যাইতে ভাবিতেছেন, 'মাস্টার মশায় (শ্রীম) এরূপ কেন বললেন? আমি তো ছেলেমানুষ নই।' ফিরিবার পথে তিনি ইহার সুগভীর মর্ম উপলব্ধি করিলেন। তিনি বুঝিলেন — হাতে থাকিলে উহা দেখিয়া অপরের লোভ হইতে পারে, আর তাহাতে বিপদ ঘটিতে পারে। আর হাত হইতে উহা নষ্ট হইবার সম্ভাবনাও বেশি।

এইবার ডাক আসিয়াছে। আশ্রমের নিয়মানুসারে পত্র সব পড়া হইতেছে, শ্রীম শুনিতেছেন। কলিকাতা হইতে একজন ভক্ত লিখিতেছেন, তিনি বড় ঝঞ্ঝাটে পড়িয়াছেন — মনে অশান্তি।

শ্রীম — (জনৈক সেবকের প্রতি) ইনি ঝঞ্ঝাটে পড়েছেন, help (সহায়তা) চান। তাহলে আপনি শীঘ্র যান দুই একদিনের মধ্যে। বন্ধুদের সাহায্য করা উচিত।

ভক্তদের দেখলে মনে জোর আসবে, ঈশ্বরের কথা স্মরণ হবে — তবেই শান্তি। রোজ একঘন্টা হলেও কত! পুত্র, আত্মীয় স্বজন সকলে আপন আপন সুখ নিয়ে ব্যস্ত। তারা ছাড়তে পারে, কিন্তু ভক্তগণ ছাড়তে পারে না। ক্রাইস্ট বলেছিলেন ভক্তদের দেখিয়ে — এরা আমার মা, এরা আমার ভাই, এরাই আত্মীয়কুটুম্ব। ঠাকুরও বলেছিলেন, 'যারা আপন তারা হলো পর, আর ভক্তরা হলো আপন।

বাবুরামকে বলি — যা, হাত-মুখ ধো গিয়ে।'

আর ঐ কথা বলবেন — বিদ্যাসাগরমশায়ের মত আত্মীয়দের আলাদা বাড়িতে রেখে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে। আর মাঝে মাঝে শিমুলতলা চলে যেতে।

শ্রীম গরম জলে স্নান করেন। জলের বালতিটা একজন ভক্ত ঘরে দিয়া আসিলেন। শ্রীম ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিলেন — এবার স্নান করিবেন। ভক্তরা অনেকেই বারান্দায় রহিয়াছেন। পাশেই স্নানঘর। ঘরের ভিতর হইতে শ্রীম বলিতেছেন — ঠাকুর বলতেন, অকৃতজ্ঞের মুখ দর্শন করতে নেই। তিনি কি ভক্তদের সাবধান করিতেছেন?

২

ঠাকুরের পূজা হইয়া গিয়াছে, এখন বেলা নয়টা। শ্রীম ঠাকুরঘরে ভক্তসঙ্গে ধ্যান করিতেছেন। ধ্যানান্তে মৈত্রায়ণী উপনিষদ্ পাঠ করিতেছেন। ভক্তগণ কেহ শুনিতেছেন, কেহ কার্যান্তরে গিয়াছেন। শ্রীম বাংলায় অনুবাদ করিয়া বলিতেছেন।

শ্রীম — বৃহদ্রথ রাজা সংসার ও শরীর অনিত্য জেনে বৈরাগ্য করে বনে গেলেন। আর উর্দ্ধবাহু হয়ে কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। মহর্ষি শাকায়ন্য এসে বললেন, বৎস বর নাও। রাজা তখন মহর্ষির চরণ ধারণ করে এই 'গাথা' বলছেন —

বৃহদ্রথ — (মহর্ষি শাকায়ন্যের প্রতি) ভগবন্, অস্থি, চর্ম, স্নায়ু, মজ্জা ও মাংস, শুক্রশোণিত ও শ্লেষ্মাশ্রু দ্বারা দূষিত — বিষ্ঠা মূত্র ও বাতপিত্ত কফের আধার, দুর্গন্ধ ও অনিত্য এই দেহদ্বারা বিষয়ভোগ সাধনে কি ফল? কাম ক্রোধ লোভ ভয় বিষাদ, ইষ্টবিয়োগ ও অনিষ্টপ্রাপ্তি, ক্ষুৎপিপাসা, জরামৃত্যু, রোগশোক দ্বারা অভিহত (পরাজিত) অনিত্য এই দেহদ্বারা বিষয়ভোগ করে লাভ কি?

এইক্ষণে জন্ম, পরক্ষণেই মৃত্যু — এইরূপ ক্ষণস্থায়ী, তৃণবৎ বিনাশশীল দংশমশকাদির ন্যায় এই সবই দেখছি নশ্বর। এই নশ্বর শরীর দিয়ে নশ্বর বিষয়ভোগ সম্পূর্ণ বিফল।

ভারতের মহাধনুর্ধর রাজচক্রবর্তিগণ আজ কোথায়? কোথায় সুদ্যুম্ন, ভূরিদ্যুম্ন ও ইন্দ্রদ্যুম্ন! কোথায় কুবলয়াশ্ব, যৌবনাশ্ব, বদ্ধিয়াশ্ব ও অশ্বপতি! কোথায় গেল শশবিন্দু, হরিশ্চন্দ্র ও অম্বরীশ! কোথায় মনু, উৎক, খয়াতি, যযাতি ও অনরণ্য! কোথায় আজ উক্ষসেন, উখ, মরুত্ত, ভরত প্রভৃতি মহাপরাক্রান্ত রাজন্যবর্গ! আত্মীয়পরিজন ও বিপুল ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে কেন তাঁরা পরলোকগমন করলেন?

অমিত শক্তিসহায়ে গন্ধর্ব, অসুর, যক্ষ ও রাক্ষস, ভূতগণ, পিশাচ উরগ ও গ্রহ প্রভৃতিকে দমন করাও বিড়ম্বনামাত্র।

সমুদ্রের শোষণ, পর্বতের প্রপতন, ধ্রুবের প্রচলন, তরুগণের উৎপাটন, পৃথিবীর সমুদ্রে নিমজ্জন, দেবগণকে স্বীয়পদ থেকে অপসরণ, বিভূতিবলে এই অসম্ভব সম্ভব করাও নিষ্ফল। শরীর ক্ষণভঙ্গুর।

ভগবন্, আমি অজ্ঞানান্ধ — কূপমণ্ডুকবৎ এই ভবার্ণবে নিমগ্ন। কৃপা করে আমায় উদ্ধার করুন। আমি আপনার একান্ত শরণাগত।

অনুবাদ শেষ হইল। শ্রীম এক্ষণে ব্যাখ্যা করিতেছেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — ঠাকুর বলতেন, তীব্র বৈরাগ্য হলে সংসার পাতকুয়া আর আত্মীয়স্বজন কালসর্প বলে বোধ হয়। বৃহদ্রথ রাজার তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত। আত্মীয়-পরিজন, রাজ্য, ঐশ্বর্য, শক্তিলাভ — কিছুতেই মন নেই। কিসে ভগবানদর্শন হয়, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, শুধু তার আকাঙ্ক্ষা।

ত্রিলোকের অধিশ্বরই হও আর অষ্টসিদ্ধিই লাভ কর, সব নিষ্ফল — সব কামিনীকাঞ্চন। যার জন্মমৃত্যু নিরোধ হয়েছে সে ধন্য। যাঁর ঈশ্বরদর্শন হয়েছে তিনিই যথার্থ বীর। বৃহদ্রথ রাজার এই জ্ঞান হয়েছে।

ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হলে দেহের উপর মন থাকে না। তখন দেখে, দেহ হাড়মাসের খাঁচা — অতি কদর্য বস্তু, পরিণামে বিনাশ। অত বড় বড় সব রাজা — ইন্দ্রদ্যুম্ন, যযাতি, হরিশচন্দ্র, মনু, ভরত প্রভৃতি কেহ নাই, সব চলে গেছে। এক ঈশ্বর আছেন চিরকাল।

অষ্টসিদ্ধি — সমুদ্রের শোষণ, পর্বতের পতন — এ সব

অলৌকিক কার্য করবার শক্তি লাভ করেও কোন ফল নাই। ঠাকুর দিতে চাইলে স্বামীজী তাই অষ্টসিদ্ধি নিলেন না। অর্জুনও তাই নেন নাই। কি হবে এসব দিয়ে? শরীর যে থাকবে না।

ঠাকুর একটি গল্প বলেছিলেন। একজন তপস্যা করে সিদ্ধাই লাভ করেছে — হাতী মারে আবার তক্ষুণি জীইয়ে দেয়। নারদ একদিন যাচ্ছেন ঐ রাস্তা দিয়ে, তপস্বীকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হে, কেমন চলেছে?' তপস্বী বললে, 'আজ্ঞে বেশ হচ্ছে — আমি হাতী মারি, আবার তখুনি জীয়াতে পারি।' নারদ শুনে বললেন, 'তা তো হলো, কিন্তু আসল কাজের কি হলো? জন্ম-মরণ রোধ করেছো কি? জন্ম-মরণ রোধ না হলে কিছুই হলো না।'

অত ঐশ্বর্য ও শক্তি লাভ করেও বৃহদ্রথ রাজার মন সংসারে নাই। স্ত্রী, পুত্র, দেহ, বিত্ত, আধিপত্য — কিছুতেই মন নাই। নিজকে সম্পূর্ণ অসহায় — দংশমশকের* ন্যায় নিরুপায়, নগণ্য মনে হচ্ছে। এটি যথার্থ ব্যাকুলতার লক্ষণ।

তাই অত দীনভাবে মহর্ষি শাকায়ন্যের শরণাগত হয়ে বলছেন, প্রভো, আমি কূপমণ্ডুক — অজ্ঞানান্ধ, আমায় উদ্ধার করুন।

আমি রাজা, আমার ঐশ্বর্য — এই সব, আমি মহাশক্তিমান — এই বুদ্ধি অজ্ঞান থেকে হয়। একেই রাঁড়ীপুতি বুদ্ধি বলতেন ঠাকুর — অর্থাৎ ক্ষুদ্র বুদ্ধি, হীন বুদ্ধি। তাই কূপমণ্ডুক — 'উদপানস্থো ভেকঃ'।

আমি ঈশ্বরের সন্তান, তাঁর স্বরূপ, এই বুদ্ধিই জ্ঞান — বৃহৎ বুদ্ধি। আমি সচ্চিদানন্দ-সাগরে মীন, আমি রামদাস, মায়ের ছেলে আমি, I am the son of God (ঈশ্বরের সন্তান) — এসব বৃহৎ বুদ্ধি।

এই সংসার-কূপ থেকে ঈশ্বর ছাড়া কেউ তুলতে পারে না। তিনি গুরুরূপে এসে উদ্ধার করেন। বৃহদ্রথ রাজা ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাক দিলেন। তাই তিনি পাঠিয়ে দিয়েছেন মহর্ষি শাকায়ন্যকে।

---

*দংশমশক - মশা জাতীয় কীট পতঙ্গ

গুরু কেমন? — যেমন ল্যাম্প্‌ম্যান — ফরাশ। হ্যারিকেন, তেল, শলতে, আগুন, সব ঠিক আছে — কিন্তু হ্যারিকেন জ্বলছে না। ফরাশ জ্বালিয়ে দিলে জ্বলে।

ঠাকুর বলেছিলেন ঠাকুরদাদাকে, 'দাঁতে দাঁতে পড়ছে না, মাঝে মাঝে এসো এখানে। একটু ঘষে লাগিয়ে দেব।' মানে, ধ্যান ভজন ঠিক ঠিক হচ্ছে না। ঠাকুরের কাছে এলে গেলে, তিনি সব ঠিক করে দেবেন, কামার যেমন যন্ত্রপাতি ঠিক করে দেয়।

কখনও বলতেন, কোদলানো। বলতেন, কে যায় কোদলাতে অত মাটি? সোনা কারো অল্প মাটির নিচে আছে, কারো অনেক নিচে। অল্প নিচে থাকলে গুরু শ্রমিকের ন্যায় একটু কোদলিয়ে সোনা বের করে দেন। সোনা মানে ঈশ্বর, মাটি বাসনা।

শাকায়ন্য ঋষি, তাই বৃহদ্রথ রাজাকে বললেন, আমি আত্মা, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত, আমার জন্মমরণ নাই, আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ — এই চিন্তা কর, মনের মল দূর হয়ে যাবে। তখন সস্বরূপ আপনি প্রকটিত হবে। ঈশ্বরচিন্তায় 'নিরিন্ধন বহ্নি'র ন্যায় মন আপনি শান্ত হয়ে যায়।

(জনৈক ভক্তের প্রতি) এই যে উপনিষদ্ আপনাদের পড়ে শুনান হচ্ছে, এর মানে আছে। পাছে মনে হয় বেদ-উপনিষদাদি শাস্ত্রে না জানি কি আছে, সব দেখা হলো না — এই জন্য। এই দেখছেন তো, এতে ঠাকুর যা বলে গেছেন তার অধিক তো নাই-ই, তার সমানও নাই।

ভগবানের কথাই হলো উপনিষদ্। এর অধিক কিছু নয়। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ) কথামৃতে যা আছে তাই উপনিষদ্। কেমন করে বলে গেছেন — সহজ করে, সরল করে, সব দেখিয়ে! তেমন আর কোথাও পাবেন না। কেমন বলেছেন, ঈশ্বর সত্য, সংসার অনিত্য! সংসারে সার কিছু নাই। এখানে আছে আঁটি আর চামড়া। টাকাকড়ি, ইন্দ্রিয়সুখ, নামযশ — একটাও সেই বস্তু দিতে পারে না — ব্রহ্মবস্তু। এমন সরল কথা আর কোথায় পাবেন? এইজন্য উপনিষদ্ শোনাচ্ছি। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ) কথামৃত উপনিষদ্।

আপনারা ভাল লোক এসেছেন তাই এসব কথা বের হচ্ছে। কারু কারুকে দেখলে চাপা পড়ে যায়, কিছু বলতে ইচ্ছা হয় না। কারুকে দেখলে যেন সব উথলে উঠে।

এর মধ্যেই অনেক ভাল ভাল লোক এসেছিলেন। তাঁদের দেখলে উদ্দীপন হয়। জিতেন, সীতাপতি এঁরা এসেছিলেন, তখন বেশ উদ্দীপন হতো।

সব সময় ঠাকুর বলান না — চেপে রাখেন। কাউকে দেখলে জেগে উঠে। যারা শুধু ভগবানকে চায় আর কিছু চায় না — ব্যাকুল, তাদের দেখলে উদ্দীপন হয়। এমন লোককে দেখলে জোর করে মনে ঈশ্বরীয় কথা ভেসে উঠে।

৩

মিহিজামের কুটীর। শ্রীম ঠাকুরঘরে বসিয়া আছেন। এখন বেলা দশটা। কয়েক মিনিটের মধ্যে হাতে একখানা গীতা লইয়া বারান্দায় তক্তাপোষের উপর আসিয়া বসিলেন। অষ্টাদশ অধ্যায় পাঠ করিতেছেন। সাত্ত্বিকাদি কর্মের লক্ষণসূচক শ্লোক তিনটি শুনাইতেছেন।

শ্রীম — সাত্ত্বিক কর্ম আসক্তি রাগদ্বেষ ও ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত। রাজসিক কর্মে ফলের আকাঙ্ক্ষা, অহংকার, আর চেষ্টার প্রাবল্য থাকে। পশ্চাৎ-বন্ধন, ক্ষয়, হিংসা, নিজের সামর্থ্যের অবিচার ও মোহ — এগুলি তামসিক কর্মের লক্ষণ।

সাত্ত্বিক কর্ম মানে, যে কর্মে ভগবান লাভ হয়। অন্য কোন ফলের জন্য নয়, তাই আসক্তি নাই, তাই রাগদ্বেষও নাই — নিষ্কাম কর্ম। আমি এই কর্মদ্বারা ভগবান লাভ করবো — এইরূপ কামনা থাকলে দোষ নাই। ঈশ্বরলাভের কামনা কামনার মধ্যে নয়। ঠাকুর বলতেন, মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়। অল্প করে খেলে অম্বল সারে। অন্য মিষ্টি খেলে অম্বল বাড়ে।

স্বর্গাদি লাভের জন্য যে কর্ম তা রাজসিক কর্ম। আবার যে কর্মে পুত্র, বিত্ত, ধনৈশ্বর্য, নামযশ প্রভৃতি লাভ হয় এরূপ কর্মও রাজসিক কর্ম। রাবণ স্বর্গের জন্য — ইন্দ্রত্বপদ লাভের জন্য তীব্র

সাধনা করেছিলেন।

ধন, ঐশ্বর্য, স্বর্গ — এসব চাইলে তিনি দেন, কিন্তু তাঁকে পায় না। যে তাঁকে চায় সে অন্য কিছু চায় না। যে ধনাদি চায় সে রাগ ও দ্বেষযুক্ত হয়ে দানব্রত-যজ্ঞাদি কর্ম করে। এইরূপ সাধক খুব কঠোরতা করে। হয়তো কেহ এক পায়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কিম্বা শীতকালে বরফজলে গা ডুবিয়ে রইলো। শরীরকে অযথা কষ্ট দেয়। পুরাণে আছে রাবণ নিজের ন'টা মাথা কেটে আহুতি দিয়েছিল।

তামসিক কর্মের ফলে বন্ধন দৃঢ়তর হয়। এতে শক্তি, ধন, প্রাণাদির বিনাশ হয় — অপব্যয় হয়। এতে নিজেরও অনিষ্ট, অপরেরও অনিষ্ট। তামসিক কর্মে নিজের শক্তিসামর্থ্যের হিসাব নাই। ওজন করে কাজ করা — এতে তা নাই। একজনের হয়তো পাঁচ টাকা আয়, কিন্তু দুর্গোৎসব আরম্ভ করে দিলে পাঁচ শ' টাকা ঋণ করে। ঠাকুর বলতেন, বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি। বিচার-বিবেচনাবর্জিত কর্ম।

এইবার সাত্ত্বিকাদি কর্মীর কথা পড়িতেছেন।

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥
রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিত॥
ৈ অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠোঽনৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে॥

(গীতা ১৮-২৬/২৭/২৮)

শ্রীম — সাত্ত্বিক কর্মী যা করে তা ধৃতি ও উৎসাহসমন্বিত হয়ে — with perseverance and promptitude করে। নিজের স্বার্থ, selfish motive নাই। সব রামের — ঈশ্বরের। তাই সিদ্ধি কিংবা অসিদ্ধিতে — success or failure-এ unaffected (নির্বিকার)।

সাত্ত্বিক সাধক ধৈর্যের সহিত সব করে যায় — দানব্রত, যজ্ঞাদি কর্মই হউক, কিংবা ধ্যানজপাদিই হউক। এক জন্মে ঈশ্বরলাভ নাই

বা হলো, পরজন্মে হবে। নিরুৎসাহ হয় না। ঠাকুর বলতেন, খানদানী চাষা, এক বছর ফসল হলো না, তা বলে বসে থাকে না — চাষ করতেই থাকবে।

গুরু বলেছেন করতে, তাই করে যাচ্ছি। হয় হউক এক জন্মে, কিংবা নাই হউক — লাভ ক্ষতি আমি জানি না। গুরুবাক্য বিশ্বাস করে করে যাচ্ছি। নিষ্কাম কর্মীর এই ভাব — নিরুদ্বেগ।

রাজসিক কর্মীর selfish motive (স্বার্থবুদ্ধি) থাকে, তাই কর্মে আসক্তি। তার জন্যই সে সিদ্ধিতে হর্ষযুক্ত আর অসিদ্ধিতে বিষাদগ্রস্ত হয়। মহালোভী আর পরপীড়ক। অপরকে কিছু দিতে জানে না, শুধু নিতে জানে। অশুচির অর্থ, যার চিত্ত শুদ্ধ নয়। আত্মপর ভেদজ্ঞান অতি প্রবল। ভোগের বাসনা অতিশয় প্রবল।

তামসিক কর্মীর ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ নাই — ঠিক যেন পশু। তার খাওয়াপরা সার, উচ্চ চিন্তা নাই। অতিশয় জড়বুদ্ধি ও স্তব্ধ, অর্থাৎ অবিনয়ী। কর্কশভাষী — ঠাশ ঠাশ করে কথা কয়। গুরুজনদের সঙ্গে নম্র হয়ে কথা বলতে হয়। সকলের সঙ্গেই নম্র আর মধুরভাষী হতে হয়। তামসিক কর্মী শঠ হয় — cunning like a jackal (শৃগালের ন্যায় ধূর্ত) ও মায়াবী। যেন তেন প্রকারেণ কার্যসিদ্ধি করে — সত্যমিথ্যার পার। তামসিক লোক সকলের সামনে একজনকে অপমান করে — তাই নৈষ্কৃতিক। দশজন লোক বসে আছে একস্থানে তখন একজনকে অপমান করা উচিত নয়। হলোই বা দোষী, তবুও একজনকে ছোট করতে নাই। কারো দোষ থাকলে শান্তভাবে তাকে একান্তে বলা উচিত।

Idleness, inertia (আলস্য) তমোগুণীর প্রধান লক্ষণ। আর সর্বদা বিষাদভাব। মুখে হাসি নাই, উৎসাহ নাই। কোন কাজে আঁট নাই, দীর্ঘসূত্রী, হচ্ছে হবে করে, লেদাড়ু — যেন চিড়ের ফলার। ঠাকুর বলতেন, তাদের আঠারো মাসে বছর।

সাত্ত্বিক কর্মী কাজ জমিয়ে রাখে না — সর্বদা করছে। ক্লান্তি নাই — একা একশ’ জনের কাজ করতে পারে। ঠাকুরকে দেখতুম কিছু করতে হলে উঠে পড়ে লাগতেন।

(একজন ভক্তের প্রতি) এই ছ’টি শ্লোক (২৩-২৮) গীতায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে। এগুলি মুখস্থ রেখে, প্রার্থনা করবেন নিজের জীবনে যাতে ধারণা হয়।

উপনিষদ্ ও গীতায় যে সকল শ্লোক পড়লেন, মুখস্থ করলেন সেগুলি আবৃত্তি করলে নিজের অবস্থা বুঝতে পারবেন। কোথায় আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমার কি দোষ — এসব ধরা যায়, আর correct (সংশোধন) করা সহজ হয়। আর একটি হয়, লোক চেনা যায়। কে কি রকম লোক, বোঝা যায়। মাঝে মাঝে আবৃত্তি করতে হয়। আর নির্জনে গিয়ে প্রার্থনা করতে হয় — প্রভো, আমাকে এসব শ্লোকের মর্মার্থ ধারণা করিয়ে দাও।

মুখস্থ করে রাখলে ভাল। জানা না থাকলে নিজের সঙ্গে মিলান যায় না। প্রার্থনা আর কেমন করে হবে? আমি কোথায় আছি, কি হতে চাই, এটি জানা থাকলে প্রার্থনা করা যায়। নির্জনে এক একটি শ্লোক ধ্যান করতে হয়। এক গুচ্ছের বই পড়ার কোনও প্রয়োজন নাই। ধ্যান আর প্রার্থনা — এতে সব হয়।

৪

শ্রীম ভক্তগণসঙ্গে আহার করিতে বসিয়াছেন। এখন বেলা সাড়ে দশটা। আহার্য অতি সরল! শ্রীম দিনে দুধভাত আর রাত্রে দুধরুটি খান। ভক্তগণ ডাল ভাত আর সামান্য ঘৃত খান। কখনও পেঁপের তরকারী হয় — কেবল লবণ ও হলুদ দিয়া, অন্য মশলা নয়। আহার করিতে করিতে কথা হইতেছে।

শ্রীম — (জনৈক সেবকের প্রতি) তাহলে পরশুই আসুন। বড় গোলমালে পড়েছেন ইনি। সাহায্য চাইছেন। ঠাকুর তেজচন্দ্রকে বলেছিলেন, তোর জন্যই তো এত ভাবনা। Complicated (সংসারে জড়িত) হয়ে পড়েছে কিনা বিয়ে করে! অক্ষম ছেলেকে মা বাপ আদর করে বেশী। যারা বিয়ে করে নাই তাদের জন্য অত ভাবতে হয় না — মুক্ত, গা ঝেড়ে ফেলে দিলেই হলো।

অক্ষম, সংসারে জড়িত ভক্তদের জন্যই গুরু বেশী চিন্তিত হন।

গুরু যখন ধরেন, তখন আর ভাবনা থাকে না। তখন সংসারের জ্বালায় suicide (আত্মহত্যা) করতে হয় না। একজন ভক্তকে বলেছিলেন ঠাকুর, কেন যাবে তুমি আত্মহত্যা করতে — কি দায় পড়েছে? তোমার যে গুরু রয়েছেন।

ঠাকুর বলেছিলেন, একটা দড়ি, তা'তে অনেক গাঁট। দশ হাজার লোকের সামনে সেটা ফেলে দেওয়া হলো, কিন্তু কেউ একটা গাঁটও খুলতে পারলে না। বাজিকর হাতে নিয়ে (হাত নাড়ার অভিনয় করিয়া) এমন এমন করে সব গ্রন্থি খুলে ফেললে।

গুরু সব করতে পারেন। — বাবু বড় মুস্কিলে পড়েছেন। তা ভয় কি? গুরু যার সহায় তার কোন ভয় নাই।

ঠাকুরের আশ্রিত একজন ভক্ত কলিকাতায় সাংসারিক ঝঞ্ঝাটে পড়িয়াছেন। তাঁহার সাহায্যার্থ জনৈক সেবককে শ্রীম নানা উপদেশ দিয়া পাঠাইতেছেন।

শ্রীম — (ভক্তদের প্রতি) হ্যাঁ, ঐ ছয়টি শ্লোক আজ যা পড়া হলো সকলের মুখস্থ করে রাখা উচিত। তাহলে নিজের অবস্থা জানা যায়, আর ফস্ করে মানুষ চিনতে পারা যায়। ঠাকুর বলেছেন, 'গীতা সর্বশাস্ত্রের সার'। গীতা পড়া ভাল। মুখস্থ থাকা উচিত প্রত্যেকের। ডাক্তারবাবুর (ডাক্তার কার্তিক বক্সীর) মুখস্থ আছে।

মোহন — একজন অবতার আর একজন অবতারের কথা বলতে পারেন। ঠাকুর যখন বলেছেন, গীতা সর্বশাস্ত্রের সার, তখন ইহা বেদবাক্যবৎ সত্য।

শ্রীম — তা আর বলতে! অবতার ছাড়া শাস্ত্র ব্যাখ্যা করার শক্তি কার আছে? কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ — একথা বলতে পারেন এক অবতার! জন্মমৃত্যুর রহস্য ভেদ করা কার সাধ্য, অবতার ছাড়া? তাঁর কথায় বিশ্বাস হলে বেঁচে গেল।

তাই তো আজ যেমন পড়া হলো এইরূপ সব শ্লোক আবৃত্তি করতে হয়। তারপর মনন। তবে তো নিজের অবস্থা জানা যাবে আর উপরে উঠবার চেষ্টা হবে — প্রার্থনা করা যাবে। তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে তিনি অর্থ বুঝিয়ে দেন, আর আমাদের মনকেও উপরে

উঠিয়ে দেন।

সংস্কৃত শ্লোক, বাংলা অর্থ দেখে মুখস্থ করা। রোজ পড়লে আপনি হয়ে যায়। স্থিতপ্রজ্ঞ ও গুণাতীতের লক্ষণ, ভক্তি ও জ্ঞানের সাধন, তিন রকমের তপস্যা, কর্ম ও কর্মীর পরিচয়সূচক শ্লোকগুলি সর্বদা আবৃত্তি করিতে হয়। আর ঠাকুরের কথার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হয়। তিনি তো গীতারই জীবন যাপন করতেন। ঠাকুর গীতাবিগ্রহ।

মোহন — আজ্ঞে, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতরা গীতার সম্বন্ধে নানা মত পোষণ করেন। Date (উৎপত্তিকাল) সম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন মত।

শ্রীম — গীতার বিষয়সম্বন্ধে কিছু বলা পণ্ডিতদের কর্ম নয়। কেহ কেহ বলেন, সমগ্র গীতা এক সময়ে লেখা নয়। কেহ বলেন, বৌদ্ধ যুগের আগে হয়েছে, পরে হলে তার influence (প্রভাব) থাকতো। Evidence (প্রমাণ) দু'রকম — internal আর external (আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক)। আভ্যন্তরিক প্রমাণের সাহায্যে astronomers (জ্যোর্তিবিদ্‌গণ) ঠিক বলতে পারেন গ্রহ নক্ষত্রের বিচার করে। গীতা মহাভারতের অংশবিশেষ। মহাভারতের রচনাকাল দেখলে গীতার রচনাকাল ঠিক হয়ে যাবে। শাস্ত্রাদিতে date (ঘটনার কাল) generally (সচরাচর) দেখতে পাওয়া যায় না। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ) কথামৃতে এটি আছে!

(ভক্তদের প্রতি) গুচ্ছের বই পড়ে কি দরকার? সার নিয়ে বই পরিত্যাগ করা। বইতে তো আর ঈশ্বর নাই। পত্র পড়ে জানা গেল, একজন লিখেছে একখানা রেলপেড়ে কাপড় আর পাঁচসের সন্দেশ পাঠাতে। তারপর পত্রের প্রয়োজন নাই। জিনিস চেষ্টা করে সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দাও। তেমনি বই। বই থেকে সার সংগ্রহ করে বই রেখে দেওয়া। সারা জীবনই বই পড়তে হবে এমন কি কথা।

তপস্যা চাই। তপস্যা মানে, গুরু যা বলেন, শাস্ত্র যা বলেন, সেই সব কথা উপলব্ধি করার চেষ্টা। বাজনার বোল মুখস্থ হয়েছে। এখন হাতে আনার চেষ্টার নামই তপস্যা।

খুব রোখ চাই। দুর্বলের ধর্ম হয় না। বেদে আছে — 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত'। ওঠ, জাগো — দুর্বলতা পরিহার

করে তাঁকে জান। আবার বলেছেন, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ' — দুর্বলের আত্মতত্ত্বে অধিকার নাই। ঠাকুর বলতেন, ডাকাতপড়া ভাব চাই। উঠে পড়ে লাগতে হয় — নইলে সোনা গালানো হবে না।

সাত্ত্বিক কর্তার মনে অদম্য বল। কাজ সিদ্ধ না করে ছাড়বে না — প্রাণ যাক বা থাক। 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্' — শরীর যায় যাক, তাঁকে লাভ না করে উঠবো না — এরূপ রোখ চাই।

তামসিক কর্তা হলে চলবে না। তার কাছে একদিনের কাজ এক মাস লাগে। অযুক্ত — ভগবানের সঙ্গে যোগ নাই, তাই মনে জোর নাই।

সাত্ত্বিক সাধক তাড়াতাড়ি সব কাজ সেরে নেয়। বাকী সময় ঈশ্বরচিন্তা করে। বসে বসে জপ করছে — টক্‌টক্ ঘড়ি কাঁটার ন্যায় 'ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত' — তাই অন্যের পক্ষে যা এক বছর লাগে শিখতে, intelligent, educated (বুদ্ধিমান, শিক্ষিত) লোকের পক্ষে তা দু'দিন। মনে অদম্য বল চাই — মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন — এই সঙ্কল্প।

এখন বেলা দুইটা। একটি ভক্ত ভাণ্ডারের সব জিনিসপত্র পরিষ্কার করিয়া সাজাইয়া রাখিতেছেন। শ্রীম ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়া ইহা দেখিয়া খুব প্রীত হইয়াছেন, তাই এই কার্যের প্রশংসা করিতেছেন।

শ্রীম — বাঃ, বাঃ ! দেখ কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে, যেন ঠাকুরঘর! ঠাকুর শ্যামপুকুরের বাড়িতে এসেই ভাঁড়ারে ঢুকলেন। হাঁড়ির নিচে বিড়ে নাই, উপরে সরা নাই, দেখে তৎক্ষণাৎ বাজারে পাঠালেন পয়সা দিয়ে। তিনি এলোমেলো ভাব পছন্দ করতেন না। সব সাজগোজ করে রাখতে বলতেন। যেখান যা রাখার দরকার ঠিক সেখানে তা রাখতে বলতেন। এদিকে দিনরাত মুহুর্মুহুঃ সমাধি, পরনের কাপড়ের ঠিক নাই, কিন্তু ব্যবহারিক বিষয়ে এত দৃষ্টি। ঠাকুর বলতেন, যে নুনের হিসাব করতে পারে সে মিছরির হিসাবও করতে পারবে।

বিদ্যাসুন্দর পালা যাত্রাগান হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরে ফলহারিণী পূজার রাত্রিতে। পরদিন যাত্রাওয়ালারা ঠাকুরের ঘরে এসেছে। যে বিদ্যা সেজেছিল তার পার্ট শুনে ঠাকুর খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তার সঙ্গে

আনন্দে কথা কইতে লাগলেন। তাকে বলেছিলেন — দেখ, যে একটা বিষয়ে ভাল — নাচ, গান, বাজনায়, সে ইচ্ছা করলে ভগবানের পথেও ভাল হতে পারে। মোড় ফিরিয়ে দিলেই হলো। শক্তি তো একটাই। তাই সবই বিদ্যা, কোনটাই অবহেলা করবার যো নাই। যেটুকু করতে হবে ভাল করে করা উচিত। সাত্ত্বিক কর্মী নিজের জন্য কিছু করবে না, সব ভগবানের জন্য। বাড়িঘর, জিনিসপত্র নিজের ব্যবহারের সব, সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে হয়। সর্বত্র সর্বদা পূজা কি না — whole-time man, wholelife worship.

৫

শ্রীম ঠাকুরঘরের মেঝেতে কম্বলের উপর বসিয়া আছেন উত্তরাস্য। সম্মুখে বেদীর উপর ঠাকুর। শ্রীম-র ডানদিকে পশ্চিমাস্য অন্তেবাসী উপবিষ্ট। তাহাকে তিনি উপদেশ দিতেছেন।

এখন বেলা তিনটা।

শ্রীম — (অন্তেবাসীর প্রতি) আমাদের এই শরীরের ভিতর তিনটা দেহ আছে — স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। স্থূলশরীরে দিতে হয় বাহ্যিক আহার — অন্নপানাদি। সূক্ষ্মশরীরের আহার আর্ট, সায়েন্স, literature, reasoning (শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, বিচার) — এসব। এরও আহার দেওয়া দরকার। কারণশরীরের আহার — ভক্তি, প্রেম, জ্ঞান; এ শরীরেরও রোজ আহার আবশ্যক। গীতাদি শাস্ত্র, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ, সৎচিন্তা, সন্ধ্যাদি কর্ম, জপ, ধ্যান — এসবও আহার। এগুলি ভগবানলাভের সহায়ক।

যেমন স্থূলশরীরকে আহার না দিলে উহা শিথিল হয়ে যায়, ক্রমশঃ শুকিয়ে যায়, তেমনি সূক্ষ্ম ও কারণশরীরকে আহার না দিলে তারাও শুকিয়ে যায়। স্থূল দেহ খাবারদাবার নিয়ে ব্যস্ত। এতে মানুষ পশু হয়ে যায়। ভাল খাব, ভাল পরবো, এই চেষ্টা সর্বদা। পশুদের ভাব, খালি আহার আর বিশ্রাম। দেখ নাই পশুদের — ছাগল, গরু, কুকুর এগুলি!

অন্তেবাসী — (স্বগত) দেখেছি, কিন্তু এ দৃষ্টি ছিল কই? এখন

যেন একটি নূতন চোখ ফুটিয়ে দিলেন। এই তিনটা দেহের পার্থক্য এমন উজ্জ্বলভাবে তো মনে কখনও উদিত হয় নাই। এখন যেন তিনটি আলাদা মানুষ দেখছি।

(প্রকাশ্যে সসঙ্কোচে) আজ্ঞে, দেখছি কিন্তু —

শ্রীম — হাঁ, দেখবে ওদের লক্ষ্য করে। অনেক শিখতে পারবে। আমি তো খুব লক্ষ্য করে দেখি। খালি আহার আর বিশ্রাম নিয়ে আছে! আর এরই মাঝে সৃষ্টির কাজ হচ্ছে।

সূক্ষ্মশরীরকে আহার দিলে মানুষ হয়। Reasoning, judgement (যুক্তি, বিচার) এই সব faculty (শক্তি) পরিপুষ্ট হয়। কারণশরীরে আহার দিলে দেবতা হয়। আহার না দিলে শুকিয়ে যায় ওদিকটা। এর আহার ভাগবৎচিন্তা, প্রার্থনা, এই সব।

দেখ, এই শরীরে পশু, মানুষ, দেবতা এই তিনই রয়েছে। দিতে হয় রোজ প্রত্যেকটাতে আহার।

স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, মহাকারণ সবই তিনি। তবে মহাকারণ তাঁর স্বরূপ। যারা স্থূল নিয়ে আছে, তারা তাঁর পশুপ্রকৃতি পায় — আসুর সম্পদ লাভ করে। যারা নানা বিদ্যা নিয়ে থাকে, মনের অনুশীলন করে, তারা তাঁর মানুষপ্রকৃতি পায়। তাদের যুক্তি, বিচার বাড়ে। আর যারা তাঁর চিন্তা নিয়ে পড়ে আছে — সাধু ও ভক্তগণ, তারা দৈবী সম্পদ লাভ করে — দেবতা হয়! পশু, মানুষ, দেবতা একাধারে — বুঝলে?

অন্তেবাসী — (আত্মগত) উঃ, কি আশ্চর্য! কথার সঙ্গে সঙ্গে মনটা একটা থেকে আর একটায় সিঁড়ি বেয়ে ওঠার মত যেন ধাপে ধাপে উঠে পড়লো। (প্রকাশ্যে) আজ্ঞে, হাঁ।

উভয়ে কিছুকাল চুপ করিয়া বসিয়া আছেন — প্রায় পনর মিনিট। আবার কথা হইতেছে।

শ্রীম — দেখ, ধ্যান প্রথমে হয় না। আগে জপ করে নিতে হয়। বসে বসে ঝিমানো ধ্যান নয় — তাই জপ করতে হয়। ঠিক ঠিক ধ্যান হলে শরীর মন প্রশান্ত হয়। একটা স্বচ্ছন্দ ভাব হয় — যেমন সুষুপ্তির পর অনুভব হয়।

অন্তত চারবার নিয়ম করে জপ করা উচিত। সকালে হাতমুখ ধুয়ে, মধ্যাহ্নে স্নান করে — সন্ধ্যায় আর ঘুমুবার সময়। মনটা ঘড়ির কাঁটার মত যোগ হয়ে থাকবে — টক্‌টক্ করে বাজবে। তাঁর শ্রীপাদপদ্ম ধ্যান করবে। যে কোনও ঈশ্বরীয় রূপের চিন্তা করা — সাকার হোক নিরাকার হোক। এখন পরমহংসদেবের চিন্তা করলে সহজে হয়। তিনি বলেছিলেন, 'আমার চিন্তা যে করবে সে আমার ঐশ্বর্য লাভ করবে, পিতার ঐশ্বর্য যেমন পুত্র লাভ করে।' তাঁর ঐশ্বর্য জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম সমাধি।

অন্তেবাসী — যাদের গুরুকরণ হয়ে গেছে তারা কি করবে?

শ্রীম — গুরুমন্ত্র জপ ধ্যান করবে। তবে ঠাকুরের সঙ্গে যোগ রেখে করলে শীঘ্র কাজ হবে। এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দের ধ্যান করে সব লোক। কেউ সগুণভাবে করে, কেউ নির্গুণভাবে। তিনিই শিব, তিনিই বিষ্ণু, তিনিই যীশুর পিতা, তিনিই ঠাকুরের মাতা। তিনিই রাম, তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ।

এ যুগে ঠাকুরের ধ্যান করলেই হবে অনায়াসে। ঠাকুর নিজে বলেছিলেন, আন্তরিক যারা ঈশ্বরকে ডাকবে তাদের এখানে (তাঁর আশ্রয়ে) আসতে হবে। আর বলেছিলেন, 'মা, যারা আন্তরিক এখানে আসবে তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো'। একদিন বলেছিলেন, 'ঈশ্বর, মা আর আমি এক'।

অন্তেবাসী — সংখ্যাজপের প্রয়োজনীয়তা কি? এমনি জপ করে গেলে হবে না?

শ্রীম — হবে না কেন? তাঁ'তে ভালবাসা এলে তখন আর সংখ্যার প্রয়োজন হয় না। যখন তাঁ'তে মন পড়ে থাকবে সর্বদা — 'রাম রাম' বা 'মা মা' বলতে বলতে যখন দু'নয়নে প্রেমাশ্রু বইতে থাকবে, মনপ্রাণ আনন্দে পূর্ণ হবে, দেহ পুলকিত হবে, তখন সংখ্যাজপের আর প্রয়োজন হবে না!

ঈশ্বরকে ডাকতে হয়, মনে বনে আর কোণে — অতি গোপনে। তিনি যে গোপনের ধন। তাঁকে ডাকবে — তা আবার অপরে জানবে?

শ্রীম একটু চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। ক্ষণকাল পর আবার বলিতেছেন।

শ্রীম — প্রথমে জপ করা ভাল। জপ কি কম জিনিস গা! গোপালের মা জপসিদ্ধ। জপ করতে করতে গোপালের দর্শনলাভ করেছিলেন। ঠাকুর বলেছিলেন, জপ করতে করতে আমার সমাধি হয়ে গিছলো।

অন্তেবাসী — আজ্ঞে, জপ করার সময় ইষ্ট-পাদপদ্মে মন রাখার প্রয়োজন আছে কি?

শ্রীম — না, তা কি হয়? দু' নৌকায় পা দিলে কিছুই হয় না। প্রথমে একটু ধ্যান করে, তাঁর চরণে নমস্কার করে জপ আরম্ভ করতে হয়। মন যেই স্থির হয়ে আসবে তখন আপনি তাঁর পাদপদ্ম চিন্তা হবে। যাদের কাজের ঝঞ্ঝাট আছে তাদের জপই ভাল — মন চঞ্চল বলে। যাদের তা নাই তারা সব সময়ই ধ্যান করতে পারে। তবে শেষ রাত্রে ধ্যান করা ভাল। ঠাকুর বলতেন, তখন মাথা ঠান্ডা থাকে, মন শীঘ্র স্থির হয়।

৬

মিহিজাম-আশ্রমপ্রাঙ্গণ। জম্বুতলা। ভক্তগণ ভাগবত শ্রবণ করিবার জন্য একত্রিত হইয়াছেন। এখন অপরাহ্ন চার ঘটিকা। বেশ গরম পড়িয়াছে। শ্রীম আসিয়া চেয়ারে উপবেশন করিলেন — বেদীর নিচে উত্তরাস্য, হাতে গীতা।

শ্রীম — (ভক্তদের প্রতি) মুখস্থ হলো সেই শ্লোকগুলি (গীতা ১৮ অঃ, ২৩-২৮ শ্লোক)?

গদাধর দুই একটি মুখস্থ বলিতেছেন।

শ্রীম (জনৈক ভক্তের প্রতি) — গীতার এই ছ'টি শ্লোক জানা থাকলে লোক চিনতে পারা যায়।

এই বলিয়া শ্রীম তাঁহার প্রশান্ত গম্ভীর দৃষ্টি ভক্তের চক্ষুর উপর নিক্ষেপ করিলেন এবং শির দক্ষিণে ঈষৎ আন্দোলিত করিয়া পুনরায় বলিতেছেন, insight (অন্তর্দৃষ্টি) হয়। নিজকে রক্ষা করা যায়।

শ্রীম গীতা খুলিয়া রাজসিক ও তামসিক কর্ম ও কর্মীর লক্ষণ কয়েকবার পড়িলেন। এসব কি সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য?

শ্রীম — (সকলের প্রতি) গীতা পড়া খুব ভাল। এক একটি শ্লোক পড়, আর ধ্যান কর। শ্রীকৃষ্ণের personality (জীবন্ত মূর্তি) ভাবতে হয়। As a man (মানুষরূপে) ভাবলে তবে impressed (অঙ্কিত) হয় মনে। নইলে তা হয় না। Concrete form-এ (স্থূল মূর্তিতে) ভাবলে শীঘ্র দাগ বসে। হড় হড় করে খালি শ্লোক ঝাড়লে কি হবে? শুধু পাণ্ডিত্যের কর্ম নয় — ধারণা চাই। শ্রীকৃষ্ণ বা ঠাকুরকে ভাবলে গীতার অর্থ শীঘ্র বোঝা যায়।

কথাপ্রসঙ্গে ডাক্তার পরেশবাবুর কথা হইতে লাগিল। ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দৌহিত্র। মিহিজামে থাকেন, গরীবদুঃখীদের উপর তাঁহার খুব দয়া।

শ্রীম — খুব ত্যাগী লোক। আবার বিয়ে করেন নাই।* কত খাটেন লোকের জন্য। সকাল থেকে সারাদিন খাটছেন, আবার রাত এগারটা পর্যন্ত। শুতে রাত একটা দেড়টা হয়ে যায়। সাদাসিধে লোক, পায়ে জুতা নাই। গায়ে বিদ্যেসাগরমশায়ের রক্ত। পড়েছেনও খুব। উপনিষদ্, কুমারসম্ভবাদি কাব্য, মিলটন, শেক্সপীয়র — সব বইতে দাগ রয়েছে।

বিনয় — কিন্তু কম্পাউণ্ডারই কর্তা প্রকৃত পক্ষে।

শ্রীম — সফরী ফরফরায়তে। নিজের আধিপত্য দেখাতে চায়। আবার ভালর দিকও আছে। পরেশবাবুর পরিশ্রম বেঁচে যায়। কম্পাউণ্ডারকে responsibility (দায়িত্ববোধ) শিক্ষা দেন authority (কর্ত্তৃত্ব) দিয়ে। বৈষয়িক বিষয়ে একটু art (কৌশল), একটু common sense (কাণ্ডজ্ঞান) খাটিয়ে চলতে হয়। না হয় করলেনই বা একটু 'মশায় মশায়' কর্মচারীকে। এতে অন্যায় কিছু নাই।

এখন অপরাহ্ন পাঁচটা। ভাগবত পাঠ হইবে।

শ্রীম — (জগবন্ধুর প্রতি) — ভাগবতখানা নিয়ে আসুন।

---

* পরে বিয়ে করেছেন।

জগবন্ধু — আজ্ঞে, ভাত খেয়েছি এ কাপড় পরে।

শ্রীম — একটু জপ করুন বসে, তারপর নিয়ে আসুন।

জগবন্ধু — এই কাপড় পরে এইমাত্র জপ করে এসেছি।

শ্রীম — তা হোক, আর একটু না হয় হলো। 'অধিকন্তু ন দোষায়।' ভাতখাওয়া কাপড় পরেও ঠাকুরকে ছোঁয়া যায় যদি জপ করা হয়। জপাদিতে সব শুদ্ধ হয়।

জগবন্ধু অল্পক্ষণ জপ করিয়া পূজার আসন হইতে ভাগবতখানা লইয়া আসিলেন। শ্রীম-র নির্দেশমত একাদশ স্কন্ধের একাদশ অধ্যায় — বদ্ধ ও মুক্তের লক্ষণ পাঠ করিতেছেন।

পাঠক — 'মুক্তপুরুষ প্রকৃতিতে অবস্থান করেন বটে, কিন্তু আকাশ, সূর্য ও সমীরবৎ নিঃসঙ্গ'।

শ্রীম — In the world, but not of the world — পদ্মপত্রে যেন জল।

'বদ্ধপুরুষ' ঠাকুর বলতেন, 'মরবার সময় উপস্থিত — বলছে, কাগজ কলম নিয়ে এসো, লিখে দি'। এ সময়ও সম্পত্তি বিভাগ করছে। বলতেন, 'এদিকে মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আছে। প্রদীপের সলতেটা একটু বেশী জ্বলছে দেখে বলছে, হাঁ রে, এটা কমিয়ে দে না — তেল যে পুড়ে যাচ্ছে!' বদ্ধপুরুষ অবসর হলেও, তিনি বলতেন, 'ঈশ্বরচিন্তা করে না। বলে, আমার কিরূপ স্বভাব বসে থাকতে পারি না। হয়তো বেড়া বাঁধছে।'

ঠাকুর একদিন ঠন্‌ঠনে কালীবাড়িতে গিয়ে দেখেন সব বসে তাস খেলছে। দুঃখ করে বললেন, 'দেখ, এসব স্থানে বসেও তাস খেলা!' বদ্ধপুরুষ সারা দুপুর পাশের বাড়িতে গিয়ে তাস খেলে কাটাবে, তবুও ঈশ্বরের নাম করবে না।

মুক্তপুরুষ ভাবেন — 'ইন্দ্রিয়ানি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত'। আমার কিছু নয়, আমি মুক্ত। আমেরিকায় ঐশ্বর্যের ভিতর থেকেও (স্বামীজীর) Song of the sannyasin ('সন্ন্যাসীর গীতি') চলছে ভিতরে সর্বদা — I am free, ever free (আমি মুক্ত — নিত্যমুক্ত)।

পাঠক — '(শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন) আর যদি ব্রহ্মপদে মন নিশ্চল রাখিতে অসমর্থ হও তাহা হইলে হে উদ্ধব, মদেকাবলম্বী হইয়া আমাতে সর্বকর্ম সমর্পণ কর। শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ মদীয় ভুবনমঙ্গল কথা শ্রবণ, গান ও স্মরণ এবং মদীয় জন্মকর্ম বিবরণ অভিনয় করিতে করিতে আমাতে নিশ্চলা ভক্তি লাভ করিবে।'

শ্রীম — জন্মকর্মলীলা-অভিনয়। ঠাকুর দেবীপক্ষ পড়তেই সকাল বেলা দু'হাত তুলে 'দুর্গে', 'দুর্গে' বলে নৃত্য করতেন। প্রতিপদ থেকে কোজাগরী পূর্ণিমা পর্যন্ত, নিত্য।

'জন্মলীলা' — যেমন 'দুঃখিনী ব্রাহ্মণী কোলে, কে শুয়েছ আলো করে' — এসব গান। এসব তাঁরই লীলা-অভিনয়। এসব করলে ভক্তিলাভ হয়। ভক্তিলাভ হলেই তাঁর কৃপায় মুক্তিলাভ করবে।

'মদেকাবলম্বী' — অর্থাৎ ভগবানকে যিনি অবলম্বন করেন, অন্য কারো প্রত্যাশা করেন না যিনি। ঠাকুর কেবল মাকে জানতেন আর কিছু না। মা যা বলবেন তাই করবেন — যেন শিশুর মা।

এক এক দল আসতো ঠাকুরের সেবা করতে, আবার চলে যেতো। ঠাকুর বলতেন, 'আমি কি কারুকে ডেকে আনি, না যেতে বলি? মা-ই সব করেন ও করান।' এদের কিন্তু এতেই হয়ে গেল।

তিনি যে সেবা নিতেন সে কি তাঁর অভাবের জন্য, না ভক্তদের মঙ্গলের জন্য? ভক্তদের মঙ্গলের জন্যই। তাঁর আবার অভাব কি, যিনি সকলের সকল অভাব পূরণ করেন?

একবার একটি ভক্তকে একটা কোট আনতে বললেন। তিনি তিনটা নিয়ে এলেন। একটি রেখে বাকিগুলি ঠাকুর ফিরিয়ে দিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বললেন, 'আর রাখলেনই বা। ওরা না দিলে আসবে কোত্থেকে?' অমনি খপ্ করে ঠাকুর উত্তর করলেন, 'না, সঞ্চয় করতে নেই, মা-ই সব দেন।' ভক্তটি বুঝলেন, তাঁর কল্যাণের জন্যই একটি কোট গ্রহণ করলেন।

একজন ভক্ত সেবা করতো ঠাকুরের। একদিন সকালে অনেক বেলা পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে আছে দেখে ঠাকুর তাকে খুব তিরস্কার করলেন। ভক্তটি অভিমান করে শরীরত্যাগ করবে বলে চলে গেল।

আবার আর একজন তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। ইনি plead (পক্ষ সমর্থন) করে বলছেন, 'তাহলে, ও কি এখানে থেকে যাবে?' ঠাকুর বললেন, 'তাঁর ইচ্ছা হয় থাকুক।' মানে, প্রত্যাশা নাই কারো উপর।

আর একজনকে কাশীপুরে তিরস্কার করেছিলেন — 'এই সন্ধ্যেবেলা কি হৈ হৈ করে কাটাচ্ছিস্। এখন বসে ধ্যানজপ করতে হয়। এখন এসব করবি না তো, পরে কি লোকের ঘরের বউ-ঝি টেনে বের করবি?'

কারো অপেক্ষা নাই — অনপেক্ষ। এই বুদ্ধি নাই, যদি চলে যায় কে সেবা করবে! তিনি দেখতেন, সবই মা করছেন।

একজন কয়েকটা টাকা দিত মাসে মাসে। তাতে তার মনে হয়তো একটু অভিমান হয়েছিল। কোন ঘটনায় বিরক্ত হয়ে একদিন ঠাকুর বললেন, 'কে সে? — কয়টা টাকা দেয় বলে! টাকা দেয়, সে আমার কি? ভক্তদের সেবার জন্য দেয়, তাতে তার নিজের কল্যাণ।'

তুমি কেশব সেন, আমায় মানবে তবে বড় হবো। কি, তুমি অমুক বড়লোক — রাজা, আমায় বড় বলবে তাহলে আমি বড় হবো, এসব তাঁর ছিল না। ঠাকুর কারো মুখ চেয়ে কথা কইতেন না। মার মুখ চেয়ে থাকতেন — সর্বদা 'মা মা'। একে বলে 'মদেকাবলম্বী', অর্থাৎ ঈশ্বরের উপর যার সম্পূর্ণ নির্ভরতা।

শ্রীম — যাঁকে জগন্মাতা ধরে রেখেছেন তাঁকে অন্য লোক ডেকে আনতে হয় না। নিজেই কত লোক আসে। কোথায় দক্ষিণেশ্বর বাগান — ঠিক ঠিক ভক্তরা সবাই গিয়ে সেখানে জুটলো। ঠাকুর বলতেন, ফুল দূর বনে ফুটলেও মৌমাঝিরা সব আসে ভন্‌ভন্‌ করে খুঁজতে খুঁজতে। তাদের আনতে হয় না গিয়ে নেমন্তন্ন করে।

টাউন হলে লেকচার দেয় — পাঁচ হাজার লোক হাততালি দেয় — এমন সব লোকও দেখেছি ওখানে গিয়ে ঠাকুরের কাছে চুপটি করে বসে আছে। এখানে চালাকি চলে না, সব ধরা পড়ে যায়!

আমি যখন প্রথম যাই, কি অদ্ভুত কাণ্ড! বাড়িতে বনিবনা হলো না বাপভাইয়ের সঙ্গে। মনে হলো — কি, যাদের জন্য এত করলুম

তাদের এই ব্যবহার! এ যন্ত্রণা আর সহ্য হচ্ছে না। এ বাড়িতে আর থাকা হবে না — suicide (আত্মহত্যা) করে সব যন্ত্রণা দূর করবো। একদিন রাত দশটার সময় বের হয়ে পড়লুম। গাড়ী করে বরানগর বোনের বাড়িতে যাচ্ছি, মাঝ রাস্তায় চাকা ভেঙ্গে গেল। নিকটে একজন আলাপী লোকের বাড়ি ছিল, সেখানে উঠা গেল। তারা মনে করলে, আপদ জুটেছে, হয়তো রাত্রে থাকবে। তারপর অন্য গাড়ি ডাকিয়ে বরানগর যাই।

পরদিন বিকেলে এ-বাগান ও বাগান বেড়িয়ে বেড়িয়ে সময় কাটাচ্ছি, সঙ্গে সিঁদু। উভয়ে দেহ ও মনে অবসন্ন হয়ে এক বাগানে মাটিতেই বসে পড়লুম। সিঁদু বললে, চল যাই আর একটি বাগান আছে রাসমণির। ওখানে একটি সাধু থাকেন। আসা গেল মেন গেট দিয়ে। তখন সন্ধ্যা হবার আধঘন্টা বাকী।

বাগান দেখে মুগ্ধ হলুম। ফুল দেখছি, ফুল তুলছি, ফুল শুঁকছি। আর ফুলের সৌন্দর্যের কথা ভাবছি। (সহাস্যে) আমি একটু poet (কাব্যরসিক) ছিলাম কি না!

শেষে ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ। ঠাকুর ছোট খাটটিতে উপবিষ্ট — ভক্তরা সব নিচে বসে। আমি কাউকে চিনি না। প্রথম কথা শুনলুম — ঠাকুর বলছেন, যখন ঈশ্বরের নামে দু'নয়নে ধারা বইবে, অঙ্গে পুলক হবে, তখন বোঝা যাবে কর্ম ত্যাগ হয়েছে।

এর সাত আটদিন পর উঠোন দিয়ে যাচ্ছেন ঠাকুর। মণি (শ্রীম) বলছেন ঠাকুরকে, এসব যন্ত্রণা থেকে আত্মহত্যা করাই ভাল। ঠাকুর শুনেই উত্তর করলেন, 'ওকথা কেন? তোমার যে গুরুলাভ হয়েছে। তোমার আবার ভাবনা কি?' বললেন, 'গুরু যে তোমার পিছু পিছু রয়েছেন। যাকে কষ্ট ভাবছো তা যে তিনি ইচ্ছে করলেই দূর করে দিতে পারেন, সহজ করে দেন। অনেক গাঁটওয়ালা একটা দড়ি বাজিকর কয়েক হাজার লোকের সামনে ফেলে দিলো, কেউ একটা গাঁটও খুলতে পারলে না, কিন্তু বাজিকর হড় হড় করে হাত ঝাঁকুনি দিয়ে সবগুলি খুলে ফেলবে। ভাবনা কি, গুরু সব কিছুর মোড় ফিরিয়ে দিবেন।'

এইতো এত যন্ত্রণা, আর কিনা তাঁকে পেলুম। কিভাবে নিয়ে যান তিনি। তারপর বাপ এলেন — কত আদর যত্ন, শেষে খোসামোদ করে বাড়ি নিয়ে যান।

মোহন — আচ্ছা, এই জন্যই কি ভগবানকে সর্বমঙ্গলময় বলে?

শ্রীম — হাঁ, পিছনে ফিরে দেখলে সর্বমঙ্গলময়। আমরা সম্মুখ দেখে বিচার করি। কোথায় ঝগড়া, আত্মহত্যা আর কোথায় ভগবানদর্শন!

কথা কহিতে কহিতে শ্রীম আসন হইতে উঠিয়া কুটীরের বারান্দায় আরোহণ করিলেন। সেখানে তক্তপোশে বসিয়া পুনরায় কথা কহিতেছেন।

শ্রীম — Human life is an excellent apology for suicide except Guru (গুরুর উপর নির্ভরতাহীন জীবন আত্মহত্যার সমান)।

(ভক্তদের প্রতি) আহা তিনি (ঠাকুর) যে কি জিনিস ছিলেন গা — আপনারা তো দেখেন নাই! অমনটি আর হয় না। অমন 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্'। যোগেনস্বামী একটা ফল এনে দিলেন ঠাকুরকে, তিনি সেটা খেতে পারলেন না। পরে জানা গেল, না বলে অপরের বাগান* থেকে এই ফলটা আনা হয়েছিল। তিনি 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্', আবার কপালমোচন।

৭

ঠাকুরঘরে সন্ধ্যা-প্রদীপ দেওয়া হইয়াছে। খুব গরম পড়িয়াছে। ঠাকুর প্রণাম করিয়া সকলে বাহিরে চলিয়া আসিলেন। জম্বুবেদিকায় সকলে উপবিষ্ট। শ্রীম পার্শ্বেই চেয়ারে বসিয়া আছেন। কৃষ্ণপক্ষের

* এই বাগান যোগানন্দ স্বামীর কোনও আত্মীয়ের ছিল। তিনি সর্বদা এখান হইতে ফল (লেবু) আনিয়া ঠাকুরের সেবায় দিতেন। ঠাকুর তাহা গ্রহণ করিতেন। কিন্তু এই ঘটনার কয়েকদিন পূর্বে ঐ বাগান বিক্রয় হইয়া যায়। যোগানন্দ স্বামী তাহা জানিতেন না। ঠাকুর অন্তর্যামী, তিনি সব জানিতে পারিয়াছিলেন। তাই ঐ ফল আহার করিতে পারিলেন না।

আকাশে অগণিত নক্ষত্র উজ্জ্বল মণির মত জ্বলিতেছে।

রন্ধনশালায় একটি ভক্ত রাত্রির আহার্য প্রস্তুত করিতেছেন। ঠাকুর বলিতেন, 'একটা হাঁড়িতে দু'টি চাল ফুটিয়ে মুখে দেওয়া আর বাকী সময় ভগবানচিন্তা করা।' ঠাকুরের এই উপদেশ শ্রীম নিজেও পালন করিয়াছেন আর ভক্তদেরও শিক্ষা দিতেছেন। তাই আশ্রমের সকলকেই অন্তত ডালভাত কিংবা ভাতেভাত রান্না শিক্ষা করিতে হইতেছে। রন্ধননিরত ভক্তটি ছাড়া সকলে বাহিরে।

উপরের আকাশের অপূর্ব শোভা। চারিদিকে বনভূমির গভীর নীরবতা। আবার মৃদুমন্দ সান্ধ্য সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে। শ্রীম ভক্ত সঙ্গে ধ্যান করিতেছেন। কিয়ৎক্ষণ পর এই মধুর সম্মিলন হইতেও সুমধুর স্বরে শ্রীম কথা কহিতেছেন!

শ্রীম — (ছোট অমূল্যর প্রতি, আকাশ দেখাইয়া) এই দেখুন কাণ্ডখানা — 'চমকে মোতি রে!' রোজ দেখা যাচ্ছে, তাই আশ্চর্য মনে হচ্ছে না, কিন্তু কি কাণ্ড, একবার ভাবুন দেখি — অনন্ত কাণ্ড!

এই দেখুন সপ্তর্ষিমণ্ডল। অনন্তকাল ধরে এঁরা রয়েছেন। এসব দেখলে ভগবানের উদ্দীপন হয়। আকাশে দৃষ্টি ভাল। লোকের দৃষ্টি শুধু পেটে পড়ে আছে। আকাশে দৃষ্টি ঊর্ধ্ব দৃষ্টি, এতে তাঁকে মনে পড়ে।

(গদাধরের প্রতি) এই দেখছো আকাশ। বল তো এর (পৃথিবীর) নিচেও আছে কি না? গদাধর চুপ করিয়া আছেন।

শ্রীম — এই পৃথিবীর যেমন এই আকাশ, তেমনি সকল গ্রহেরই আকাশ আছে। আমাদের এই সূর্যমণ্ডলে ন'টি গ্রহ আছে। পৃথিবী তার মধ্যে একটি! অপরগুলিরও এমনি সব আছে — আকাশ। অনন্ত ব্যাপার — অনন্ত সূর্যমণ্ডল — সব অনন্ত।

এতক্ষণে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ হইয়া গেল। বলরাম মন্দিরে রথযাত্রা দিবসে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দোৎসব করিতেছেন — চতুর্থ ভাগ — ত্রয়োবিংশ খণ্ড। এইবার শ্রীম ভক্তসঙ্গে আহার করিতে বসিলেন। তিনি নিত্য রাত্রিতে দুধ রুটি আহার করেন। আজ বলিলেন ভাত খাইবেন। একটি ভক্ত রন্ধন শিক্ষা করিতেছেন। ভাত

আহার করিয়া তাহার উৎসাহ বর্ধন করিবেন। একে রান্নায় নূতন লোক, তাতে আবার লম্বাগলা সাঁওতালী হাঁড়িতে রান্না — ভাতগুলি সব পিণ্ডি হইয়া গেল। কিন্তু শ্রীম ইহাই অতি পরিতোষপূর্বক ভোজন করিলেন।

রাত্রি দশটা বাজিয়া গিয়াছে। শ্রীম প্রাঙ্গণে পদচারণ করিতে করিতে অন্তেবাসীর সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম — (অন্তেবাসীর প্রতি) ঠাকুর রাত্রি দু'টো তিনটের সময় গঙ্গাতীরে একাকী বেড়াতেন, অনাহত শব্দ শুনতেন। একদিন দেখি, একজন 'দাদা মধুসূদন, দাদা মধুসূদন' বলে ডাকছেন। ঠাকুর শিখিয়ে দিছলেন। আমি তখন পঞ্চবটীতে — গভীর রাত। চুপি চুপি গিয়ে শুনলুম।

তাঁর কি কৃপা! ভক্তরা যারা সেবা জানতো না, তাদের দ্বারা জোর করিয়ে সেবা করিয়ে নিতেন। 'গামছাটা ভিজিয়ে আন তো', 'জলের ঘটিটা এগিয়ে দাও তো', 'জামাটা রৌদ্রে দাও', 'একটু বসো, খাওয়া হলে হাতে জল ঢেলে দেবে' — এই রকম করে বলে বলে।

অহেতুক কৃপাসিন্ধু! স্বয়ং ঈশ্বর মানুষ শরীর ধারণ করে এসেছেন। ভক্তরা তাঁকে জানে না, কিন্তু তিনি তো নিজেকে জানেন। তাই জোর করে সব করিয়ে নিতেন এই মনে করে — তারা তো বোঝে না আমায়, এখন জোর করে করিয়ে নি। পরে যখন বুঝবে তখন এক একটা বিষয় ভাবতে ভাবতে জীবন অতীত হয়ে যাবে — মধুময় হবে।

অন্তেবাসী — (স্বগত) আমাদেরও এই দশা।

কলিকাতায় একটি ভক্ত সাংসারিক ঝঞ্ঝাটে পড়িয়াছেন। তিনি একটু স্থূলকায় — তাঁহার অনেক কাজ। বাড়ির সব আবার অবাধ্য। ভক্ত ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল — সাধু ও ভক্তের সঙ্গ করিতে চান, কিন্তু অবসর হয় না বলিয়া মনে দুঃখ। শ্রীমকে চিঠি দিয়া প্রায় নিত্য ইহা নিবেদন করিয়া থাকেন। এই ভক্তটির সেবার জন্য জনৈক সেবককে কলিকাতায় পাঠাইতেছেন। আগামী পরশু সেবক যাইবেন।

তাই তাহাকে নানা উপদেশ কয়দিন হইতে দিতেছেন। আজও বলিতেছেন সেই সব কথা।

শ্রীম — (সেবকের প্রতি) ভক্তকে ভগবান ছাড়তে পারেন না। ভক্ত এমন জিনিস! ঠাকুর কত ভাবতেন ভক্তদের জন্য। কেউ না গেলে চিঠি লিখতেন, কিংবা কাউকে পাঠিয়ে দিতেন সংবাদ নিতে। কারো হয়ত কর্ম নাই, অন্য ভক্তদের বলতেন কর্ম করে দিতে। (সহাস্যে) একদিন বললেন, নারাণ বলেছে কিশোরীর একটা কর্ম করে দেবে। নারাণ ছেলেমানুষ কি করে কর্ম করে দেবে? এর অর্থ, যাকে একথা বলছেন তার কাছে recommend (প্রস্তাব) করছেন। তাঁর way of presentation (বলবার ভঙ্গী) অদ্ভুত।

ইনি বড় মুস্কিলে পড়েছেন। বন্ধুদের, ভক্তদের help (সাহায্য) করা উচিত। পিতামাতা, আত্মীয়কুটুম্ব থেকে ভক্ত বড়। এরা সব সংসারে আবদ্ধ করে, কিন্তু ভক্ত বন্ধু, মুক্তির সহায় হয়। ভক্তই যথার্থ সুহৃদ। ভগবানের পথে যারা সহায় তাদের মত কি আর কেউ বন্ধু আছে? এরা প্রকৃত বন্ধু।

একটা আড্ডা করা ভাল — বাড়ি থেকে দূরে। এমন কি খাওয়াটাও ওখানে নিয়ে যেতে পারলে ভাল। তা, এখন অতটার দরকার নাই।

সেবক — পরিবারের অনেকে পছন্দ করে, ইনি কেবল তাদের সঙ্গে থেকে আমোদআহ্লাদ করুন। সাধু ভক্তের সঙ্গে মিশামিশি হয়, এটা তারা চায় না। একবার দু'টি সাধুকে খাওয়াতে নেওয়া হয়েছিল, বাড়ির লোক তত পছন্দ করলে না।

শ্রীম — ওরা নিজের standard-এ (গজে) মাপে কিনা। ভাবে, আমাদের ভোগে তাহলে টান পড়বে। কি হীন বুদ্ধি! ঠিক ঠিক সাধু, ভক্ত কারো পরোয়া করে না। তাঁর উপর সব ভার। একবার খোকামহারাজের অসুখ হলো আলমোড়ায়। মঠে সংবাদ দিলেন না। পড়ে আছেন এক স্থানে — ঈশ্বরের উপর সব নির্ভর। সেরে যাবে এমনি, তা না হয় তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে — সাধু, ভক্তরা এইরূপ ভাবেন। তা এরূপ কেন করবেন না? এঁরা, মনে করো কত বড় সাধু!

কত স্বপ্ন দেখতেন! ঠাকুর মাথায় ধরে আছেন। মাথায় গায়ে হাত বুলুচ্ছেন।

(সেবকের প্রতি) তোমরা দু'জন কাছে থাকলে ওর মনে খুব বল হবে।

সেবক — বাড়ির লোক যদি মনে করে আমাদের হাতছাড়া হলো?

শ্রীম — তো তা করবেই ওরা — করে করুক। এরা সব বন্ধু, যারা খেয়ে সব ধ্বংস করছে? ঈশ্বরের পথে বিঘ্ন যারা, তারা বন্ধু নয় — বন্ধুরূপী শত্রু — খাবার কুটুম। ভাবে আমরা না থাকলে বুঝি হবে না। যখন দেখবে তোমরা দু'জন রয়েছ পিছনে, তখন আপনি ভয় পাবে। তখন ভাববে আমাদের ছাড়াও চলতে পারবে। ভক্তরাই সব কাজ করবে — রোগে শুশ্রূষা করবে। সকলে ছাড়তে পারে, কিন্তু ভক্তরা ছাড়তে পারে না। ভক্তরা ঈশ্বরের পথে সহায়।

সংসারে সকলের সঙ্গে একটু বিচার বিবেচনা করে চলতে হয়। একটু আর্টের (কৌশলের) দরকার। টাকা দিয়ে যখন সবাইকে আলাদা করে রাখবেন, তখন সব ঠিক হবে। যখন যা দরকার বিবেচনা করে করবে। বাধা দেওয়া আর দলবাঁধা, বাড়ির লোকের কর্ম। ঠাকুর রয়েছেন ভাবনা কি, তিনি ভক্তদের সহায়।

২২শে চৈত্র, ১৩২৯ সাল।
৫ই এপ্রিল, ১৯২৩ খ্রীঃ।
বৃহস্পতিবার, কৃষ্ণা চতুর্থী।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

সোপেনহার ও ধর্মজীবন

১

মিহিজাম, দক্ষিণ প্রান্তর। পুষ্করিণীর তীরে শ্রীম বসিয়াছেন, সঙ্গে মোহন। সূর্য উঠিতেছে। কয়েক দিন পূর্বে মোহনকে বলিয়াছিলেন, 'যখন দেহ আলাদা আর আত্মা আলাদা — এ বোধ হয়, তখনই ধর্মজীবন আরম্ভ হয়।' মোহনের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তিনি তাই প্রশ্ন করিতেছেন।

মোহন — সেদিন বলেছিলেন, দেহ আলাদা আর আত্মা আলাদা — এ বোধ থেকে ধর্মজীবন আরম্ভ হয়। মনে হচ্ছে এ শেষ কথা। আত্মার বোধ হয়ে গেলে তো সব হয়ে গেল।

শ্রীম — দেহ অনিত্য, থাকবে না — এ জ্ঞান যখন হয় তখনই লোক ঈশ্বরকে চায় ঠিক ঠিক। তা না হলে বলে, বেশ আছি। উদ্দেশ্য ভুলে যায়। তাই তো যুধিষ্ঠির বলেছিলেন — 'কিমাশ্চর্যমতঃ পরম্।' কি শ্লোকটা?

মোহন — অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃ পরম্॥

শ্রীম — এই ভুল। সকলেই মরবে, কিন্তু ভাবছে, আমরা বেঁচে থাকবো চিরকাল। একটি মড়া নিয়ে যাচ্ছে লোক, তা দেখে মা ছেলেটাকে অঞ্চল দিয়ে ঢেকে ফেলে। মা ও ছেলে দু'জনকেই যে যেতে হবে সে চিন্তা নাই। মনে করে, যারা মাসে মাসে মরে, তারাই মরছে। আমরা বেঁচে থাকবো চিরকাল। এমনি তাঁর মায়া। তাইতো মহারাজ যুধিষ্ঠির বললেন, এইরূপ মনে করাই সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয়।

তাঁর কৃপায় কারো কারো মনে হয়, এ শরীর থাকবে না। এর

সেবা করে কি লাভ? তখন বিষয়বৈরাগ্য হয়। ভোগে মন যায় না। তখনই বিয়ে করতে চায় না — করলেও ছেড়ে চলে আসে। নিত্যবস্তু ঈশ্বরকে চায়। কিংবা সংসারে থাকলেও না থাকারই মত থাকে। তাই বলতেন ঠাকুর, 'মানুষ যারা জ্যান্তে মরা।'

মোহন — যেমন বৃহদ্রথ রাজার হয়েছিল।

শ্রীম — হাঁ, রাজ্য ছেড়ে বনে চলে এলেন। আমার শরীর থাকবে না, আমার পূর্ববর্তী যযাতি, ভরতাদি রাজাগণকেও চলে যেতে হয়েছে — এ বোধ যখন হলো তখনই রাজ্য ছেড়ে দিলেন আর কঠোর তপস্যায় মগ্ন হলেন। এ ভাবটি মনে দৃঢ় হলেই তীব্র বৈরাগ্য। তিনি তখনও গুরুলাভ করেন নাই। তারপর ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকাতে ভগবান শাকায়ন্য মুনিকে পাঠিয়ে দিলেন। তখন গুরুকৃপা আর নিজের চেষ্টায় আত্মজ্ঞান লাভ করেন।

স্থূল দেহ থাকবে না, এ বোধ first stage (প্রথমাবস্থা)। তারপর সূক্ষ্মদেহ, এও অনিত্য। তারপর কারণদেহ। এ সব পরে অনিত্য বলে জ্ঞান হয় তাঁকে দর্শন করলে। তিনি মহাকারণ — এসবের পার। পঞ্চকোষের পার তিনি। অন্নময় কোষ আর প্রাণময় কোষ — এ দু'টিতে স্থূলশরীর। মনোময় কোষ আর বিজ্ঞানময় কোষ — এ দু'টিতে সূক্ষ্মশরীর। আনন্দময় কোষে কারণশরীর। এসবের পর তিনি।

ঠাকুর বলতেন, এই সব কথা বিচার করলে এক রকম, আর তিনি দেখিয়ে দিলে অন্য রকম। ধ্যান করতে করতে এসব কথা আপনি বোঝা যায়। এই তিনটে শরীরকে পৃথক ভাবে দেখা যায় — যোগীরা দেখতে পান।

একটি ভক্তের* একবার অসুখ করেছিল। অনেকদিন ভুগেছেন। একদিন ঘরে কেউ নাই, উঠে পায়খানা যাচ্ছেন। হঠাৎ মেঝেতে পড়ে গেলেন, শরীর খুব দুর্বল ছিল। ভক্তটি দেখছেন তিনি বিছানায় — খাটের উপর শুয়ে আছেন — আর শরীরটা পড়ে আছে নিচে মেঝেতে।

* শ্রীম-র

তাঁর চিন্তা করলে — ধ্যান ভজন করলে ক্রমে এসব বোঝা যায়। তাঁর কৃপা মূল। নির্জনে গোপনে প্রার্থনা করতে হয়। তাঁর কৃপা হলে এসব বোঝায় যায়। তাঁর কৃপা না হলে ধ্যানই হবে না — বোঝা তো দূরের কথা! 'ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্'।

মোহন — আত্মা কথাটার অর্থ বড় গোলমেলে। কখন অর্থ — শরীর, কখনও মন, কখনও পরমাত্মা। তাতে গোলমালে ফেলে দেয়।

শ্রীম – Context (পূর্বাপর সম্বন্ধ) দেখলে বোঝা যায়, কি অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। 'আত্মানং নাবসাদয়েৎ' — এখানে আত্মা অর্থ, মন। 'অহমাত্মা গুড়াকেশ', এখানে পরমাত্মা। কখনও শরীর অর্থে ব্যবহৃত হয়। বিরোচনমতাবলম্বী আর চার্বাকমতাবলম্বীরা দেহকে আত্মা মনে করে। প্রজাপতি উপদেশ দিলেন ইন্দ্র আর বিরোচনকে — 'অক্ষিনি যো পুরুষঃ স আত্মা।' বিরোচন ভাবলে চক্ষুতে ছায়া পড়ে, আর ছায়া শরীরের, অতএব শরীরই আত্মা। তাই অসুরগণ শরীরের সেবায় তৎপর। কিন্তু ইন্দ্র বুঝেছিলেন, বহু বৎসর তপস্যা করে — একশ' এক বছর বুঝি — আত্মাই ব্রহ্ম।

আত্মা ইন্দ্রিয় অর্থেও ব্যবহৃত হয় — যেমন লোকে বলে, আমি দেখি, আমি শুনি। এখানে চক্ষুকর্ণ, আত্মা। প্রাণ অর্থেও ব্যবহৃত হয় — যেমন, যতক্ষণ প্রাণ ততক্ষণ জীবন। হিরণ্যগর্ভের উপাসকরা আত্মা অর্থে প্রাণ বোঝে। মন অর্থেও নেয়, যেমন গীতায় বলা হয়েছে। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধরা আত্মা অর্থে বুদ্ধিকে বোঝে। আনন্দময় কোষকে আত্মা বলে, ন্যায় আর মীমাংসা মতে। বেদান্ত বলেন, আত্মা পঞ্চকোষের বাইরে — স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ শরীরের অতীত মহাকারণ, ব্রহ্ম — transcendental aspect of the reality.

মোহন — আচ্ছা, পাশ্চাত্ত্য দর্শনশাস্ত্রে যাকে self or soul (সেলফ্ বা সৌল্) বলা হয়, তার অর্থ কি?

শ্রীম — জীবাত্মা পর্যন্ত হতে পারে। অধিকাংশ স্থলেই মন, বুদ্ধি। এরিস্টটল 'সৌল'কে immortal (নিত্য) বলেছেন। আর 'Pure Thought', 'Active Reason' undefiled with action — রজঃবিবর্জিত শুদ্ধবুদ্ধি, অর্থাৎ জীবাত্মা। কেহ কেহ oversoul,

universal soul (বিশ্বাত্মা) বলে নির্দেশ করেছেন পরমাত্মাকে। তাও হিরণ্যগর্ভ, কি ঈশ্বর পর্যন্ত। ব্রহ্মের conception (ধারণা) ওরা প্রায় ধরতে পারে না। সক্রেটিস বলতেন, 'Gnothi Seauton' — know thyself, নিজকে জান। 'জীবব্রহ্মৈব' বেদান্তের এ উচ্চভাব ওরা প্রায় ধরতে পারে না।

ঠাকুর ভক্তদের বলেছিলেন, বিচার করো না, তাঁর কাছে প্রার্থনা কর। তিনি সব জানিয়ে দেবেন। ঈশ্বরীয় তত্ত্ব তিনি না বুঝিয়ে দিলে বোঝা যায় না। শুধু বুদ্ধির কর্ম নয় — ত্যাগ, তপস্যা, চাই। তপস্যা না করলে শব্দের অর্থই বোঝা যায় না। Fine distinction (সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য) বুঝতে হলে তপস্যা চাই। তপস্যার অর্থ — ভগবান যা বলেছেন, গুরুমুখে যা সব শোনা গেছে, সেসব বোঝবার চেষ্টা। যারা ঠাকুরকে চিন্তা করে তাদের এসব বুঝতে কষ্ট হবে না। (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ) কথামৃত ভাল করে পড়লে আর চিন্তা করলে, কোন বিষয়ই বুঝতে কষ্ট হবে না।

মোহন — ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে মহিমাচরণকে বলছেন, 'একদিন দেখলাম আমার ঘরে ছোট একটি জ্যোতি। ক্রমে সেই জ্যোতি বড় হয়ে সমস্ত ঘর ছেয়ে ফেললে, তারপর বাইরে, ক্রমে সমস্ত জগৎ।' আবার বললেন, 'একটা পুকুর, জল পানায় ঢাকা — একটু দেখা গেল, আবার নাচতে নাচতে ঢেকে ফেললে! সচ্চিদানন্দ-সাগর মায়াতে ঢেকে গেল।' এমন সহজ কথায় ব্রহ্ম আর মায়ার description (বর্ণনা) কোথাও দেখা যায় না।

শ্রীম — মা দেখিয়ে দিচ্ছেন কিনা এই দৃষ্টান্ত। একেই revelation (প্রজ্ঞাদেশ) বলে! এটা পণ্ডিতদের কর্ম নয়। ঐখানেই আছে, ঠাকুর বলছেন, 'মা-ই ভিতরে থেকে সব করাচ্ছেন।' একজন ভক্তকে* জিজ্ঞেস করছেন, 'কেউ কেউ বলে পূর্ণ আবির্ভাব, তুমি কি বল?' ভক্তটি বললেন, আজ্ঞে পূর্ণ, অংশ — এসব বুঝতে পারি নাই। এটি বুঝেছি যেমন বলেছিলেন, দেওয়ালের মাঝে একটি ছিদ্র, এটা দিয়ে ওপারের মাঠ দেখা যায়। আপনি ঐ ছিদ্র, আপনার

* শ্রীমকে।

ভিতর দিয়ে অনন্তকে দেখা যায়। শুনে খুশি হয়ে বললেন, 'হাঁ অনেকটা দেখা যায় — একেবারে দু'তিন ক্রোশ'।

দেখ, অবতারলীলার কি অভিনব ব্যাখ্যা! অত করে বলছেন, নিজকে নিজে প্রচার করছেন, তবুও কি লোকের বিশ্বাস হয়!

২

ঠাকুরঘরে শ্রীম বসিয়া আছেন। বিনয়, অমূল্য, জগবন্ধু প্রভৃতি ভক্তরাও আছেন। পূজা শেষ হইয়াছে, সকলে ধ্যান করিতেছেন। কিয়ৎকাল পরে শ্রীম চণ্ডীপাঠ করিতেছেন — দেবগণ কর্তৃক দেবীর স্তব — 'নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ' ইত্যাদি। তারপর নমস্কার ও প্রার্থনামন্ত্র পর্যন্ত পাঠ করিলেন। ভক্তগণ কেহ কেহ আশ্রমকার্যে চলিয়া গিয়াছেন। জগবন্ধু পাশে বসিয়া শুনিতেছেন।

এখন বেলা নয়টা। পাঠান্তে ব্যাখ্যা করিতেছেন।

শ্রীম — ব্রহ্মশক্তির স্তব। ঠাকুর বলেছিলেন নরেন্দ্রকে, তুমি যাকে ব্রহ্ম বল, আমি তাঁকেই শক্তি বলি, মা বলি। যখন স্বরূপে অবস্থান করেন তখন বলি ব্রহ্ম — যেমন সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে। আবার যখন জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন তখন বলি — শক্তি, কালী, আদ্যাশক্তি — যেমন সাপ একে-বেঁকে চলছে। শক্তি ব্রহ্ম অভেদ।

সেই শক্তিরই স্তব করছেন দেবতাগণ। সংসার শক্তির এলাকা। এখানে কিছু করতে হলে তাঁর permission (অনুমতি) চাই। তিনি প্রসন্ন হলে সব হয়। অসুরগণ অত্যাচারী, তাদের বিনাশের জন্য মার স্তব করছেন। দেবী সন্তুষ্ট না হলে হয় না। রাবণবধের পূর্বে রাম দেবীর পূজা করে অনুমতি নিয়ে তবে রাবণ বধ করেন। বিপদে পড়লে দেবীর পূজা করতে হয়। স্তব, স্তুতি, নমস্কার — সবই পূজা।

দেবগণ বলছেন, মা তুমি জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী! তুমি দুর্গা — তোমাকে বোঝা দুঃসাধ্য। তুমি দুর্গাপারা, অর্থাৎ এই দুর্গম ভবসাগর পারকারিণী। গীতায়ও তাই বলেছেন, এই দুরত্যয়া

মায়া — ভবসাগর আমাকে, অর্থাৎ ঈশ্বরকে যারা প্রসন্ন করতে পারে কেবল তারাই পার হতে পারে। অন্য উপায় নাই।

তিনি জগতের material cause (উপাদান কারণ), আবার তিনিই efficient cause (নিমিত্ত কারণ), কিন্তু নিজে uncaused (অকারণ)। আবার support of the universe (বিশ্বাধার)। ঠাকুর বলেছিলেন, এই মা-ই আমার ভিতর থেকে কথা কইছেন। এই মা-ই পণ্ডিতের বুকে পা দিয়েছিলেন।

ঠাকুরের ঘরে মহিমাচরণ বন্ধচক্র রচনা করেছেন। রাখাল, মাস্টার, মহিমা চক্র করে বসেছেন। ঠাকুর ছোট খাটে। রাখালের ভাব হলো। ঠাকুর নেমে এসে বুকে হাত দিলেন। তারপর মার নাম করতে লাগলেন, তবে ভাব উপশম হলো।

দেবগণ এইবার মাকে প্রণাম করছেন কতগুলি প্রধান গুণের নাম করে। তিনি সব — কত আর বলা যায়। তাই বড় বড় কয়েকটা নাম করা হচ্ছে — যেমন গীতায় আছে। দেবী সর্বভূতে মায়া, চেতনা ও বুদ্ধি। এই বলিয়া শির বাম দিকে ঈষৎ হেলাইয়া, চক্ষু দিয়া ইঙ্গিত করিয়া শ্রীম জনৈক ভক্তকে অস্পষ্ট ভাষায় বলিলেন, ‘বুঝেছো — তিনি বুদ্ধিরূপে আছেন। এই যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কারো কারো দেখতে পাওয়া যায় তা-ও তিনি। তাঁর দিকে মোড় ফিরিয়ে দিলেই বুদ্ধির সার্থকতা।’

ভক্তকে কি সাবধান করিতেছেন?

শ্রীম — নিদ্রাও তিনি। তাই নিদ্রিত লোককে হঠাৎ জাগাতে নাই। মনে করতে হয় এখানে দেবীর আবির্ভাব হয়েছে। ক্ষুধাও তিনি। ‘অহং বৈশ্বানরঃ ভুত্বা’ — আমি বৈশ্বানর, জঠরাগ্নি। তাই ক্ষুধিতকে খাওয়ালে দেবীরই পূজা হয়। শক্তি — প্রাণশক্তিও তিনি। ক্ষমা এবং তৃষ্ণা, অর্থাৎ ভোগবাসনা তা-ও তিনি। লজ্জারূপেও তিনি। নিন্দনীয় কার্য করতে যে লজ্জা হয় তা-ও দেবীর শক্তি। লজ্জাযুক্ত স্ত্রীলোকে দেবীর বিশেষ প্রকাশ। তিনিই শান্তি, তিনিই শ্রদ্ধা — অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাস, তিনি কান্তি, অর্থাৎ সৌন্দর্য। তিনিই আবার লক্ষ্মী, যেমন লোকে বলে থাকে — এ বড় লক্ষ্মীমন্ত,

তা-ও তিনি। তিনি বৃত্তি — সৎ বৃত্তি, অসৎ বৃত্তি — উভয়ই তিনি। স্মৃতিও তিনি। স্মৃতি অর্থ স্মরণশক্তি, মেধা — শাস্ত্র ও গুরুবাক্যের মর্মার্থ যে অধিক স্মরণ রাখতে পারে, বুঝতে হবে তাতে দেবীর বেশী প্রকাশ।

দয়া, পরদুঃখমোচনের ইচ্ছা — যেমন বিদ্যেসাগর মশায়ের ছিল — তা-ও দেবীর শক্তি। তাইতো ঠাকুর বিদ্যেসাগর মশায়কে দেখতে গেলেন মায়ের প্রকাশ বেশী বলে। সন্তোষ — contentment, তা-ও তিনি।

দেবী সর্বভূতে মাতৃরূপে অবস্থিতা। মাতৃরূপে অর্থ, স্নেহরূপে। এই স্নেহেতেই জগতের পালন হয়। স্ত্রী পুরুষ সকলের ভিতরই এ অল্পবিস্তর রয়েছে। তবে স্ত্রীলোকে মাতৃভাবের প্রকাশ অধিক।

ভ্রান্তিও তিনি। ভুল প্রমাদ, এ তাঁরই রূপ। অসত্যকে সত্য, আর সত্যকে অসত্য বলে বোধ করিয়ে দেন তিনি, এই শক্তিসহায়ে। ভেল্কী লাগিয়ে দেন এ দিয়ে।

তিনি মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের পরিচালক, আবার এই বাহ্য জগতেরও পরিচালক। তিনি অন্তরে, তিনিই বাহিরে। তিনিই ভ্রান্তি, তিনিই চৈতন্য — সব তিনি।

শ্রীম — (ভক্তদের প্রতি) এর সবটা মুখস্থ করে ফেলতে হবে। পড়া রইলো। ঋক্‌বেদের দেবীসূক্তের মত এটিও দেবীসূক্ত। নির্জনে প্রার্থনা করতে হয়, তাতে দেবী প্রসন্ন হন।

প্রার্থনা কি করে করতে হয় তা-ও ঠাকুর শিখিয়েছিলেন। 'তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না মা — শরণাগত, মা শরণাগত।'

দেবগণও প্রার্থনা করছেন, 'বড় বিপদে পড়েছি মা, রক্ষা কর। বিপদে পড়ে আমরা যখনই তোমায় ডেকেছি তখনই রক্ষা করেছ। এবারও রক্ষা কর মা! শরণাগত, মা শরণাগত।'

৩

মিহিজাম-আশ্রম। এখন বেলা প্রায় সাড়ে দশটা। শ্রীম আহার করিতে বসিয়াছেন, সঙ্গে ছোট অমূল্য, জগবন্ধু ও বিনয়। বিনয় প্রায়

আগে বসেন না। তিনি প্রধান সেবক — সকলকে খাওয়াইয়া পরে বসেন! প্রথম হইতে শ্রীম-র সঙ্গে থাকিয়া বিনয় একাকী সেবা করিয়াছেন। এখন দিনকতক ভজনাদিতে সময় অতিবাহিত করিতেছেন।

শ্রীম-র সকল দিকে লক্ষ্য। ভক্তগণ — সাধনভজন, সেবা, পাঠ ও স্বাস্থ্যরক্ষা — সবগুলির অভ্যাস যাহাতে এক সঙ্গে চালাইতে পারেন তাহার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। দৈবাৎ কাহারও উপর কাজের চাপ পড়িলে এবং ভজনাদির বিঘ্ন জন্মিলে অনতিবিলম্বে উহা পূরণ করাইয়া লন।

গদাধর পরিবেশন করিতেছেন। আহার করিতে করিতে শ্রীম কথা কহিতেছেন।

শ্রীম — (জনৈক ভক্তের প্রতি) সকালের গরম ভাত জলে রেখে দিয়ে রাত্রিতে ছেঁকে গরম দুধে নিলে ঠিক পূর্বের মত হয়ে যায়।

শ্রীম-র প্রধান আহার দিনে দুধভাত আর রাত্রিতে দুধরুটি। ভক্ত বুঝিলেন, শ্রীম সময় সংক্ষেপ করিবার জন্য এই কথা বলিতেছেন। কারণ তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্তও দোকানের রুটি কিনিয়া দুধে ভিজাইয়া খাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি সর্বদা বলেন, আহার বিহার শয়ন প্রভৃতিতে যত অল্প সময় অতিবাহিত হয় ততই ভাল। নেহাৎ যা না করলে নয় তা করে বাকি সময় ভজন কর। শুধু যে বলেন তাহা নহে, নিজে দৃঢ়নিষ্ঠ হইয়া পালন করেন, আর ভক্তদেরও পালন করাইতে চেষ্টা করেন। শ্রীম-র এখনকার এই কথার অভিপ্রায় বুঝিয়া ভক্ত উত্তর করিলেন, 'আজ্ঞে তা করার কি প্রয়োজন এখন? আমরা সব রয়েছি।' শ্রীম বলিলেন, ঠিক ভাল থাকে, আপনাকে দেখাব। এসব জেনে রাখা ভাল। এতে খুব সময় বাঁচে। আহার তো জীবনের উদ্দেশ্য নয় — উদ্দেশ্য হলো তাঁকে ডাকা। তবে দেহরক্ষা না করলে নয়, তাই যতটা অল্প সময় এতে যায় ততই ভাল। আর বাকি সময় তাঁর চিন্তা করা।

এইবার বিভিন্ন ভক্তদের সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে। ভক্তদের

সদ্‌গুণগুলি বাছিয়া বাছিয়া অপর ভক্তদের সম্মুখে ধরিতেছেন। শ্রীম-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য — গুণ কাহারো ভিতর একবিন্দু দেখিলেও ইনি তিলকে তাল করিয়া তুলেন। দোষের বেলায় সম্পূর্ণ বিপরীত — তাল যেন তিলের আকার ধারণ করে — এমনি দোষদর্শনবিবর্জিত ও ক্ষমাশীল। কাহারো দোষ দেখিলে শ্রীম-র হৃদয় স্নেহে ও সহানুভূতিতে বিগলিত হইয়া পড়ে। ভগবানের নিকট তাহার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেন। কেহ প্রতিবাদ করিলে বলেন, দোষে গুণে মানুষ — মহামায়ার হাতে মানুষ পুতুল। তার ভাল করতে চেষ্টা করা প্রকৃত বন্ধুর কাজ। তাকে সৎপথে আনতে পারলে বুঝি বন্ধু। কখনও বলিতেন, ঠাকুর যদি দোষ দেখতেন, তবে আমরা কেউই তাঁর কাছে দাঁড়াতে পারতুম না — এমন কি স্বামীজী পর্যন্তও না। ঠাকুর ছিলেন, 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্', শুদ্ধস্বরূপ।

শ্রীম — শু-বাবুর অত কাজ, কিন্তু কি ব্যাকুল, রোজ চিঠি। মন এখানে পড়ে আছে। বড় ঝঞ্ঝাটে পড়েছেন — ভক্তদের help (সাহায্য) চাইছেন। সাহায্য কি শুধু অর্থ ও শরীর দিয়েই হয়? যথার্থ সাহায্য ভগবানের কথা শোনানো। ঈশ্বরের উদ্দীপন করে দেওয়া সব চাইতে বড় জিনিস।

(জনৈক সেবকের প্রতি) কালই তবে আসা ভাল। আমাদের প্রার্থনা তাঁকে help (সাহায্য) করবে। ভক্তদের দেখলে মনে জোর আসবে।

সেবক — (স্বগত) কি ভাবনা ভক্তদের জন্য! আর কি বিনয়-প্রকাশ আশ্রিতের প্রতি! (প্রকাশ্যে সসঙ্কোচে) আজ্ঞে, যথাসাধ্য চেষ্টা করবো যেমন বলেছেন সেরূপ করতে।

শ্রীম — (আহ্লাদের সহিত) হাঁ, ভক্তদের সেবা ভগবানের সেবা। তবে একটু art (কৌশল), একটু common sense (সাধারণ বুদ্ধি) খাটিয়ে চলতে হয়, অনেকের সঙ্গে যখন ব্যবহার। প্রয়োজন হলে পরামর্শ করতে হয় বন্ধুদের সঙ্গে, কিন্তু কাজ করবে নিজের মতে। যেমন বলে লোকে — always consult your wife but do what you think best (স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করা খুব ভাল,

কিন্তু কাজটি করবে নিজের বুদ্ধিতে)।

আর একটি ভক্ত আছেন — ডাক্তারবাবু। এম.বি. পাশ ডাক্তার, খুব প্র্যাকটিস্। কিন্তু কি ব্যাকুল! আবার ‘ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত’। যখনকার যেটি, শত বাধাসত্ত্বেও সেটি করতে চেষ্টা করেন। মঠে যাবেন, তা জল হোক, ঝড় হোক, যাবেনই। রোজ মঠে যাচ্ছেন সকালে, আর স্কুলবাড়িতে (শ্রীম-র বাসস্থানে) রাত্রে। এত কাজ, তারই ভিতর এসব! একদিন জলে কলকাতা ভেসে গেছে — ওমা, দেখি ডাক্তারবাবু এসে রাত্রে উপস্থিত। জামাকাপড় সব মাথায় বাঁধা, গামছাপরা — যেন সাঁতরিয়ে নদী পার হয়ে এলেন। যে সময়ের যেটি, ঠিক সে সময়ে করবেন। এমনটি আর দেখা যায় না। যেন সৈনিক, সর্বদা প্রস্তুত। এঁকে ক’বছর থেকে দেখছি। গরীবের কাছে পয়সা নেন না, পথ্য কিনে দিয়ে আসেন, আর বিনে পয়সায় ঔষধ। না ডাকলেও খবর পেলে গরীবের বাড়িতে নিজেই গিয়ে উপস্থিত হন।

এসব concrete example (বাস্তব দৃষ্টান্ত)। এঁদের দেখলে উদ্দীপন হয়। তাইতো সাধু-ভক্তের জীবনী শুনতে হয় — পুরাণ, এসব। একজন ভক্তকে বলেছি ডাক্তারবাবুকে সাহায্য করতে। বাড়িতে ঠাকুর রয়েছেন, নিত্যসেবা। Waste (নষ্ট) না হয় জিনিসপত্র। আর সব গোছগাছ থাকে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন — neat and clean. সর্বত্রই তাঁর পূজা কিনা! ভক্তদের সেবা, আর ভগবানের সেবা এক।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাবধি প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরিয়া বহু ভক্ত শ্রীম-র প্রভাবে সাক্ষাৎভাবে অথবা তাঁহার প্রণীত ‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত’-এর মধ্য দিয়া পবিত্র সন্ন্যাসী জীবন গ্রহণ করিয়াছেন। এখনও কতকগুলি ব্রহ্মচারী তাঁহার কাছে থাকেন। শ্রীম ইচ্ছা করেন, তাঁহারাও মঠে যোগদান করুন। এইজন্য মঠের একটি সহজ চিত্তাকর্ষক চিত্র ভক্তদের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন।

শ্রীম — (ভক্তদের প্রতি) মঠ-life (জীবন), এতে আর তেমন কি কষ্ট! আজকালের মঠজীবন যেন বোর্ডিং-এ থাকা। খাওয়া দাওয়া,

পড়া সব আছে। একটু কাজ করতে হয় এই যা। তা-ও altruistic work (নিষ্কাম সেবা)। বন্যায়, দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে সেবা করা। শিবজ্ঞানে জীবসেবা। মঠবাস যেন ফার্স্ট ক্লাস বোর্ডিং-এ থাকা। শাস্ত্রাদি পাঠ হয়। ধ্যান, জপ, পূজা, পাঠ — সব আছে।

নিত্য গঙ্গাস্নান, দক্ষিণেশ্বর দর্শন, প্রসাদ ভক্ষণ। আর, এমন সব সাধুসঙ্গ! ঠাকুরের ছেলেরাও কেউ কেউ আছেন। এই golden combination (সুবর্ণ সংযোগ) কোথায় পাবে আর? সিদ্ধপুরুষও রয়েছেন। সর্বদাই highest ideal-এর (মনুষ্যজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শের) touch-এ (সংস্পর্শে) থাকা। এমন স্থান আর হয় না। তবে যাতে অলসতা প্রশ্রয় না পায়, তাই একটু সেবা কর, আর থাক — কর্তাদের এই ব্যবস্থা!

পূর্বে সন্ন্যাস বড় কঠিন ছিল। বার বৎসর জন্মভূমিতে আসতে পারতো না। নিখোঁজ হয়ে থাকতে হতো। আজকাল শুনতে পাওয়া যায়, এক বৎসরের মধ্যেই সন্ন্যাস হয়ে যায়। গেরুয়া তো শুধু সাইন বোর্ড! অনেকদিন ব্রহ্মচর্যের পর সন্ন্যাস নিলে পাকা হয়। ঠাকুর বলতেন, ঈশ্বর গোপনের ধন, তাঁকে ডাকা লোকে যত না জানে ততই ভাল।

একজন ভক্ত — আজ্ঞে, নবীনদের কারো কারো ব্যবহার তত প্রীতিকর নয়।

শ্রীম — তা হলেও তাঁরা আমাদের নমস্য। সংসার ত্যাগ করেছেন বলে সকলের নমস্য। যদি বল কাঁচা, তা হলেও নমস্য। কেন না, পথে দাঁড়িয়েছেন যে! তা ওঁদের দোষ কি! ওঁরা তো সব জানেন না। সব ছেড়ে ছুড়ে এসেছেন সব জানতে। দোষেগুণে মানুষ। লোম বাছলে কম্বল থাকে না। কেরমে (ক্রমে) ভাল হয়ে যাবেন। আমি দেখেছি, যাঁরা সব ছেড়ে মঠে আছেন দুই এক বছরের মধ্যে তাঁরা দেবতা হয়ে গেছেন। তাতে আর আশ্চর্য কি! কত বড় আদর্শ সামনে, highest ideal — ভগবানলাভ জীবনের উদ্দেশ্য, আর কিছুই চাই না।

ঠাকুর যদি দোষ দেখতেন তবে কেউ দাঁড়াতে পারতো? এমন

যে স্বামীজী, যাঁকে বলতেন মাথার মণি, তিনিই দাঁড়াতে পারতেন তাঁর সামনে? তিনি জানতেন, দোষেগুণে মানুষ। এক আধটা গুণ ধরে টান মারতেন। আর দোষ সব চাপা পড়ে তখন নষ্ট হয়ে যেতো।

যদি বল ধর্মের গ্লানি — তার কি করবে? কালক্রমের ধর্মের গ্লানি অবশ্যসম্ভাবী এ কেউ রোধ করতে পারে না। তা নইলে তিনি আসেন কি করে? ঠাকুর তাই বলেছিলেন, বাড়ির কড়ার ডাল নিত্য ভাল লাগে না। ঈশ্বর তাই মাঝে মাঝে (অবতার হয়ে) ভক্তদের নেমন্তন্ন খেতে আসেন। এ তাঁরই ব্যবস্থা।

ঠাকুর বলেছিলেন, দেহটা কিছুদিন থাকলে আরো কতকগুলির চৈতন্য হতো। আমি মুখ্যু — সব বলে দিচ্ছি, মা আর রাখবেন না। যে কয়জন পুরোনো লোক আছেন তাঁরা যতদিন থাকবেন ততদিন ঠাকুরের ভাব ঠিক থাকবে। তারপর বিকার হয়। তাই সকলের খুব সাবধান হওয়া উচিত।

সাধুদের দর্শন করতে হয় best time-এ — যখন তাঁরা জপ, ধ্যান, পূজা, পাঠ করেন। মঠে থাকলে সকাল সন্ধ্যায় এটি হয়। ছোট জিতেনবাবুর এটি হচ্ছে। মঠের সাধুরা আমাদের নমস্য। তা না হলে আমরা সাধুসঙ্গ করবো কোথায়, বল! অন্য কোথায় পাব এমন সাধু — ঠাকুরের ideal (আদর্শ) পালন করছেন যাঁরা, তাঁকে সর্বদা চিন্তা করেন যাঁরা! কত ভাল ভাল লোক এসেছেন। কতগুলি আবার এম. এ., বি. এ. পাশ করে সব ত্যাগ করেছেন। সর্বদা ঈশ্বরের চিন্তা, তাঁর কথা নিয়ে রয়েছেন। খুব উদ্দীপন হয় এঁদের দেখলে। ভগবানকে চান, আর কিছু চান না এঁরা।

আহারান্তে সকলে বারান্দায় সমবেত হইয়াছেন! সাধারণতঃ দিনে এগারটার মধ্যে সকল কার্য শেষ করিয়া ফেলিতে হয়, আর রাত্রিতে নয়টায়। এখন সাড়ে এগারটা। শ্রীম তক্তাপোষে বসিয়া ভক্তদের সঙ্গে আনন্দ করিতেছেন।

জনৈক ভক্ত — আমায় দেশে যেতে হবে একবার।

শ্রীম — তাতে আর কি, গেলেই হলো — বেড়িয়ে আসা

একবার। যাদের বিয়ে হয় নাই তাদের ভয় কি? ফস্ করে গা ঝেড়ে চলে এলুম।

(সহাস্যে) একটি গল্প আছে বেশ। নবদ্বীপে এক পণ্ডিতের কাছে প্রতিবেশী এয়েছে ব্যবস্থাপত্রের জন্য। তিনি বাড়ি নাই। তাঁর একটি ভাই আছে, কিন্তু মূর্খ। অগত্যা তার কাছেই ব্যবস্থা নিয়ে চলে গেল। প্রতিবেশীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হয়েছে — বয়স তিন বৎসর। এখন মৃতদেহ পোড়াতে হবে, কি পুঁততে হবে — এর ব্যবস্থা। মূর্খ ভাই বলে দিল পুঁততে। রাস্তায় পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন পোড়াতে। প্রতিবেশী তখন তাঁর ভাইয়ের ব্যবস্থার কথা পণ্ডিতকে বলে। পণ্ডিতমশায় রেগে বাড়ি এসে ভুল ব্যবস্থার জন্য ভাইকে খুব তিরস্কার করছেন! মূর্খ ভাই উত্তর করলে — দাদা, আমিও ঠিক ব্যবস্থা দিয়েছি। যদি আমি পোড়াতে বলতাম আর পুঁততে হতো, তবে তো দেহটা পাওয়া যেতো না। আমি পুঁততে বলেছি — এখন ইচ্ছা করলে তুলে পোড়াতেও পারে, নয়তো, পোঁতাও থাকতে পারে (সকলের উচ্চহাস্য)।'

শ্রীম — (ভক্তের প্রতি সহাস্যে) সেইরূপ যারা বিয়ে করেন নাই — যেমন আপনারা — তারা সবই পারে। সংসারে যেতেও পারে, আবার ফস্ করে গা ঝেড়ে চলেও আসতে পারে। বিয়ে করলে কিন্তু এটি হয় না। যেখানে যাও, পিছু পিছু লেগে আছে ঐ চিন্তা।

৪

গ্রীষ্মের গরম পড়িয়াছে। ক্ষুদ্র কুটীরে থাকিতে কষ্ট হয়। বিশেষ করিয়া অপরাহ্নে যখন সূর্য পশ্চিম দিকে হেলিয়া পড়ে। শ্রীম প্রাঙ্গণে আসিয়া জম্বুতলে উপবেশন করিলেন। এখন সাড়ে তিনটা।

একটি ছাগী ক্ষুদ্র একটি শিশুসঙ্গে প্রাঙ্গণে আসিয়াছে। শ্রীম আসন হইতে উঠিয়া ছাগশিশুটিকে কোলে তুলিয়া লইলেন। একটু আদর করিয়া আবার ছাড়িয়া দিলেন। ছাগশিশু 'ম্যাঁ ম্যাঁ' করিতে করিতে মায়ের সঙ্গে চলিতে লাগিল। ছাগী আশ্রম-উদ্যানের শিমলতা-

মঞ্চে সম্মুখের পা দু'টি উঠাইয়া দিয়া আহারের চেষ্টা করিতেছে। ইহা দেখিয়া শ্রীম এ বিষয়ে ভক্তদের সহিত আলোচনা করিতেছেন।

শ্রীম — (ভক্তদের প্রতি) এই দেখ, গলা বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই কোন কোন জন্তুর গলা লম্বা 'Origin of Species'-এ ('জাতির উৎপত্তি' নামক গ্রন্থে) ডারউইন (Darwin) এসব বিষয় বিচার করেছেন। গলা লম্বা কেন হলো, চতুষ্পদ কেন, তার কারণ দেখিয়েছেন। এইরূপ চেষ্টা আর প্রবৃত্তি দেখে এসব সিদ্ধান্ত করেছেন।

মানুষ উচ্চ চিন্তা করে, তাই দুই পায়ে চলে, আর দৃষ্টি আকাশে। পশুরা শুধু আহার নিয়ে ব্যস্ত। তাই (হস্তদ্বয় ও শীর্ষদেশ নত করিয়া চতুষ্পদে চলার ভঙ্গী করিয়া) এমন করে চলে — নিম্ন দৃষ্টি। কিন্তু সকল প্রাণীরই এই স্থূল শরীরের মধ্যে আরো দু'টি শরীর আছে — সূক্ষ্ম ও কারণশরীর। সূক্ষ্মশরীরের অনুশীলনে মানুষ হয় — বিচারবুদ্ধি বাড়ে। কারণশরীরে ভগবানদর্শন হয় — মানুষ দেবতা হয়। তিনটারই আহার দিতে হয়।

পশুগণ কেবল স্থূলশরীরে আহার দেয় — খালি খাওয়া আর খাওয়া কর্ম। আর কোনও চিন্তা নাই। সকাল থেকে সারা দিনরাত ঘাসই খাচ্ছে। বাচ্চাটি হয়ত আর দিনকয়েক পর মানুষের পেটে যাবে। কাটবে তো ঘাড় পেতে দিল। কোনও উচ্চ ভাবনা নাই — খাওয়া আর মরা। মানুষও এদের মত অনেক আছে। তারা শুধু সুখ — pleasurable sensation খুঁজে বেড়ায়। যারা দুর্বল তারাই এই সুখ চায়। যেই বাচ্চাটাকে কোলে নিয়েছি, আদর করেছি অমনি চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়লো। Pleasurable sensation-এ yield করা (বিষয়সুখের বশ্যতা স্বীকার করা) পশুপ্রকৃতির কাজ। স্থূলশরীর -পশুশরীর।

ক্রমে, Theory of Free will and Predestination (স্বাতন্ত্র্য ও প্রারব্ধবাদ)-এর কথা উঠিল।

শ্রীম — কি করে লোক বলে free will (স্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি), এত সব দেখেও?

মোহন — সোপেনহারও বলেন, free will (মানুষের স্বাতন্ত্র্য) কোথায় — স্বাধীন ইচ্ছা মোটে নাই। সব subordinate to one indivisible will — Idea (একটা অখণ্ড ইচ্ছার, জ্ঞানের অধীন)। আমরা সব একটা ogranism-এর (দেহের) বিভিন্ন অঙ্গ — little currents in an ocean of will, the universal will (একটি বিরাট ইচ্ছাসাগরের ক্ষুদ্র নগণ্য একটি প্রবাহ)।

শ্রীম — তিনি বলবেন না তো কি! তিনি যে এই দেশেরই লোক — মহাপুরুষ। যেন একটি ভারতীয় ঋষি in German frame (জার্মান দেহে)। জ্ঞানী ভক্ত। তাঁর রচিত 'The World as Will and Idea' (ইচ্ছা ও জ্ঞানজগৎ) - নামক গ্রন্থ অতি উত্তম। ঐ গ্রন্থে তিনি বলেছেন, The world is the objective manifestation of One Will (এই বিশ্ব এক বিরাট ইচ্ছার বাহ্য প্রকাশ মাত্র)। উপনিষদের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে — ‘স ঐক্ষত বহুস্যাম্ প্রজায়েয়েতি’। ইনি বেদান্তের নবীন ভাষ্যকার for the West (পাশ্চাত্ত্যের)।

মোহন — আজ্ঞে, আরও মিল আছে। ঠাকুর বলেছেন, বাজনার বোল মুখে বললে কি হবে, হাতে আনতে হয়। সোপেনহারও বলেন, অপরের চিন্তা দিনরাত পড়ে কি লাভ, নিজের জীবনে দেখাও! Philosophy should be understood as experience and thought — not as mere reading and passing study. Life before books : texts before commentary.

শ্রীম — তাঁর নিজের জীবনে এসব বোধ হয়েছে। সেই জন্য এসব কথা মিলে। সন্ন্যাসী — বিয়ে করেন নাই। একটা বোর্ডিং হাউসে দু’খানা ঘর নিয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দিলেন। তাঁর শরীরত্যাগও মহাযোগীর মত হয়েছিল আসনে বসে। তাঁকে বুঝতে পারে নাই ওরা! হেগেল এঁর contemporary (সমসাময়িক) ছিলেন। তিনি শুধু পণ্ডিত, আর ইনি সন্ন্যাসী — নিজ জীবনে সব বোধ হয়েছে। হেগেলের খুব নাম ছিল। সোপেনহারকে ওদেশের লোক প্রথমে

বুঝতে পারে নাই — শেষের দিকে বুঝেছিল। গ্যেটে (Goethe) কিন্তু বরাবর এঁর সুখ্যাতি করতেন। ইনি চিনেছিলেন। সোপেনহার, গ্যেটে আর বীথোবাঁকে (Sehopenhaur, Geothe, Beethoven) ঐ দেশের লোকেরা Pessimist (দুঃখবাদী) বলে। সংসারের ভোগটোগের কথা না বললেই ঐরূপ বলে থাকে।

বুদ্ধদেবের নির্বাণ ছিল এঁর আদর্শ। তিনি বলেছিলেন, Buddhism is profounder than Christianity (বৌদ্ধধর্ম খ্রীস্টধর্ম হইতেও সুগভীর)। আর একটি অমূল্য কথা বলেছিলেন প্রাচ্যে খ্রীস্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচার সম্বন্ধে। It is just the same as if we fired a bullet against a cliff — পর্বতগাত্রে গুলি মারার ন্যায় মিশনারীদের এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল। তাঁর আর একটি prophecy (ভবিষ্যৎবাণী) ছিল। সেটিও দেখছি পূর্ণ হতে চলেছে। তিনি বলেছিলেন, Sanskrit literature will deeply penetrate in the West (সংস্কৃতসাহিত্য অর্থাৎ, ভারতীয় চিন্তা ক্রমশঃ প্রতীচীর হৃদয়মন অধিকার করিবে)।

ইনি ঠাকুরের খবর পান নাই। তখনও ঠাকুরের কথা ওদেশে যায় নাই। প্রথম কেশববাবু ওখানে প্রচার করলেন। তারপর স্বামীজী ওদেশে গিয়ে বলেন। ঠাকুরের কথা শুনলে খুব আহ্লাদ করতেন।

মোহন — সোপেনহার বলেন, যিনি সর্বদা সংসারকে অনিত্য বোধ করেন তিনি তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী। ঠাকুরও বলেছেন, তীব্র বৈরাগ্য হলে আত্মীয়স্বজন কালসর্প, আর সংসার পাতকূয়ার মত মনে হয়। ঠাকুরের মত তিনিও বলেন, সংসারে সব জিনিসে মৃত্যুর ছাপ লেগে রয়েছে।

শ্রীম — একস্থানে ঠিক থাকলে সব মিলে যায়। উদ্দেশ্য ঠিক না হলেই যত গোলমাল। এক, অদ্বিতীয় সত্যবস্তু যাঁদের লক্ষ্য, তাঁদের কথা মেলে। সোপেনহার একস্থানে বলেছেন, জগৎ জয় করে কি হবে — আত্মজয় করতে না পারলে? বেশ কথা! আর এক জায়গায় বলেছেন, Genius suffers most of all (অবতারাদি মহাপুরুষগণ সকলের চাইতে অধিক দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন)।

স্বামীজীর কথাও তাই — 'যত উচ্চ তোমার হৃদয় তত দুঃখ জানিও নিশ্চয়।' ঠিক কথা। কেউ তাঁদের বোঝে না — অরণ্যে রোদন, তাই কষ্ট। ঠাকুর কুঠীর ছাদে উঠে কাঁদতেন আর বলতেন, মা, আমার দেহ জ্বলে যাচ্ছে। শুদ্ধসত্ত্ব ভক্ত পাঠাও — যারা আমায় বুঝবে। কে বোঝে তাঁদের — সাধ্যই বা কার আছে বোঝবার! তিনি বোঝান যারে সেই বোঝে। তাই তাঁদের এত কষ্ট!

মোহন — সোপেনহার বলেন, a-priori (বাহ্যদৃষ্টিতে) মনে হয় মানুষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কিন্তু a-posteriori*, through experience (অভিজ্ঞতার ফলে) বুঝতে পারা যায়, মোটেই স্বতন্ত্র নয় মানুষ, সম্পূর্ণ পরতন্ত্র। যে যে-কার্য সাধন করতে জন্মগ্রহণ করেছে, শেষ পর্যন্ত তাকে সেই কর্ম করতে হবে। তা না করে নিস্তার নাই। He must play the part which he has undertaken, to the very end.

শ্রীম — আমরা শুধু কাঠ কাটছি — rough hew (মোটা কাজ) করছি; ভগবান তাতে form (গড়ন) দেন, কারুকার্য করেন। There is a Divinity that gives the final shape—we only rough hew the timber, এতে সুন্দরভাবে opposite theory-র (বিরুদ্ধ মত দু'টির) — Free will আর Predestination-এর (পুরুষকার আর প্রারব্ধবাদের) — conciliation (সমন্বয়) হচ্ছে।

ঠাকুর একটি গান গাইতেন —

সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।।

৫

এখন অপরাহ্ন সাড়ে চারটা। শ্রীম ভক্তসঙ্গে জম্বুতলে বসিয়া আছেন। গদাধরের সঙ্গে কথা কহিতেছেন, আর বিনয় ও অমূল্য আছেন নিকটে।

---

* a-posteriori - পরীক্ষামূলক, গবেষণামূলক

শ্রীম — (গদাধরের প্রতি, আকাশ দেখাইয়া) এই দেখ, মানুষ উচ্চ চিন্তা করতে পারে, তাই আকাশের দিকে দৃষ্টি। পশুদের দৃষ্টি খালি পেটে, তাই নিম্ন দৃষ্টি। এই আকাশে সপ্তর্ষি এখনও রয়েছে। সূর্য আছে বলে দেখা যাচ্ছে না। অনন্তকাল ধরে আছে। সূর্যগ্রহণ হলে তখন দিনেও দেখা যায়। এই বলিয়া গদাধরকে কি করিয়া সূর্যগ্রহণ হয় তাহা বুঝাইয়া দিলেন।

শ্রীম — (স্বগত) লোক কেন চায় ঐদিকে (নক্ষত্রাদির দিকে আকাশে)? নিশ্চয়ই কোন affinity (অজ্ঞাত সম্বন্ধ) আছে। কত লোক কত জন্ম কাটালো ঐ সব দেখতে দেখতে। আমরাও দেখতে ভালবাসি। সপ্তর্ষি ধ্রুবের চারিদিকে ঘোরে। ধ্রুবকে বলে fixed star (অচল)। ঈশ্বরও অচল। তাই গানে বলে — 'তোমাকেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা।'

ভাগবতপাঠের সময় উপস্থিত। জগবন্ধু পাঠ করিতেছেন। শ্রীম বলেন, পাঠাদি শুভকর্মে উত্তরাস্য হইয়া বসা ভাল। তাই আজ সকলে উত্তরাস্য উপবিষ্ট বেদিকার উপর, শ্রীম নিম্নে চেয়ারে। একাদশ স্কন্ধের একাদশ অধ্যায় — 'উত্তম সাধুর লক্ষণ' পাঠ হইতেছে।

পাঠক — (শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিতেছেন) হে উদ্ধব, যিনি সর্বজীবে দয়াশীল, অন্তরে যাহার হিংসার লেশ নাই, যিনি ক্ষমতাশীল, সত্যবলশালী, নির্দোষ, সমদর্শী, সর্বহিতৈষী, কামসমূহে অনভিভূত-চিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, কোমলপ্রাণ, সদাচারসম্পন্ন, সঙ্গবর্জিত, নিরীহ, মিতভোজী, জিতচিত্ত, স্বধর্মনিষ্ঠ, মদেকাবলম্বী, চিন্তাশীল, অপ্রমাদী, নির্বিকারচিত্ত, ধীরপ্রকৃতি, ক্ষুৎ-পিপাসা-শোক-মোহ-জরা-মৃত্যুজয়ী, মাননিস্পৃহ, মানপ্রদ, পরোপদেশে সুদক্ষ, অপ্রতারক, কারুণিক ও সম্যক্‌জ্ঞানী — তিনিই উত্তম বা শ্রেষ্ঠ সাধু বলিয়া বিখ্যাত।

শ্রীম — আবার পড়।

পাঠক পুনরায় ধীরে ধীরে পাঠ করিতেছেন। আর শ্রীম ব্যাখ্যা করিতেছেন।

শ্রীম — 'মদেকাবলম্বী, অর্থাৎ ভগবানের উপর যাঁর নির্ভর সর্বতোভাবে। He walks with his head erect looking at

the world in the face (ভগবানের উপর যাঁর সম্পূর্ণ নির্ভর এরূপ ভক্ত উন্নতশির হইয়া নিঃসঙ্কোচচিত্তে জগতে অবস্থান করেন)। অবতারাদিতে এসব গুণ দেখা যায় — শ্রীকৃষ্ণ, যীশু, বুদ্ধ, ঠাকুর। এঁরা সকলের মান্য হয়েও অপরকে মান দেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজে ব্রাহ্মণদের পা ধুইয়ে দিলেন। ঠাকুর নারায়ণজ্ঞানে সকলকে নমস্কার করতেন।

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্তনিয়া সদা হরিঃ ।।' —

যিনি তৃণ হইতে অধিক দীন, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু এবং নিজে মান চাহেন না, কিন্তু অপরকে মান দেন, তিনি উত্তম ভক্ত। চৈতন্যদেব এদিকে এত কোমলপ্রাণ কারুণিক, কিন্তু নৈতিক ব্যাপারে uncompromising – বজ্রের ন্যায় কঠোর। তিনি ছোট হরিদাসকে বারণ করেছিলেন স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা কইতে। হরিদাস ভক্তগণের অনুরোধে মাধবী নাম্নী অশীতিপরা এক পরম ভক্তিমতী বৃদ্ধার নিকট থেকে চৈতন্যদেবের জন্য চাল ভিক্ষে করে এনেছিলেন বলে তাঁকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করলেন। হৃদয়ে ব্রজের মত কঠোর ভাব ধারণ করেছিলেন তখন। অন্য সময় কুসুমের চাইতেও কোমল। 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমানীব' — এ-টিও মহাপুরুষের একটি চিত্র। পাঠ আবার চলিতেছে —

পাঠক — (শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন) আমি পরমেশ্বর। মৎপ্রতি ভক্তিমান হইলেই সর্বাভীষ্ট সাধিত হইবে — এইরূপ ধারণার বশে যিনি — আমি বেদরূপে যে সকল উপদেশ দিয়াছি তৎসমুদয় ধর্মোপদেশ পরিত্যাগপূর্বক শুধু আমারই আরাধনায় তন্ময় হন — তিনিও সাধুশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হন।

শ্রীম — গীতায়ও অর্জুনকে এই কথাই বলেছেন। 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণম্ ব্রজ' — সকল কর্তব্য ছেড়ে আমার শরণাপন্ন হও। আমি তোমায় মোক্ষ প্রদান করবো।

দুইজনই উত্তম ভক্ত — উত্তম সাধু। একজন বৈদিক নিয়মাদি পালনে তৎপর। আর একজন নিয়মাদি পালন করেন না, কিন্তু ভগবানকে প্রাণ ভরে ভালবাসেন, তাঁর একান্ত শরণাগত। জ্ঞানভক্তি,

আর প্রেমভক্তি দুই-ই পথ, দুই-ই উত্তম।

শ্রীম — শাস্ত্রাদি, যেমন ভাগবত, অবতারের কথার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে পড়তে হয়। তাহলে যেখানে sectarianism (গোঁড়ামি) ঢুকেছে সেগুলি ধরা পড়ে। ঠাকুর বলতেন, অনেকে শাস্ত্রাদিতে গোঁড়ামি ঢুকিয়েছে। তাই কষ্টিপাথরে সোনা যেরূপ পরখ করা হয়, সেইরূপ অবতারের কথার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া উচিত।

আর এসব কথা নির্জনে ধ্যান করলে তার অর্থ বোঝা যায়। শুধু পড়লেই, কিম্বা শুনলেই অর্থবোধ হয় না। নির্জনে তপস্যা করতে হয়, চিন্তা করতে হয়। আর তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয় — প্রভো, এর মর্মার্থ ধারণা করিয়ে দাও আমায়। তবে হয়।

শাস্ত্র গুরুমুখে শুনলে রক্ষা, নচেৎ 'শব্দজালং মহারণ্যং চিত্ত ভ্রমণকারণং'। অজ্ঞাত গভীর বনে প্রবেশ করলে যেমন প্রাণ সঙ্কটাপন্ন হয়, সেইরূপ শব্দারণ্য। গুরুর সহায়তা ছাড়া এতে প্রবেশ করলেও জীবন সংশয়াপন্ন হয়। শান্তির পরিবর্তে অশান্তির বোঝা বহন করতে করতে প্রাণ যায়। গুরুমুখে শোনা সম্ভব না হলে, অবতারের কথার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া alternative (অন্য উপায়)।

বই তো অনেকে পড়ে — অর্থ বোঝে কই? ফলে উল্টো উৎপত্তি হয়। ঠাকুর বলতেন, 'যদি বা ছিল রোগী বসে, বদ্দি তারে শোয়ালে এসে' — এই দশা হয়। গুচ্ছের পড়লেই হয় না। পড়তে হয় — অবতারের মহাবাক্যের সঙ্গে মিলিয়ে পড়। তারপর নির্জনে চিন্তা কর আর প্রার্থনা।

স্টেশন মাস্টার দুইজন সঙ্গী লইয়া উপস্থিত। সকলে জম্বুতলে উপবেশন করিলেন। শ্রীম তাঁহাদের সহিত কথা কহিতেছেন।

শ্রীম — (স্টেশন মাস্টারের প্রতি) এই ভাগবত পাঠ হচ্ছে, শুনুন। (পাঠকের প্রতি) ভগবানের পূজা কোথায় কোথায় আর কি প্রকারে করতে হয় — এটা আবার পাঠ হোক। পাঠক এই স্থানটি পুনরায় পাঠ করিতেছেন।

শ্রীম — দেখুন, ভগবান বলছেন, আমার প্রতিমাতে পূজা করতে হয়। আবার আমার ভক্তগণের দর্শন, স্পর্শন, পূজন ও পরিচর্যা

করলেও আমার পূজা হয়। সাধুর সঙ্গ, সাধুর সেবা তাই আমাদের করা উচিত। ঠাকুর বলতেন, ভাগবত-ভক্ত-ভগবান — তিন-ই এক। তাই ভগবৎ-ভক্তের পূজা — তাঁরই পূজা। শ্রবণ, মনন, কীর্তন, দাস্য, আত্মনিবেদন — নবধা ভক্তির অঙ্গ এসব।

পাঠক — (পড়িতেছেন) বেদবিদ্যায় সূর্যে, ঘৃতাহুতি দ্বারা অগ্নিতে, অতিথি সৎকারদ্বারা বিপ্রে, তৃণাদি অর্পণে গোসমূহে, মিত্রবৎ সম্মান প্রদর্শনে সাধুজনে, ধ্যানযোগে হৃদাকাশে, প্রাণদৃষ্টি দ্বারা পবনে, জলদ্বারা জলে এবং রহস্যমন্ত্রে পৃথিবীতে আমার পূজা করিবে।

শ্রীম — আবার বলেছেন, সর্বপ্রাণীই আমার পূজার আধার। জীবের হৃদয়ে তিনি বিরাজমান তাই। এ সবই বৈধী ভক্তি। প্রথমে এ সবের দরকার।

আর একটি আছে প্রেমাভক্তি। ঈশ্বরের জন্য ভক্ত ব্যাকুল। তাঁকে না পেলে প্রাণ থাকে না, এত ভালবাসা! আইন-কানুন, বিধিনিষেধ — অত শত জানে না। কিন্তু তাঁর দর্শন না হলে চলবে না। যেমন গোপীগণ পতি-পুত্র-কন্যা-গৃহ সব ছেড়ে তাঁর দর্শনের জন্য উন্মাদিনী। ভগবানে এত প্রেম!

পাঠক পড়িয়া শেষ করিতেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 'হে উদ্ধব, সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা হইতে যে ভক্তি উৎপন্ন হয় সেই ভক্তি ব্যতীত ভবাম্বুধিতরণের উপায়ান্তর নাই।'

শ্রীম — তাইতো ঠাকুর সাধুসঙ্গ করতে এত বলতেন। শুধু বলতেন না, সাধু তৈরী করে দিয়েছেন আবার। (নবাগত ভক্তদের প্রতি) ওখানে (বেলুড়ে) মঠ হয়েছে কিনা। ভাল ভাল সব সাধু আছেন। এসব সাধুরা ঈশ্বর বই কিছু জানেন না। তাঁদের সঙ্গ করলে ঈশ্বরকে জানা যাবে।

শ্রীম — (নবাগত ব্রাহ্মণ যুবকের প্রতি) কি বলেন আপনি? সাধুসঙ্গ করা ভাল।

ব্রাহ্মণ যুবক — আজ্ঞে হাঁ, কিন্তু হয়ে উঠে না। নানা ধাঁধাতে দিন চলে যায়।

শ্রীম — দেখলেন, কেমন বলছেন ভগবান — বিপ্রে আমার

পূজা হয়। বিপ্র অর্থ বিবেকবান ব্রাহ্মণ। ভগবদ্ভক্ত সাধু — এঁরাও বিপ্র।

ব্রাহ্মণ যুবক — (সসঙ্কোচে) আমাদের মধ্যে ব্রাহ্মণত্ব কোথায়?

শ্রীম — না, পূর্বপুরুষের রক্ত রয়েছে। চেষ্টা করলেই সব ফুটে বের হবে। ব্যাস, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও ভরদ্বাজ — এই সব মহর্ষিদের রক্ত।

ব্রাহ্মণ যুবক — তাই আশীর্বাদ করুন যাতে আমাদের সেদিকে মন যায়। আপনি মহাপুরুষ — আপনার কৃপায় সব হতে পারে।

শ্রীম — ভগবানের কৃপায় সব হয়। তাঁকে বলুন।

ব্রাহ্মণ যুবক — সৎসঙ্গের একটি ফল এখনই হাতে হাতে পেয়েছি। এই আশ্রমে ঢুকতেই মনটা অন্য রকম হয়ে গেছে — শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়েছে। কি সুন্দর স্থান!

শ্রীম — (কথাপ্রবাহ উল্টাইয়া রহস্যচ্ছলে) এই দেখুন, আমাদের আকাশ। আবার আমাদের চাঁদ আছে। (সহাস্যে) একজন বলেছিল, তোমাদের গাঁয়ে চাঁদ ওঠে?

শুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

(গম্ভীরভাবে) সাধুর হৃদয় আকাশের মত প্রশস্ত। আর একটি আছে। কি বলুন তো?

ব্রাহ্মণ যুবক — (ইউক্যালিপটাস্ বৃক্ষ দেখাইয়া) এর মত সরল।

শ্রীম — বাঃ, আপনি তো বেশ মর্মজ্ঞ লোক, আবার কবি। বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে ঠাকুর একদিন চলে গিছলেন একা একা — ভাবে ছিলেন। রাস্তা খুব সোজা আর প্রশস্ত। পরে বলেছিলেন, রাস্তা দেখে আমার মনে হলো ঠিক যেন সাধুর হৃদয়। দক্ষিণেশ্বরে ত্রিশ বৎসর ছিলেন। সর্বদা মুখে মুখে 'মা, মা' — অন্য কথা নাই, অন্য কাজ নাই!

পুরীতে চৈতন্যদেব ছিলেন বিশ বৎসর। চার বৎসর তীর্থে ভ্রমণ করেন। শেষের বার বৎসর প্রায়ই মহাভাবেতে থাকতেন। এসব মহাতীর্থ — অবতারের স্মৃতিবিজড়িত।

এ-ও (দক্ষিণেশ্বর) কালে পুরীর মত হবে। সাধু ভক্ত সব বাস

করবে। আমরা একবার দক্ষিণেশ্বরে ছিলাম। ফটকের বাইরে একটা ঘর নিয়ে থাকতুম। চিঁড়ে ভিজিয়ে খেতুম, কখনও নিজে রাঁধতুম। শেষে অসুখ — dysentery (আমাশয়) আর ম্যালেরিয়া, তাই ভাগতে হলো।

ভক্তগণ বিদায় লইলেন। শ্রীম এইবার বেড়াইতে বাহির হইলেন, সঙ্গে বিনয় ও জগবন্ধু। নানা কথা হইতেছে। জগবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাল এমন সময় আপনারা কোথায় — বর্ধমান ছাড়িয়ে গেছেন? বিনয় উত্তর করিলেন, আজ্ঞে হাঁ, হাওড়ার প্রায় কাছাকাছি।

সন্ধ্যা হইয়াছে। খুব গরম পড়িয়াছে। তবুও শ্রীম ভক্তসঙ্গে এই ক্ষুদ্র কুটীরগৃহে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। কিয়ৎকাল পরে সকলে বাহিরে আসিয়া জম্বুবেদিকাতে বসিলেন। উন্মুক্ত স্থান, তাই হাওয়া চলিতেছে। গরমে শ্রীম-র খুব কষ্ট হয়। একটু হাওয়া লাগায় অনেকটা শান্ত হইয়াছেন।

জগবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আপনারা নাকি লিখছেন (দিনলিপি)? জগবন্ধু সঙ্কুচিত হইয়া উত্তর করিলেন, আজ্ঞে, তেমন কিছু নয় — নিজের জন্য কিছু লিখে রাখার চেষ্টা করা যাচ্ছে। শ্রীম আনন্দিত হইয়া বলিলেন, বাঃ বেশ! — এতে খুব উপকার হয়। প্রাণে গেঁথে যায় সব কথা। স্মরণ মননের খুব সুবিধা হয়। আর শুনবার সময়ও খুব মন দিয়ে শুনতে হয়। এতে ধ্যানের কাজ হয়ে যায়। ঠাকুরের কথা সব — আমাদের কথা নয়। কাল শোনা যাবে। তাঁর কথা অমৃত, খেলে অমর। বরফ যেমন শীতল তেমনি মন শীতল হয়।

২৩শে চৈত্র, ১৩২৯ সাল।
৬ই এপ্রিল, ১৯২৩ খ্রীঃ
শুক্রবার, কৃষ্ণা পঞ্চমী।

ষড়বিংশ অধ্যায়

অতিমৃত্যুলাভ দুর্লভ, কিন্তু অসম্ভব নয়

১

মিহিজাম আশ্রমকুটীর। শ্রীম তক্তাপোষে বারান্দায় উপবিষ্ট। জগবন্ধু, বিনয় প্রভৃতি ভক্তরা উপস্থিত আছেন। ধ্যানাদির পর সকলে একত্রিত হইয়াছেন। এখন সকাল প্রায় আটটা। ডাক আসিয়াছে। ছোট জিতেন ও মনোরঞ্জন মঠের বিবরণ লিখিয়া পত্র দিয়াছেন। প্যাকিং বাক্সের উপর বসিয়া জগবন্ধু পত্র পড়িয়া শুনাইলেন। ছোট জিতেনের কথা হইতেছে। তিনি আজকাল মঠে থাকেন।

শ্রীম — এঁর তপস্যা ছিল তাই এমনটি হলো। মঠে সাধুসঙ্গে বাস, নিত্য দু'বেলা ধ্যানমূর্তি দর্শন, সাধুসেবা, গঙ্গাস্নান — এসব দুর্লভ। অদৃষ্টে না থাকলে হয় না। এঁর ছিল, তাই হলো। আবার সকলে ভালবাসেন। মহাপুরুষ মহারাজ খুব ভালবাসেন। বাবুরাম মহারাজ ওঁদের বাড়িতে গিয়েছিলেন রাণাঘাটে। আফিসে কর্ম করেন। ছেলেপিলে দু' একটি হয়েছে শুনেছি। বিয়ের আগে থেকেই ভগবান চিন্তা করে কেমন হয়ে গিছলেন। বিয়ে হলো — এখন আবার সাধুসঙ্গ হচ্ছে।

ডায়েরীও লিখছেন। তা থেকে এই কয়দিনের বিবরণ পাঠিয়েছেন। এ খুব ভাল জিনিস। এমন minute observation (সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ) সকলে করে কি? যারা বিবরণ লেখে তাদের সব minutely (পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে) দেখতে হয়। তাতে ধ্যানের কাজ হয়। মঠে থাকেন, কিন্তু খান না ওখানে। নিত্য আফিসের পর মঠে চলে যান, আবার সকালে ফিরে আসেন। খুব ব্যাকুল।

জনৈক ভক্ত — এখানকার ভক্তরা মঠে খান না, হাতে করে একটু প্রসাদ চেয়ে নেন।

শ্রীম — হাঁ, আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন ভক্তরা কেউ কেউ। আমরা যা ঠাকুরের কাছে শুনেছিলাম তাই বলি। ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন, সাধুসন্ন্যাসীদের অন্ন রোজ খাওয়া ভাল নয়, ভিক্ষার অন্ন। কখনও উৎসবাদিতে খাওয়া যেতে পারে, কিম্বা যখন অনেক লোক খাচ্ছেন। তা নইলে একটু প্রসাদ হাতে করে চেয়ে নিতে হয়।

(ভক্তদের প্রতি) ভক্তগণ যে এখানে আসেন, এর মানে কি? ঠাকুর এখানে ভক্ত আনছেন প্রায়ই। ভক্তরা কিছুদিন থেকে আবার চলে যান, এর মানে কি?

সকলে চুপ, শ্রীম নিজেই উত্তর দিতেছেন।

শ্রীম — সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য বাড়াবার জন্য, তৃষ্ণাবৃদ্ধির জন্য। নির্জনে ভগবানকে চিন্তা করলে এটি হয়। তাই এখানে ভক্তদের নিয়ে আসেন। এই যে ভাগবতপাঠ হচ্ছে, তাতেও কেবল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ — এক কথা। সাধুসঙ্গের বড় দরকার। ঠাকুর বলতেন, রোগ তো লেগেই আছে, তাই সাধুসঙ্গের বড় দরকার। অনবরত দরকার। এখান থেকে যাঁরা যাবেন তাঁরা গিয়ে মঠে সাধুসঙ্গ করবেন। এইজন্য ঠাকুর নির্জনে নিয়ে আসছেন ভক্তদের। আর কত সুবিধে। স্টীমার করে দিয়েছেন তিনি। এত নিকটে ঈশ্বর-চিন্তার একটা আড্ডা (বেলুড় মঠ) রয়েছে, কিন্তু লোকের চৈতন্য হয় কই? এর benefit (লাভ) নিচ্ছে ক'জনে? ঠাকুর যে এত বলেছেন (সাধুসঙ্গের কথা) তা শোনে কই লোক?

যাদের সংস্কার আছে তাদের চৈতন্য হয়। ছোট জিতেনবাবুকে মঠের কথা বলা হলো আর অমনি মঠবাস করতে লাগলেন। সাধু-সঙ্গের চেষ্টা করছেন — তৃষ্ণা বেড়ে গেছে। এখন বড় জিতেনবাবুকে যদি বলি তা তিনি করবেন?

ছোট অমূল্য — আজ্ঞে বড় জিতেনবাবুর এমনি যা (ভক্তি বিশ্বাস) আছে।

শ্রীম — না, তবুও সাধুসঙ্গের নিত্য দরকার।

বড় জিতেন ওকালতী পাশ, হাইকোর্টে কর্ম করেন, বয়স প্রায় পঞ্চাশ। তিনি শ্রীম-র রিপণ কলেজের ছাত্র — অতি শ্রদ্ধাভক্তিমান্।

স্থূলকায় হইলেও নিত্য শ্রীমকে দর্শন করিতে আসেন। ভক্তরা সকলে তাঁকে খুব ভালবাসেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আর কেমন সুবিধা দেখুন না। আটটার সময় মঠ থেকে ফিরে বাসায় পোঁছান যায়। অনেকেই তো তৈরী ভাত খান, তা-ও এসে তৈরী পাওয়া যায়। কি সুবিধে — নিত্য গঙ্গাস্নান। 'গঙ্গার পশ্চিমকূল বারাণসী সমতুল।' কম পুণ্যে ওসব হয়? অনেকে তো গঙ্গাস্নান করতেও এর (মঠে যাতায়াতের) চাইতে বেশী সময় নেয়। হয়তো বসে বসে তেলই মাখছে। আবার (হাতে ছাতা ধরার অভিনয় করিয়া) ছাতামাথায় বাবু ফিরে আসছেন। কিন্তু লোকের চৈতন্য হয় কই — সাধুসঙ্গ করে কই? এত কাছে এমন একটা আড্ডা রয়েছে, তা যাবে না!

ঠাকুর এক একবার নিজে নিজেই বলতেন — মা, দেখে আশ্চর্য হয়ে যাই — কি নিয়ে আছে সব লোক! তোমার এমনি মায়া!

সংস্কার না থাকলে (সাধুসঙ্গ) হয় না। এত লোক আছে, ক'জন যায়? ব'য়ে গেল তাদের যেতে। ওঁরা (সাধুরা) কি করছেন তার একটা imagination-ও (কল্পনাও) নাই লোকের। (বড়) অমূল্যবাবুরও কথা আছে ছুটিতে মঠে যাবার। তা পারেন কই? খোলাখুলি বলেন, আলস্য হয়। তাঁদের অনেক কাজ করতে হয়, ছুটি হলে আর নড়তে ইচ্ছে হয় না।

এর (বৈধী ভক্তির) উপরও একটি আছে। ঠাকুর বলতেন, ওটি হলে আর এসব অসুবিধায় আটকায় না। আজ একটা সুন্দর কথা মনে পড়ে গিছলো ঐ (দক্ষিণ দিকের) মাঠে বসে। নির্জনে বসে ভাবলে এসব কথা মনে হয়। সংসারজ্বালায় জর্জরিত হয়ে সংসার অনিত্য বোধ হওয়া — এর চাইতেও উপরে একটি আছে — ব্যাকুলতা, তীব্র বৈরাগ্য। বুদ্ধদেবের সেটি হয়েছিল। রাজার ছেলে, সব আছে, কিন্তু তবুও সংসারে থাকতে ভাল লাগছে না। রাজভোগ আলুনি লাগছে — ছট্‌ফট্ করছেন। সংসার অনিত্য বলে বোধ হয়েছে। এটি হলেই ভাল।

জনৈক ভক্ত — এটি ঈশ্বর না করে দিলে কি করে হয়?

শ্রীম — চেষ্টা করতে হয়। তা না হলে ঈশ্বর 'আমি'টা দিয়েছেন কেন? চেষ্টা আর প্রার্থনা — দু'টিই করতে হয়।

শু-বাবুর সংসারের জ্বালায় চৈতন্য হচ্ছে। (একজন ভক্তের প্রতি) পত্রখানা ফাইল থেকে আনুন তো? (পত্র শুনিয়া) সংসারে থাকতে গেলে ওসব আছেই। মেঘ উঠবে আবার যাবে। বড় ঝঞ্ঝাটে পড়েছেন। ঠাকুর দেখছেন সব। (সাহ্লাদে) হাঁ, লিখেছেন, রবিবার মঠে যাবেন। ওখানে আসা যাওয়া করলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

(স্বগত) ঠাকুরের সঙ্গে যতদিন থাকা গিছলো ততদিনই real life (সত্যিকার জীবন) কাটিয়েছি। কত কথা মনে পড়ছে, তখনকার scene (ঘটনা) সব।

(ভক্তদের প্রতি) একদিন বগলতলে কম্বল-আসন আর হাতে জলপাত্র, বেলতলা থেকে আসছি। পঞ্চবটীর কোণে দেখা হলো, অমনি ভূমিষ্ঠ প্রণাম করলুম। ঠাকুর বললেন, কি গো এত দেরী? আমি তাই দেখতে যাচ্ছিলুম। তখন সকাল নয়টা হবে।

আর একদিন ঠাকুর খেতে বসেছেন, আমি ভেবেছি পালাবো। হঠাৎ বললেন, একটু পরে যাও, আমার হাতে জলটলটা দিয়ে যেও। কাছে বসলুম, অমনি ফস করে আমার হাতে প্রসাদ দিলেন। আমি কি বুঝবো ওঁর ভাব? নিজ হাতে নিজ পাত থেকে তুলে প্রসাদ দেবেন — অত কৃপা! কিন্তু এ কথা না বলে বললেন, জলটল হাতে দিতে হবে, আর রেখে দিলেন।

একদিন দশটা হবে, পশ্চিমের গোল বারান্দায় বসে আছেন — কাছেই রাখাল। ভাবে বলছেন, আমায় সীতার ভাবে রেখে দাও মা। সীতা রামচিন্তায় একেবারে দেহজ্ঞানশূন্য — প্রায় উলঙ্গিনী। মুখে সদা 'রাম, রাম'। ঠাকুরেরও তাই কাপড়খানা গায়ে রাখতে পারছেন না, সর্বদা সমাধিস্থ। বাহ্যদশায় 'মা, মা' করে পাগল।

আর একদিন একজন ভক্তকে* সঙ্গে নিয়ে মন্দিরে যাচ্ছেন। কালীমন্দিরের সামনের চাতালে গিয়ে বসেছেন। মাকে দর্শন করছেন।

* শ্রীমকে

ডাইনে ভক্তকে বসতে বললেন। তখন গান ধরলেন — 'ভবতারা ভয়হরা নাম নিয়েছি তোমার। তাইতো এবার দিয়েছি ভার, তার তার না তার মা॥' গানটি গেয়ে মায়ের নিকট ভক্তটিকে নিবেদন করলেন। মাকে ভার দিলেন। যেন নিজের জন্য বলছেন।

আর একদিন মনে পড়ে, অগ্রহায়ণ-পূর্ণিমা চাঁদ উঠেছে — কি সুন্দর রাত! ঠাকুর গোল বারান্দায় দাঁড়িয়ে গঙ্গা দর্শন করছেন।

আর একবার আমি ন'বতে থাকতে চাইলুম। ওখান থেকে গঙ্গা দেখা যায় বেশ। তিনি বললেন, না, পঞ্চবটীতে থাক। ওখানে কত নাম হয়েছে ভগবানের। নিজে যে তপস্যা করেছেন কত ওখানে সে কথা বলবেন না।

আর একদিন কতকগুলি সাধু এসেছেন। আমাকে আটা, ঘি এসবের ব্যবস্থা করে দিতে বললেন। আর বললেন, সাধুসেবা করা ভাল — কি বল? তারপর একটি গল্প বললেন, — একজন সাধু স্নান করছিল তখন জলে তার কৌপীন ভেসে যায়। দ্রোপদী দেখে, নিজের কাপড়ের আধখানা ছিঁড়ে সাধুকে দেন। কৌরবসভাতে বস্ত্রহরণের সময় দ্রৌপদী কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করছেন, প্রভো, লজ্জা নিবারণ কর। ভগবান দর্শন দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোনও সাধুকে কখনও বস্ত্রদান করেছ কি? দ্রৌপদী তখন ঐ ঘটনাটি বললেন। ভগবান ভরসা দিয়ে বললেন, তবে আর ভয় নাই। বস্ত্র যত টানছে ততই বেড়ে যাচ্ছে তাঁর মায়ায়!

গল্পটি বলেই আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'বল তো কি বললুম?' তার অর্থ একেবারে impress (অঙ্কিত) করে দিচ্ছেন মনে। আমার দ্বারা আবার বলিয়ে নিলেন।

আটা, ঘি সব এলে সাধুরাই রান্না করলেন। তাঁরা খেলেন, ঠাকুরও তাঁদের সঙ্গে বসে খেলেন। আমার জন্যও কিছু রেখে দিলেন।

২

শ্রীম একটু চুপ করিয়া আছেন। একটি ভক্ত দুইখানা চিঠি কুড়াইয়া আনিয়া শ্রীম-র হাতে দিলেন। একখানা ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট-গৃহে কলিকাতাবাসীগণ কর্তৃক আমেরিকা প্রত্যাগত স্বামী

প্রকাশানন্দজীকে অভিনন্দন-প্রদান সভার রিপোর্ট। বড় অমূল্য লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আর একখানা বেলুড় মঠে স্বামীজীর বিগত উৎসবের বিবরণ — লেখক মোহন।

শ্রীম — (জনৈক ভক্তের প্রতি) এখানা পড়ুন তো। ভক্তদের চিঠি পুরাণ। সকলে তো এর দাম জানে না। যত্ন করে রাখতে হয়। চেয়ে নিয়ে গিছলো পড়তে, ফেলে রেখে দিয়েছে। জানে না, এ কি অমূল্য জিনিস! হাঁ পড়ুন।

জগবন্ধু পড়িতেছেন — আজ রবিবার। আগামী কাল ২৫শে পৌষ, ইংরেজী ৯ই জানুয়ারী — কৃষ্ণা সপ্তমী তিথি। মঠে শ্রীশ্রী স্বামীজীর জন্মমহোৎসব হইবে। তাই স্কুলবাটীর (শ্রীম-র বাসস্থান মর্টন স্কুলের) ভক্তগণ অপরাহ্ন ছয়টার পূর্বেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ করিয়া ঁমঠে রওনা হইয়াছেন। ভক্তগণ সাধুদের সঙ্গে উৎসবকার্যে যোগদান করিয়া ধন্য হইবেন এই মানসে যাইতেছেন। এইরূপ ভাবে তাঁহারা মাঝে মাঝে মঠে যাইয়া থাকেন।

৬/৫৫ মিনিটের স্টীমারে বড়বাজার ঘাট হইতে মনোরঞ্জন ও জগবন্ধু, কুমারটুলি হইতে তারক, কাশীপুর হইতে ডাক্তারবাবু ও ছোট অমূল্য উঠিলেন। সকলে একসঙ্গে যাইতেছেন বলিয়া খুব আনন্দিত। প্রায় পৌনে আটটার সময় ভক্তগণ বেলুড়ে পৌঁছিলেন।

ভক্তগণ মঠের ফটকের রজঃ ললাটে স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। কেহ কেহ মনে মনে প্রার্থনামন্ত্র* আবৃত্তি করিলেন। তারপর স্বামীজীর মন্দির ও শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে ভূমিষ্ঠ প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিলেন। এখান হইতেই দেখা যাইতেছে, পশ্চিম দিকের বাগানের উৎসবের পাকশালার উনুনগুলি জ্বলিতেছে। সাধুগণও বহু ভক্তসঙ্গে বিরাট

---

* শ্রীম-র আদেশে কতকগুলি ভক্ত কিছুকাল ধরিয়া নিত্য প্রত্যুষে কলিকাতা হইতে বেলুড় মঠ দর্শন করিতে যাইতেন। শ্রীম তাঁহাদিগকে নিম্নলিখিত চারিটি বিষয় পালন করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

(১) কায়মনোবাক্যে আশ্রমপীড়া করিব না।

(২) চরণামৃত কিংবা প্রসাদ কণিকামাত্র গ্রহণ করিব। কিন্তু ভিক্ষার অন্ন উদর

ভোগের বিবিধ তরকারী কাটিতেছেন। ইহা দর্শন করিয়া ঁগঙ্গাস্পর্শ, ঁদক্ষিণেশ্বর, ঁঠাকুর ও শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজকে দর্শন ও প্রণাম করিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ তখন আপন খাটে পশ্চিমাস্য হইয়া বসিয়া আছেন। মেঝেতে আমেরিকার ভক্ত ব্রহ্মচারী গুরুদাসমহারাজ ও আরো কয়েকজন উপবিষ্ট।

তদনন্তর আমরা সকলে উৎসবভূমিতে গিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইলাম। একটি ভক্তবালক সুমধুর সঙ্গীতে সকলের আনন্দ বর্ধন করিতে লাগিল। শ্রীযুক্ত কেষ্টলাল মহারাজ, অমূল্য মহারাজ প্রভৃতি সাধুগণ আসিয়াছেন। কিছুকাল পরে গুরুদাস মহারাজও আসিলেন। মাঝে মাঝে 'ফক্স সিস্টারস' নামে সুপরিচিত আমেরিকার ভক্ত মহিলা শ্রীযুক্তা প্রেমিকা ও রাধিকানাম্নী ভগিনীদ্বয় আসিয়া সব দর্শন করিতেছেন এবং মৃদু হাস্যে যুক্ত করে ভক্তদের নমস্কার করিয়া তাঁহাদের উৎসাহ বর্ধন করিতেছেন। রাত্রির ভোগের পর প্রসাদ পাইয়া কেহ কেহ পুনরায় কার্য করিতে আসিলেন, কেহ বিশ্রাম লইলেন। সারারাত্রি ধরিয়া কাজ চলিতেছে।

পরদিন মঙ্গল আরতি দর্শন করিয়া স্কুলবাড়ির একটি ভক্ত মনোরঞ্জনকে সঙ্গে লইয়া ভোর সাড়ে চারটার সময় বেলুড় রেলস্টেশনে রওনা হইলেন। রূপনারায়ণপুর হইতে গোলাপ পুষ্প আসিয়াছে, উহা লইয়া তাঁহারা সাড়ে ছয়টার সময় ফিরিয়া আসিয়াছেন। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ মঠবাড়ির পশ্চিমের বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিলেন। ধীরে ধীরে ঠাকুরভাঁড়ারের সামনে আসিলেন এবং ফুল দেখিয়া বালকের ন্যায় আনন্দ করিতে লাগিলেন।

আজ উৎসব। মঠের পশ্চিমের বারান্দায় শ্রীশ্রীস্বামীজীর আসন

পূরণ করিয়া ভোজন করিব না।

(৩) ধ্যানের সময় সাধুদের উল্লঙ্ঘন করিব না।

(৪) সাধুদের সঙ্গে তর্ক করিব না। তিরস্কৃত হইলেও মঠসীমানায় প্রতিবাদ করিব না। এ আশ্রমের সাধু, ভৃত্য, পশুপক্ষী সকলই আমাদের নমস্য।

ভক্তগণ মঠদ্বারে উপনীত হইয়া উক্ত প্রার্থনামন্ত্র আবৃত্তি করিতেন, তারপর মঠে প্রবেশ করিতেন।

করা হইয়াছে। স্বামীজীর সন্ন্যাসীবেশের বৃহৎ তৈলচিত্রখানার উপরে দেয়ালে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবি স্থাপিত হইল। ছবিদ্বয় ও আসন নানাবিধ সুগন্ধ পুষ্পে ও মাল্যে সজ্জিত করা হইল। বেলা বাড়িতে লাগিল, ভক্ত ও দর্শকসংখ্যাও বাড়িতে লাগিল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার আয়োজন হইতেছে। ঠাকুরমন্দির আজ অপরূপ সাজে সজ্জিত। সুগন্ধ পুষ্পমাল্যে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ শোভিত হইল। উত্তম গোলাপ পুষ্প প্রচুর পরিমাণে ফুলদানীতে বেদিকার উপর ও নিম্নে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। তাহাতে বেদিকার অপূর্ব শোভা হইয়াছে।

আজ পূজারী পরেশ মহারাজ। তিনি উত্তরাস্য হইয়া বসিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে দক্ষিণদিকের মধ্য দরজার পূর্বধারে জ্যোতিষ মহারাজ বিশেষ পূজায় রত। ব্রহ্মচারী অশেষচৈতন্য তন্ত্রধারক। সকলেই উত্তরাস্য। পূর্ববারান্দায়ও উত্তরাস্য হইয়া উত্তর প্রান্তে একজন সাধু চণ্ডীপাঠ করিতেছেন। ভক্তগণ পূজা দর্শন করিবার জন্য দলে দলে আসিতেছেন, কেহ বা যাইতেছেন, কেহ বসিয়া আছেন। দুই দিকের বারান্দায় লোকে লোকারণ্য।

আজ 'আত্মারাম' (শ্রীশ্রীঠাকুরের পবিত্র দেহাবশেষ পাত্র) বাহিরে আসিয়াছেন। বহু উপাচারে উহাকে অভিষেক স্নান করাইয়া, বহুবিধ সুগন্ধ দ্রব্য ও পুষ্পোপহারে সজ্জিত করা হইল। ওদিকে নিচে আবার সঙ্গীত আরম্ভ হইল। স্বামীজীর আসনের নিচে পূর্বাস্য হইয়া লোক বসিয়াছে। প্রাঙ্গণে ও সামিয়ানার নিচে কাতারে কাতারে বহু লোক। 'তাথৈয়া তাথৈয়া—' গানে উদ্বোধন হইল। বেলা সাড়ে দশটা হইতে সাড়ে বারটা পর্যন্ত অনেক সুমধুর সঙ্গীত গীত হইল।

ঠাকুরের ষোড়শোপচারে পূজা শেষ হইয়াছে। এখন ধ্যানঘরে হোমের আয়োজন হইতেছে। আজ আঠার জন ভক্ত পবিত্র ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত হইবেন। একে একে ধ্যানঘরে সকলে প্রবেশ করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন হেড্ মাস্টার, মাদ্রাজের একজন, আর সিংহলদেশীয় একজন ভক্ত আছেন, সকলেই যুবক। দক্ষিণের বারান্দায় সাধু ভিন্ন অপর সকলের প্রবেশ নিষেধ। একজন ভক্ত

প্রাঙ্গণের সংলগ্নবর্তী দক্ষিণ দিকের উদ্যানের পাশে দাঁড়াইয়া এই অপার্থিব দৃশ্য দর্শন করিতেছেন। অপর বহু ভক্ত নিচে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ দর্শন করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। একজন কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাঁড়াইয়া আছেন।

ধ্যানগৃহে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ প্রবেশ করিলেন। তারপর আসিলেন সুধীর মহারাজ, সুশীল মহারাজ ও কেষ্টলাল মহারাজ। আরও কয়েকজন প্রবেশ করিলেন। এতক্ষণে ব্রহ্মচর্য হোম হইয়া গেল — পবিত্র 'স্বাহা' ধ্বনি আর শোনা যাইতেছে না। ব্রহ্মচারিগণ অগ্নি, ঠাকুর, গুরু ও সাধুগণকে সাক্ষী করিয়া, তাঁহাদের শুভাশীর্বাদ লইয়া ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণ করিলেন। নবীন ব্রহ্মচারিগণ নবীন সাজে এইবার একে একে বাহির হইয়া পাশের ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন। এইবার লালপাড় কোরা অর্ধছিন্ন নূতন বহির্বাসপরিহিত, শিখাসূত্র, উত্তরীয়শোভিত, মুণ্ডিতশীর্ষ মুক্তকচ্ছ নবযুগের নবীন সন্ন্যাসীগণ 'আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ' — এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া মন্দিরসোপান বাহিয়া নিম্নে অবতরণ করিতেছেন। এখানকার এই স্বর্গীয় পবিত্র ভাব ও অলৌকিক দৃশ্য বর্ণনা করিবার সামর্থ্য কোথায়!

এই মহাব্রত গ্রহণের আরও প্রার্থী ছিলেন। একটি পনের ষোল বৎসর বয়স্ক বালককে ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণে অনুমতি দেওয়া হয় নাই বলিয়া সে কত ক্রন্দন করিতেছে। অনেকে অনেক প্রবোধ দিয়াও তাহাকে শান্ত করিতে পারিতেছেন না। লোক সংসারভোগে বাধা পড়িলে ক্রন্দন করে, আর এ বালক সংসারভোগত্যাগ-ব্রত গ্রহণের জন্য ক্রন্দন করিতেছে — কি অলৌকিক দৃশ্য!

এখন মহারাজরাজেশ্বর শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগ লাগিবে। বিবিধ পক্বদ্রব্য ও মিষ্টান্নাদিতে ঠাকুরের ঘর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ভোগ নিবেদনান্তে শ্রীভগবানের আরতি হইতেছে। সাধু ভক্ত সম্মিলিত কণ্ঠে গাহিতেছেন — 'খণ্ডন-ভব-বন্ধন জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।' তাহার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে সকলে শরণ লইলেন স্তব গাহিয়া — 'তস্মাৎ ত্বমেব শরণম্ মম দীনবন্ধো'! ভক্তগণ জগন্মাতাকে নারায়ণী স্তবে প্রণাম করিলেন।

এইবার জয়ধ্বনি — জয়, শ্রীগুরুমহারাজজীকী জয়, জয় মহামায়ীকী জয়, জয় স্বামীজী মহারাজজীকী জয়, জয় গঙ্গামায়ীকী জয়! ভক্তগণের সম্মিলিত কণ্ঠোচ্চারিত পবিত্র জয়ধ্বনিতে মঠভূমি পরিপূর্ণ হইল। ইহার সুমধুর প্রতিধ্বনি মঠগাত্রপ্রবাহিণী জাহ্নবী-সহচর মৃদুমন্দ পবনের দ্বারা বাহিত হইয়া দিগদিগন্তরে পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল।

শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে গোপাল মহারাজ যোড়শোপচারে পূজা করিয়াছেন। এক্ষণে প্রসাদবিতরণ হইবে। বাগানের পাকশালার পশ্চিম দিকস্থ বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড পদ্মপুকুর পর্যন্ত পরিষ্কৃত করিয়া তদুপরি সুবৃহৎ পটমণ্ডপ নির্মিত হইয়াছে। সারি সারি লোক তাহার নিচে বসিয়া গিয়াছে। দক্ষিণে বৃহৎ চৌবাচ্চা ও বাঁশঝাড়, উত্তরে উৎসবের সময় ঢুকিবার বিরাট ফটক ও উদ্যান, পূর্বে পাকশালা, আর পশ্চিমে পদ্মপুকুর — এই ভূমিতে পুরুষগণ প্রসাদ পাইতেছেন। এই ভূমিভাগের উত্তর দিকে ফল ও তরকারী বাগানে দুই স্থানে বসিয়া স্ত্রীলোকেরা প্রসাদ পাইতেছেন। সর্বশুদ্ধ প্রায় চারি সহস্র লোক প্রসাদ পাইয়াছেন। খিচুড়ি, আলু-কপির ডালনা, চচ্চড়ি ও চাটনি, দই বুঁদে ও পায়েস, পরম পরিতোষপূর্বক সকলে ভোজন করিলেন। স্ত্রীলোকেরা চারি বারে প্রায় পাঁচশত জন আহার করিয়াছেন। পুরুষদের বড়পঙ্গদ্ ছয়বার বসিয়াছে। ভাণ্ডারা হইয়াছিল গোশালার পূর্বধারের ঘরটি।

বিরাট ভোগের পর প্রসাদবিতরণ আরম্ভ হইল। কলিকাতার স্কুলকলেজের বহু ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক হইয়াছেন। সেবকগণ প্রসাদ-বিতরণে ব্যস্ত, কিন্তু পরিচালক সাধুগণ। চতুর্দিকে ‘দীয়তাম্ ভূজ্যতাম্’ রব। একদল উঠিতেছে, অপর দল বসিতেছে। মেয়েদের সেবায় স্কুলবাড়ির ভক্তগণ নিযুক্ত হইলেন। কেষ্টলাল মহারাজ প্রভৃতি বয়স্ক সাধুগণ আসিয়া মাঝে মাঝে পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। সেবকগণ যেন নিজেদের ভুলিয়া গিয়াছেন — উৎসবানন্দে এত মাতোয়ারা। অনেকে আবার জলও স্পর্শ করেন নাই — ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া দরিদ্রনারায়ণসেবায় নিরত। সন্ধ্যা পর্যন্ত সেবা চলিল। মাতা ম্যাক্লিয়ড্

কাঙ্গালিনী মায়েদের সঙ্গে আসিয়া পংক্তিতে বসিলেন। আমার কাছে চাহিয়া দুইটি খুরিতে জল ও পায়েস লইয়া আহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার আনন্দ যেন আর ধরে না। তিনি ভক্তদের নানা ভাবে উৎসাহিত করিতেছেন। আনন্দে আত্মহারা হইয়া অতি সুমধুর স্বরে মাঝে মাঝে বলিতেছেন, 'Swamiji's Birthday today' (আজ আমাদের স্বামীজীর জন্মতিথি)। স্বামীজীর উপর এই মহিলার কি অপরিসীম প্রেম!

এই বর্ষীয়সী মহিলা আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরের অতুল ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী সাজিয়া জীবনের অধিকাংশ এবং উত্তম সময় ম্যালেরিয়াপ্রপীড়িত বেলুড় মঠে বাস করিতেছেন। তাঁহার ভাব — স্বামীজীর সমাধিমন্দিরের পার্শ্বে, স্বামীজীর উজ্জ্বল কীর্তি বেলুড় মঠে বাস করা। ধন্য মার্কিন মহিলা, ধন্য তোমার গুরুভক্তি!

বৃদ্ধা মিস্ ম্যাক্লিয়ডকে একজন ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন — How do you enjoy the ceremony, auntie (দেবি, এই আনন্দ উৎসব আপনি কিরূপ উপভোগ করছেন)? তিনি উত্তর করলেন, অতি চমৎকার! এরূপ আনন্দোৎসব ক্রাইস্টের সময় হতো — 'Oh, not to speak, such a thing was done in the time of Jesus, the Christ'. ভক্তটি পুনরায় বলিলেন — 'This is done once again in our Christ's time' (আমাদের ক্রাইস্টের সময়ে পুনরায় উহা সম্ভব হচ্ছে!)' 'Certainly so, certainly!' (নিশ্চয়) — এই বলিয়া বৃদ্ধা স্মিতহাস্য উত্তর প্রদান করিলেন। তাঁহার হাস্যময় মধুর ভাব ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইল। তিনি ধীরে ধীরে প্রশান্ত ও গম্ভীর ভাব ধারণ করিলেন।

কলিকাতা হইতে ডক্টর মরিনো আসিয়াছিলেন। তিনি খুব ভক্ত লোক। ঠাকুর ও স্বামীজীর উপর তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি আছে। তিনি কখনও অধ্যাপনা করেন। ক্লাসে প্রায়ই ইঁহাদের কথা বলিয়া থাকেন। তিনি সমস্ত উৎসবমণ্ডপ পরিদর্শন করিলেন এবং হাতে করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। শ্রীশ্রীশরৎ মহারাজ আসিয়া মাঝে মাঝে সব দেখিতেছেন। আজ প্রভাতে স্বামীজীর ঘরে চা ও বিস্কুটাদি

দিয়া তাঁহার পূজা হয়। রাত্রিতে পাশ্চাত্ত্যের ভক্তগণ ঐ দেশের প্রথায় ভোগ নিবেদন করিবেন।

এইবার সন্ধ্যা। মঠের সকল গৃহে আলো প্রজ্জ্বলিত হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরমন্দির হইতে শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। সান্ধ্য আরতিতে সকলে একত্রিত হইতে লাগিলেন। জাহ্নবীতটে ঠাকুরমন্দিরে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীবৃন্দ প্রায় সারাদিন উপবাস থাকিয়া, পাখোয়াজাদি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে মধুর তানে সুমধুর ভগবৎগুণগান গাহিতে লাগিলেন। এই দেবদৃশ্য অবর্ণনীয়। সৃষ্টির প্রাথমিক পঞ্চভূত উপকরণে শ্রীভগবানের আরতি-পূজা সম্পন্ন হইয়া গেল। সাধু ও ভক্ত কেহ কেহ বসিয়া ধ্যান করিতেছেন।

রাত্রি সাড়ে সাতটা। ভিজিটারস্ রুমে একজন ভক্ত উৎকৃষ্ট মহারাষ্ট্রীয় ভজন গাহিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীকালী মহারাজ, সুশীল মহারাজ ও গুরুদাস মহারাজ প্রভৃতি সাধুগণ বসিয়া শুনিতেছেন। রাত্রি সাড়ে নয়টার ভোগের পর সমস্ত দিনের উপবাসী সাধু ভক্তগণ প্রসাদ পাইতে বসিলেন। কেষ্টলাল মহারাজ আমাদের ডাকিয়া বসাইলেন। ছোট জিতেন, ছোট নলিনী ও আমি সারাদিন আহারের অবসর পাই নাই।

রাত্রিতে ঁকালীপূজার আয়োজন হইয়াছে। ছোট জিতেন একবার গিয়া দেখিয়া আসিলেন। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে সকলে ক্লান্ত। আজ রাত্রিতে নবীন ব্রহ্মচারী অনেকেই আমাদের সহিত শয়ন করিলেন। বড় জিতেনবাবু ছাড়া স্কুলবাড়ির সকল ভক্তগণ উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। শুকলালবাবু রাত্রিবাসের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু মাথা ধরায় চলিয়া যান। উৎসবান্তে পর দিবস সূর্যোদয়ের পূর্বে উঠিয়া ঠাকুরঘর, মায়ের মন্দির, স্বামীজীর মন্দির প্রণাম করিতে বাহির হই। মায়ের মন্দিরের সম্মুখের সিঁড়ির দক্ষিণ দিকে গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া বৃদ্ধা মার্কিন ভক্ত শ্রীমতী প্রেমিকা ধ্যান করিতেছেন। ঠাকুরঘরেও পূর্ব ও দক্ষিণ বারান্দায় বহু সাধু ব্রহ্মচারী ধ্যান করিতেছেন। শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ ঠাকুর-মন্দির মধ্যে ধ্যানমগ্ন।

আজ প্রথম স্টীমারে ডাক্তারবাবু মঠে আসিয়াছেন। গঙ্গাস্নান করিয়া ৭-৩৫ মিনিটের স্টীমারে আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। মঠে আজ কালী মহারাজ, হরিপ্রসন্ন মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ রহিয়াছেন। আসিবার সময় প্রণাম করিয়া তাঁহাদের নিকট বিদায় লইতেছি, তখন হরিপ্রসন্ন মহারাজ বলিলেন, 'বেশ করেছো, বেশ করেছো। এই যে দিবারাত্র সেবা করেছো, নিজে না খেয়ে অপরকে খাইয়েছো, এই হলো কাজ — এটাই চাই। এটাই ঠিক পথ।'...

পাঠ শেষ হইল। শ্রীম নিবিষ্টচিত্তে এতক্ষণ শুনিতেছিলেন। এইবার কথা কহিতে লাগিলেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আহা, কি বিবরণ! যেন সব জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আর কি পবিত্র দেবদৃশ্য — it is a sight for the gods to see! কি আশ্চর্য message (সংবাদ)! কতগুলি মানুষ ঈশ্বরের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করছে — 'যদিচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্যম্ চরন্তি'। প্রায় সকলেই সংসার চায়। কিন্তু কতকগুলি কেবল ঈশ্বরকে চায়। তারা বুঝি চাতক!

আর দেখ কি আকর্ষণ! ঠাকুর বলেছিলেন কিনা, ঠিক ঠিক যারা ঈশ্বরকে চায় তাদের এখানে আসতে হবে। তাই ভাবি, কোথায় দেশ, আর কোথায় এসেছেন! কোথায় আমেরিকা আর কোথায় বেলুড়! মিস ম্যাক্‌লিয়ড্, গুরুদাস, এঁরা এদেশের লোক হয়ে গেছেন, আর ফক্স্ সিস্টাররা। মঠে গঙ্গাতীরে মন্দিরে বসে এঁরা ধ্যান করছেন — কি দৃশ্য!

তাইতো বলি, ভক্তের চিঠি সব পুরাণ! পুরাণে তবুও প্রাচীন যুগের কথা আছে। আর এ মনে কর, একেবারে টাট্‌কা সন্দেশ। এই সেদিন চলে গেছেন অবতার — তাঁর লীলাকথা। আবার কেমন graphic (সুস্পষ্ট বর্ণিত) — গেলে দেখা যায় এখনও এসব, শুধু বিবরণ নয়। পুরাণে কেবল বিবরণ আছে। এই বর্তমান লীলায় স্থান, কাল ও পাত্র প্রায় সবই চোখের সামনে। পুরাণ পড়েও এমন উদ্দীপন হয় না, এ চিঠি পড়ে যেমন হয়।

শ্রীম স্নান করিতে গেলেন।

৩

মিহিজাম আশ্রম। ঠাকুরঘরে শ্রীম বসিয়া আছেন। জগবন্ধু, ছোট অমূল্য প্রভৃতিও রহিয়াছেন। পূজার পর ভক্তসঙ্গে শ্রীম কিছুকাল ধ্যান করিতেছেন। ধ্যানান্তে কঠোপনিষদ পাঠ করিতেছেন। এখন বেলা সাড়ে নয়টা। পাঠের পর ব্যাখ্যা চলিতেছে।

শ্রীম — নচিকেতা প্রশ্ন করলেন, 'মৃত্যুর পর কেহ বলে আত্মা থাকে, কেহ বলে থাকে না, এবিষয়ে আমার সংশয় উপস্থিত হয়েছে। আপনি কৃপা করে আমায় এই আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিন।' উত্তম অধিকারী না হলে — ব্যাকুল না হলে, বলেও কোন লাভ নাই। তাই যম পরীক্ষার জন্য বললেন, 'বাছা, দেবতাদেরও এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। আত্মতত্ত্ব বড়ই সূক্ষ্ম বিষয়। তুমি অন্য বর চাও। আত্মার কথা ছেড়ে দাও।'

তারপর যম বললেন, 'শতবর্ষ পরমায়ু চাও, পুত্র পৌত্র চাও, তোমায় দিচ্ছি। হস্তী অশ্ব চাও, কিংবা অন্য পশু ও স্বর্ণাদি ধন চাও, দিচ্ছি। সুবৃহৎ রাজ্য চাও, তাও পাবে। তোমায় ইচ্ছামৃত্যু দিচ্ছি। যা চাইবে তাই দেব। এই গাড়ি, ঘোড়া, সুন্দরী স্ত্রী, সব পাবে। স্বর্ণপুরী তৈরী করে দিচ্ছি। অথবা পৃথিবীতে যা দুর্লভ বলে মনে হয়, সেসব চাইলেও পাবে। কিন্তু লক্ষ্মীটি আমার, এ বরটি চেও না। আত্মার কথা ছেড়ে দাও — 'মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ'।

নচিকেতা ব্যাকুল, যেন চাতক — অন্য বর চাইলে না। সাত সমুদ্র তের নদী সব জলে ভরপুর, কিন্তু চাতক এ জল ছোঁবে না। বৃষ্টির জল চাই! নৈকষ্য কুলীন — এ সব চেয়েও দেখলে না। অলি — তার পদ্মমধু চাই। তাই অতি বিনীতভাবে নচিকেতা বললেন — 'প্রভো, রাজ্য বিত্ত জীবন — এসব দু'দিনের জন্য! এ চেয়ে কি লাভ? আপনার যখন কৃপা লাভ করেছি, তখন এসবের অভাব হবে না। আমি আত্মতত্ত্ব ছাড়া অন্য কিছু চাই না। চাইতুম, যদি আপনি সম্মুখে না থাকতেন। কিন্তু আপনি সম্মুখে দণ্ডায়মান। দু'দিনের জন্য এসব ভোগ করে কি লাভ? কৃপা করে আমায় আত্মতত্ত্ব উপদেশ করুন।'

শ্রীম — নচিকেতা কিছুই নেবে না। — 'বরস্তু মে বরণীয়ঃ স

এব'। তাই যমের খুব আহ্লাদ হলো। গুরু অমন শিষ্যকে চান, অমন শিষ্যকে সব প্রদান করেন! (ভক্তদের প্রতি) ভোগ প্রত্যাখ্যানের এই শ্লোক তিনটি কণ্ঠস্থ রাখা উচিত। তারপর উপযুক্ত লোক জেনে আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। যম বললেন —

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।।

শ্রীম — আত্মার জন্মও নাই, মরণও নাই। আত্মা নিত্য ও শাশ্বত। শরীর নাশ হলেও আত্মা বিদ্যমান থাকেন চিরকাল।

নচিকেতা বললেন — আজ্ঞে, আত্মার স্বরূপ জানবার উপায় কি?

যম উত্তর করলেন — তাঁর কৃপাতেই কেবল তাঁকে জানা যায়। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে চাইলে তিনি দেখা দেন। তাঁর কৃপা চাই। চেষ্টা কর, জানতে পারবে। আর দেখ — প্রবচন, মেধা কিংবা পাণ্ডিত্যদ্বারা তাঁকে লাভ করা অসম্ভব, তাঁর কৃপা চাই। অতএব, তুমি আত্মারই শরণ লও। 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ'।

শ্রীম — ঠাকুর বলতেন, নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে বল। আন্তরিক হলে তিনি অবশ্য দেখা দেবেন। যেমন ছেলে কাঁদছে, চুষি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, কিছুতেই শান্ত হচ্ছে না। মা তখন এসে কোলে তুলে নেয় সব কাজ ফেলে রেখে দিয়ে — এ-ও ঠিক তেমনি। তাঁকে না পেলে প্রাণ থাকে না, এমনি ব্যাকুল হলে তিনি দর্শন দেন।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — একটা কথা মনে পড়ে গেল। জার্ণাল অব দি এসিয়াটিক সোসাইট অব বেঙ্গল'-এ বের হয়েছিল একটা গল্প। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখেছিলেন। ইনি antiquity-র research (প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা) করতেন কিনা!

মেক্সিকো পূর্বে civilised (সুসভ্য) দেশ ছিল। ইউরোপের লোকেরা ঐ দেশ জয় করে লোকদের বন্দী করতো। তারপর একমাস পর তাদের হত্যা করা হতো। এই একমাস কাল বন্দীকে খুব বড় লোকের মত রাখা হতো। সুন্দর বাড়িঘর, পোষাকপরিচ্ছদ সব

সুন্দর, বিবিধ উপাদেয় আহার, আর সুন্দরী যুবতী স্ত্রীগণের পরিচর্যা, এসবের মধ্যে বন্দীগণ বাস করতো। যুবতীরা গায় হাত বুলুচ্ছে, কত আদর করে বলছে — এটা খাও, ওটা খাও। কিন্তু, খেতে পারছে না। ভাল পোষাকও পরতে পারছে না। কোন দিকে মন নাই, কিছু ভাল লাগছে না। কেন? না, তার যে মৃত্যুচিন্তা রয়েছে সর্বদা। একমাস পরে মৃত্যু হবে।

সে আবার কেমন বীভৎস ব্যাপার! বন্দীকে একটা পাথরের উপর শুইয়ে রেখে আগে হৃদয়টা কেটে বের করে নেবে। এটা থালায় রেখে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হবে। তারপর সমস্ত শরীরটা কেটে টুকরো টুকরো করে তার ঝোল হবে। অসংখ্য লোক চারদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তারা সব এ থেকে একটু একটু করে প্রসাদ পাবে।

এমনতর ব্যাপার। মৃত্যু সম্মুখে রয়েছে বলে বন্দী কিছুই গ্রহণ করতে পারছে না। এটি নচিকেতার সুন্দর illustration (উপমা)। যারা ঈশ্বরচিন্তা করে — জীবন-মৃত্যু — এসব কথা ভাবে, তাদের পক্ষে এ গল্পটি একটি অমূল্য দৃষ্টান্ত।

শ্রীম এতক্ষণে উঠিয়া আসিয়া বারান্দায় বসিলেন। কিন্তু এখনও নচিকেতার অনুচিন্তন চলিতেছে। ত্যাগ, ভোগে বিতৃষ্ণা, ব্যাকুলতা — এসব সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

শ্রীম (ভক্তদের প্রতি) — আর একটি গল্প আছে বুদ্ধদেবের সময়ের। বুদ্ধদেব তখন এদিকে বিহারে রয়েছেন। অনেক রাজন্যবর্গ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কোনও এক রাজ্যে একটি পরমা সুন্দরী court courtezan-এর (রাজ্য-বিলাসিনীর) মৃত্যু হয়। ইনি নাকি তখন ভারতবিখ্যাত সুন্দরী ছিলেন। বুদ্ধদেবের পরামর্শ চাইলেন রাজা, এই মহিলার মৃতদেহ কিরূপে সৎকার করা হবে। বুদ্ধদেব বললেন, 'দেহটা একটা কাঁচের বাক্সে রেখে দাও।' তাই করা হল। কয়েকদিন পর দেহটা decomposed (বিকৃত) হতে লাগলো, পচতে লাগলো। বড় বড় সব পোকা জন্মেছে, আর নাকমুখ সব খসে খসে পড়ছে। বিকৃত হয়ে গেছে সম্পূর্ণ।

বুদ্ধদেব তখন সব সন্ন্যাসী ও অপর ভক্তদের বললেন, 'যাও, তোমরা গিয়ে ঐ মৃতদেহটা দর্শন করে এসো।' তারা সব গিয়ে দেখে আসতে লাগলো। কি দেখলে তারা? না, যে দেহটার জন্য রাজন্যবর্গ লালায়িত ছিল, তারই এ দশা। পচে দুর্গন্ধ হয়ে গেছে, কেহ কাছে যেতে পারছে না।

সুন্দরী স্ত্রী-ই বল আর দীর্ঘ জীবনই বল, সব অনিত্য, দু'দিনের জন্য। মৃত্যু হাঁ করে রয়েছে — সব তাঁর মুখবিবরে। তাই নচিকেতা চাইলেন না এসব। কেবল আত্মা, ঈশ্বর চাই।

শ্রীম একটু মৌন হইয়া রহিলেন। পুনরায় বলিতেছেন।

শ্রীম — এর একটা গল্প আছে ওদেরই (বৌদ্ধদের)। পিতা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের সেবা করেন — প্রায় সন্ন্যাসী তিনিও। পুত্র তা পছন্দ করছে না। পিতাকে যাতনা দেয় — ওসব ছেড়ে দিতে বলে। ভারি জ্বালাতন করছে বাপকে। বাপ কিন্তু খুব ব্যাকুল — আন্তরিক ভক্ত। একজন খুব ভাল ধার্মিক বিচারক ছিলেন — ম্যাজিস্ট্রেট, এই রকম কিছু হবে। ইনি এই ঘটনাটি জানতে পারলেন। একটা ওয়ারেন্ট বের করে দিলেন ছেলেকে ধরে আনতে। ধরে এনে আটকিয়ে রেখে দিলেন। কি একটা মিছামিছি চার্জে ফাঁসির হুকুম দিলেন। এক মাস পরে ফাঁসি হবে।

ছেলেকে নানাবিধ আহারাদি দিয়ে অতি সুখস্বাচ্ছন্দ্যে কয়েদের ভিতর রেখে দিলো। ছেলে কিছুই খেতে পারছে না। ম্যাজিস্ট্রেট একদিন জেলে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হে, বড়ই যে শুকিয়ে যাচ্ছ। খাচ্ছ না বুঝি? পছন্দ হচ্ছে না খাবার? তা বল কি খেতে চাও সব পাঠিয়ে দেবো।' দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে ছেলে বললে, 'আর মশায় খাওয়া! আপনার আদেশে আমার প্রাণ বিসর্জন করতে হবে দিন কয়েক পর! এতে কি আর খাওয়া রোচে!' বলেই বিষণ্ণ হয়ে গালে হাত দিয়ে বসে রইলো। কি করে খায় বেচারা? মৃত্যু যে সম্মুখে দণ্ডায়মান।

জজ তখন অভয় দিয়ে বললেন, 'বাবা, একমাস পরে তোমার মৃত্যু হবে। সেই চিন্তায় আহারাদি তুমি ছেড়ে দিয়েছ। ভাবছো, কি

হবে শরীর পুষ্ট করে যখন কয়দিন পর এ যাবেই। কিন্তু বাপ্, যদি একজন সর্বদা মৃত্যুকে সামনে দেখতে পায়, তাহলে সে আর কেমন করে সংসারে মন রাখে? তাই বৈরাগ্য অবলম্বন করে। ঘরে থাকলেও নামমাত্র থাকা। সংসার অনিত্য, ঈশ্বর সত্য, এ বোধ হয়ে গেছে। তাই তোমার বাপ সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা করেন। মৃত্যুচিন্তা এসে গেছে তাই সাধুসঙ্গ করছেন। তাঁর ভিতরে সন্ন্যাস এসে গেছে।' এই কথা বলে হাসতে হাসতে ওকে ধরে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে বসালেন, তারপর বাড়িতে পৌঁছিয়ে দেন। এখন ছেলে আর বাপকে জ্বালাতন করে না। সে নিজে বুঝেছে, মৃত্যুচিন্তা কি জিনিস!

(মোহনের প্রতি) এই জীবনটাকে বাড়াবার প্রচেষ্টা জগতে সর্বদা হয়েছে — সর্বদেশে, সর্বকালে। তাহলে বেশীদিন বিষয়ভোগ করা চলবে, এই ভেবে। যযাতি পুত্রের আয়ু নিয়ে ভোগ করলেন, কিন্তু তবুও আশা মিটলো না। এ যে মিটবার নয় — আগুনে ঘি ঢাললে কি আর আগুন নেভে? হঠযোগ পর্যন্ত হয়েছে আয়ু বাড়াবার চেষ্টায়। আজকাল কত রকম গবেষণা চলছে পাশ্চাত্ত্যে। জানোয়ারের গ্ল্যাণ্ডস্ দিয়ে আয়ু বাড়াবার চেষ্টা চলেছে। কিন্তু কি করে চিরায়ু হতে হয়, তা লোক জানে না। নচিকেতা এটি বুঝেছিল। তাই বললে, আমি এই finite life (ক্ষণভঙ্গুর জীবন) — লোকে যাকে শতায়ু বলে, তা চাই না। আমি চাই infinite life, infinite existence life everlasting — অনন্ত জীবন, অমৃতত্ব।

সেটি হয় ঈশ্বরলাভ হলে। ঈশ্বর অনন্ত জীবন, অনন্ত সুখের স্বরূপ। ভারতীয় তত্ত্ববিজ্ঞানবিদ্গণ অর্থাৎ ঋষিগণ, অবতারগণ, মহাপুরুষগণ ও পথের সন্ধান সর্বদা জগৎকে বলে দিচ্ছেন। তাঁরা বলছেন — জীবগণ, এমন সুখ চাও, এমন জীবন চাও, যার শেষ নাই, অন্ত নাই। আমরা তা লাভ করেছি। তোমরাও এই রাস্তা ধরে এসো, উহা লাভ করে কৃতার্থ হবে। ক্রাইস্ট যাকে eternal life (অনন্ত জীবন) বলেছেন, ঋষিগণ তাকেই অমৃতত্ব বলেছেন। নচিকেতা অমৃতত্ত্বের খদ্দের। এইটি মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য — এই অমৃতত্ব, এই অতিমৃত্যু।

এইটি বলতে অবতার আসেন। এই কথা বোঝাতে ঠাকুর এসেছেন। এই পরমাত্মাই, নচিকেতার জিজ্ঞাস্য যাহা, মানুষ শরীর ধারণ করে এসেছেন। তিনি শুধু উদ্দেশ্যের কথা বলেই ক্ষান্ত হন নাই, উপায়ের সন্ধানও দেখিয়ে গেছেন। আবার কতকগুলিকে 'অতিমৃত্যু' লাভ করিয়ে দিয়ে গেছেন। ইহা দুর্লভ, কিন্তু অসম্ভব নয়। তিনি বলেছেন, নির্জনে গোপনে ব্যাকুল হয়ে কাঁদ, তিনি অবশ্য দেখা দিবেন।

ঠাকুরের initiation for humanity (বিশ্বমানবের জন্য দীক্ষার বাণী) রয়েছে। তিনি বলেছিলেন, ঈশ্বরের যে ভাব যার ভাল লাগে, সে সেই ভাবে তাঁকে ডাকুক — সাকার, নিরাকার, যে কোন ভাব। এমনও বলেছেন, যাদের ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই তারা এই বলে প্রার্থনা করতে পারে — 'যদি ঈশ্বর বলে , সত্যবস্তু বলে কেহ থাকে, তবে আমার সহায় হও। পথ বলে দাও — সংশয় দূর কর। সুখ ও শান্তি বিধান কর।' কি উদার হৃদয়, কি উদার বাণী! দীক্ষা দীক্ষা করে লোক — বিশ্বাস করলে এটাই দীক্ষা। ঠাকুর জগৎগুরু। তাই সকলের জন্য সব রকম ব্যবস্থা করে গেছেন। আবার তাঁর prayer for humanity-ও (বিশ্বমানবের জন্য জগন্মাতার নিকট প্রার্থনা) রয়েছে। তিনি বলেছিলেন — 'মা, যারা আন্তরিক এখানে আসবে, তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো।'

ঠাকুরের এই আহ্বানে কত লোক এসেছে, এখনও আসছে, ভবিষ্যতেও আসবে। তাঁর কৃপায় কত জনের অমৃতত্ত্ব লাভ হয়ে গেছে, এখনও হচ্ছে, আর ভবিষ্যতেও হবে। তাঁর কৃপামূল — 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।'

৪

মধ্যাহ্ন আহারের পর শ্রীম নিজ কুটীরে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে একটি ভক্ত ঢুকিলেন। এখন বেলা এগারটা। এই ভক্তটি গোপনে দিনলিপি লিখিয়া থাকেন। শ্রীম-র সৎসঙ্গে যেসব ঈশ্বরীয় কথা হয় তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করেন। শ্রীম উহা জানিতে পারিয়াছেন। আজ বেলা সাড়ে আটটার সময় বলিয়াছিলেন, আহারের পর উহা শুনিবেন।

দুই একদিন পূর্বেও উহা শুনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাই লেখক এখন পড়িয়া শুনাইতেছেন। গতকালের দিনলিপি শুনিতেছেন, আর suggestions-ও (উপদেশ) মাঝে মাঝে দিতেছেন।

একটি বিত্তশালী ভক্ত ভগবৎচিন্তার অবসরের জন্য ব্যাকুল, কিন্তু সংসারে নানাভাবে জড়িত। কি করিয়া সংসারচক্র হইতে নির্মুক্ত হইয়া তিনি অবসর পাইতে পারেন, এই সম্বন্ধে শ্রীম অপর একটি ভক্তের নিকট কিছু কিছু উপায় বলিয়া দিয়াছিলেন। এই কথা এখন পাঠ হইতেছে।

শ্রীম — (লেখকের প্রতি) বেশ করেছেন এটি লিখে। কখনও বলতে হলে এই রকম করে indirectly (পরোক্ষভাবে) বলতে হয়, directly (প্রত্যক্ষভাবে) বলতে নেই। বলতে হয় — মশায়, আমার ডায়েরীতে এ রকম আছে। যেমন শুনেছি তেমনি লিখেছি। এসব বিষয়ে directly (সাক্ষাৎভাবে) কোন কথা বলতে নেই। এতে অন্যের interest (স্বার্থ) আছে কিনা! ওরা সব শত্রু হয়ে দাঁড়াবে। জগতে যত tragedy (দুর্ঘটনা) হয়ে গেছে, আর ড্রামা, সব স্বার্থ নিয়ে। একজনের স্বার্থ কম পড়লেই এই সবের সৃষ্টি হয়। পাণ্ডবদের দেখ। একজন বলছে রাজ্য দেবে না, অপর পক্ষ ছাড়বে না। তাই এই ভারতযুদ্ধ। মহাভারত, রামায়ণ, ম্যাকবেথ, কিং লিয়ার — এ সবই স্বার্থ নিয়ে সৃষ্টি।

স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন ভাবছে, ইনি আমাদের সম্পত্তি — আমরা ভোগ করবো। এদের স্বার্থে হয়তো হাত পড়ছে। এর মধ্যে গেলে ওরা বলবে — ওমা, এটা আবার কে এসেছে ভালবাসা দেখাতে? তখন স্বরূপ ধরবে। শত্রু মনে করবে। এমনতর কাণ্ড সংসার! Interest (স্বার্থ) নিয়ে যত সব মারামারি, কাটাকাটি, যুদ্ধবিগ্রহ — এসব হচ্ছে।

যাদের পরমার্থজ্ঞান হয় নাই, এসব মিথ্যা বলে কথঞ্চিৎ বোধ হয় নাই, সংসারই যাদের কাম্য, পরম ধনের সন্ধান যারা পায় নাই, তারা তো হবেই ঐ রকম। এতে আশ্চর্যের কিছু নাই। তারা বুঝবে কি করে ওসব কথা — সাধুসঙ্গ, নির্জনবাস, ঈশ্বরদর্শন জীবনের

উদ্দেশ্য — এই সব? এরা সব এই সংসারের ভোগ নিয়ে আছে। তুমি হয়তো একটু বুঝেছো এই সব কথা তপস্যাদি করে। তাও একবার বিশ্বাস হচ্ছে, আবার যাচ্ছে। তাদের তো আর তপস্যা নাই। বোঝালেও বুঝবে না সহজে। যখন সময় হবে আপনা থেকেই হবে। এই জন্য সব চাইতে ভাল পথ — the best way, directly (সোজাসুজি) কিছু না বলা।

এমন দেখেছি, পাঁচটাকা মাইনের চাকরী করে একজন। অপর একজনের কথায় তার চাকরী চলে গেল। অমনি সে শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে তাকে খুন করবে বলে। একজনের পক্ষে পাঁচটাকা কিছু নয়, কিন্তু তার পক্ষে অনেক। তার ভাত মারা গেছে — তাই শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অনেক গুরু সেই জন্য directly (সাক্ষাৎভাবে) কিছু বলেন না শিষ্যদের। তাঁরা জানেন, শিষ্য জীবনে তা পালন করতে পারবে না। কিন্তু indirectly (প্রকারান্তরে) বলে রাখেন সব কথা। সময় হলে তখন বুঝবে। একজন নানকপন্থী সাধুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কথাপ্রসঙ্গে বেশ একটি কথা বলেছিলেন। বললেন, 'মহারাজ, শোনে গা কৌন্?' বললেই কি সকলে শোনে? সময় হলে তবে শোনে। এ থেকেই অধিকারীবাদের সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রীম — একটি অতি সুন্দর গল্প আছে। দুইজন partner (অংশীদার) একটা কাজ করতো জুয়েলারীর। একজন মরে গেল একটিমাত্র ছেলে রেখে। তার স্ত্রী ছেলেকে সঙ্গে করে অপর শরিকের বাড়ি এসে বললে, 'কর্তা মারা যাবার সময় একে আপনার হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন। আমাদের আর কেই বা আছে। আর এই একখণ্ড হীরক রেখে গেছেন। তার দাম বলেছিলেন, একলাখ টাকা।' বন্ধুটি দেখে বুঝতে পারলো এর দাম পাঁচ হাজার টাকা। তখন সে বললে, 'ওটা এখন বরং আপনার কাছেই রেখে দিন। আর ছেলে বেরুতে থাক আফিসে।' বন্ধু এটা নিলে না। কেন? না, যদি তখন সে পাঁচ হাজার টাকা বলতো হীরেটার দাম, তাহলে বন্ধুপত্নীর এ কথা বিশ্বাস হতো না। মনে করতো, মিথ্যা কথা বলে ঠকাতে চায়।

তাই নিজের কাছে রেখে দিতে বললেন। ছেলেটি সব কাজ শিখে কিছুদিনের মধ্যে লায়েক হয়ে উঠেছে। হীরে, মণি, মুক্তার দাম সব জানে। একদিন সে মাকে বললে, 'কই মা সেই হীরেটা, দাও তো, দেখি কেমন? দেখে বললে, 'এর দাম পাঁচ হাজার টাকা — এক লাখ টাকা নয়।'

সময় হলে আপনি বোঝে, তখন চেষ্টা করতে হয় না। এখন হাজার বল, কেউ শুনবে না। বেশী বললে ফল উল্টো হবে। এই জন্য direct (স্পষ্ট করে) বলতে নাই।

লেখক — এসব ডায়েরী পড়ে অপরকে শোনানো উচিত কি? বাবুজীকে শোনাব কি — আর বাবাজীকে?

শ্রীম — না, ডায়েরীর কথা যাকে তাকে বলা উচিত নয় — খুব confidential (গোপনে) রাখতে হয়। যেখানে personality আর criticism (কোন ব্যক্তির কিম্বা সমালোচনার) কথা আছে, সেখানে খুব সাবধান। এসব কথা না বলাই ভাল। আর সব রিপোর্ট ঠিক নাও হতে পারে। তবে সাধারণগুলি, যেমন ভাগবত উপনিষদ্ গীতা — শাস্ত্রাদির কথা, সাধুসঙ্গ, নির্জনবাসের কথা — এসব সম্বন্ধে সকলকেই বলা যেতে পারে। কিন্তু ব্যক্তি আর সমালোচনা সম্বন্ধে খুব সাবধান। বাবুজীকে খুব গোপনে সব বলতে পার, অপরে না জানে। কিন্তু বাবাজীকে বলে কাজ নাই, ওরা সব ছেলেমানুষ। সাধারণগুলি বলা যেতে পারে। কলকাতায় গিয়ে আরও শুনবো ডায়েরী, আর suggestion (উপদেশ) দিতে চেষ্টা করবো।

একটি ব্রহ্মচারী শ্রীম-র সহিত তাঁহার কুটীরে বসিয়া আছেন। সাধনভজন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন। এখন বেলা সাড়ে বারটা।

ব্রহ্মচারী — অনেক সময় সংখ্যা জপ করা হয়ে ওঠে না, কোন না কোন বিঘ্ন এসে উপস্থিত হয়। সে অবস্থায় কি করা উচিত?

শ্রীম — একশ' আট বার তাঁর নাম করা উচিত। যে কোনও অবস্থায় এ সংখ্যা হতে পারে। মন সর্বদা ফাঁকি খোঁজে। তাতে যদি আবার কোন কার্য এসে পড়ে তবে তো কথাই নাই। মন কাজ তৈরী করে নেয়। তেমন কোন কাজ না থাকলে বলে, 'আমায় স্টেশনে

যেতে হবে — মামাবাবুর শালা আসছেন।’ যেদিন মামার শালা আসবেন না সেদিন হয়ত মন বলবে, ‘হরে বেচারীর জামাই এসেছে, তার সঙ্গে দু’বাজী তাস খেলে আসা যাক্।’ নয়তো মন বলবে, ‘আজ শরীরটা বড়ই খারাপ।’ পেটটা হয়তো একটু কামড়াচ্ছে, কিম্বা দু’টো হাঁচি বেশী হয়েছে। এই রকম। মন সর্বদা ওজর খোঁজে। তাই খুব চেষ্টা করতে হয়। মনের উপর লক্ষ্য না রাখলে কোথায় নিয়ে যাবে তার ঠিক নেই। তাই সর্বদা হুঁশিয়ার সতর্ক থাকতে হয়। কখনও শৈথিল্য না হয়। আর প্রার্থনা।

মন যেন দুষ্ট ঘোড়া — সর্বদা চঞ্চল। কখনও পিঠে হাত বুলিয়ে শান্ত করা, কখনও চাবুক মারা। কখনও বা বিচারের রশ্মি টেনে ধরা। কখনও একেবারে ছেড়ে দেওয়া। ঘুরতে থাকুক দিল্লী, বিলেত। কিন্তু খেয়াল করতে হবে সর্বদা তার গতিবিধির উপর। এগুলি নানা অস্ত্র। এক এক অবস্থায় এক এক রকম প্রয়োগ করতে হয়। তাঁকে আন্তরিক প্রার্থনা করলে তিনি সব মনে উদয় করে দেন, কখন কি করতে হবে।

ব্রহ্মচারী — মন কখনও বেশ বসে, কখনও গোলমাল করে, এরকম হয় কেন?

শ্রীম — মনের স্বভাবই এই। মহামায়া স্থির হতে দেন না। যখন কার্যগতিকে প্রতিবন্ধক হয় তখন না হয় একটু কমই হলো, কিন্তু যখন মন ভাল থাকে তখন খুব করে নিতে হয়। উঠে পড়ে লাগতে হয়। এই হলো secret (কৌশল) মন বশ করবার। এইরূপ করতে করতে মনের উপর আধিপত্য এসে যায় ক্রমশঃ। তখন আপনিই শান্ত হয়। কোন কার্যগতিকে নিত্যকার ধ্যান, কিংবা সংখ্যা জপ না করতে পারলে অন্য সময় উহা পূরণ করে নেওয়া উচিত। বসুক বা না বসুক, নিয়ম রক্ষা করা চাই। অন্ততঃ বসে প্রণাম করে উঠে আসা উচিত।

ব্রহ্মচারী — আজ্ঞে, কাম-ক্রোধাদির সময় কি করা উচিত?

শ্রীম — প্রার্থনা করতে হয়, আর সাধুসঙ্গ করতে হয় সর্বদা। সাধুসঙ্গে এসব আপনি খসে পড়ে যায়। সাধুরও সাধুসঙ্গের দরকার।

শ্রদ্ধা থাকলে ঈশ্বরীয় যে কোনও নামজপ কর, কি যে কোনও

ভাব ধ্যান কর, কাজ হবেই! ঠাকুরের নাম মহামন্ত্র এ যুগে। তিনি বলেছিলেন প্রতিজ্ঞা করে, আমার চিন্তা যে করবে সে আমার ঐশ্বর্যলাভ করবে, পিতার ঐশ্বর্য যেমন পুত্র লাভ করে। তাঁর ঐশ্বর্য জ্ঞান ভক্তি, বিবেক বৈরাগ্য, শান্তি সুখ, প্রেম ও সমাধি।

একটি ভক্ত কলিকাতা রওনা হইতেছেন। এখন প্রায় অপরাহ্ন দুইটা। গাড়ী আড়াইটাতে। বিনয় ও ছোট অমূল্য সঙ্গে স্টেশনে যাইতেছেন। শ্রীম কুটীরপ্রাঙ্গণে জম্বুতলে দাঁড়াইয়া আছেন সাদাপাড় ধুতি ও লংক্লথের পাঞ্জাবীপরিহিত — পায়ে কালো বার্নিশ চটিজুতা। ভক্ত ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইয়া শ্রীম-র পাদমূলে প্রণাম করিলেন। কোনও বিশেষ কার্যোপলক্ষে ভক্ত শ্রীম-র আদেশে কলিকাতা যাইতেছেন।

কোনও জটিল কার্যে বিদেশগমনোদ্যত পুত্রের স্নেহময়ী জননীর ন্যায় শ্রীম করুণকণ্ঠে 'দুর্গা, দুর্গা, শ্রীদুর্গা, সর্ববিঘ্নবিনাশন' এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে ভক্তের পশ্চাৎ আশ্রমের ফটক পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। রাস্তায় কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া ভক্ত দেখিলেন — 'দুর্গা, দুর্গা, শ্রীদুর্গা' — এই প্রার্থনামুদ্রাতে শ্রীম তখনও দণ্ডায়মান। ভক্তদের জন্য কেন এত করুণা এই মহাপুরুষের? অকিঞ্চনের কল্যাণের জন্য কেন এত ব্যাকুল শ্রীভগবানের নিত্যলীলাসহচর এই মহর্ষি? ইহাই কি অহেতুক কৃপা?

মিহিজাম, বিহার। ২৪শে চৈত্র ১৩২৯ সাল।
৭ই এপ্রিল, ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ।
শনিবার, কৃষ্ণা পঞ্চমী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পূজ্যপাদ্য স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজ যখন শ্রীম-দর্শন রচনায় হিমালয়ের কোলে হৃষিকেশের 'তুলসী মঠ' আশ্রমে সাধনারত ছিলেন, সেই সময় ব্রহ্মলীন পরমারাধ্য স্বামী সারদেশানন্দজী মহারাজও ঐ মঠে অবস্থান করিতেন। শ্রীশ্রী মায়ের আশীর্বাদ পুষ্ট সৌভাগ্যবান তাপস স্বামী সারদেশানন্দজী তাঁকে এই সুমহান ব্রত উদ্‌যাপনে বিশেষ রূপে সহায়তা করেন। স্বামী সারদেশানন্দজী মহারাজের এই অকৃপণ স্নেহপরায়ণ সহায়তায় শ্রীম-দর্শন রচনা সম্ভবপর হয়। শ্রী ম ট্রাস্ট এবং স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজের সেবকগণ আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সহিত এই অপরিশোধ্য ঋণ স্মরণ করেন।

শ্রীম - দর্শন

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধন

(প্রথম ভাগ)

শ্রীম - দর্শন ❁ স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

৮

গ্রন্থকার

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ দীর্ঘকাল শ্রীম-র সান্নিধ্যে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সঙ্গে ও সাধু ভক্তদের সঙ্গে শ্রীম-র যেসব ঈশ্বরীয় কথা হইত তাহা তিনি নিত্য ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতেন। শ্রীম এই ডায়েরীর পাঠ শুনিয়াছেন, আর স্থানে স্থানে সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। আর কিভাবে উত্তমরূপে ডায়েরী রাখিতে হয় তাহাও শিখাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীম-দর্শন এই ডায়েরীর সংকলন। সম্পূর্ণ গ্রন্থ ষোল ভাগে লিখিত।

ইহাতে আছে ঠাকুর, মা, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের কিছু কিছু নূতন কথা। আর কথামৃতকারের দ্বারা কথামৃতের ভাষ্য। অধিকন্তু উপনিষদ, গীতা পুরাণ, তন্ত্র, বাইবেলাদি শাস্ত্রের শ্রীরামকৃষ্ণের উদার ভাবসম্মত অভিনব ব্যাখ্যা।

।। কয়েকটি অভিমত ।।

স্বামী বিরজানন্দ (শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট) বলেন, শ্রীম-দর্শন অপূর্ব মনোমুগ্ধকর গ্রন্থ। ইহার লিখনভঙ্গী যেমনি নাটকীয়, বিষয় - বস্তুও তেমনি সুগম ও সুগভীর।

প্রবুদ্ধ ভারত — শ্রীম দর্শন এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক রত্ন।

বিশ্ববাণী — রচনানৈপুণ্যে ও বর্ণনামাধুর্যে শ্রীম-দর্শন পাঠকালে কথামৃতের কোনও নবতর সংস্করণ বলে ভ্রম হয়। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ-সাহিত্যে এক অপূর্ব সংযোজন।

ভবন জারনেল (বম্বে) — প্রতি মানবই শ্রীম-দর্শন থেকে কিছু না কিছু লাভ করবে।

আনন্দবাজার পত্রিকা — শ্রীম-দর্শন শ্রীরামকৃষ্ণ ভাষ্যকারের...জীবনভাষ্য। গ্রন্থকার গভীর একটি তত্ত্ববোধিনী দৃষ্টি নিয়ে সেই মহাশ্চর্য জীবনকথা আলোচনা করেছেন। ভক্ত বা ধর্মনিরপেক্ষ যে কোন পাঠকের কাছেই এর আবেদন অমোঘ।

শ্রীম

শ্রীম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বিশিষ্ট স্নাতক। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেন, 'এই চক্ষে চৈতন্য-সংকীর্তনে তোমাকেও যেন দেখেছিলাম।' 'তোমার চৈতন্য ভাগবত পড়া শুনে তোমায় চিনেছি।' মাস্টার স্বভাবসিদ্ধের থাক্।' 'তুমি আপনার লোক এক সত্ত্বা যেন পিতা আর পুত্র।' 'তুমি অন্তরঙ্গ।' 'তুমি জহুরীর জাত।' 'তোমাকে জগদম্বার একটু কাজ করতে হবে — লোককে ভাগবত শিখাতে হবে।' 'মা এর চৈতন্য কর। তা না হলে অপরকে কেমন করে চৈতন্য করবে।' 'আমি ছাড়া এ কিছু জানে না।' 'মা ওকে এক কলা শক্তি দিলে? ও বুঝেছি, ওতেই তোর কাজ হবে।'

শ্রীম-র অবিনশ্বর কীর্তি বর্তমান যুগের বেদতুল্য মহাগ্রন্থ সম্বন্ধে শ্রীশ্রী মা বলেন, — একদিন তোমার মুখে কথামৃতের পাঠ শুনিয়া বোধ হইল, তিনিই (ঠাকুর) ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেন — কথামৃত অপূর্ব। এর রচনাভঙ্গী মৌলিক।.... এই মহাকার্যের জন্য আপনি পূর্ব হইতে চিহ্নিত হইয়া আছেন।

প্রতীচীর মহামনীষী রোমা রোঁলা বলেন — শ্রীম-র লেখা যেন শর্টহ্যান্ড রিপোর্ট।

এলডাস্ হাক্সলী বলেন — কথামৃত জগতে প্রথম ও অদ্বিতীয়, ধর্মাচার্যদের জীবনচরিতের মধ্যে।

ইসারউডের মর্মবাণী — কথামৃত লিখে শ্রীম আমাদের ও ভবিষ্যৎ মানবসমাজের এত উপকার করেছেন যে তা বলে শেষ করা যায় না।

মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট, ঠাকুরের অন্যতম পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বেলুড় মঠে শ্রীমকে বলেছিলেন, কথামৃতও একটি, তার লেখকও একটি। যতবার পড়ি ততবার নূতন বলে বোধ হয়। আহা, কি অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করেছেন। মঠের চৌদ্দ আনা লোক সাধু হয়েছে কথামৃত পড়ে আর আপনার সঙ্গে মিশে।

যুগান্তর —'কথামৃত নব বেদান্তের গঙ্গোত্রী।' 'নব যুগের ভগীরথ কথামৃতকার শ্রীম।' 'কলিযুগের নারদ মহেন্দ্রনাথ।' 'নববেদান্তের একটি মূল স্তম্ভ স্বামী বিবেকানন্দ, অন্যটি শ্রীম।' শ্রীম এই তত্ত্বদর্শী, গৃহী মানুষের চাক্ষুষ আদর্শ।

ঃ এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থাবলী ঃ

(১) শ্রীম-দর্শন (বাংলা) ১ম হইতে ১৬শ ভাগে সমাপ্ত

(২) শ্রীম-দর্শন (হিন্দী) ১ম হইতে ১৬শ ভাগে সমাপ্ত

(৩) শ্রীম-দর্শন (ইংরাজী) - "M. the Apostle and the Evangelist", ১ম হইতে ১১শ ভাগ

(১৬ ভাগ পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ইংরাজীতে প্রকাশিত হইবে)

(৪) Sri Sri Ramakrishna Kathamrita Centenary Memorial

(৫) A Short Life of Sri "M"

(৬) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (হিন্দী), ভাগ ১ম হইতে ৫ম (মূলগ্রন্থের যথাযথ হিন্দী অনুবাদ)

(৭) The Life of M. and Sri Sri Ramakrishna Kathamrita

এই সকল গ্রন্থে আছে —

ভারতীয় সংস্কৃতি - আধ্যাত্মিকতা — আত্মদর্শন, ঈশ্বরদর্শন আর যোগসাধনার বিবিন্ন প্রণালী সম্বন্ধে — বর্তমান কালোপযোগীভাবে সিদ্ধ মহাপুরুষের উপদেশ — যাহা পড়িয়া দেশবিদেশের বহু নরনারী চির শান্তি ও পরমানন্দের অধিকারী হইয়াছেন ও হইতেছেন।

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

1. Sri Ma Trust Office
579, Sector 18-B, Chandigarh 160018

2. Sri Sri Ramakrishna Kathamrita Peeth
Sri Ma Trust
Sector 19-B, Chandigarh - 160019

3. Smt. Padma Gadi
R-899, New Rajendra Nagar
New Delhi -110060

নিবেদন

শ্রীম-দর্শন ষোলটি খণ্ডে সম্পূর্ণ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপার অনুগ্রহে এই গ্রন্থের প্রথম ভাগের প্রথম সংস্করণ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ১৯৬০) প্রকাশিত হইয়াছিল। তদবধি ভক্তগণের চাহিদাতেই একের পর এক সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভব হইতেছে।

শ্রীম-দর্শনের মূল আবেদন ঃ গৃহে বাস করিয়া কি প্রকারে দেবভাবে জীবন যাপন করা যায়, কিভাবে বেদবর্ণিত উপায়ে সুখ দুঃখ সমভাবে গ্রহণ করিয়া সংসারে শান্তিতে বাস করা সম্ভব হয়।

এই পুস্তকে আছে পরমহংসদেবের ও মায়ের কিছু নূতন কথা, আর স্বামীজীপ্রমুখ অন্তরঙ্গ সন্তানদের কথা। আর আছে 'কথামৃত'-কার দ্বারা 'কথামৃত'-র ব্যাখ্যা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনালোকে উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, পুরাণ, বাইবেল-আদি শাস্ত্রের আলোচনা।

শ্রীমতি ঈশ্বরদেবী গুপ্তা শ্রীম-দর্শনের পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ শ্রীম-র কথামৃত হইতে স্বর্গীয় আনন্দ ও শান্তি উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং স্বামী নিত্যাত্মানন্দজীকে এই পুস্তক প্রকাশের জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। তিনি নিজে বাংলাভাষা শিক্ষা করিয়া এই গ্রন্থ হিন্দীতে অনুবাদ করেন যাহাতে হিন্দী ভাষাভাষী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ এই মহাগ্রন্থের রসাস্বাদন করিতে পারেন। পরে এই গ্রন্থ 'M - the Apostle and the Evangelist' নামে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন শ্রীযুক্ত ধরমপাল গুপ্ত মহাশয়।

পূজ্যপাদ স্বামী নিত্যাত্মানন্দজী মহারাজ এই মহাগ্রন্থ প্রকাশ করিবার দায়িত্বভার 'শ্রী ম ট্রাস্ট'-এর উপর অর্পণ করিয়া গিয়াছেন এবং তদবধি ট্রাস্ট এই গ্রন্থরাজি বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় নিয়মিতভাবে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে।

শ্রীম-দর্শন মুদ্রণে এবং প্রকাশনে যে সকল সহকর্মী, অনুরাগীবৃন্দ ও ভক্ত সমাজ অক্লান্ত সহায়তা দান করিয়াছেন তাহাদের প্রত্যেককে আমাদের অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বিনীত
প্রকাশক

শ্রীম - দর্শন

ভারতীয় সংস্কৃতি ও আত্মজ্ঞানের পথ প্রদর্শক
শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ

শ্রীম-র কথামৃত

(প্রথম ভাগ)

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

শ্রী ম ট্রাস্ট

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট

৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি, চন্ডীগড় - ১৬০০১৮

প্রকাশক ঃ
প্রেসিডেন্ট
শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম প্রকাশন ট্রাস্ট
(শ্রী ম ট্রাস্ট)
৫৭৯, সেক্টর ১৮-বি
চন্ডীগড় - ১৬০০১৮
ফোন ঃ ০১৭২-২৭২৪৪৬০
Website : http://www.kathamritra.org

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

সপ্তম সংস্করণ
শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মতিথি
২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৪১৩
(১১ই ডিসেম্বর, ২০০৬)

মুদ্রাক্ষর বিন্যাস ঃ
শ্রীমতী রমা চক্রবর্তী
ডি-৬৩০, চিত্তরঞ্জন পার্ক
নিউ দিল্লি - ১১০০১৯
ফোন ঃ ০১১-৪১৬০৩৯৯৬

মুদ্রক ঃ
শ্রী অরবিন্দ গুপ্ত
প্রিন্ট ল্যান্ড, কাশ্মীরি গেট, দিল্লী
ফোন ঃ ০৯৯১১৩৮৬৭১৬/০৯৮১০০৮৬৭১৬

মূল্য ঃ পঞ্চাশ টাকা (Subsidised)

সূচীপত্র

প্রাক্‌কথন ১
প্রথম সংস্করণের ভূমিকা ৩
আচার্য শ্রীম-র সংক্ষিপ্ত জীবনী ২৭
প্রথম অধ্যায়
মিহিজামে শ্রীম ৪২
দ্বিতীয় অধ্যায়
লক্ষ্য — ঈশ্বরলাভ, নিষ্কাম কর্ম — উপায় ৪৭
তৃতীয় অধ্যায়
লৌকিকবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যালাভের সোপান ৬২
চতুর্থ অধ্যায়
ভারতের ভাব — যত কিছু ভাল সব ঈশ্বরে সমর্পণ ৬৭
পঞ্চম অধ্যায়
আগে ঈশ্বর, পরে সব — 'আমায় ধর' ৭৩
ষষ্ঠ অধ্যায়
লীলায় বিচিত্রতার প্রয়োজন ৮৯
সপ্তম অধ্যায়
সত্যস্বরূপ ঠাকুরকে ধরেছেন, আর ভয় নাই ৯৪
অষ্টম অধ্যায়
যথার্থ বীর কে? — প্রেয়কে তুচ্ছ করেছে যে ১১৫
নবম অধ্যায়
মেয়েরা মায়ের জাত ১২২
দশম অধ্যায়
সদাচার বড় দরকার ১২৫
একাদশ অধ্যায়
ঠাকুরের তিন মন্ত্র ১২৮
দ্বাদশ অধ্যায়
চাতক অন্য জল খাবে না ১৪৬

ত্রয়োদশ অধ্যায়
পুরুষকার আর কৃপা — বস্তু একটি ১৫৮
চতুর্দশ অধ্যায়
দ্বৈতভাব থেকে অদ্বৈত ১৭২
পঞ্চদশ অধ্যায়
যতক্ষণ ইন্ধন ততক্ষণ অগ্নি ১৮৪
ষোড়শ অধ্যায়
রামনবমীর আনন্দোৎসবে শ্রীম ১৯৮
সপ্তদশ অধ্যায়
ঠাকুরের বৈশিষ্ট্য — 'ধর্মসমন্বয়' ২১০
অষ্টাদশ অধ্যায়
সমাধি লাভ সকলেরই হইবে ২২৭
ঊনবিংশ অধ্যায়
অক্ষম ছেলের মত শরণাগত ভক্তেরই ভার ঈশ্বর লন ২৩৭
বিংশ অধ্যায়
উঠন্ত যৌবন ভগবদ্-আরাধনার শ্রেষ্ঠ সময় ২৫৪
একবিংশ অধ্যায়
জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে সেবা ২৭৪
দ্বাবিংশ অধ্যায়
কবি ও দার্শনিকের গন্তব্যস্থল এক ২৮৯
ত্রয়োবিংশ অধ্যায়
ঈশ্বরকে না জানাই অতি বড় দুঃখ ৩০৮
চতুর্বিংশ অধ্যায়
ম্যাক্সমূলার ও শ্রীরামকৃষ্ণ — গীতার ছয়টি শ্লোক ৩২৪
পঞ্চবিংশ অধ্যায়
সোপেনহার ও ধর্মজীবন ৩৫৪
ষড়বিংশ অধ্যায়
অতিমৃত্যুলাভ দুর্লভ, কিন্তু অসম্ভব নয় ৩৭৭

* * *

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব
(১৮৩৬ - ১৮৮৬)

যোগীর চক্ষু

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি অর্থাৎ মাষ্টার মহাশয়ের প্রতি) — যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে, — সর্বদাই আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যাল্ ফ্যালে, দেখলেই বুঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে — সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নামমাত্র চেয়ে রয়েছে! আচ্ছা আমায় সেই ছবি দেখাতে পার?

মণি — যে আজ্ঞা। আমি চেষ্টা করবো যদি কোথাও পাই।

[দক্ষিণেশ্বর, ২৪শে আগষ্ট, ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ]

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৩য় ভাগ - ২য় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ)

দক্ষিণেশ্বরে বেলতলায় শ্রীম

গ্রন্থকার স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

(গঙ্গা দশহরা, ১৮৯৩ হইতে ১২ই জুলাই, ১৯৭৫)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম)

(১৪ই জুলাই, ১৮৫৪ হইতে ৪ঠা জুন, ১৯৩২)

শ্রীমদর্শন - অন্যান্য ভাগের কিয়দংশ (এক ঝলক)

ঈশ্বরদর্শন মনুষ্যজীবনের আদর্শ। এটি নিশ্চয় করে যা ইচ্ছা কর। তখন বেচালে পা পড়ার সম্ভাবনা কম। সকলে যদি এ করে, তবে দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে নিমেষে। আর ঠাকুরকে ধরা। ইনি এ যুগের আদর্শ। ভারতকে উঠাতে এসেছেন। ভারত উঠলে জগৎ উঠবে। ভারতের উত্থান অবশ্যম্ভাবী।

২য় ভাগ অধ্যায় ২১ (২)

ঠাকুর একটি গল্প বলতেন। দুই বন্ধু বেড়াতে বেরিয়েছেন। একজন রাস্তার পাশে ভাগবত পাঠ হচ্ছিল দেখে ওখানেই বসে পড়লো। আর একজন গেল বেশ্যালয়ে। যে বেশ্যালয়ে গেল খানিক পর সে ভাবছে, ছিঃ আমি কি হীন কাজ করছি। ভাগবত পাঠ ছেড়ে এ নরকে এসেছি। যে ভাগবত পাঠে ছিল সে ভাবছে বন্ধু আমার কত মজা লুটছে। দু'জনেরই মৃত্যু হলো। যে ভাগবত পাঠে ছিল তাকে নিয়ে গেল যমদূত নরকে মারতে মারতে। আর যে বেশ্যালয়ে গিছলো সে গেল বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুদূতের সঙ্গে। এর মানে হলো, মনই সব। শরীরটা নাই বা গেল। মন গেলেও হয়। মন যেখানে তুমিও সেখানে।

৩য় ভাগ ১৫ অধ্যায় (৩)

২রা এপ্রিল, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ। স্বামী সারদানন্দ, আমেরিকা নিবাসী পরমভক্তিমতী ফক্স ভগিনীদ্বয়কে শ্রীম-র নিকট পাঠাইয়াছেন। তাঁহারা স্বামী বিবেকানন্দের গুরুভ্রাতা এবং কথামৃতকার শ্রীম-র সহিত বার্তালাপ করিতেছেন।

"M.– Do you remember what did you find in Swamiji that impressed you most?

Both Sisters – His snow-white purity and dynamic spirituality. Premika (Radhika supporting) – When we heard him we felt his spirit was lifting our soul per force much against all our

intellectual barriers, to a serene and beatific stage. This living religion we hankered after. And Swamiji quenched that long thirst...."

শ্রীম এই ভগিনীদ্বয়কে স্বামীজী এবং ঠাকুরের বিষয়ে বলিতেছেন।

Narendra (Swami Vivekananda) sang this song in the northern verandah leading to the Master's (Sri Rama Krishna's) Chamber. And the Master was plunged in Samdhi...."

৪র্থ ভাগ অধ্যায় ৮ (১)

মর্টন স্কুলের সংস্থাপক রেক্টর শ্রীম এখন সর্বদা ঠাকুরের কথায় সময় ব্যতীত করিলেও মধ্যে মধ্যে স্কুলের বিষয়ে খবরাখবর লইয়া থাকেন। একদিন তিনি এক ভক্ত শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করিলেন (শিক্ষার মাধ্যম বিষয়ে) কি সব কথা হ'ল আমাদের স্কুলের টিচার কনফারেন্সে।

শিক্ষক উত্তর করিলেন, দেখলাম বৃদ্ধ শিক্ষকগণ আপনার প্রবর্তিত মাতৃভাষায় নূতন শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নন। — ইহা শুনিয়া শ্রীম বলিলেন, মাতৃভাষা ভিন্ন শিক্ষা হতে পারে না। .... জগতের সকলে আপন মাতৃভাষায় শিক্ষা পায় — এটা স্বাভাবিক। আশু বাবুও (স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়) এ বিষয়ে খুব ভাবছেন।..... উনি সেদিন লাহোর ইউনিভার্সিটির Convocation address-এ মাতৃভাষায় পড়ানোর প্রশংসা করেছেন।

৫ম ভাগ অধ্যায় ১৫ (৪)

.......ফিলোজফিকে ভারতে বলে দর্শন। অর্থাৎ প্রথমে ঈশ্বর দর্শন করা। তারপরে সেই সত্যটি যুক্তিতর্কের দ্বারা জগৎকে বুঝিয়ে দেওয়া। এরই নাম ভারতীয় দর্শন। সত্য, ভগবান একটি। দর্শন ছয়টি। আবার বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন। এ সবেরই basis (মূল) revelation (প্রত্যক্ষ) একই সত্য নানা বুদ্ধির ভিতর দিয়ে গিয়ে বহু নাম ধারণ করেছে। তাই ভারতীয় দর্শনের ভিন্নত্ব। মূলে একত্ব....।

৬ম ভাগ অধ্যায় ২২ (১)

শ্রীম — "কথা শুনতে হয়, গুরুজনদের কথা। গুরু মানে ঈশ্বর অবতার। নররূপী যে গুরু, তাঁকেও ঈশ্বরের রূপ মনে করতে হয়। তাই কথা মান্য করতে হয়। মহাজনদের আদেশই প্রসাদ।"

৭ম ভাগ অধ্যায় ৮

......ঠাকুরের আসার প্রধান কাজ অনন্ত কালের জন্য দুঃখ দূর করে সুখ শান্তি আনন্দের বিধান করা।...... *৮ম ভাগ* অধ্যায় ১৫

"........কর্মকাণ্ডে দেশ ছেয়ে গিছলো। এই জন্যই অবতার এক একবার আসেন, শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন, তিনি গীতা বলে সমস্ত বেদ উপনিষদের সার এক স্থানে দিয়ে গেলেন। কর্মের সার কি তা বলে গেলেন। ঈশ্বরই যুগে যুগে এসে সর্বশাস্ত্রের মর্ম কথা উদ্ঘাটন করে দিয়ে যান। এইবার ঠাকুর এসে ঐ কার্যটি করে গেলেন 'কথামৃত' মুখে।"

৯ম ভাগ অধ্যায় ১৪ (২)

"দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর নানা ভাবের সাধন করেছেন — বেদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি নানা মতের নানা সাধন। আবার ইসলাম ও খ্রীস্টান ধর্মমত। সব সাধন ক'রে সবে সিদ্ধ। ওখানেই বলেছিলেন — 'যত মত তত পথ'। সব ধর্মমতই ঈশ্বরের কাছে যাবার এক একটি পথ। পথমাত্র, কিন্তু ঈশ্বর নয়। .... সব জীবের, সব মানুষের উৎপত্তিস্থল এক, এক সত্য বস্তু। (ঈশ্বর) ....একই পিতার সন্তান সব মানুষ, এটা মনের গোড়ায় থাকলে বিভিন্ন প্রকৃতি ও শিক্ষা, বিভিন্ন আহার পরিচ্ছদ, বিভিন্ন ধর্মমতের ভিতর থেকেও সকলে মিলেমিশে থাকতে পারে......।"

১০ম ভাগ অধ্যায় ১৯ (১)

ভিক্ষার উদ্দেশ্য দুইটি — প্রথম, উদরপূরণ; দ্বিতীয়, মান ও অপমানে চিত্তের সমতা অভ্যাস।........ (সাধু) রাস্তায় ঠাকুরের নাম জপ করতে করতে যাবে। কোন বাড়িতে ঢুকবার সময় মনে করবে, আমি ভগবানের নাম নিশ্চিন্তে করতে পারবো বলে ভগবানের দ্বারে উপস্থিত হয়েছি।...

বেশী চাল দিলে নেবে না। .... এক বাড়িতে সব চাল ডাল দিলে নেবে না। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভিক্ষা করবে....... তোমার প্রয়োজনীয় পরিমাণ চাল হয়ে গেলেই চলে আসবে।......"

১১শ ভাগ অধ্যায় ১১ (১)

আজ ক্রীসম্যাস্। .... আজ সকাল হইতেই শ্রীম-র অন্তর্মুখীন ভাব। ভগবান যীশুর কথা স্মরণ মনন করিতেছেন। মাঝে মাঝে দুই চারিটি বাইবেলের বাণী শুনাইতেছেন। বলিতেছেন, ঠাকুরই ক্রাইস্ট। .... শ্রীম (অতি প্রত্যূষে ভক্তদের প্রতি) — Rejoice, rejoice — 'The Kingdom of heaven is at hand once again,.' আনন্দ কর। ভগবান আবার অবতীর্ণ হয়েছেন। হাত বাড়ালে

ধরা যায়.....। তিনি নিজমুখে বলেছিলেন, 'আমিই ক্রাইস্ট। .... বলেছিলেন, আনন্দ কর, আনন্দ কর, আনন্দময়ীর সন্তান সব, আনন্দ কর।'

১২শ ভাগ অধ্যায় ১ (১)

"ভারতের সংস্কৃতির মূর্তিমান বিগ্রহ ঠাকুর। তাই ঠাকুর বলেছেন, আগে ঈশ্বরকে ধরে ঈশ্বর হও মনে। তারপর বাইরে কাজ কর। তখন অপরের ভিতর ঈশ্বরজ্ঞান সঞ্চারিত হবে তোমার সঙ্গের প্রভাবে। আগে নিজে দেবতা হও, পরে অপরকে দেবতা কর। এই উপায়ে হিংসা দ্বেষও দূর হয়ে যায়। ভয়ও দূর হয়। মানুষে মানুষে প্রীতি ও শ্রদ্ধা বাড়ে।"

১৩শ ভাগ অধ্যায় ১০ (১)

শ্রীমকে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'পুরীতে আমিই জগন্নাথ।' ঠাকুরের জীবিত অবস্থাতেই পাঁচ ছয়বার তাঁহাকে পুরীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বলিতেন, 'পুরীতে আমার যাবার যো নেই। সেখানে গেলে আমার শরীর ত্যাগ হবে।' .....শ্রীম কয়েক মাস ব্রহ্মচারীগণের সঙ্গে এই পুরীতে বাস করিতেছেন। ব্রহ্মচারীগণ অবাক হইয়া ভাবিতেন, কোথা হইতে এই শক্তি, এই উদ্দীপনা আসিতেছে। শ্রীম-র দৈনন্দিন জীবন শান্ত ও সমাহিত। কিন্তু এই মন্দিরদর্শন, প্রণাম ও পরিক্রমার সময় এই যুবকের তেজ কি করিয়া এবং কোথা হইতে আসিত, ইহা যুবক ব্রহ্মচারীদের নিত্য চিন্তার বিষয় ছিল।..... *১৪শ ভাগ - ভূমিকা*

কেন শ্রীমকে গৃহস্থাশ্রমে রাখিয়াছিলেন? পূর্বেই বলা হইয়াছে, গৃহস্থাশ্রমের লোকদের শিক্ষার জন্য। এই গৃহস্থাশ্রম সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে ভারত উঠিবে না। আর ভারত না উঠিলে জগৎও উঠিবে না। কেন?.....

১৫শ ভাগ ভূমিকা (২)

খাটুনিকে ভয় করলে ঠাকুরের ভক্ত হতে পারে না — 'ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত' হতে হবে। আর 'সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যৌ নির্বিকারঃ' হতে হবে। ঠাকুর এসেছেনই মানুষকে, এই দেশকে, জগৎকে ওপরে ওঠাতে। তাই তাঁর ভক্তদের খুব কাজ।.........

একটু ঘেমে গেলে, একটু সকালে উঠলেই যদি শরীর গলে যায় তা'হলে কি করে তাঁর ভক্ত হওয়া যাবে?....... তাঁর ভক্তরাও যদি ভুশভুশ করে ঘুমাবে, ঈশ্বরচিন্তা করবে কখন?....

১৬শ ভাগ অধ্যায় ১২ (২)

শ্রীমতী ঈশ্বরদেবী গুপ্তা

(৩০শে নভেম্বর, ১৯১৫ হইতে ২৬শে মে, ২০০২)

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ রচিত

'শ্রীমদর্শন' মহাগ্রন্থের প্রকাশিকা

শ্রীমতী ঈশ্বরদেবী গুপ্তাকে লিখিত শ্রীম-দর্শনের গ্রন্থকার স্বামী নিত্যাত্মানন্দজীর পত্র (মূল হিন্দী পত্রের বঙ্গানুবাদ)

শুভাশীর্বাদ

পরমকল্যানীয়া শ্রীমতী ঈশ্বরদেবী গুপ্তা,

দেবী, দেবার্চনার অর্ঘস্বরূপ আপনার কৃত 'শ্রীম-দর্শন'-এর (প্রথম ভাগ) হিন্দী অনুবাদ একাধারে অতি সুন্দর, সরল, সাবলীল, প্রাঞ্জল, ভাব-ব্যঞ্জক এবং মূল রচনার প্রতিচ্ছবি স্বরূপ।

অনুবাদকার্য স্বভাবতঃই নীরস। কিন্তু গ্রন্থের মূল বিষয়-বস্তুর সহিত আপনার একাত্মতা-হেতু এই অনুবাদ অতিশয় সরস ও সুরুচিসম্পন্ন হইয়াছে।

ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও বাংলাভাষা শিক্ষা করিয়া দৈনন্দিন জীবনে আচরণীয় বৈদান্তিক এই গ্রন্থ হিন্দী ভাষায় অনুবাদ অতি সুকঠিন কার্য।

'শ্রীম-দর্শন'-এর মূল বিষয়বস্তু ঃ সুখ-দুঃখময় এই সংসারে কি করিয়া বেদবর্ণিত দেব-জীবন লাভ সম্ভব, তাহারই পথ-নির্দেশ।

বেদ-মূর্তি যুগাবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষায় বর্তমান জড়-সভ্যতার যুগে আচার্য শ্রীম বনের বেদান্তকে ঘরে আনিয়া মূর্ত করিয়াছিলেন আপনার জীবনে — এই ঊনবিংশ-বিংশ শতকে, ঠিক যেরূপ মূর্ত হইয়াছিল বৈদিকযুগে - তপোবনে ঋষিগণের জীবনে।

'শ্রীম-দর্শন' মহর্ষি শ্রীম-র জীবনের একটি জীবন্ত আলেখ্য, আবার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা প্রকাশকও। বর্তমান বিজ্ঞানসম্মত যুগে, শ্রীম কথিত এই প্রামাণিক মহাগ্রন্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতের মনোমুগ্ধকর সজীব বিস্তৃত বিবরণ ও সটীক ভাষ্য।

আপনি এই পরম আকর্ষণীয় মহাগ্রন্থ (হিন্দীতে অনুবাদ করিয়া) হিন্দী ভাষাভাষী ভক্তগণের কর-কমলে পরিবেশন করিয়া এক সুমহান জ্ঞান-যজ্ঞ সাধন করিয়াছেন।

দেবী, আপনার এই মহৎ প্রচেষ্টা দেখিয়া স্বতঃই মনে উদয় হইতেছে যে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ আপনার হৃদয়-মন অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন।

তাঁহার শ্রীচরণে আন্তরিক বিনীত প্রার্থনা — তিনি তাঁহার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া আপনার দ্বারা 'শ্রীম-দর্শন'-এর অবশিষ্ট সকল ভাগও এইরূপ সরল, সুমিষ্ট, হৃদয়গ্রাহী অনুবাদ করাইয়া লউন।

ইহাদ্বারা আপনার জীবন হইবে অধিকতর ধন্য ও মধুময় এবং সমাজ-জীবন হইবে অধিকতর উন্নত ও দেবভাব-মন্ডিত। ইতি,

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, ঋষিকেশ, হিমালয়। শুভানুধ্যায়ী
দুর্গা-নবরাত্রি, ১৯৬৫ (ইং)। স্বামী নিত্যাত্মানন্দ